বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু

(Reflection of Ideologies in the Bangla Poetic Drama: Rabindranath Tagore and Buddhadeb Basu)

সান্‌জীদা মাসুদ
পিএইচ ডি গবেষক



বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়নঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু

(Reflection of Ideologies in the Bangla Poetic Drama: Rabindranath Tagore and Buddhadeb Basu)

পিএইচ ডি গবেষক
সান্‌জীদা মাসুদ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন : ২০/২০১৫-২০১৬
(খণ্ডকালীন)
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন: ১৮/২০২২-২০২৩
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ ডি তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর হোসনে আরা
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত ‘বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু’ শিরোনামের গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি মৌলিক রচনা এবং এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। এতে সহায়ক যে-সব তথ্য ও উপাত্ত অন্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব চিন্তার ফসল।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, বর্তমান অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভিলকবৃত্তি নেই।



(সান্‌জীদা মাসুদ)
পিএইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন : ২০/২০১৫-২০১৬ (খণ্ডকালীন)
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন : ১৮/২০২২-২০২৩
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, সান্‌জীদা মাসুদ কর্তৃক উপস্থাপিত ‘বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু’ শীর্ষক পিএইচ ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করেননি।

আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি।



(ডক্টর হোসনে আরা)
গবেষক-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিএইচ ডি গবেষণার সুযোগ প্রদানের জন্য শুরুতেই বাংলা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ বিভাগের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামালের তত্ত্বাবধানে পিএইচ ডি গবেষণায় নিবন্ধিত হই। তিনি অবসর গ্রহণ করায় এবং গবেষণাকর্ম সম্পন্ন না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃনিবন্ধন-কালে আমার পিএইচ ডি-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর হোসনে আরা। এটা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। উভয় তত্ত্বাবধায়কের সার্বিক সহযোগিতায় আমি নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ অভিসন্দর্ভ রচনায় সমর্থ হয়েছি। ডক্টর হোসনে আরা তাঁর ব্যস্ততম দিনগুলিতেও আমাকে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে গবেষণা সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করে এবং আমাকে অপূরণীয় কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার গবেষণাকর্ম ত্বরান্বিত করতে তিনি তাঁর অফিস-কক্ষ ব্যবহারেরও সুযোগ প্রদান করেন, এজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

পিএইচ ডি গবেষণা বিষয়ক উন্মুক্ত সেমিনারের দুইজন সম্মানিত আলোচক আমার শিক্ষক যথাক্রমে অধ্যাপক ডক্টর সৌমিত্র শেখর এবং অধ্যাপক ডক্টর মুনিরা সুলতানা-সহ উপস্থিত সকল শিক্ষকের নিবিড় পাঠ-পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এ অভিসন্দর্ভকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত সর্বোপরি ঋদ্ধ করেছে। যথাসময়ে গবেষণা-বিষয়ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বাংলা বিভাগের সভাপতি এবং আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর মোঃ সিরাজুল ইসলামকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অনালোকিত ক্ষেত্রে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে পরামর্শ প্রদান করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী। এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সাহচর্য ও সাহায্য পেয়েছি। আমার গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নবিজ্ঞান। এ বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়ে এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। তাঁর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য বাংলা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি। গবেষণার শেষ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে কাজ করার প্রয়োজনে আমি ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অফিস-স্পেস ব্যবহার করতে পেরেছি। এই সূত্রে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতিও জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক কম্পোজের কাজে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জাহাঙ্গীর খান জাহিদকে। তার আন্তরিক সহায়তায় আমার পরিশ্রম হ্রাস পেয়েছে।

সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতায় যখন আমি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার প্রত্যাশা ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সহকর্মী অধ্যাপক ড. ফজলে এলাহি চৌধুরী। অভিসন্দর্ভের কিছু অংশের পাঠ-পরিমার্জনাতেও তিনি সহায়তা করেছেন। তাঁর ভূমিকা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দের আন্তরিকতা ও উৎসাহ এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে নির্ভার করেছে। এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার জন্য সহায়তা নিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ গবেষণাকর্মের অন্যতম অনুপ্রেরণা আমার বর্তমান ও পূর্বতন দুই কর্মস্থলের শিক্ষার্থীবৃন্দ। তাদের প্রতি রইলো স্নেহ ও ভালোবাসা।

পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ভারে এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, সে-সময় প্রায় সমাধানহীন সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসেন আমার ছোটো ফুপি সাদিয়া আফরোজ। আমার সন্তানের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মো. মোখলেছুর রহমান আমাকে গবেষণাকর্মে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। মাসের পর মাস তাঁদের বাড়িতে অবস্থান করে এ অভিসন্দর্ভের সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন করেছি। বয়সে নবীন হয়েও মাতৃতুল্য স্নেহ ও দায়িত্ববোধে এই গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে আমার ফুপির ভূমিকা অনন্য। মায়সাম আবাবীল ওহী ও সুহায়লা আলিহানের সঙ্গে আমার আত্মজ আহমাদ বিন তানভীরের আনন্দময় সময়-যাপন আমার গবেষণাকর্মের সঞ্জীবনীশক্তি হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। আমাকে পিএইচ ডি গবেষণা সম্পাদনের প্রয়োজনে সকল সাংসারিক দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করার সুযোগ করে দিয়েছে আমার জীবনসঙ্গী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী। একাকী দিন যাপনের বেদনা হাসিমুখে মেনে নেয়ায় তার ঋণ অনস্বীকার্য। দাদা-দাদির অপত্যস্নেহ, আব্বা-মায়ের স্নেহ-আদর, আমার অপর চার ফুপি শামসুন নাহার, শাহনাজ পারভীন, শারমিন সুলতানা, নাহিদ সুলতানা এবং তাদের সন্তানদের বিশেষ করে সারাহ, নুরিন, আনিশা ও তুহ্‌ফার অফুরান ভালোবাসা, দোয়া ও সহযোগিতা এ অভিসন্দর্ভ রচনায় বাড়তি আনন্দ ও উৎসাহ জুগিয়েছে। 'ধন্যবাদ' শব্দটি তাদের সহমর্মিতার বোধকে খাটো করবে। বিবাহ-সূত্রে পাওয়া আমার আরেকটি পরিবারের ভালোবাসা আমাকে গবেষণাকর্মে প্রাণিত করেছে। তাদের প্রতি, বিশেষ করে আম্মু নিলুফা নিহারের স্নেহ ও আশীর্বাদ আমার চলার পাথেয়স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

পিএইচ ডি গবেষণার শিরোনাম

বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়নঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু (Reflection of Ideologies in the Bangla Poetic Drama: Rabindranath Tagore and Buddhadeb Basu)

গবেষক

সান্‌জীদা মাসুদ

বিষয়-ভাবনা, শিল্পদৃষ্টি এবং প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য কাব্যনাট্যকে ঋদ্ধ এক সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছে। কবিতা এবং নাটকের বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী অন্বয়ে, এবং বাস্তব জীবনবোধের ঘনিষ্ঠ সংযোগে বিশ শতক থেকে কাব্যনাট্যের যে পুনঃনবযাত্রা সূচিত হয় তার গৌরবময় আয়ত্তীকরণের অভিযাত্রা বাংলা সাহিত্যেও চলমান রয়েছে। এই প্রতীতিকে মুখ্য বিবেচনা হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা কাব্যনাট্যের সমৃদ্ধ ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪)-এর অবস্থান, তাঁদের সৃজিত শিল্পবিশ্বাসের প্রাকরণিক বিন্যাসের বিশেষত্ব বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। কাব্যনাট্যকারেরা স্বকাল ও সমাজের বহির্বাস্তবতাকে ধারণ করেও মানবের অন্তর্দেশের গভীরতম রহস্যের অভিমুখে ধাবিত হন; আর এক্ষেত্রে তাঁদের মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে স্বোপার্জিত শিল্পবিশ্বাস। একেই শিল্পীর ভাবাদর্শ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

কবিতার রয়েছে এমন এক সম্মোহনী সামর্থ্য যা অনায়াসেই অন্য সাহিত্য-মাধ্যমকে প্রভাবিত করতে পারে। নাটক ও কবিতার যুগলবন্দি এক ভিন্ন রস-সংবেদনার যোগান দেয়, যা কাব্যনাট্য (poetic drama) নামে পরিচিত। নাট্যকাব্য (verse play) নামেও এক ধরনের নাটক রয়েছে যেখানে নাট্যগুণকে অতিক্রম করে কাব্যগুণ মুখ্য হয়ে ওঠে। অপরদিকে আধুনিক কাব্যনাট্য একটি বিশেষ ফর্ম যা কবিতার নিগূঢ়তাকে ধারণ করে, পাশপাশি নাটকের সংলাপধর্মী সক্রিয়তানির্ভর মানবিক যূথবদ্ধতাকে স্পর্শ করে এবং এ দুয়ের সুসমন্বয়ে এক ভিন্ন শিল্পাবয়ব রচিত হয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলা চলে যে, খ্রিষ্টপূর্ব দুশো বছর পূর্বে ভরতমুনি ও দণ্ডী থেকে শুরু করে আজ অবধি ভারতীয় নাট্যধারার পালাবদলের সঙ্গে কাব্যনাট্যের গভীর সংযোগ রয়েছে। তাঁদের মতে নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের একটি সমন্বিত রূপ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য কবিতা-আশ্রয়ী; এবং এসবের অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত রয়েছে নাট্যধর্মিতা; সেই সূত্রে অভিনয়োপযোগিতা। তাছাড়া কৌম সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজপৃষ্ঠপোষকতা, আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা ও ধর্মীয় ভাবোন্মাদনা প্রভৃতি উপরিকাঠামো নাট্যকলার অন্তস্তলের তথা গান কবিতা ও নৃত্যের ভিতটি গড়ে তুলেছিল। অনুবাদের পুনরাবৃত্তি ও সংস্কৃতানুকারিতাকে বলি দিয়ে বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটান

Dhaka University Institutional Repository

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩)। তবে ভরত-দণ্ডী, এস্কিলাস-সফোক্লিস, শেকসপিয়র প্রমুখের কাব্যনাট্যময় রূপপ্রকরণ বাংলা নাটকের ধারায় পূর্ণাঙ্গতাস্পর্শী হতে শুরু করে বিশ শতকের শুরুর দিকে; এলিয়ট, ডব্লু. বি. ইয়েটস্-এর শিল্পচেতনার অনুসরণে। মনে রাখা প্রয়োজন, চেনা-জানা বিশ্বসাহিত্যে এলিয়টই প্রথম কবিতা ও নাটকের সমান সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সার্থক কাব্যনাট্য রচনা করেন, যেখানে একই সঙ্গে 'form of entertainment' ও 'form of art'-এর মেলবন্ধন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হন। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আধুনিক কাব্যনাট্যধারার বিকাশে এই মেলবন্ধন ঘটাতে এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পথধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন বুদ্ধদেব বসু।

সাহিত্য মাত্রেই শিল্পীর অনন্য উপলব্ধিজাত ভাবাদর্শের রূপায়ণ ঘটে থাকে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব তাঁদের সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহে যে শিল্পমনস্তত্ত্বের সক্রিয় প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, যে ভাবাদর্শকে ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের কাব্যনাট্যের পরিসরকে নন্দন-সৌকর্যে পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট থেকেছেন তা-র নিরূপণ ও বিশ্লেষণ সম্পাদিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে, উভয় শিল্পীর স্বোপার্জিত মানবতাবাদ তথা হিউম্যানিজম ও পোস্ট-হিউম্যানিজমের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানকে যেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, তেমনি তাঁদের উপনিবেশ ভাঙার ফল্গু-আকাঙ্ক্ষার শিল্পপ্রকাশকে উত্তর-উপনিবেশবাদী পাঠ বিশ্লেষণরীতির আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বহুসম্পর্কিত এই শিল্পদার্শনিক বিবেচনাকে আখ্যানতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার করে সাহিত্যশিল্পীদ্বয়ের রচিত কাব্যনাট্যের শিল্প-বিশেষত্ব অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বর্তমান গবেষণায় অবভাসতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে, অবভাসতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণে গবেষক একটি সুনির্দিষ্ট অবভাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট কাঠামোর সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে। এর আলোকে গবেষণা-প্রশ্ন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে: 'রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের নাটকায়ন ও প্রকরণে তাঁদের নিজ নিজ নাট্যিক ভাবাদর্শের যে প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?'

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের লক্ষ্যে একটি অবভাসতত্ত্ব ভিত্তিক পাঠ-বিশ্লেষণমুখ্য গবেষণা নক্‌শা (research design) প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাব্যনাট্যকারগণের কাব্যনাট্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত, কাব্যনাট্যসমূহের নিবিড় পাঠ, নির্বাচিত উপত্তের আখ্যানতাত্ত্বিক ও চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে সংগৃহীত বিশ্লেষণ পুনর্বিবেচনা প্রভৃতির আলোকে উল্লিখিত গবেষণা-সমস্যাটির একটি যৌক্তিক ও শিল্প-সম্মত সমাধান প্রদান করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

কাব্যনাট্যে কবিতা নাটকের সহচর, নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ দুটিই এতে সমান গুরুত্ব পায়। নাটকের গতি ও কাব্যের শিল্পিত দৃশ্যকল্প কাব্যনাট্যে একই সূত্রে গ্রথিত। কাব্যনাট্যকারকে প্রকৃত অর্থে কবি হতে হয়; নাটকটির বয়নকৌশলে

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার উপস্থিতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে– এমনটি যেন মনে না হয়। এর ঘটনাসংস্থান প্রচলিত নাটক থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের: একদিকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকগুলো চরিত্র নির্মাণ করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য থাকে; অপরদিকে ঘটনা ও সংঘাতকে ব্যাপকমাত্রায় প্রকটিত না করে ব্যক্তির আন্তর-রহস্যের সূক্ষ্ম উন্মোচন কাব্যনাট্যকারের প্রধানতম প্রবণতা হিসেবে সক্রিয় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে ও সাহিত্যে সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধের যে সাধনায় আমৃত্যু আস্থাশীল ছিলেন তার সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার অনিবার্য সংঘাতকেই প্রকটিত করলেন কাব্যনাট্যে। এক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় রূপক-প্রতীকের শিল্পান্বিত আড়াল। গত শতকের ত্রিশের দশকের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু ছিলেন এলিয়টীয় কাব্যনাট্যের রূপ ও রীতি এবং প্রতীচ্যের বোদলেয়ারীয় আধুনিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভারতীয় পুরাণের নানা অংশ নিয়ে কাব্যনাটক রচনায় তিনি সমকাল ও চিরন্তন কালের জীবনবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে। চিরায়ত ভাবনা-চিন্তা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটা স্থায়ী রূপ লাভ করে থাকে– এই প্রবণতা তাঁর কাব্যনাট্যে প্রবল। রবীন্দ্র-কাব্যনাট্যে দেখা যায় যে, তিনি সমস্ত সংকটের সমাধান করেন রোমান্টিকতার আশ্রয়ে। আর দুঃসহ সময়ের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক পরিণতির জন্যে বুদ্ধদেব বসু অবগাহন করেন মিথের জগতে। এই দুই মহান শিল্পীর কাব্যনাট্যের ভাবসম্পদ ও শিল্পনির্মাণের পরস্পর-সমন্বিত বিশ্লেষণ বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য প্রমাণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-সূচি

ভূমিকা ১০–১৭

প্রথম অধ্যায় ১৮–৭০
বাংলা কাব্যনাট্য: সংরূপ, বিশেষত্ব, দেশজ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

১.১ কবিতা, নাটক ও কাব্যনাট্য
১.২ বৈশ্বিক নাট্যচর্চায় কাব্যনাট্যের অবস্থান (গ্রিক-রোমান নাট্যভাবনা ও শেক্সপিয়রীয় নাট্যচিন্তা)
১.৩ বিশ শতকের বিশ্ব নাটক ও কাব্যনাট্য: বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব (স্ট্রিন্ডবার্গ, বার্নার্ড শ', স্ট্যানিস্লাভিস্কি, ব্রেখট্, এবং এলিয়ট)
১.৪ কাব্যনাট্যসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, স্বরূপ ও তাত্ত্বিক পরিচিতি
১.৫ বাংলা কাব্যনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ
১.৬ বাংলা কাব্যনাট্যের প্রস্তুতি পর্ব
১.৭ বাংলা কাব্যনাট্যের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১–১১০
বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের মিথস্ক্রিয়া

ক. তত্ত্বীয় কাঠামো
২.১ মানবতাবাদী চর্চা
২.২ উত্তর-উপনিবেশবাদী কাঠামো

খ. বিশ্লেষণ আয়ুধ
২.৩ চিহ্নতত্ত্ব
২.৪ আখ্যানতত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায় ১১১–১২২
গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ গবেষণা কাঠামোর রূপরেখা
৩.২ গবেষণা নক্শা: অবভাসতত্ত্ব (Phenomenology)-ভিত্তিক বিশ্লেষণ-কৌশল
৩.৩ প্রতিপাদ্য প্রমাণের মাপকাঠিসমূহ

চতুর্থ অধ্যায় ১২৩–৩৫৭
কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন

৪.১ প্রথম পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ভাবাদর্শের রূপক-প্রতীকায়ন

৪.১.১ কাব্যনাট্য পরিচিতি: বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব
৪.১.২ রোমান্টিকতা, বিশ্বায়িত জীবন দর্শন ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ
৪.১.৩ কাব্যনাট্যিক আখ্যান বিবেচনা
৪.১.৪ চরিত্রায়ণ কৌশল
৪.১.৫ মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা
৪.১.৬ কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্র: চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব
৪.১.৭ কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বুদ্ধদেব বসু: ভাবাদর্শে মিথ ও মিথায়ন

৪.২.১ কাব্যনাট্য পরিচিতি: বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব
৪.২.২ উত্তর-উপনিবেশবাদ ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ
৪.২.৩ কাব্যনাট্যিক আখ্যান বিবেচনা
৪.২.৪ চরিত্রায়ণ কৌশল
৪.২.৫ মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা
৪.২.৬ কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্র: চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব
৪.২.৭ কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন

পঞ্চম অধ্যায় ৩৫৮—৩৬৬
তুলনামূলক আলোচনা

উপসংহার ৩৬৭—৩৬৯

আকরগ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা
৩৭০—৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পরিচিতি

বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য হলো কাব্যনাট্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) এবং বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮–১৯৭৪) চিন্তনজগতের দার্শনিক ও প্রাকরণিক বিন্যাসের বিশেষত্ব নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা। সাহিত্যে শিল্পীর অনন্য উপলব্ধিজাত ভাবাদর্শের শিল্পিত রূপায়ণ ঘটে। ভাবাদর্শ (ideologies) মূলত লেখকের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সৃজনশীল মানস গঠন ও স্বোপার্জিত জীবনদর্শনের সংশ্লেষকে ধারণ করে। সাহিত্যে বিধৃত লেখকের জগৎ-জীবন সম্পর্কিত বিবিধ চিন্তা, চেতনা, বোধ, দর্শন প্রভৃতির সৃষ্টিশীল ও বিবর্তমান অনুষঙ্গের জৈব সমন্বয়ে তাঁর ভাবাদর্শকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর আলোকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের নিম্নলিখিত অভীষ্ট নির্ধারণ করা যেতে পারে:

ক) সংশ্লিষ্ট কাব্যনাট্যকারগণের শিল্পমনস্তত্ত্বের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব নিরূপণের মধ্য দিয়ে তাঁদের ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ করা;

খ) কাব্যনাট্যে প্রতিফলিত তাঁদের ভাবাদর্শ কীভাবে শিল্প-প্রকরণে নান্দনিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা নিরূপণ করা;

ভাবাদর্শের মুখ্য প্রবণতা হলো রচয়িতার সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার শিল্পসামর্থ্য। তাঁর অধীত জ্ঞান, তত্ত্বাশ্রয় কিংবা সুগভীর পঠন-পাঠন এবং সমাজ ও সময় অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য না করেও এতে প্রাধান্য পায় লেখকের অন্তর্নিহিত ও সহজাত সৃষ্টিশীলতার জগৎ। বলা যায়, ভাবাদর্শ শিল্পীর চেতনা ও আবেগের সুসমন্বিত প্রতিফলনকে স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব ভাবনার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এ উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই শিল্পীর ভাবাদর্শকে শনাক্ত করা সম্ভব। সুতরাং, রচয়িতা তাঁর গভীর অনন্য অনুভবকে কীভাবে প্রকাশ করছেন, তার মানদণ্ডেই রচয়িতার ভাবাদর্শ অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। কেননা:

> সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টাকে নিবিড়ভাবে পাঠ করা আবশ্যক। ... পরিবার-পরিবেশ এবং বংে যাওয়া কালের অন্তর্লীন প্রবাহে ব্যক্তির যে হয়ে ওঠার ব্যাপার, তা অগ্রাহ্য করা যায় না। সমাজ-সমকাল এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্মিতিতে অর্জিত জীবনদর্শনের শব্দরূপ তাঁর সাহিত্যকর্ম। (হোসনে আরা, ২০১৮ : ২৭)

বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচ্যসীমাকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, কাব্যনাট্যের চরিত্রায়ণ ও নাট্যিক উপাদান সমৃদ্ধ কাব্যকাঠামো সৃজন, কাব্যগুণের নান্দনিক নাট্যায়ন (dramatization), শিখরস্পর্শী কাব্য-সংলাপ ও বিবরণে চিত্রকল্প, আলংকারিক ভাষা ও শৈলীর অভূতপূর্ব চিহ্নায়ন– এসবকিছুর নিবিড় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই কাব্যনাট্যে রচয়িতার ভাবাদর্শ নির্ণীত হয়। কাব্যনাট্যকার সময় ও সমাজ থেকে যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, জ্ঞান ও অনুভব অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করেন; রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি-সমাজনীতির পরিসর তাঁকে যে সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে এবং তা যেহেতু তাঁর কাব্যনাট্য সৃজন-উৎসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; সেহেতু কাব্যনাট্যিক সৃষ্টিশীলতা এবং সময় ও সমাজ নিবিড় শিল্পোপলব্ধি– এসবের সমন্বিত ভাবাদর্শের রূপায়ণ ঘটে কাব্যনাট্যের বিষয় ও প্রকরণের নান্দনিক পরিসরে। এর আলোকে বর্তমান গবেষণায় ভাবাদর্শকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে:

ক) সহজাত শিল্পীসত্তা থেকে উদ্ভূত ভাবাদর্শ

খ) অধীত ও মননঋদ্ধ কাঠামো থেকে উদ্ভূত ভাবাদর্শ

উপর্যুক্ত দুটি দিক থেকে ভাবাদর্শ বিশ্লেষিত হলে, কাব্যনাট্যকারগণের অন্তর্দেশবাহিত সৃষ্টিশীলতা ও অধীত বিদ্যার জগৎ সমভাবে মূল্যায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বাশ্রয় বর্তমান অভিসন্দর্ভের অভিপ্রায় নয়। বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় বিবেচ্য হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহে বিধৃত ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন বিশ্লেষণ। অর্থাৎ বিষয়টি ভাবাদর্শের এবং এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, একটি সৃষ্টিশীল সত্তার ভাবাদর্শ চঞ্চল ও ক্রম-বিবর্তনশীল। যে-দুজন সাহিত্যিককে এ অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে, তাঁরা এমন এক সময়ের মানুষ যে-সময় বিশ্বপ্লাবী তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মানব ভাবাদর্শের উল্লেখযোগ্য প্রান্তের সীমিত পরিসরের সংক্ষিপ্ত সংশ্লেষ
এ অভিসন্দর্ভে ঘটেছে।

নাটক ও কবিতার যুগলবন্দি এক ভিন্ন রস-সংবেদনার যোগান দেয়, যা কাব্যনাট্য (poetic drama) নামে পরিচিত। আধুনিক কাব্যনাট্য একটি বিশেষ ফর্ম যা কবিতার নিগূঢ়তাকে ধারণ করে, পাশপাশি নাটকের মানবিক যূথবদ্ধতাকে স্পর্শ করে এবং এ দুয়ের সমন্বয়ে এক ভিন্ন শিল্পাবয়ব লাভ করে। কাব্যনাট্যের পুরোধা নাট্যতাত্ত্বিক টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮–১৯৬৫) কাব্যনাট্যের স্বরূপ তুলে ধরেন এভাবে:

> As I have gradually learned more about the problems of poetic drama, and the conditions which it must fulfil if it is to justify itself, … It must justify itself dramatically, and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form. (Eliot, 1950 : 12)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতই, কাব্যনাট্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সম-তাৎপর্য নিশ্চিত হতে হবে। নাটকের কাব্যগুণ কিংবা কবিতার নাট্যগুণের উপস্থিতিকে কাব্যনাট্য বলা যায় না। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন *চর্যাপদ*–এ কাব্য ও নাট্যগুণের প্রচ্ছন্ন সমাবেশ লক্ষণীয়:

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহিণ সবরী গীবত গুঞ্জুরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
নিঅ ঘরিনী ণামে সহজ সুন্দরী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।। (আনোয়ার ও মুহম্মদ ২০১৪ : ১২৮)

এ যেন কবিতার ফর্মে লেখা নাট্যাংশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য কবিতা-আশ্রয়ী; এবং এসবের অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত রয়েছে নাট্যধর্মিতা; সেই সূত্রে এর সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে অভিনয়োপযোগিতা। *চর্যাপদ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মঙ্গলকাব্য, রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান, *জঙ্গনামা*, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, কবিগান, পালা গান, যাত্রা প্রভৃতিতে বিভিন্ন নাট্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কবিতা ও নাটকের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের বরাত দিয়ে এগুলোকে কাব্যনাট্যের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে নির্দেশ করা যেতে পারে। আধুনিক কাব্যনাট্য একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য সংরূপ, যেখানে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সুষম বিন্যাস অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ:

এক এ নূরলদীন যদি চলি যায়,
হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।
এক এ নূরলদীন যদি মিশি যায়,
অযুত নূরলদীন য্যান আসি যায়,
নিযুত নূরলদীন য্যান বাঁচি রয়। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ১৪৮)

ঔপনিবেশিক সময়ের কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২) কাব্যনাটকে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামশীলতার ও সাহসিকতার ইতিবৃত্ত সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫–২০১৬) নির্মাণ করেন কবিতাকে নাটকের পটভূমিকায় যথাযথরূপে প্রয়োগের সূত্রে। বিশ শতকের শুরুর দিকে একদল কবি ও নাট্যকারের প্রচেষ্টায় কাব্যনাট্যের সাহিত্যিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ সময়ে আধুনিক কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক ফর্ম গঠিত হয়। [এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।]

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যনাট্য সৃজনে কাব্যনাট্যকারকে কাব্য ও নাটককে অভিন্ন আধারে ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে কাব্যনাট্যকারের জৈবসমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে। গভীর রসবোধ, কবিচেতনা এবং নাটকের শৃঙ্খলাপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে তিনি অভিপ্রায় প্রকাশে আগ্রহী হন। একদিকে কাব্যচেতনার প্রগাঢ়তা, অন্যদিকে নাট্যিক গুণ– এ দুয়ের সমন্বয় করে কোনো এক বিশেষ বোধ– যা প্রচল নাট্যকাঠামোয় প্রকাশ করা নাট্যকারের নিকট অপূর্ণ ও অসংগত মনে হয়। তিনি তখন এমন এক প্রকরণের অনুসন্ধানী হন, যা তাঁর বিশেষ বোধের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটাবে। কাব্যনাট্য সেই অভিনব প্রকরণ। কাব্যনাট্যকারের ভাববিশ্ব তাই কেবল অনুভূতি বা জীবনদৃষ্টির প্রকাশ নয়। কাব্যনাট্যে নাট্যকারের উপলব্ধিজাত বোধ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপনের মধ্যে ভাববিশ্ব প্রতিফলিত হয়। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব আমৃত্যু কবিপ্রাণ। কবিসত্তার শিল্পসামর্থ্য তাঁরা কাব্যনাট্যের ফর্মে পরীক্ষা করার প্রয়াস পান। সময় ও সমাজের বাঁক বদলের ফলে সৃষ্ট নতুন জীবনবোধ তাঁরা কবিতার কাঠামোয় পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তৃপ্ত হচ্ছিলেন না; আবার কবিসত্তার প্রবল প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারছিলেন না। একদিকে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা; অপরদিকে জীবনকে কবিতার চেয়ে ব্যাপক পরিসরে উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁরা আশ্রয় নেন কাব্যনাট্য প্রকরণের। কাব্যনাট্যের বহির্কাঠামোয় নাটকের বাস্তবধর্মিতা আর অন্তর্কাঠামোয় থাকে কবিতার নিগূঢ়তা ও পেলবতা। প্রকৃতপক্ষে 'কাব্যনাট্যকার দেখবেন কীভাবে বললে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পাঠক ও দর্শকের নিকট গ্রহণযোগ্য সত্য করে তুলতে পারবেন। সেইভাবে লিখবেন।' (তরুণ, ২০০৩ : ১৭৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্যসমূহ মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, কলোনিয়াল শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামিতা, প্রেম ও প্রকৃতির চেতনায় স্নাত। জীবনে ও সাহিত্যে সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধের আমৃত্যু সাধনাকে কাব্যনাট্যের ফর্মে অভিব্যঞ্জিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় রূপক-প্রতীকের শিল্পান্বিত আড়াল। অপরদিকে, বুদ্ধদেব বসু এলিয়টীয় আধুনিক কাব্যনাট্যের রূপ-রীতি ও বোদলেয়ারীর আধুনিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমকাল ও চিরন্তনকালের জীবনবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় পুরাণের নানা অংশকে কাব্যনাট্যের বিষয় করে তোলেন অভিনব শিল্পরস সৃষ্টির অভীপ্সা থেকে। এখানে কবি তাঁর চিন্তন জগৎ, শিল্পদৃষ্টিসঞ্জাত অনুভব কাব্যনাট্যের নির্বিকল্প প্রকরণে ধারণ করেন। মিথকথার আধুনিক জীবনানুষঙ্গী ও সৃজনক্ষম উপস্থাপনায় বুদ্ধদেব বসুর বিশিষ্টতা অবশ্যস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহে বিধৃত শিল্পমনস্তত্ত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজস্ব ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ এবং তাঁদের কাব্যনাট্যসমূহের প্রকরণ-আশ্রয়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁদের কাব্যনাট্যসমূহ বিশ্লেষণ-সূত্রে বর্তমান গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে কাব্যনাট্যের সম্যক পরিচিতি, এর সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা, নান্দনিক ভাবনা, কাব্যনাট্যকারগণের সৃজিত শিল্পবিশ্বাস তথা ভাবাদর্শ। এ গবেষণায় কাব্যনাট্যকারগণের কাব্যনাট্যসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত তালিকার অন্তর্গত কাব্যনাট্যগুলোর শিল্পসৌকর্যকে আশ্রয় করে গবেষণার প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রেক্ষাপট হিসেবে বিশ্বসাাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্যের প্রসঙ্গ যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে, সেগুলো কেন্দ্রীয় আলোচ্য হিসেবে পরিগণিত হয়নি।

বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। ভূমিকা অংশে বর্তমান গবেষণার পরিচিতি, পরিধি এবং অধ্যায়-পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম, বাংলা কাব্যনাট্য: সংরূপ, বিশেষত্ব, দেশজ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট। এ অংশে আলোচিত হয়েছে কবিতা, নাটক ও কাব্যনাট্য প্রভৃতির সংরূপগত পরিচিতি ও বিশেষত্ব; বৈশ্বিক নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় কাব্যনাট্যের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য আলোচিত হয়েছে গ্রিক-রোমান নাট্যভাবনা, শেক্সপিয়রীয় নাট্যচিন্তা; বিশ শতকের বিশ্ব নাটক ও কাব্যনাট্যের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব নির্ণয়ে স্ট্রিন্ডবার্গ, বার্নার্ড শ', স্ট্যানিস্লাভিস্কি, ব্রেখট্ এবং এলিয়ট প্রমুখের অবদান; বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্যের অবস্থান; এছাড়া প্রাসঙ্গিকভাবে সংযোজিত হয়েছে কাব্যনাট্যসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, স্বরূপ ও তাত্ত্বিক পরিচিতি; বাংলা কাব্যনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ; বাংলা কাব্যনাট্যের প্রস্তুতি পর্ব এবং বাংলা কাব্যনাট্যের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো: বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের মিথস্ক্রিয়া। এ অধ্যায়টি দুটি উপবিভাগে বিভক্ত: **ক)** তত্ত্বীয় কাঠামো এবং **খ)** বিশ্লেষণ আয়ুধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর ভাবাদর্শের বিবিধ প্রান্ত অনুসন্ধানের সূত্র হিসেবে আলোচিত হয়েছে মানবতাবাদী চর্চা ও উত্তর-উপনিবেশবাদী পাঠের তত্ত্বীয় দিকসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশে উভয় কাব্যনাট্যকারের কাব্যনাট্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য চিহ্নতত্ত্ব ও আখ্যানতত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো: গবেষণা পদ্ধতি। এ অধ্যায়ে গবেষণা কাঠামোর রূপরেখা, গবেষণা নক্শা: অবভাসতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

(Phenomenology)–ভিত্তিক বিশ্লেষণ-কৌশল এবং কাব্যনাট্যের বিশ্লেষণে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য প্রমাণের মাপকাঠিসমূহ সংযোজিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন। এ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহের বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দুটি পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ ভাবাদর্শের রূপক-প্রতীকায়ন নামক উপ-শিরোনামায় বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব; রোমান্টিকতা, বিশ্বায়িত জীবন দর্শন ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ; কাব্যনাট্যিক আখ্যান বিবেচনা; চরিত্রায়ণ কৌশল; মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা; কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্রঃ চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব; কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন প্রভৃতি। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুদ্ধদেব বসুঃ ভাবাদর্শে মিথ ও মিথায়ন শীর্ষক উপ-শিরোনামায় বিশ্লেষিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহ। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব; উত্তর-উপনিবেশবাদ ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ; কাব্যনাট্যিক আখ্যান বিবেচনা; চরিত্রায়ণ কৌশল; মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা; কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্রঃ চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব; কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন প্রভৃতি। পঞ্চম অধ্যায়ে উভয় কাব্যনাট্যকারের কাব্যনাট্যিক প্রয়াস তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। উপসংহার অংশে বর্তমান গবেষণার অনুসন্ধানের বিষয়, ধরন ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ব্যবহৃত সহায়কপঞ্জির তালিকা যুক্ত হয়েছে। এছাড়া, পরিশিষ্ট অংশে এ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত আকরগ্রন্থ, সহায়কগ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়কপঞ্জি

তরুণ মুখোপাধ্যায়	২০০৩, *বাংলা কাব্যনাট্য: রূপ ও রীতি*, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, কালকাতা
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	২০১৪, *চর্যাগীতিকা* (সম্পাদিত) স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা
সৈয়দ শামসুল হক	২০১২, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা
হোসনে আরা	২০১৮, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
T.S. Eliot	1950, *Poetry and Drama*, Fabar & Faber Ltd, 24 Russell square, London

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা কাব্যনাট্য: সংরূপ, বিশেষত্ব, দেশজ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

Dhaka University Institutional Repository

১.১ কবিতা, নাটক ও কাব্যনাট্য

কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধসহ সমস্ত সৃজনশীল প্রকাশের মূলে রয়েছে নান্দনিক স্ফূর্তি। কবিতা নন্দনতত্ত্বের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে সংবেদনশীল সাহিত্য প্রকরণ। নন্দনতত্ত্বের ধারণা সৃষ্টির পূর্বেই থেকে কবিতার যাত্রা শুরু হয়। আনন্দ-উৎসারণ কবিতার উদ্দেশ্য। কবিতার অন্তস্তলে নিহিত এ আনন্দ অকপট, নিছক ও অদরকারি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ শিল্পমাধ্যম হিসেবে কবিতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। কবিমাত্রেই ব্যক্তি-সাধারণের চেয়ে অধিক সংবেদনশীল হন। কল্পনা, কালধর্ম ও কবির স্বকীয় জীবনবোধ সংশ্লেষে কবিতার অবয়ব গড়ে ওঠে। জীবন ও সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিরাশি কবি উপযুক্ত প্রকরণে বিধৃত করতে প্রয়াসী হন। ভাববস্তু উপযুক্ত প্রকরণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হলেও সৃষ্টিশীল কবিসত্তায় স্থিত অনিঃশেষ অতৃপ্তির বোধ তাঁকে চঞ্চল, গতিশীল ও সক্রিয় রেখেছে। কেননাঃ

> মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবল মাত্র, কিন্তু এই দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে, মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস; কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে তাকে সৃষ্টি করে। (জীবনানন্দ, ১৪১৩ : ১০৫–১০৬)

সুতীব্র ও প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে যখন বিশ্বজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কল্পনাশক্তির আশ্রয়ে অভিনব শিল্পরূপ নির্মাণ করে, তখন তা কবিতা হয়ে ওঠে। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে, `For all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: ... For our continued influxes of feeling are modified and directed by our thoughts, which are indeed the representatives of all our past feelings.' (Wordsworth & Coleridge, 1802 : x–xi) স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ অনুভূতিকে যথার্থ শব্দক্রমে সজ্জিত করবার কথা বলেন কবি কোলরিজঃ Best words in the best order– অর্থাৎ শব্দ কবিতার নন্দনতত্ত্বে

গুরুত্বপূর্ণ। 'কবিতা হলো ছোটো অলংকৃত একখানি সোনার তরী– যার মধ্যে বাহুল্যের স্থান নেই।' (দেবীপ্রসাদ, ২০১৫ : ১৭৯) কবিতার শব্দই প্রাণ, অস্তিত্বের সারবত্তা। কবিতার ভাষিক গুরুত্ব নিয়ে কবি শেলীর মন্তব্য:

> Their language is vitally metaphorical. … A single sentence may be considered as a whole, ... a single word even may be a spark of inextinguishable thought. (ক্ষুদিরাম, ২০০৫ : ২৫)

মুহূর্তকালের অনুভূতির সংহত প্রকাশ-ব্যাকুলতা কবিকে কবিতার যথোপযুক্ত ভাষাকাঠামো স্থির করতে সহায়তা করে। কবিতা নামক রূপ-সিন্ধুতে শব্দ রূপী মুক্তোর অন্বেষণে কবি হয়ে ওঠেন প্রকৃত ও সাহসী নাবিক। দেশ-কাল, প্রেম-প্রকৃতি ও নানা অনুভূতির ব্যঞ্জনাঋদ্ধ প্রকাশরীতির জন্য কবি সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে শব্দ আহরণ করেন, শব্দকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সজ্জিত করেন; সর্বোপরি নির্মাণ করেন শব্দের শিল্পিত অভিজ্ঞান।

> আসলে শব্দের অপরিহার্য বিন্যাসে, সুর-লয়-তালে, কবিতার একটি বিশেষ রূপময় শরীরী অস্তিত্ব আছে। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বিচার বা আরোপ করে তাই কবিতাকে বোঝা মুশকিল। (কুন্তল, ২০১২ : ১৪)

কবিতার অর্থগ্রাহ্যতা তাই আপেক্ষিক। পাঠক তার অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন এবং অনুভূতির সাহায্যে কবিতার অর্থ নির্মাণ করেন; কবিতার রস আস্বাদন করেন। কেননা, `No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone.' (Eliot, 1921 : 44) কবি-সত্তায় বাহিত দর্শন, চিন্তা, বিশ্বাস, আবেগ বিষয়ের সঙ্গে শিল্পান্বিত হয়ে কবিতার শরীর গড়ে তোলে। সময়-সমাজকে ধারণ করেও তা অসীমতার ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতার বিবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলে এ প্রতীতীই জন্মে। ফলে কবিতার নেই কোনো স্থিও বিষয়; এর শেষ বলেও কিছু নেই। এর আছে বহুমাত্রিকতা, বহুকৌণিকতা, বহুরৈখিকতা। কবিতা রূপান্তরকামী; জীবনের ও সমাজের প্রয়োজনে কবিতা নানা ফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে বারংবার।

নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাচীন সাহিত্য সংরূপ। এটি মানবজীবন ও সমাজের বৈচিত্র্যমণ্ডিত উপস্থাপনার কার্যকরী, শক্তিশালী ও নান্দনিক ক্ষেত্র। প্রাচ্য আলংকারিক নাট্যাচার্য ভরতমুনি নাটককে পঞ্চম বেদ বলে আখ্যায়িত করেন। এটি এশটি মিশ্রকলা যা– "সব ধরনের জ্ঞান, বিদ্যা, কলা যোগ ও কর্মেও মিলনস্থল। মানবজীবন, ধর্ম, রাষ্ট্র– সকলের সঙ্গেই নাটক ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। জীবনের কোনও অংশ থেকেই নাটককে বাদ দেওয়া যায় না। নাটকের আবেদন সর্বজনীন, সুদূরপ্রসারীও।" (সুখেন, ২০১১ : ৩১) নাট্যসাহিত্য গদ্য-পদ্য উভয় রীতিতেই স্বমহিমায় বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত। নাটক (drama) আদিম মানবের সমবয়সী: সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গী হয়ে ক্রমশ সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়েছে। নাট্যসাহিত্য প্রারম্ভিক পর্যায়ে কাব্যসাহিত্যেও অঙ্গীভূত হয়ে আলোচিত হয়েছে। আরিস্টটল গ্রিক নাটক বিশ্লেষণ কওে যে-সব সূত্র তুলে ধরেন, সে-সব সূত্রের ওপর ভিত্তি কওে আজ পর্যন্ত নাটকের আলোচনা এগিয়েছে। সাধনকুমার যথার্থই বলেন:

> সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষতঃ নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরাই কোন গভীর আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই 'পোয়েটিক্স'-এর শরণ না নিয়ে পারেননি। (সাধনকুমার, ১৩৬৯ : ৬০)

বহু-বিচিত্র নাটকীয় ঘঁনার সমাবেশ আমাদেও মানবজীবন নাট্যসাহিত্যেও মূল উপজীব্য। 'কিন্তু শুধু নাটকীয় উপাদান থাকলেই নাটক হয় না। এই উপাদানগুলি যখন নাটকের বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত হয় তখনই জন্ম নেয় নাটক। .... সেজন্য নাটকের শিল্পরীতি দৃঢ়, সতর্ক এবং কঠোর নিয়মনিয়ন্ত্রিত।' (অজিতকুমার, ১৯৬৩ : ০২) নাট্টায়ন (dramatization) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত, আকস্মিক কোনো আঘাত-প্রত্যাঘাতে মানবজীবনে যখন কোনো ঘঁনার আবির্ভাব ঘটে, তখন জীবন নাটকীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া মানুষের স্বভাবেই নাটকীয়তা রয়েছে। নাট্যকার নাটক রচনার জন্য সে-সব উপাদান অন্বেষণ করেন। বাস্তব ঘঁনা বা স্বভাবজাত নাটুকেপনার হুবহু উপস্থাপন না কওে, নাট্যকার তাতে সংযুক্ত করেন আবেগপ্রবণতা, আরেকটু নাটুকেপনা– যা বিষয়টিকে নান্দনিক কওে তুলবে। কোনো গল্প বা ঘঁনাকে আকর্ষণীয় ও নান্দনিক অভিব্যক্তি প্রদান করা হলো নাট্টায়ন। প্রকৃতই:

> নাটকীয় উপাদানেই নাটক তৈরি হয় না। উপাদানগুলি যখন বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে রূপ পায় তখনই 'নাটকেস্ফর জন্ম হয়। (উজ্জ্বলকুমার, ১৪১৬ : ৮৫)

নাট্য-উপাদানকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য নাট্য ক্রিয়া (action) গুরুত্বপূর্ণ। আরিস্টটল *পোয়েটিক্স*- এ নাট্যক্রিয়ার অনুকৃতির (imitation of an action) কথা বলেছেন। নাট্যক্রিয়া নাট্যদ্বন্দ্বের (elements of conflict) মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রকাশিত হয়। নাট্যক্রিয়া পাঠক ও দর্শকের কৌতূহল ও নাট্য-আখ্যানের প্রতি মনোযোগী করে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব থেকে সূচনা হয় নাট্যক্রিয়ার। পুরো নাট্য-আখ্যানে নাট্যক্রিয়া ও নাট্যদ্বন্দ্ব বজায় রাখতে নাট্যকারের অভিজ্ঞ ও দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, চরিত্রের মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব, ঘঁনার সঙ্গে ঘঁনার দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নাট্যক্রিয়াকে গতিশীল ও আকর্ষণীয় কওে তোলে। `We cannot imagine a mental conflict which does not involve an adjustment to the environment, and the whole interconnection between them.' (Lawson 1960 : 06)

একইভাবে, নাটোৎকণ্ঠা (suspense) নাট্য-ঘঁনার প্রতি পাঠক ও দর্শককে আবিষ্ট কওে রাখে। এটি ছাড়া প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টি হয় না। উৎকণ্ঠার সূত্র ধওে পাঠক সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার উত্তেজনায় নাট্য-ঘঁনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পারেন। নাটকে পূর্বাপর উৎকণ্ঠা বজায় রাখা প্রকৃত নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে নাট্যকার কষনও কষনও 'প্রচ্ছন্নতার' সহায়তা নেন। নাট্য-কাহিনির কোনো এশটি ঘঁনা, সত্য বা তথ্য নাটকের শেষে উন্মোচিত হওয়াকে 'প্রচ্ছন্নতা' বলে। 'ধাকস্মিকতা' (surprise) আরেকটি নাট্য-উপাদান। এটি নাট্যক্রিয়া ও নাট্যোৎকণ্ঠার জন্য প্রয়োজন। কোনো এশটি চরিত্রের আকস্মিক আগমন, হঠাৎ কোনো সত্যেও উন্মোচন প্রভৃতির কারণে নাট্যরস ক্রম-ঘনীভূত হয়। নাটকীয়তা সৃষ্টির আরেকটি উপাদান নাট্যশ্লেষ বা নাট্যবক্রোক্তি (dramatic irony)। এটি শ্লেষ অলংকাওে মত দ্ব্যর্থকুার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নাটকে এমন কিছু ঘঁনা বা সংলাপ কিংবা চরিত্রের কার্যকলাপ সন্নিবেশিত হতে পাওে, যা পাঠক মনে দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করে– একে নাট্যশ্লেষ বলা হয়। নাট্যশ্লেষ পাঠক চিত্তে বেদনা ও কৌতুক দুই-ই সঞ্চারিত করে। নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টিতে ছয়টি অপরিহার্য উপাদানের উল্লেখ করেন আরিস্টটল: কাহিনি/বৃত্ত (plot), চরিত্র (character), রচনাশৈলী (diction), ভাব (thought), দৃশ্য (spectacle), সংগীত (melody)। এসব উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় নাট্যশিল্পের জগৎ।

নাট্যসাহিত্যেও সূচনাবিন্দুতে ভাষিক আশ্রয় কবিতা ছিল। ভাষার ক্রম-বিবর্তনের সূত্রে এবং সাহিত্যেও গতিধারার ফলে নাটকের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে গদ্য। ফলে নাটক ও কবিতার আপাত দূরত্ব তৈরি হয়। তবে, কবিতার রয়েছে এমন এক সম্মোহনী সামর্থ্য যা অনায়াসেই অন্য সাহিত্য-মাধ্যমকে প্রভাবিত করতে পারে। সময় ও সংকটের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য কবিতার প্রকরণে এসেছে নতুনত্ব।

> সময়ের সংকট ঝলসে দিচ্ছে তার শিল্পিত অবয়বকে, ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সংযোগের প্রকরণ। কবিতার ভাষায় আলো-আঁধারি চিরকাল ছিল; তবে এখন যেন তার জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা অনেক বেশি। (তপোধীর, ২০০৯ : ০৯)

এছাড়া, বাস্তববাদী নাট্যধারা ক্রমশ আকর্ষণ হারাতে শুরু করে। আধুনিক সময় ও সংকটে বিধ্বস্ত মানব মন ও রূঢ় বাস্তবতাকে প্রথাবদ্ধ নাট্য-কাঠামোর রূপ দিয়ে নাট্যকারেরাও তৃপ্তি অনুভব করছিলেন না। আধুনিক কবিগণ সময়-সঞ্জাত বাস্তবতাকে নাট্য-ফর্মে নতুন ভঙ্গিমায় চিত্রিত করতে আগ্রহী হলেন। বিশ্বনাট্য জগতে তাই নতুন প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। সময়ের কাঙ্ক্ষিত ও অভিনব প্রকরণ হিসেবে কাব্যনাট্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মূলত: 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী

বন্ধ্যা নাট্যকলার প্রতিক্রিয়ার ফলে এলিয়ট প্রমুখের মধ্য দিয়ে কাব্যনাটক কথাটির বহুল প্রচার ঘটে।' (শান্তনু, ২০১৩ : ০৭)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে কবির মানসভূমি, কবিতার পটভূমি এবং পাঠক-শ্রোতার চৈতন্য গভীরভাবে আলোড়িত হয়। কবি ও পাঠক উভয়েই যুগের সংকট কবিতায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। যুগ-মানসের নান্দনিক প্রতিবিম্বায়নের জন্য কবিরা নতুন প্রকরণের সন্ধানী হন। এ অনুসন্ধানের শিল্পফসল কাব্যনাট্যিক ফর্ম। আধুনিক কাব্যনাট্যসাহিত্যের পথিকৃৎ টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮–১৯৬৫)। এলিয়ট কবিতার রূপাবয়বে যুগের চালচিত্র নৈর্ব্যক্তিক ও নাট্যিক গুণের সন্নিবেশে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন: এ ক্ষেত্রে তিনি কবিকে হতে বললেন- 'More and more comprehensive'। সময় ও সভ্যতার অনিবার্য মুহূর্তকালে সাহিত্যের রূপগত পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। 'কবিতার গঠনগত রূপে এই আঙ্গিকগত পরিবর্তন পাঠককে দিশেহারা করেছে, আবার পাঠকের কথা ভেবেই এমন এক আঙ্গিকের কথা ভেবেছেন কবিরা যাতে পাঠকের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া যোগ নতুন করে প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে। এই অন্বেষণেরই ফল কাব্যনাট্য। কবি আর নাট্যকারের দ্বৈতসিদ্ধি সমাহৃত হয়েছে এখানে।' (উত্তম, ১৯৮৯ : ০৯) কাব্যনাট্যতাত্ত্বিক তরুণ মুখোপাধ্যায় মনে করেন:

> কাব্যনাট্য মূলত চরিত্রে নাটক; যার অন্তঃসার কবিতা। কবিতা মানে এখানে ছন্দোবদ্ধ বাণীবিন্যাস মাত্র নয়। কবিতার মধ্যে যে গহনগভীর উপলব্ধি, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা থাকে, যে নান্দনিক চেতনা থাকে, যে না-বলা বাণীর ব্যাকুলতা থাকে– তাই কাব্য বা কবিতার অন্তঃসার। (তরুণ, ২০০৭ : ১৩৫)

কবিতা ও নাটক দুটি স্বতন্ত্র প্রকরণ-বিন্যাস। কবিতায় নাট্যগুণ এবং কখনও-বা নাটকে কাব্যগুণের সংশ্লেষ ঘটে নান্দনিকতার প্রয়োজনে, কখনও-বা সমাজ ও জীবনের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার নিমিত্তে। `From the point of view literature, the drama is only one among several poetic form. The epic, the ballad... Nevertheless, the drama is perhaps the most permanent, is capable of greater variation and of expressing more varied types of society, than any other.' (Eliot, 1920 : 54)

নাট-প্রকরণে ঘটনার সংঘাতময় গ্রন্থনা, চরিত্রসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বাস্তব পটভূমিকা থাকে। কবিতায় থাকে কবির অন্তরের ভাবনাসূত্র, অনুভূতির প্রগাঢ়তা। কাব্য ও নাট্য উভয় ফর্মের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রেখে কাব্যনাট্যকে যথাযথ ও সফল হতে হয়। জীবনের যে গল্প, ঘটনা নাটকের প্রথাগত ফর্ম ধারণ করতে পারে না; আবার তা কেবল কবিতার ফর্মেও আঁটে না– সেই গল্প বা আখ্যান খুঁজে নেয় কাব্যনাট্যের পরিসর। অর্থাৎ, আধুনিক শিল্পীর অস্ফুট, অর্ধস্ফুট

গল্প বলার আধুনিক প্রকরণ হলো কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যে নাটকের ঘটনা, গতিশীলতা, উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতার সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ অথচ সূক্ষ্ম ভাবসম্পদ কাব্যের পেলবতা নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবাবেগসহ বিকশিত হবে। মূলত, কবিতা ও নাটকের রসায়নে এক অভিনব শিল্পভুবন সৃষ্টি হয়; তা নাটকের জগৎ নয়, কবিতার জগৎ নয়– তা কাব্যনাট্যের এক অভিনতুন জগৎ।

১.২ বৈশ্বিক নাট্যচর্চায় কাব্যনাট্যের অবস্থান

শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক যে-কোনো আলোচনায় গ্রিক ও রোমান তাত্ত্বিকগণ অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হন। শিল্প-সাহিত্যের ধ্রুপদী ও ধারাবাহিক রূপাবয়ব নির্মিতিতে তাঁদের যুগান্তরকারী ভূমিকা রয়েছে। গ্রিসের কবি ও দার্শনিক প্লেটোর (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭–খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৮) অভিমত হচ্ছে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার প্রথম সোপান।

> পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে নন্দিত শিল্পতাত্ত্বিক নিঃসন্দেহে প্লেটো। ... আজ সারা পৃথিবীতে নান্দনিক ভাবনার যে সুর দার্শনিকদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, তার উৎস বা সৃষ্টিপথ সেই প্রাচীন গ্রিসে। সেই প্লেটোর মননে। মার্কিন দার্শনিক যথার্থই বলেছেন, 'প্লেটোই দর্শন, আর দর্শন মানেই প্লেটো'। (সুখেন, ২০১০ : ৩২)

দার্শনিকের দৃষ্টিতে তিনি সাহিত্য বিশ্লেষণ করেন। *দ্য রিপাবলিক*, *ফিডো*, *এপলোজি*, *ক্রাইটো*, *প্রোটাগোরাস*, *গর্জিয়াস*, *সফিস্ট*, *ল'য*, *ক্রিটিয়াস* প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর দর্শন চিন্তা ও রাষ্ট্রভাবনার পরিচয় মেলে। তিনি 'ধারণাতত্ত্ব' (theory of idea)– এর আলোকে কাব্যকে বিচার করেন। তাঁর মতে, কাব্য অনুকরণের অনুকরণ বলে তা সত্য থেকে একাধিক স্তর দূরবর্তী। ভাবাবেগ ও কল্পনার আশ্রয়ে কবিতা জন্ম বলে তিনি কাব্যকে অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক সাহিত্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ, শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত সত্য তাঁর নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হয়নি। তিনি কাব্যে কোনো বিষয় উপস্থাপনের কৌশল (manner of presentation) নিয়ে আলোচনা করেন। কাব্যে কী বলা হবে, কীভাবে বলা হবে, কোন পুরুষে বর্ণিত হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অভিমত পরবর্তী সময়ের তাত্ত্বিকদের জন্য পাথেয়স্বরূপ। শিল্পতাত্ত্বিক আরিস্টটলের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪–খ্রিস্টপূর্ব ৩২২) প্রধানতম অনুপ্রেরণা ছিলেন প্লেটো। তাঁর রচিত *পোয়েটিকস্*– আধুনিক সাহিত্যের আকর গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কাব্য, মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি নিয়ে তাঁর ভাবনা আজ অবধি সাহিত্য বিশ্লেষণ গুরুত্বের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা পায়। সাহিত্য মানবজীবনের বৈচিত্র্যময়তার নান্দনিক প্রকাশ– তাঁর এ অভিমত আধুনিক সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করেছে নিঃসন্দেহে। বস্তুজগতের বিশৃঙ্খল ঘটনাপ্রবাহের হুবহু অনুকরণ নয়, বরং কবির কল্পনা ও দর্শন চিন্তার সংমিশ্রণে তা নান্দনিক রূপ পায় বলে তিনি মনে করেন। তিনি

হোমার, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস প্রমুখের কাব্যভাবনা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে ট্র্যাজেডি ও কমেডি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন। তাঁর তাত্ত্বিক সূত্রসমূহ আধুনিক নাটক ও কাব্যনাট্য বিগঠনের আকর হিসেবে কাজ করে। `There must therefore be six parts of a tragedy, from which it derives its quality: these are, the story, the manner, the discourse, the sentiment, the scenery, and the melody.' (Aristotle, 1819 : 15) আধুনিক নাটকের অঙ্গ-সংগঠন আরিস্টটল-কথিত এ ছয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। বস্তুত 'বিংশ শতাব্দীতেও, (ট্র্যাজেডি তত্ত্ব আলোচনার জন্য তো বটেই) এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান সংরক্ষিত রয়েছে।' (সাধনকুমার, ১৩৬৯ : ৬০)

গ্রিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত রোমান শিল্পতাত্ত্বিক কুইন্টাস হোরাটিয়াস ফ্লাক্কাস (খ্রিস্টপূর্ব ৬৮–খ্রিস্টপূর্ব ০৮)। তাঁর রচিত চারশো সাতষট্টি চরণের *আর্স পোয়েটিকা* (খ্রিস্টপূর্ব ১২–খ্রিস্টপূর্ব ০৮)–য় কাব্যনির্মাণতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির সন্নিবেশ ঘটেছে। তাঁর মতে, সাহিত্য-শিল্পের মূল কথা হল প্রকাশ। প্রতিনিয়ত মানুষ বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হচ্ছে। তিনি মনে করেন সাহিত্যে সে-সবের প্রকাশ তাই বৈচিত্র্যময় হতে হবে। মানবজীবনকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে প্রতিতুলনায় তিনি বলেন, বৃক্ষ হল সাহিত্য, আর ভাষাবিন্যাস সে-বৃক্ষের পত্র-পল্লব। একটি বৃক্ষ যেমন প্রতি বছর নতুন পত্র-পল্লবে সজ্জিত হয়, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমন। (সুখেন, ২০১০) কাব্যভাবনার সঙ্গে জীবনভাবনার গভীর সম্পর্ক নির্ণয়-সূত্রে তিনি এ অভিমত দেন। কেবল প্রতিভা দিয়ে প্রকৃত লেখক হওয়া যায় না; তিনি মনে করেন এর জন্য সাধনা ও শৈল্পিক অভিপ্রায় অত্যাবশ্যক। তিনি কবির প্রতিভা ও জীবন-জগৎ দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্যের বিষয় ও বিষয়ানুগ উপস্থাপন কৌশল এবং নাটকের চরিত্র সৃষ্টি ও নাট্যবস্তুর যথাযথ উপস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর শিল্পভাবনায় সাতটি বিষয় তাৎপর্যের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। সেগুলো হল: কাব্যের ঐক্য, কাব্যের বিষয়, কাব্যের রচনারীতি ও শব্দসৃজন, কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কবির প্রতিভা ও তার চর্চা, কাব্য নৈপুণ্য, কাব্য সমালোচনা। কাব্য বা শিল্পের নৈপুণ্যের, উৎকর্ষের উৎসভূমি কবির মনন। কবির প্রতিভা, দর্শন-চিন্তা, বিষয় ও ভাষা নির্বাচন প্রভৃতি কবির কাব্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে কবির নিজস্ব স্টাইল গড়ে ওঠে। নাট্যকাব্যের আলোচনায়ও তিনি এসব বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাহিত্যে প্রকাশের উৎকর্ষ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সূত্র প্রদান করেন রোমান কাব্যতাত্ত্বিক লঙ্গিনুস। *On the Sublime* গ্রন্থে প্রকাশের উৎকর্ষ ও উৎকর্ষের পথে বাধা নিয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রভিতাকে উৎকর্ষময় করতে শ্রমনিষ্ঠা ও অনুশীলন বিকল্প নেই। তিনি বলেন `the vices of tumidity, puerility,

misplaced passion, and frigidity' সাহিত্যের উৎকর্ষের পথ বিঘ্নিত করে। সাহিত্যিককে এসব বিষয়ে সতর্ক থেকে রচনায় মনোনিবেশ করতে হবে। তাঁর মতে:

> Next he enumerates five sources of the sublime. The first and most important of these is grandeur of thought- the power of forming great conceptions. (Longinus 1907 : 24)

তিনি মনে করেন মহৎ কাব্য ভাবনা সৃষ্টি ছাড়াও কাব্যের প্রকৃত উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন ভাবাবেগের উদ্দীপনা, আদর্শ রূপকলা সৃষ্টি, প্রকাশরীতির মহত্ত্ব ও আভিজাত্য এবং বলিষ্ঠ ভাব প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক দক্ষতা। তিনি কবিতার সঙ্গে কল্পনার সংযোগ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বিকশিত হওয়া কল্পনাতত্ত্বের পথ সুগম করে। তাঁর চিন্তার সূত্র ধরে সাহিত্যে নির্দিষ্ট কাঠামো থেকে মুক্ত হবার অবকাশ পায়। মূলত গ্রিক নাট্যভাবনায় নির্দিষ্ট ফর্ম ও নিয়মের বাধ্যবাধকতা ছিল। রোমান নাট্যভাবনায় তা খানিকটা শিথিল হয়। তবে, গদ্যের পরিপূর্ণরূপে বিকশিত না হওয়ায় তখনও পূর্বের মত কাব্যই ছিল নাটকের প্রধান আশ্রয়।

> পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাল গ্রীক ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলাই ছিলো কাব্যনাটকের। অবশ্য তখন কাব্যনাটক কথাটির আলাদা প্রচলনের প্রয়োজন হয় নি, কারণ কাব্যে নাটক রচনাই ছিলো তখনকার সাধারণ রীতি। (শান্তনু, ১৯৫৮ : ০৯)

এলিজাবেথীয় যুগের বিশ্বনন্দিত কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়র (১৫৬৪–১৬১৬) নাট্যশিল্পের যুগান্তরকারী পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি আনেন। তিনি ক্লাসিক্যাল শিল্পরীতির প্রতি আনুগত্যশীল না হয়ে চিন্তার স্বকীয়তায় গড়ে তোলেন আধুনিকস্পর্শী নাট্যরীতি। *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* (১৫৯৪), *দি কমেডি অব এররস* (১৫৯৩), *টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা* (১৫৯৪), *লাভ্‌স্ লেবারস লস্ট* (১৫৯৪), *টেমিং অব দ্য শ্রু* (১৫৯৪), *কিং জন* (১৫৯৬), *জুলিয়াস সিজার* (১৫৯৯), *দি মার্চেন্ট অব ভেনিস* (১৫৯৬), *হ্যামলেট* (১৬০১), *ওথেলো* (১৬০৪), *কিং লিয়ার* (১৬০৫) –সহ অসংখ্য নাটক ও কবিতায় তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পভাবনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এসব নাটকে মানব চরিত্র চিত্রণের বৈচিত্র্য পাঠকচৈতন্যে বিস্ময় জাগায়। বহির্দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক গ্রিক ট্র্যাজেডির বিপরীতে শেক্সপিয়রীয় নাটকে চিত্রিত হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক ট্র্যাজেডি। নিয়তি ও মানুষের স্বাধীন সত্তার দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে:

> মনোবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বেই মানুষের অন্তর্মনের যে দ্বন্দ্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভাবলে অবাক হতেই হয়। (শেকসপিয়র, ২০০৯ : ভূমিকা)

তিনি আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, বীরত্ব-ভীরুত্ব, জয়-পরাজয় প্রভৃতি মানবজীবনের বৈপরীত্যসূচক প্রান্তসমূহকে নাট্য-আখ্যানে সহ-অবস্থান দিয়েছেন। জীবনের বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যকে তিনি ধারণ করেন ভাষার বহুত্ব-

ব্যঞ্জনায়; শব্দের শক্তিশালী ভাণ্ডারের আশ্রয়ে। বলা যায়, তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টার সূত্রে আধুনিক কাব্যনাট্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়।

> শেক্সপীয়রের নাটকীয় form-এর অন্যতম আদর্শ ছিলো poetic drama. … রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়রকে অনুসরণে সৃষ্ট প্রখ্যাত নাটকগুলির সবই কাব্যনাট্য। (সনৎকুমার, ১৩৬০ : ১৬৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রভাবে শেক্সপিয়রের নাট্যাদর্শের সঙ্গে বাংলা নাটকের পরিচয় সুদৃঢ় হয়। তাঁরই নাট্যাদর্শের অনুসরণে নতুন নাট্য-জগৎ নির্মিত হয়। এ সময়ে বেশ কয়েকজন নাট্যকার শেক্সপিয়রের নাটক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করে বাংলার নাট্যধারাকে সক্রিয় রাখায় সচেষ্ট হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯–১৯২৫) *জুলিয়াস সিজার*, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪–১৯১১) *ম্যাকবেথ*, দেবেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬০–১৯৩৯) *ওথেলো* অনুবাদ করেন। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭–১৮৮৪) তাঁর *দি মার্চেন্ট অব ভেনিস* এবং *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* এর অনুকরণে লেখেন যথাক্রমে *ভানুমতী চিত্তবিলাস* (১৮৫৩) ও *চারুমুখ চিত্তহরা* (১৮৬৩); হরলাল রায় (১৯২৩–১৯৯৪) *ম্যাকবেথ* এর অনুসরণে *রুদ্রপাল*; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২–১৯২৩) *দি টেম্পেস্ট* এর আদলে *নলিনী-বসন্ত* রচনা করেন। মূলত বাঙালির আধুনিক নাট্য-মানস ও নাট্য-রীতি অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তাঁর রীতি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

১.৩ বিশ শতকের বিশ্ব নাটক ও কাব্যনাট্য: বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব

বিশ শতকের বিশ্ব নাটকের রয়েছে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। বিশ শতকের নাট্যধারায় সুইডিশ নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের (১৮৪৯–১৯১২) নাম শেক্সপিয়র ও হেনরিক ইবসেনের (১৮২৮–১৯০৬) সঙ্গে সম-তাৎপর্যে উচ্চারিত হয়। তাঁর যাপিত জীবন ও সাহিত্যিক জীবন ছিল সংগ্রামশীল। স্ট্রিন্ডবার্গ প্রথানুগত্যের বিপরীতে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে নাটক রচনা করে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি ন্যাচারালিজম, ট্র্যাজেডি ভাবনা, মনোড্রামা প্রভৃতি নাটকে প্রয়োগ করেন। *মাস্টার ওলফ* (১৮৭২), *দ্য ফাদার* (১৮৮৭), *মিস জুলি* (১৮৮৮), *ক্রেডিটরস* (১৮৮৯), *দ্য গ্রেট হাইওয়ে* (১৯৯০) *এ ড্রিম* (১৯০২) নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি একজন আধুনিক নাট্যতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর রচিত *অন সাইকিক মার্ডার* এবং *অন মর্ডান ড্রামা এন্ড দ্যা মর্ডান থিয়েটার* নাট্যজগতে পরিবর্তন আনে। তিনি আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্বমুখরতা, ব্যক্তিসত্তাকে হারিয়ে অস্তিত্বহীন মানবের অসহায়ত্ব গদ্য ও পদ্যে নাট্য-আখ্যানে তুলে ধরেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ *মিস জুলি* নাটকের মিস জুলির ভাষ্য:

> My father, my mother, I myself? I myself? I haven`t got a self at all… (August, 1924 : 45)

মায়ের মৃত্যুর পরে পিতা কাউন্টের বিত্ত-বৈভবে বেড়ে ওঠা *মিস জুলি* নাটকের শেষ মুহূর্তের উপলব্ধি– তার সাহস, ক্ষমতা, বৈভব, চিন্তা, শিক্ষা সবকিছুই অপরের। তার সমস্ত কিছুর মূলে পিতা-মাতার শিক্ষা– এ বোধ তাকে ক্রমশ অস্তিত্বহীনতার চরমে নিয়ে যায়; এমনকি ধাবিত করে আত্মহননের দিকে। বস্তুত, নিজস্ব স্বপ্ন ও সাহস নিয়ে বাঁচতে চায় মিস জুলি। স্ট্রিন্ডবার্গ ব্যক্তি-মানসের সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি, স্বপ্ন, আত্মমুক্তির বাসনাকে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করেন।

আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৬৫–১৯৫০) বিশ্ব নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সমাজ ও জীবনের নিবিষ্ট পর্যবেক্ষক এবং মানবতাবাদী হিসেবে। "নাটকের ক্ষেত্রে জর্জ বার্নার্ড শ ইব্‌সেনের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের প্রেরণায় এক নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। মননশীল, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, রোমান্টিকতা তথা ভাবাবেগের তীব্র সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তির্যক সরসতা ইত্যাদি ছিল শ'র থিয়েটারের অভিনবত্ব।" (কুন্তল, ১৯৫৯ : ১৯৫) সমাজের অবক্ষয়, অন্যায়-অবিচার, মানুষের অবমূল্যায়ন, পুঁজিবাদের কদর্য চেহারা, সমাজ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো নারীর অস্তিত্বহীনতাসহ নানাবিধ সংকট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নাটক লেখেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কসীয় তত্ত্ব। ফলত, তাঁর নাটক সংকটের বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। *'মিসেস ওয়ারেন্‌স প্রফেসন'* (১৮৯৩), *উইডোয়ার্স হাউসেস্‌* (১৮৯২) *আর্মস্‌ অ্যান্ড দ্যা ম্যান* (১৮৯৪), *ক্যান্ডিডা* (১৮৯৪), *দি ম্যান অব ডেস্টিনি* (১৮৯৫), *পিগম্যালিয়ন* (১৯১২), *ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান* (১৯০২), *মেজর বারবারা* (১৯০৫), *দ্য ফিলান্ডারার* (১৮৯৩), *সেন্ট জোয়ান* (১৯২৩) সহ অসংখ্য নাটকে পূর্ববর্তী তরল ও অবাস্তব আবেগ-সর্বস্বতার বিপরীতে তীক্ষ্ণ-তির্যক, ব্যঙ্গ ও কৌতুকচ্ছলে বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। *মিসেস ওয়ারেনস্‌ প্রফেসন* নাটকে মিসেস ওয়ারেন চরিত্রকে নির্মাণ করেন অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে ক্রমশ দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হয়ে-পড়া নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে। নারীর পতিতাবৃত্তির কারণ হিসেবে শ' দায়ী করেন আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে। তিনি নাট্য-আখ্যানে বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা, সমাজ ও সভ্যতার জন্য কল্যাণকামী চিন্তাসূত্রসমূহ বিধৃত করেন। *পিগম্যালিয়ন* নাটকে তিনি মিথকথার আড়ালে শ্রেণি বিভেদ নিয়ে আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মতর্ব্য:

> Much of pygmation revolves ground a very divided class system. One of the play's themes is close to Shaw's beliefs- that people should not be limited by their birth or environment or even their speech. (Bernard, 1991 : ix–x)

নাটকের প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেন রুশ মঞ্চ অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক কনস্তানতিন স্টানিস্ল্যাভিস্কি (১৮৬৩–১৯৩৮)। নাট্য-পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা স্ট্যানিস্লাভিস্কি অল্প বয়স থেকে অভিনয় শিল্প নিয়ে

আগ্রহী হন। তিনি বিত্তবান পিতার সন্তান হওয়ায় মঞ্চ সুবিধা পেয়েছিলেন। 'আলেকসিয়েভ নাট্যচক্র' গড়ে তোলেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। মঞ্চে অভিনয়ের সাবলীলতা, যথার্থতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে তিনি আলোকপাত করেন। সস্তা জনপ্রিয়তা ও যথেচ্ছ অভিনয় নাকচ করে, তিনি গুরুত্ব দেন কাহিনি ও চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের যুক্তিযুক্ততাকে। তাঁর নিকট অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্প। তিনি 'ব্যালে' নৃত্যশিল্পীদের একনিষ্ঠ অনুশীলন, মনোযোগ ও দক্ষতাকে অভিনয়শিল্পে প্রত্যাশা করেন। অভিনয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনুশীলনকে অবিকল্প মনে করেন। অভিনয়ের প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিয়ে তিনি বলেন: অভিনয় অবচেতন মনের অংশ। সচেতন এবং যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে এ মন প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, `Art is a product of the imagination, as the work of a dramatist should be.' (Constantin, 1936 : 54) তিনি আরও বলেন: নাট্যকার ও অভিনেতাকে প্রকৃত নাট্যকার 'হয়ে-ওঠার' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নাট্যসাহিত্যকে শিল্প পর্যায়ে উন্নীত করতে নাট্যকারের প্রস্তুতি, শিক্ষা, দক্ষতার প্রয়োজন বলে তাঁর অভিমত। তাঁর মতে: `An actor should be observant not only on the stage, but also in real life.' (Constantin, 1936 : 91) এ পর্যবেক্ষণ শক্তি অভিনেতাকে অন্তরের দিক থেকে সৃজনক্ষম এবং সাবলীল ও প্রকৃত অভিনেতা হতে সহায়তা করে। অভিনেতার কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন: চরিত্র সম্পর্কে নিবিড়ভাবে ভাবা, চরিত্র-উপযোগী ও প্রাণবন্ত অভিনয় কৌশল আয়ত্ত করা, অভিনেতাকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হওয়া, অভিনেতা এমন দক্ষ হবেন যেন অভিনয়কালে তিনি তার অবচেতন মনের সমস্ত শক্তি ও সমভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অভিনয়কে শিল্পে উন্নীত করতে পারেন। এছাড়াও তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্রের সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করে পরবর্তী অভিনয়ে তা কাটিয়ে আরও শাণিত ও শিল্পিত হয়ে ওঠার পারেন। উপযুক্ত ফর্মে নাট্যবিষয়কে যথাসাধ্য সুবিন্যস্ত ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন অভিনয়শিল্পের লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেন।

> You can go astray only if you do not understand that truth: if you do not have confidence in nature, if you try to think out ``new principles'', ``new bases'', ``new art.'' Natures laws are binding on all, without exception, and woe to thos who break them. (Constantin, 1936 : 313)

সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে নাটককে জনতার শিল্পে পরিণত করার প্রত্যাশী ছিলেন। 'শিল্পের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য তাঁকে নিয়ে আসছে জনতার প্রতি আনুগত্যে।' (উৎপল, ১৯৯৮ : ২৭৩) এ জনসম্পৃক্ততা তাঁকে প্রবল মানবতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে। মানবতাবাদ থেকে তিনি সামষ্টিক কল্যাণবোধে সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হন।

জার্মান ইউজিন বের্টল্ট ফ্রেডরিক ব্রেখট্ (১৮৯৮–১৯৫৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের কবি হিসেবে নয়, বরং নাট্যকার ও নাট্যতাত্ত্বিক হিসেবে ইউরোপীয়দের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামশীলতার মাধ্যমে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়– এ বিশ্বাসের আলোয় তাঁর নাট্য-জীবন উদ্ভাসিত। শোষণ, নিপীড়ন, অসাম্য ও অমানবিকতার বিপরীতে আধুনিক নাট্য-পদ্ধতি গড়ে তোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৃংশসতা, যুদ্ধ-পরবর্তী সামূহিক সংকট, নিম্নবর্গীয় মানুষের দুর্বিষহ জীবন তাঁকে ভাবিয়েছে। এসব সংকটের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন মার্কসীয় দর্শনবিশ্বে।

> সমাজ, প্রেম, বিবাহ, অপত্যস্নেহ, মাতৃভক্তি, ধর্ম, আইন, সাহিত্য, চিন্তার প্রতি আনাচে কানাচে বিস্তৃত ব্রেখ্ট্- এর শ্রেণীচেতনা। (সত্য, ১৩৬৪ : বারো)

এরিস্টটলীয় নাট্যভাবনার বিপরীতে বিপ্লবী নাট্যাভিনয়ের অভিমুখ নির্মাণ করেন ব্রেখট্। এম্প্যাথি, ক্যাথারসিস প্রভৃতি এরিস্টটলীয় প্রত্যয় নাকচ করে এবং তাঁর কাহিনিবিন্যাসের পরম্পরা ও অখণ্ডতাকে অস্বীকার করে ব্রেখট্ কাহিনিকে পৃথক পৃথক উপকাহিনিতে বিভক্ত করে পরিবেশনের ধারণা দেন। ব্রেখ্ট, ম্যাক্স রাইনহার্ট, আরউইন পিসটের প্রমুখ পরিচালকেরা 'এপিক থিয়েটার' (epic theatre) নামে নতুন নাট্যরীতি গড়ে তোলে। এলিয়েনেশন (alienation) তাঁর নাট্যভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে মানসিক বা অনুভূতির দূরত্বের কথা বলে। 'অর্থাৎ ঘটনার কাছে বা ভেতরে থাকলে ঘটনাকে সঠিকভাবে বোঝা যায় না; বিশ্লেষণ করা যায় না; সেহেতুই দূরত্ব অপরিহার্য। ... এলিয়েশনকে তিনি তাঁর নাট্যায়নের জন্য প্রধান রীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। (জিয়া, ১৯৯৫ : ৮৯)

এপিক থিয়েটারে এলিয়েনেশন হল বাস্তব ও নাটকের পার্থক্য দর্শককে বুঝতে দেয়া; দর্শককে নাট্য-কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত না করা। ফলে দর্শক যা দেখছেন তা পুরোপুরি সত্য বলে মানছেন না; একই সঙ্গে দর্শক সমালোচনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। এ থিয়েটারের উপজীব্য হলো: বাস্তব বিষয়কে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা; ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে শ্রোতার সম্পর্ক যুক্তিনির্ভর হওয়া; থিয়েটারের সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের যোগ অধিক হওয়া; এর নাট্য বর্ণনা নির্ভর; দর্শক এখানে পর্যবেক্ষক; ঘটনার উল্লম্ফনধর্মিতা তৈরি করা প্রভৃতি। এপিক থিয়েটারের আরেকটি দিক: থিয়েট্রিক্যালিজ (theatricalism) নাটক চলাকালীন দর্শককে সচেতন রাখা যে, এটি নাটক মাত্র; সত্য ঘটনা নয়– এটিকে থিয়েট্রিক্যালিজম বলে।

ব্রেখট্ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি শ্রেণি-শোষণ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের তত্ত্বকথার মোড়কে জীবন ও সমাজ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অসংখ্য নাটকের রচয়িতা: *মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন* (১৯৪১), *বাল* (১৯১৮), *দ্য ওয়েডিং* (১৯১৯), *দ্য মাদার* (১৯৩০), *দ্য থ্রিপেনি অপেরা* (১৯২৮), *লাইফ অব গ্যালিলিও* (১৯৪৩), *দ্য প্রাইভেট টিউটর* (১৯৫০), *ড্রামস্ ইন দ্য নাইট* (১৯১৮), *দ্য বেগার* (১৯১৯), *ডন জন* (১৯৫২)। ত্রিশ বছর ধরে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা *মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন* নাটকে ব্রেখ্ট যুদ্ধের ভয়াবহতা, মানবতার বিপর্যয়ের পাশাপাশি মানুষের বেঁচে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টাকে মাদার কারেজ চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এ কাব্যনাট্য শেষ দৃশ্যে যুদ্ধে তিন সন্তান হারিয়েও ক্লিষ্ট শরীরের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে মাদার কারেজ ভ্রাম্যমান খাবারের গাড়ি টেনে চলছে আর তখন মঞ্চের পেছনে মর্মস্পর্শী সংগীতের মূর্ছনা:

With all its luck and all its danger
The war is dragging on a bit…
The new year's come, The Watchman shout.
The thaw sets in. The dead remain.'' (Brecht, 1939 : 82)

এভাবে সামূহিক বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের সংগ্রামশীলতা ব্রেখ্টের চেতনায় বড় হয়ে ওঠে। এ সংগ্রামশীলতাকে উপজীব্য নাট্যফর্মে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়াই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তাঁর নিরন্তর শিল্পসৃষ্টির তাৎপর্যই এখানেই।

বিশ্ব নাট্য অঙ্গনে টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮–১৯৬৫) কবি ও নাট্যকার– উভয় পরিচয়েই সমুন্নত প্রতিভা। ভিন্ন প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কবিতার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। *দি ওয়েস্ট ল্যান্ড* (১৯২২), *দি হলো মেন* (১৯২৫), *অ্যাশ ওয়েন্সডে* (১৯৩০) *ফোর কোয়ার্টার্স* (১৯৪৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে কবিতার ভাব ও রীতিকে পরিপক্ব ও সমৃদ্ধ করেন। 'সব কবিতার মধ্যেই নিহিত নাট্যমুখিতা রয়েছে যেমন সব নাটকেরই আছে অন্তর্গত কাব্যৈষা– এলিয়টই বলেছিলেন।' (দেবীপ্রসাদ, ২০১৫ : ৮০) তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে গীতিকাব্যিক-নাট্যিক-আখ্যানমূলক-পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যসমূহ; কখনও-বা কথোপকথনের সাধারণ ভঙ্গিমা। কবিতার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা প্রকাশসূত্রে এলিয়ট অনুভব করেন কবিতার কাঠামোয় নাট্যলক্ষণ। ইউরোপীয় প্রথাগত নাটকের বৈচিত্র্যহীনতায় এলিয়ট নতুন প্রকরণের অন্বেষী হন। নতুন এ নাট্যপ্রকরণে কবিসত্তার সরব উপস্থিতি এবং জীবন-জগৎ সম্পর্কিত প্রত্যাশিত শিল্পিত রূপায়ণ অভীপ্সাও থাকবে। এলিয়ট মনে করেন– পূর্ববর্তী নাট্যকারদের রচনায় কবিতা ও নাটকের উপস্থিতি রয়েছে, তবে তাতে নতুন শিল্পরস নির্মিত হয়নি। কবিতা ও নাটকের রসায়নে অভিনব প্রকরণ নির্মাণে শিল্পীকে `serious' হতে হয়। তিনি ``The possibly a Poetic Drama'' প্রবন্ধে বলেন:

> Very few treat art seriously. There are those who treat it solemnly, and will continue to write Poetic Pastiches of Euripides and Shakespeare; and there are others who treat it as a Joke. (Eliot, 1920 : 63)

তিনি শেকসপিয়রের রচনায় কাব্য ও নাট্যের সুষম বিন্যাস লক্ষ করে বলেন:

> I observed that when Shakespeare, in one of his mature plays, introduces what might passage, it never interrupts the action, or it out of character, but on the contrary, in some mysterious way supports both action and character. (Eliot, 1950 : 28)

শেকসপিয়রের নাটকের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য এলিয়টকে নতুন নাট্যভাবনায় উৎসাহিত করে। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়ড*, *ওডেসিসহ* তাঁর পূর্ববর্তী রচনাসমূহে এলিয়ট কাহিনি বিন্যাস, ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চরিত্রের মনোলোকের উন্মোচনে কবিতা ও নাটক একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওার সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। মূলত আধুনিক কাব্যনাট্যেও প্রবর্তনা টি. এস. এলিয়টের হাত ধরে। মানব মনের নিবিড় অনুভূতি নাট্যিক ও কাব্যিক সুষমায় নান্দনিক হয়ে ধরা দেয় কাব্যনাট্যে। এলিয়ট বলেন:

> It seems to me that if we are to have a Poetic Drama, it is more likely to come from poets learning how to write plays, than from skillfull prose dramatists learning to write poetry. (Eliot, 1950 : 33)

কাব্যনাট্যকার হওয়ার পূর্বশর্ত কবি হওয়া, তারপর নাট্যকার হওয়া। কাব্যনাট্যে সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগতে সঙ্গে পাঠকের সংযোগ ঘটে সংলাপের মাধ্যমে। এ সংলাপ হতে হয় কাব্যমণ্ডিত। কেননা: `Dialogue without Poetry is only half-alive. The dramatist who is not a Poet is only half a dramatist.' (Hudson, 1913 : 298)

১.৪ কাব্যনাট্যসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, স্বরূপ ও তাত্ত্বিক পরিচিতি

বিষয়-ভাবনা, শিল্পদৃষ্টি এবং প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য কাব্যনাট্যকে ঋদ্ধ সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছে। কবিতা এবং নাটকের বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী অন্তর্বয়নে আধুনিক কাব্যনাট্যের (poetic drama) জন্ম। ইংরেজিতে কাব্যনাট্যের বেশ কয়েকটি প্রতিশব্দ প্রচলিত রয়েছে: `dramatic poetry', `verse drama',

`dramatic verse', `poetic drama' ইত্যাদি। এখানে `verse play' ও `poetic drama' প্রত্যয়ে কাব্যলক্ষণ এবং `dramatic poetry' ও `dramatic verse' -এ নাট্যলক্ষণ প্রাধান্য পায়। ``verse drama' কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু `poetic drama' যেন দুটি পৃথক গুণের দ্বন্দ্ব সমাস।' (কণিকা, ১৯৯৪ : মুখবন্ধ) আধুনিক কাব্যনাট্যতাত্ত্বিক টি. এস. এলিয়ট `verse play' ও `poetic drama'-কে সমার্থক বিবেচনা করেন। তিনি এতে একই সঙ্গে 'form of entertainment' ও 'form of art'-এর মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। কাব্যনাট্যের সংজ্ঞার্থ প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> The poetic drama must have an emotional unity, let the emotion be whatever you like. It must have a dominant tone, and if this be strong enough, the most heterogeneous emotions may be made to re-inforce it. (Eliot, 1951 : 214)

অশ্রুকুমার সিকদার কাব্যনাট্যের স্বরূপ চিহ্নিত করেন এভাবে:

> তার নামই জানিয়ে দিচ্ছে তাকে নাটক ও কাব্য হিসাবে সার্থক হতে হয়। ... এখানে নাটকীয়তার মধ্যে কাব্যত্ব এবং কাব্যত্বের মধ্যেই নাটকীয়তা নিহিত। ... কাব্যনাট্যকে নাটক হওয়ার পরেও কাব্য হতে হয়। ঘটনার গতি উৎকণ্ঠা বিস্ময় এই সব নাটকীয় গুণ যেমন থাকবে, তেমনি ঘটনা চরিত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে তারই মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তাৎপর্যও পুষ্পিত হবে কাব্যের মতো। (অশ্রুকুমার, ২০১৬ : ৩৪১)

এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত:

> যে নাট্যধর্মী রচনায় কাব্যগুণের প্রাধান্য এবং নাট্যরস 'কাব্য-বেষ্টনীসংহত' তা হ'ল নাট্যকাব্য, আর যে রচনায় কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না ক'রে এর 'সমশক্তিসম্পন্ন' হয়ে ওঠে এবং নাট্যধর্মের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা আনুগত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তা হ'ল কাব্যনাট্য। (শ্রীকুমার, ১৩৭২ : ১৪৮)

মূলত কবিতার চূড়াস্পর্শী সামর্থ্যের সঙ্গে নাট্যগুণের কৌশলগত সমন্বয়ে কাব্যনাট্যের জন্ম। নাটক ও কবিতার আশ্রয়ে বিশেষ আইডিয়া ও আইডিওলজিকে কেন্দ্র করে এর অভিযাত্রা। এতে কবিতা বা নাটক একটি আরেকটিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে না। নাট্য প্রকরণে 'অন্তর্নিহিত বাস্তবতা' (inner reality) এবং 'অন্তর্নিহিত সত্য' (inner truth)–কে প্রকাশ করার তাগিদেই কবিতার সন্নিবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কাব্যনাট্যকারকে কবির মন্ময় ভাবাশ্রয়ী সৃষ্টিশীলতা-তুল্য উৎকর্ষকে নিশ্চিত করেই তাই আত্মস্থ করতে হয় নাটকের প্রয়োগরীতি ও কলাকৌশল, অপরদিকে নাট্যকার-তুল্য বহুস্বরিক সংজ্ঞাপন-সামর্থ্য অর্জন করেই বুঝতে হয় কবিতার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ও তাৎপর্য। বস্তুত, যে নাটকের অন্তর্দেশে গীতিময়তা, সুরের মূর্ছনা থাকে, চরিত্রসমূহের সংলাপে কবিমানসের নানাবিধ অনুভবের প্রকাশ

ঘটে–তা কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যসাহিত্য পাঠক-দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে যোগাযোগ নির্মাণের কার্যকর শিল্পমাধ্যম। আর যোগাযোগের সেতুটি গড়ে ওঠে কবিতার অন্তর্বয়নে এবং নাটকের কাঠামোয়।

> পাঠক, দর্শক ও কবি-নাট্যকারের সঙ্গে এই কাব্যনাট্যই সাযুজ্য ঘটায়। কবিতা পাঠের অনুভবের এবং কবিতাকেই মঞ্চস্থ দেখার আনন্দ অনুভব করে পাঠক– `should be affected by the poetry' এবং কবিতার সাহায্যে জনমানসের অনুভূতি, ইচ্ছেকে ব্যক্ত করা সহজ বলে তাঁর মনে হয়েছে। (তরুণ, ২০০৩ : ২৩)

কাব্য ও নাটকের শর্ত পূরণ করে এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ, বাহুল্য বর্জিত ও অপরিহার্য হয়ে কাব্যনাট্যের ভুবন সৃষ্টি হয়। প্রথাবদ্ধ নাটকে অনিবার্য হয়ে উঠলেই কেবল কবিতার আশ্রয় নিতে হয়। আর কাব্যনাট্যে অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ আবেগের অন্তর্বয়নের তাগিদে কবিতার ভাষা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে গদ্য ফর্মেও কাব্যনাট্য রচনার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> ঘণ্টা বাজছে। একটি পরমাণু খসে গেছে। আর একটি পরমাণুকে ডাকছে। তিনটি পরমাণু ডাকছে। আরো রাশি রাশি পরমাণু মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে বিরাট এক পৃথিবী ঘুরছে আর ঘুরছে। আর একের পর এক সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। (আবার ঘণ্টা। অমল-বিমল-কমল অধৈর্য।) ঘণ্টা বাজছে। আবার বাজবে। তবু পৃথিবী আছে। তবু শতাব্দী আছে। আমার পৃথিবী। আমার শতাব্দী। নাগরদোলা চুলোয় যাক। আমরা আছি। অমল-বিমল-কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং আমি। আমরা আছি। এখন আছি। পৃথিবীতে আছি। (অমল বিমল কমল অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন ঘণ্টা দিচ্ছে। কিন্তু ওদের ওখানে আবছায়া। তীব্র সন্ধানী আলো লেখককে কুড়িয়ে নিয়েছে।) (বাদল, ১৪২১ : ২৮৫)

গদ্যভঙ্গিমার মধ্যে শব্দবিন্যাসের এমন চমৎকার কারুকাজে পুরো সংলাপে অ্যাবসার্ডধর্মিতার আশ্রয়ে সুরের হিল্লোল বয়ে চলেছে যেন।

কাব্যনাট্যের আলোচনায় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য আলাদা জাতের। এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের মধ্যে পার্থক্য-সূত্র উল্লেখ করেন এভাবে:

> 'Verse drama' is a purely technical phrase; it makes no implications whatever as to the quality of the script or of the play as a whole. Unlike `poetic drama', it is entirely neutral in its application. (Denis, 1966 : 03)

নাট্যকাব্যে নাট্যগুণ অতিক্রম করে কাব্যগুণ মুখ্য হয়ে ওঠে। আর কাব্যনাট্যে 'It must justify itself dramatically, and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form.'' (Eliot, 1961 :

74) অর্থাৎ, কাব্যগুণকে নাট্যগুণের অনুসারী হতে হয়। কাব্যনাট্যের রসাস্বাদনে পাঠক নিজের অজান্তেই কবিতায় নিমগ্ন হন। নাটক প্রথমত পাঠককে জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণের ধারণা দেয়, দ্বিতীয়ত কবিতা পাঠককে একধরনের উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায়। অর্থাৎ কাব্যনাট্য অর্ধেক নাটক, অর্ধেক কবিতা। সুতরাং কাব্যনাট্যে এ দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে হয় সচেতনভাবে। আধুনিক কাব্যনাট্য মূলত নাটক। এটি একটি বিশেষ ফর্ম যা কবিতার নিগূঢ়তাকে ধারণ করে, পাশপাশি নাটকের মানবিক যূথবদ্ধতাকে স্পর্শ করে এবং এ দুয়ের সংগতিতে ও নান্দনিক ভারসাম্যে অভিনব শিল্পাবয়ব রচনা করে। কবিতা এখানে নাটকের সহচর, নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ দুটিই এতে সমান গুরুত্ব পায়। নাটকের গতি ও কাব্যের শিল্পিত দৃশ্যকল্প কাব্যনাট্যে সংশ্লেষিত হয়। এ সংশ্লেষ কবির হাতে নান্দনিক হয়ে ওঠে।

> কবিতার বিষয় যখনই নৈব্যক্তিক প্রকাশের শর্তে [এই নৈব্যক্তিকতা রূপগত অর্থে] নাটকের কুশীলব সংলাপের কাঠামো আশ্রয় করে, তখনই রচিত হয় নাট্যকবিতা। দীর্ঘকবিতার মধ্যে নাট্যকবিতার সম্ভাবনা ফুটে ওঠে বলে নাট্যকবিতার রীতিতে দীর্ঘ আঙ্গিক ও ব্যাপ্ত পরিসর গৃহীত হয়, তবে তা বহির্গত রূপবন্ধ মাত্র। অন্তর্গতভাবে নাট্যকবিতা কবিতারই সম্প্রসারণ যেখানে ভাব নাট্যধর্মী হয়ে কবির আত্মগত রূপটিকে চরিত্র ও ব্যক্তিপাত্রের কণ্ঠস্বরে নিরূপিত করে তোলে। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৫৮)

অর্থাৎ নাট্যকাব্য প্রধানত কবিতা। এর মধ্যে নাট্যিক বৈশিষ্ট্য কাব্যের সীমা অতিক্রম করে না। নাট্যকাব্যে কাব্যভাবনা, নাটককারের কল্পনা ও সংলাপ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্র ও ঘটনার চমক সমস্তটাই কাব্যিকতায় আচ্ছন্ন থাকে। বর্ণনা বা বিবরণধর্মিতার আধিক্যের কারণে কখনোবা নাট্যকাব্য কাহিনিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়। অপরদিকে, কাব্যনাট্যে কবির সত্তা সঞ্চারিত হয় চরিত্রের মনোলোকে। ফলে কাব্যনাট্যে নাট্যরচয়িতার নিজস্বতাকে চিনে নেয়া যায় অনায়াসে।

কাব্যনাট্যে এলিয়ট-কথিত থার্ড ভয়েসের ভূমিকা লক্ষণীয়। থার্ড ভয়েসের মাধ্যমে নাট্যকার মানব জীবনসম্পর্কিত নানা অনুভব ও উপলব্ধ গভীর জীবনবোধকে পাঠকের গোচরে আনেন। এসব নাট্যকাব্যে অনুপস্থিত। ভাব ও আবেগ প্রবল বলে এ নাট্যকাব্যের সংলাপ দীর্ঘ হয়। নাট্যকাব্যে চরিত্রের অন্তর্লোকের সংঘাত তেমন থাকে না। এর বিপরীতে কাব্যনাট্যে অন্তর্সংঘাত মুখ্য হয়ে ওঠে। সংঘাত ও অন্তসংর্ঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায়। যেমন : রাম বসুর *নীলকণ্ঠ* (১৯৫৭) নাটকের অরুণা ও শেখরের পারস্পরিক সংলাপে আধুনিক মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়েছে। আবার, কাব্যনাট্যে নিত্যদিনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অনন্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

হঠাৎ নূরলদীন দেখিবারে পায়,
দেখিয়া তাজ্জব তাঁই হয়া যায়, দেখিবার পায়,
বাপ তার নিজ কান্ধে জোয়াল তুলিল,
জোয়ালে সে অতি ধীরে নিজেকে জুতিল। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ১১৬)

নূরলদীনের স্বপ্ন-কল্পনায় যেন কোনো ভান নেই, আড়ম্বর নেই; আছে কেবল সামান্য স্বপ্নটুকু বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার সুতীব্র আকুতি যার মধ্য দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক সমগ্র বাঙালি জাতির ঐতিহ্যময় জীবনাকাঙ্ক্ষা চিত্র আঁকেন।

একটি বিশেষ ভাবাদর্শকে আশ্রয় করে কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু অন্তর্বয়িত হয়। অতীত, পুরাণ কিংবা ইতিহাস, সমসাময়িক সংকট কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে প্রচলিত নাটকের ন্যায় ঘটনার যৌক্তিক বিন্যাস ও কার্যকারণ কাব্যনাট্যে নাও থাকতে পারে। তবে কাহিনির মধ্যে সমগ্রতা থাকে। এর ঘটনাসংস্থান প্রচলিত নাটক থেকে স্বতন্ত্র: একদিকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকগুলো চরিত্র নির্মাণ; অপরদিকে ঘটনা ও সংঘাতকে ব্যাপকমাত্রায় প্রকটিত না করে ব্যক্তির আন্তর-রহস্যের সূক্ষ্ম উন্মোচন কাব্যনাট্যকারের প্রধানতম প্রবণতা হিসেবে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র শিল্পবোধ ও প্রকরণ এতে সাঙ্গীকৃত হয়। ফলে এর সংগঠনের প্রতি নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়।

> কাব্যনাট্যে কবিতা ভাবের শরীরকে জড়িয়ে রাখে নাটক সেখানে সহায়, দুটি সত্তা সেখানে এক দেহে লীন। নাটকে কাহিনী বা চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তোলা লেখকের কৃত্য, কবিতা সেখানে শুধু সহায়ক। কাব্যনাট্যে ভাবের শরীরেই কবিতা ব্যক্ত হয়, কাহিনী কেবল তাকে ছুঁয়ে যায়। (উত্তম, ১৯৮৯ : ১৫)

কাব্যনাট্যে ''Each character speaks for himself, but no other poet could have found those words for him to speak'' (Eliot, 1961 : 112) এর চরিত্রগুলোর দুটি স্তর থাকে: এক. বহির্জগৎ বা সমাজ সত্তা, দুই. অন্তর্জগৎ বা প্রাতিস্বিক সত্তা। কাব্যনাট্যকারের মূল আকর্ষণ হলো প্রাতিস্বিক সত্তা তথা চরিত্রের অন্তর্জগতে অবগাহন। তাই পাঠককে আপাত বাস্তবতার দেয়াল ভেঙে চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান করতে হয়।

কাব্যনাট্য নাট্যকারের অনুভব ও অভিজ্ঞতার গভীর ও কাব্যিক উচ্চারণের নাম। অনুভব ও উপলব্ধির জগতের ব্যঞ্জনাঋদ্ধ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষারীতির ভূমিকা রয়েছে। প্রতীকীব্যঞ্জনায় বাস্তবতার রূপায়ণে জন্য উপযুক্ত ভাষারীতি কাব্যনাট্যকারের আয়ত্তাধীন হতে হয়। এলিয়ট যথার্থই বলেন: `Poetry is essentially dramatic and the greatest poetry always moves towards drama, drama is essentially poetic and the

greatest drama always moves towards poetry.' (Eliot, 1961 : 235) এর ভাষা নিয়ে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এলিয়ট গদ্যে রচিত কাব্যনাট্যেও প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এ জাতীয় রচনায় একঘেঁয়েমি এড়ানোর জন্য কবিকে বর্ণনায় পরিমিতিবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। এর জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় অনিবার্যভাবে অভিনব ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্যিক ভাষারীতি। প্রসঙ্গত শম্ভু মিত্রের কাব্যনাট্যের প্রতীকঋদ্ধ ভাষার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

> দ্বীপের কুমারী তুমি, নিবিড় দ্বীপের মতো শান্ত হয়্যা থেকো তুমি। আমার এ অস্থির নরক হতে দেখি যেন সবুজ টিয়ার মতো আশ্চর্য কোমল দ্বীপ আয়ত নয়ন পেতে মোর পানে চায়্যা আছে। (শম্ভু, ১৪২২ : ১২৩)

যে আশ্রয় 'বনলতা সেন'-এর মধ্যে অনুসন্ধান করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ; আধুনিক জীবনের সংকটজালে পিষ্ঠ, আত্মপরিচয়ের সংকটে অস্থির ও বেদনাহত লখিন্দর বেহুলার আয়ত নয়নে খুঁজে পেল সেই আশাটুকু, শেষ ভরসাটুকু। শম্ভু মিত্র জীবনের এই গভীর উপলব্ধির প্রতীকী রূপায়ণের জন্যে আগ্রহী হন মিথের প্রতি। মিথের অন্তর্দেশে আপাত ব্যক্তিক সংকট উত্তরণের মধ্য দিয়ে কাব্যনাট্যকার মূলত ইঙ্গিত দেন জাতীয় সংকট উত্তরণের। আশাহীন জীবনপটে কাব্যনাট্যকার আশাবাদের বাণী শোনালেন মিথ-প্রতীকে। অরাজকতায় পরিপূর্ণ চম্পকনগরীতে বেহুলা এতটুকু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে যেন 'অনিমেষ আলোর বলয়'। ভাষাকে কাব্যনাট্যকার আইডিওলজির সঙ্গে এমনভাবেই জারিত করে নেন, যেন নাটক পাঠের সময় পাঠক অবলীলায় অজানা এক কাব্যিক অনুভবের ছোঁয়া পান। কাব্যনাট্যকার আপাত খোলস রাখেন ভাষাকাঠমোয়। খোলসটি ছাড়িয়েই পাঠক পান নতুন জীবনবোধের সন্ধান। এ কারণেই সিঙ্গ বলেন 'as fully flavoured as a nut or apple'.

কাব্যনাট্য নাটক ও সংগীতের যুগপৎ প্রয়োগে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কবিতা ও নাটক মিলে তৈরি হয় সুরের আবহ। নাটক গান থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে বরং গড়নকে অলংকৃত করেছে। এই সুর নির্মিত হয় ভাষা-ছন্দ-অলংকারের সুবিন্যাসে। এর ছন্দ সম্পর্কে এলিয়ট আয়াম্বিক ছন্দ ও গদ্য ছন্দের কথা বলেন। তবে ভাব প্রকাশের অনিবার্যতায় যেকোনো ছন্দরীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

কাব্যনাট্যের অন্যতম বিশিষ্টতা হলো মঞ্চে অভিনীত হবার সামর্থ্য। এটি এমন একটি নতুন শিল্পরীতি যা একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্যও বটে। 'নাটক এখানে তীব্র নাটকীয়তাকে দমন করেছে কবিতাও শুধু আবৃত্তিযোগ্য না হয়ে দৃশ্যরূপে উদ্ভাসিত।' (উত্তম, ১৯৮৯ : ১০) মঞ্চায়নের সমস্যা কাব্যনাটককে ব্যর্থ করে দিতে পারে। কাব্যনাট্যকারকে

মঞ্চায়নের কথা বিবেচনায় রেখে কাব্যনাট্য রচনা করতে হবে। ওপরের আলোচনা-সূত্রে কাব্যনাট্যের যে-স্বরূপ ও তাত্ত্বিক পরিচিতি ফুটে ওঠে তা হলো: **প্রথমত**, কবিতা ও নাটকের সুষমামণ্ডিত সংশ্লেষে গড়ে ওঠা শিল্পপ্রকরণ হলো কাব্যনাট্য। **দ্বিতীয়ত**, যে চেতনা বা ভাবাদর্শকে এককভাবে নাট্য বা কাব্য ফর্মে যা ধারণ করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন কাব্যনাট্যের অভিনব আঙ্গিক। ব্যতিক্রমী এ আঙ্গিকের মধ্যে সুরের একটা আবহ থাকবে। **তৃতীয়ত**, কাব্যনাট্যকারকে প্রথমত ও প্রধানত কবি হতে হবে। এবং তাঁকে নাটক রচনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাকৌশল রপ্ত করতে হয়। **চতুর্থত**, কাব্যনাট্যে একটি বিশেষ আইডিওলজিকে কেন্দ্র অন্তর্জীবনের অনুসন্ধান চলে। ঘটনার উপরিকাঠামোর বর্ণনা নেই এতে। **পঞ্চমত**, ঘটনার ঘনঘটার চেয়ে বরং ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্লেষণে কাব্যনাট্যকারগণ অধিক মনোযোগী। **ষষ্ঠত**, এখানে অতি সাধারণ, তুচ্ছ বিষয় উপস্থাপনের বিশেষত্বে অসাধারণ হয়ে ওঠে। **সপ্তমত**, বিচিত্র আবেগ ও আবেগের উত্থান-পতন থাকে। **অষ্টমত**, এর আয়তন পরিমিতি ও সংহত; তবে পরিপূর্ণতা বা সমগ্রতা থাকে। **নবমত**, কবিতার ভাষাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। গদ্যেও রচিত হতে পারে। **দশমত**, কাব্যনাট্যের ভাষা হয় রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের আশ্রয়ী। এবং এসবের মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের বিচিত্র অনুভব ও সত্য প্রকাশিত হয়। **একাদশত**, চরিত্রের ভাষার অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকে কবির কণ্ঠস্বর সক্রিয় থাকে। একে তৃতীয় কণ্ঠস্বর বা থার্ড ভয়েস বলা হয়। **দ্বাদশত**, ব্যক্তির সংকটের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন সংকটের কথা বলা হয়। **ত্রয়োদশত**, কাব্যনাট্য পাঠক-দর্শক-নাট্যকারের মধ্যে সংযোগ (communication) তৈরি করে। সংযোগ ব্যতীত কাব্যনাট্যের সার্থকতা নেই। **চতুর্দশত**, কাব্যনাট্যের অভিনয়োপযোগিতা ও মঞ্চ-উপযোগিতার গুণ থাকে। **পঞ্চদশত**, এর প্রকরণ দ্বিস্তরবিশিষ্ট। উপরিকাঠামোয় নাট্যকারের সমকালীন ঘটনা বা সংকট থাকে, অন্তর্কাঠামোয় থাকে শ্বাশত জীবন সত্য।

১.৫ বাংলা কাব্যনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ

সাহিত্যের আদি ফর্ম হলো কবিতা। নাটক অভিনয়োপযোগিতার আর কবিতা পাঠের দাবি রাখে। কখনও কখনও কবিতা নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে লাভ করতে পারে অভিনয়োপযোগিতা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যধারা মূলত কবিতা-মাধ্যমকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলা চলে যে, খ্রিষ্টপূর্ব দুশো বছর পূর্বে ভরতমুনি ও দণ্ডী থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলা নাট্যধারার পালাবদলের সঙ্গে কাব্যনাট্যের গভীর সংযোগ বিদ্যমান। কেননা নাটকের, ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের বিকাশ মূলত কবিতার আশ্রয়েই। প্রাচীন সাহিত্যে (গ্রিক, ভারতীয়) নাটক ও কবিতার যৌথ প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই সম্ভবত সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাট্যসাহিত্যকে কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মতে নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বিত রূপ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য কবিতা-আশ্রয়ী; এবং এসবের অন্তঃস্রোতে প্রবাহিত রয়েছে নাট্যধর্মিতা; সেই সূত্রে

অভিনয়োপযোগিতা। অন্যদিকে, বাংলা নাটকের সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যিক ইতিহাস রয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে নয়, বরং বাঙালির লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি ও ধর্মকে আশ্রয় করে নাটক নিজস্ব পথে বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। মূলত 'বাঙালির নাট্যরসপিপাসা চিরকালই স্ব-উদ্ভাসিত দেশজ শিল্পরুচির ধারায় নিবৃত্ত হয়েছে।' (সেলিম, ১৯৯৬ : ভূমিকা) গান, কবিতা, গীতিকা, উপকথা, রূপকথা, পদাবলি, মঙ্গলকাব্য তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যধারা মূলত নাট্যাশ্রয়ী কাব্যসুষমায় মণ্ডিত।

বাংলা সাহিত্যের পদযাত্রার প্রথম স্মারক *চর্যাপদ*-এ কবিতা ও নাটকের শিল্পিত উদ্ভাসন রয়েছে। এটি মূলত কাব্য ও নাট্যের অনবদ্য শিল্প-সম্মিলন। এর পদকর্তাগণ সহজিয়া ধর্মাচার, জীবন ও সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কবিতার ফর্মে পরিবেশন করেন।

> চর্যার গানে বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় রহস্যের যে সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যময় প্রকাশ লক্ষ করা যায় তা আধুনিক কবিতার গভীরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (মোস্তফা, ২০০৮ : ৬৫)

চর্যাপদ-এর প্রথম পদের 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল' এ উচ্চারণ প্রতীকী, কাব্যময় ও নাট্যগুণে সমৃদ্ধ এ উচ্চারণে রয়েছে মানব দেহকে বৃক্ষপ্রতিম কল্পনার নান্দনিক অনুভাবনা। মূলত কবিতার ভাবসম্পদ যখন শৈল্পিক পরিবেশনায় নতুন-ভাব প্রাণিত হয়; বোধ-আবেগ-আকাঙ্ক্ষা যখন শিল্পক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়; লেখকের ভাববিশ্ব উন্মোচনে যখন শৈল্পিক আড়ালের আশ্রয় নিতে হয়, তখন কবিতায় অনিবার্যভাবে যোজিত হয় নাট্যময়তা। মূলত মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই চর্যাপদকর্তাগণ বাস্তবতা এবং কাব্যময়তার এমন মিশেলে অভিনব সাহিত্য রস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভুসুকুপা যখন বলেন 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী'; কিংবা কাহ্নপা যখন বলেন 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ'; কিংবা কুক্কুরীপা যখন বলেন 'কানেট চোরে নিল অধরাতী'– এ তো চর্যাপদকর্তাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞান। এ অভিজ্ঞানের প্রকাশে তাঁরা ভাবে ও ভাষায় রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নেন। জীবন ও জগতের এমন আধুনিক নন্দনস্পর্শী উপস্থাপনায় *চর্যাপদ* বিশিষ্ট হয়ে আছে। একইভাবে:

> নগর বারিহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছইছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ॥
> আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ

নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ
একসো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচএ ডোম্বী বাপুড়ী॥ (আনোয়ার ও মুহম্মদ, ২০১৪ : ৮৫)

নগরের বাইরের অধিবাসী এ ডোম্বীর নৃত্যের যাবতীয় আয়োজন, পারঙ্গমতা ও উচ্ছলতা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের পরিবেশনযোগ্যতাকে স্মরণ করায়। এ যুগের ' 'শূন্যপুরাণ' আদ্যন্ত 'পাঁচালি সঙ্গীত'; অর্থাৎ ধর্মপূজার আচার ও কৃত্য অনুষ্ঠানকালে সমগ্র 'শূন্যপুরাণ' গীত ও পরিবেশিত হতো। (সেলিম, ১৯৯৬ : ২১)

আবার, কবিতায় যখন বড় পরিসরে জীবন ও সমাজকে ধারণের প্রয়োজন পড়ে; বিষয়বস্তুতে সংকট সৃজন ও মোচন যখন মুখ্য হয়ে ওঠে; প্রকাশরীতিতে যখন সংলাপের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন নাটকীয়তার অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়। মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*–এর প্রসঙ্গে এ কথা প্রযোজ্য। এ কাব্য কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, উৎকণ্ঠা প্রভৃতির সন্নিবেশে নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে। বিশেষত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া নাট্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।' (পার্শ্বনাথ, ২০০৬ : ১৮২) দৃষ্টান্তস্বরূপ:

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো] সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥ (বসন্তরঞ্জন, ১৪১৪ : ১৩২)

এখানে রাধা-বড়ায়ির পারস্পরিক সংলাপ-সূত্রে কবি ও গায়েন বড়ু চণ্ডীদাস লোকপুরাণের রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহের রূপ অঙ্কন করেন চিরকালীনতার আবহে। সংলাপ নির্ভর এ আখ্যানে কবির মুন্সিয়ানা আধুনিক ও বোদ্ধা পাঠকের মনোযোগ কেড়েছে। এ কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্র নির্মাণে, কাহিনিস্রোতে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টিতে, ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ ও অন্তরাত্মার দ্বন্দ্ব-বেদনাকে যুগোত্তীর্ণ জীবনভাবনায় সন্নিবেশিত করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে গীতিকবিতার ফর্মে। বৈষ্ণব কবিগণ ধর্মদর্শন ও কাব্যভাবনার সংমিশ্রণে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ভাব শিল্পিত ও অনুভববেদ্য করে তোলেন। যেমন: ৬১ নং পদে আছে:

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্দে॥ (মুহম্মদ ও আহমদ ২০১৩ : ৩৮)

বিরহিনী রাধার মনোলোকের উপস্থাপনায় কবি জ্ঞানদাস এখানে মূর্ত ও অমূর্তের আশ্রয় নেন– যা আধুনিক কবিতার অন্যতম দিক। প্রধানত গান হলেও শাক্ত পদাবলি নাট্যগুণান্বিত রচনা। এর 'আগমনী'ও 'বিজয়া' পর্বের পদগুলোতে কাহিনির পরম্পরায়; অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন পরিকল্পনায়; সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনির সম্প্রসারণ, চরিত্রের মানস প্রবণতা ও বিকাশের ধারা সূচিত হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে নাট্যিক গুণ। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যধারায় নাট্যিক গুণ রয়েছে। কাহিনিপ্রধান এ জাতীয় রচনায় ঘটনার আকস্মিকতা, দ্বন্দ্বসংকুল ঘটনাপ্রবাহ আকর্ষণীয় দিক। মঙ্গলকাব্যসমূহ চরিত্রের রূপায়ণে, ভাষাবৈশিষ্ট্যে, দৈবের সঙ্গে মানবের দ্বন্দ্বে আধুনিকস্পর্শী নির্মাণ হিসেবে সুচিহ্নিত। বিশেষত, মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে, সংগ্রামে প্রোজ্জ্বল। চাঁদের বেদনা আধুনিক ব্যক্তি-সত্তার বেদনা যেন। এখানে:

> একের বেদনাকে এ যেন মুহূর্তে সকলের বেদনায় পরিণত করে। আমাদের নিত্যবৃত্ত জীবনের বাসনার প্রচণ্ডতা এবং বেদনার বিষণ্নতার যুগপৎ ছায়াপাত ঘটে। (ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৩৬৬ : ৭৮)

সমকালের চেতনাকে সর্বকালের করে তোলার প্রয়াস 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', *মৈমনসিংহ*-গীতিকায়, *পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়*ও লক্ষণীয়। এসব রচনায় একইসঙ্গে কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সন্নিবেশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: *মৈমনসিংহ-গীতিকার* "মহুয়া" পালার শুরুতে এটি দৃশ্যকাব্য, প্রাচীন পল্লীনাটিকা বলে উল্লেখিত। এসব পালার কাহিনির বৈচিত্র্য, ক্লাইম্যাক্স, চরিত্রের মনোগত দ্বিধা-সংগ্রামশীলতা আধুনিক কাব্যনাট্যের বীজ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কবিতার ফর্ম ব্যবহারের দীর্ঘ পরিক্রমা এবং লৌকিক জগৎ ও জীবনের উদ্ভাসন প্রভৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনার জগৎ তৈরি করেছিল– এমন ধারণা অমূলক নয়। বলা যায়:

> আধুনিক অর্থে কাব্যনাট্য না হলেও নাটকের আঙ্গিকে কাব্যভাবনার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট নয়। (কণিকা, ১৯৯৪ : ৩০)

উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে আধুনিক কাব্যনাট্যগুণান্বিত রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। অনুবাদের পুনরাবৃত্তি ও সংস্কৃতানুকারিতাকে বর্জন করে বাংলা কবিতার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটান মধুসূদন। তাঁর *মেঘনাদবধ*

কাব্য নাট্য ও কাব্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট রচনা। নাটকীয় উৎকণ্ঠা ও কাব্যিক পরিবেশনা এর কাহিনিতে গতি ও স্বচ্ছন্দ এনেছে। বীর রস পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এর কাহিনি সূচনা হলেও, শেষ পর্যন্ত মধুসূদন পুরো আখ্যানজুড়ে ব্যক্তির অন্তর্সংঘাতের স্বরূপ তুলে ধরেন; তা সন্দেহাতীতভাবে আধুনিক মানসিকতার চিহ্নায়ক। এখানে তিনি পুরাণের চরিত্রগুলোকে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা ও চেতনার মুখোমুখি দাঁড় করালেন। তিনি *বীরাঙ্গনা কাব্যর* (১৮৬২) প্রতিটি পত্রে *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর নারী চরিত্রগুলোর মনোজগতের অনুসন্ধানে একদিকে ব্যবহার করলেন কবিতার ভাষা, অপরদিকে ড্রামাটিক মনোলগ। পরস্পরবিরোধী এই দুই চেতনার মধ্য দিয়ে পুরাণের খোলস ছেড়ে নারীরা আধুনিক জীবনচেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। এখানে মধুসূদনের কবি ও নাট্যকার এ দুই সত্তার পরিচয় নিহিত। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী, শূর্পণখা, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, দ্রৌপদী, উর্বশী, জনা প্রমুখ 'বীরাঙ্গনার নারীদের বিচিত্র চরিত্রস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আছে একটি বিশেষ সত্য, সেখানেই তাদের ঐক্য। বীরাঙ্গনার নায়িকারা আপন হৃদয়কামনাকেই চরম বলে জেনেছে। চিত্তমুক্তির মাহাত্ম্যে তারা মহিমাময়ী; বাহিরের কোনো প্রথা, কোনো রীতিনীতির কাছে আত্মার আনুগত্য তারা মেনে নেয়নি।' (ক্ষেত্রগুপ্ত, ২০১৫ : আটত্রিশ) এ কারণেই জীবনতৃষ্ণার উচ্চারণে তারা এক এবং বলিষ্ঠ।

> যথা বহে প্রবাহিনী বেগে সিন্ধুনীরে,
> অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
> স্থির আঁখি সূর্যমুখী; ও চরণে রত
> এ মনঃ! ...
> কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে? (মাইকেল, ২০১৫ : ১৫৪)

পুররবার প্রতি উর্বশীর প্রণয় কথনের বলিষ্ঠতা ও কাব্যময়তায় পাঠক চিত্তে আধুনিক নারীর রূপকল্প নির্মিত হয় অনায়াসে। কিংবা শকুন্তলা যখন রাজা দুষ্মন্তকে পত্রের মাধ্যমে জানায়:

> রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
> ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী? (মাইকেল, ২০১৫ : ১৩৩)

বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১টি পত্রে নারী চরিত্রগুলো এভাবে হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার প্রকাশে প্রথা ও আনুগত্যের চিরাচরিত দেয়াল ভেঙে আধুনিক নারীর অকপট, সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল। বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলনের ফলে সেকালের নারীর প্রেম-আনন্দ দুই-ই অনুশাসনাদির কাছে পরাস্ত ছিল। প্রাগ্রসর মন নিয়ে

মধুসূদন প্রেমের ও প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চারিত করেন পৌরাণিক নারীর মনে। নারীর মনের বন্ধ দরজায় করাঘাত করে তাদের উজ্জীবিত করেন আধুনিক জীবনবোধে। ভাবের ও ভাষার শৃঙ্খল ভেঙে মধুসূদন জীবনের ও সাহিত্যের প্রথানুগত্যদের বিপরীতে মুক্তির পথ প্রদর্শন করলেন। 'দেখে শুনে মনে হয় : মধুসূদনের হাতে প্রথম বাংলা আধুনিক কাব্যনাট্য অনিবার্য ছিল।' (আবদুল মান্নান, ১৯৮০ : ১৬) কিন্তু 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, মধুসূদনের সময় হয়নি বাংলা কাব্যনাটক রচনার। (অনুপম, ২০১০ : ১১) এ প্রসঙ্গে কণিকা সাহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> চরিত্রবিশেষের স্বগত ভাবনায় বা একোক্তিতে কোন রচনায় নাট্যদেহ গড়ে ওঠে না। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র পত্রগুলিকে প্রকৃত অর্থে কাব্যনাটক বলা চলে না। তবে এর মধ্যে যে আধুনিক কাব্যনাটকের উদ্ভবের প্রতিশ্রুতি ছিল, একথা বলা যায়। (কণিকা, ১৯৯৪ : ৩২)

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও নাট্যকার সত্তার শিল্প-সম্মিলন ঘটেছে তাঁর সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনাবিশ্বের সমস্ত প্রান্তকে যথাসম্ভব প্রায় সমস্ত সাহিত্য প্রকরণে ধারণ করায় প্রয়াসী ছিলেন। রবীন্দ্র-নাট্য বিশ্লেষণ করে মার্টিন কেম্পশেন বলেন:

> রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা প্রথমে ইংরেজিতে অনুবাদ হল, তারপর সেটিকে রূপান্তরিত করা হল সাহিত্যের অন্য এক শাখায়– নাটকে; এবং সবশেষে আধুনিক তরুণ ইউরোপীয় প্রজন্মের নান্দনিক রুচির উপযোগী পাশ্চাত্য সংগীতের ধাঁচে সাজিয়ে তাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হল। এতগুলো স্তরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবিকৃত রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন সত্যের মহিমায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলেন। (মার্টিন, ২০১৮ : ১০৮)

যখন আধুনিক তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে কাব্যনাট্যের সূত্রপাত ঘটেনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন স্বপ্রণোদিত হয়ে কাহিনি-কাব্যে নাট্যগুণের সমাবেশ ঘটানোর শিল্পিত অভীপ্সা লিখলেন থেকে *বিদায়-অভিশাপ* (১৮৯৪) *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭), *সতী (১৮৯৭)*, নরকবাস (১৮৯৭), *লক্ষ্মীর পরীক্ষা* (১৮৯৭), *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ* (১৯০০), *কথা ও কাহিনী* (১৯০৮) প্রভৃতি। তবে এসব রচনায় কাব্যধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছে।

> তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক কবিধর্মের সঙ্গে নাট্যবোধ মিলিয়ে এমন এক ধরনের রচনা লিখেছেন, যার মধ্যে আধুনিক কাব্যনাটকের কিছু কিছু লক্ষণ ও পরবর্তী সম্ভাবনা আভাসিত হয়েছে। (কণিকা, ১৯৯৪ : ৪৬)

জীবনে ও সাহিত্যে সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধের যে সাধনায় তিনি আমৃত্যু আস্থাশীল ছিলেন তার সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার অনিবার্য সংঘাতকেই তুলে আনলেন কাব্যনাট্যের ফর্মে। এক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় রূপক-প্রতীকের শিল্পান্বিত

আড়াল। *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪) *রাজা ও রানী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *মালিনী* (১৯১২), *রক্তকরবী* (১৯২৬) প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনার প্রথম পর্যায়কে কেবল নয়; বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

> জীবনের এক অখণ্ড অনুভূতি ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র ধারার নাট্য সৃজনে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই নিজস্ব ধারার নাটক রচনায় তাঁর চেতনালোক ও শিল্পরূপের গতিশীল প্রক্রিয়াটি বড় স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও ভাস্বর। (সাইফুল, ২০০৩ : ২৬৯)

গত শতকের ত্রিশের দশকের কবি বুদ্ধদেব বসু বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় বিশিষ্ট নাম। তিনি এলিয়টীয় কাব্যনাট্যের রূপ ও রীতি এবং প্রতীচ্যের বোদলেয়ারীয় আধুনিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভারতীয় পুরাণের নানা অংশ নিয়ে কাব্যনাটক রচনায় তিনি সমকাল ও চিরন্তন কালের জীবনবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যনাট্যে। চিরায়ত ভাবনাবিশ্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটা স্থায়ী রূপ লাভ করে থাকে– এ প্রবণতা তাঁর কাব্যনাট্যে প্রবল।

> বাংলা কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়টি সমৃদ্ধ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর একক কৃতিত্বে। আধুনিক কাব্যনাট্য রচনার পথিকৃৎ তিনি। (মাহবুব, ২০০৯ : ১২)

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কাব্যনাট্য রচনার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। চল্লিশের দশকের নাট্যকার শম্ভু মিত্র (১৯১৫–১৯৯৭) নাটকে অসুস্থ ও স্থূল সমাজের কথা বলেছেন মার্কসীয় চেতনার আশ্রয়ে। *চাঁদ বণিকের পালা* (১৯৭৭) নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে নাটক হলো সমাজ বদলের হাতিয়ার এবং এর কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ ও ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক। বেহুলা-লখিন্দরের পরিচিত মিথকথার আবরণে জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানী এ নাট্যকারের সৃষ্ট লখিন্দরের প্রশ্নজর্জর অন্তরাত্মায় আধুনিক মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রতীকী উন্মোচন ঘটে এভাবে:

> আর আমি? আমারি কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল, তার পাছে সসম্মানে বেঁচ্যে রব আমি? মনসার দোরে যায়্যা অসম্মানে ভিক্ষা কর্যা তুমি বাঁচালে আমারে, তারেপরে নিজে মর‍্যে গেলে, সেই জ্ঞান শিয়রে বহন কর্যা খুশী মনে বেঁচ্যে রব আমি? আমার সেই মৃতদেহট্যার গন্ধ যেন প্রত্যেক নিঃশ্বাসে পাই। ... অবিরাম এই কষ্ট বয়্যে-বয়্যে কতোদিন– কেমন মানুষ হয়্যা– বেঁচ্যে রব আমি? (বেহুলার কাছে সরে এসে) বাসরের রাত্রে একবার মনে হয়্যেছিল দুইজনা মর‍্যে যাই। বেহুলারে, আজ সেই বাসরের রাত হোক। আমরা দু'জনা যেন ভালোবেস্যে বেস্যা মর‍্যে যেতে পারি।– কোন্ পরিচয় নিয়্যা লখিন্দর বেঁচ্যে রবে চাস তুই বল? (শম্ভু, ১৪২২ : ১৬০)

বিশ্ব নাট্যতত্ত্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লোকজীবনযাত্রার সঙ্গে অন্বিত করে কাব্যনাটক রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা যোজনা করেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *ঈর্ষা* (১৯৯০), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮১) প্রভৃতি পুনর্মূল্যায়নধর্মী কাব্যনাট্য রচনা করেন। তাঁর ভাষ্যেই অনুভব করা যায় কাব্যনাট্য রচনার তাগিদ কতটা প্রবল ছিল:

> কাব্যনাট্যই শেষ পর্যন্ত আমার করোটিতে জয়ী হয়; টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাট্যভাবনা আমাকে ক্রয় করে; আমি লক্ষ না করে পারি না যে আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধিতে কাব্য ও সঙ্গীতই হচ্ছে নাটকের স্বাভাবিক আশ্রয়; ... একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পঠিত ধ্রুপদী গ্রীক নাটক আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে; শেকসপীয়র, যাঁর নাটকের কথা বাবা অক্লান্তভাবে বলে যেতেন একদা, আমাকে এক তীব্র আলোকসম্পাতের ভেতর দাঁড় করিয়ে রাখে; এই অবস্থায় আমি, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, বিদেশ থেকে ছুটিতে দেশে ফিরে, ঢাকার প্রবল নাট্যতরঙ্গে ভেসে যাই এবং ফিরে গিয়ে রচনা করি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'– এক সংকীর্ণ ঘরে, টেবিলের অভাবে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপর খাতা রেখে, অফিসে যাতায়াতের পথে পাতাল রেলে মনে মনে; এই রচনাটি শেষ করে উঠবার পরে মনে হয়, দীর্ঘদিন থেকে এরই জন্যে তো আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ভূমিকা)

কাব্যনাট্যের ধারায় তাঁর অবদান সমালোচক সুচিহ্নিত করেন এভাবে:

> বিষয় বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য, সমকালীন জীবন চেতনা, স্বদেশ-সমাজ চিন্তা, অপূর্ব ভাষা বিন্যাস ও কাব্যনাট্যের আঙ্গিক কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিলে সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছে বলা যায়। (মোস্তফা, ২০০৮ : ২৬৯)

কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২) মোঘল ইতিহাস এবং পুরাণাশ্রিত বিষয়কে কাব্যনাট্যের ফর্মে পরীক্ষা করেন। *শেষ শয্যায় নুরজাহান* (১৯২১), *নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর* (১৯২৩), *দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব* (১৯৫৩), *মৃত্যু ও নচিকেতা* (১৯২৬) প্রভৃতি নাট্য-আখ্যানে নাট্যদ্বন্দ্ব, নাট্যমুহূর্ত, চরিত্রের মনোগত দ্বন্দ্ব পুরোপুরি আধুনিক কাব্যনাট্যের অনুগামী না হলেও বাংলা কাব্যনাট্যের বিকাশের ধারায় এসব কাব্যনাট্যের অবদান অনস্বীকার্য। একইভাবে, কবিপ্রাণ জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯–১৯৫৪) *কনভেশন* (১৮৭৯) নামক কাব্যনাট্যধর্মী রচনা রয়েছে। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য কবিতা নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। কবিতা ও নাটকের সম-বিন্যাসে, সম-তাৎপর্যে কাব্যনাট্য রচিত হবার অবকাশ রয়েছে; এমন অনুমান থেকে *কবিতার কথা'য়* তিনি প্রাজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন:

> এ সময়টায় খুব দীর্ঘ কবিতা রচিত হয়নি, কাব্যনাট্যও নেই, শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। আসছে দশ-পনেরো বছরে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতা– এ-সব পরিণতির দিকে কোথাও-কোথাও মোড় ঘোরাবে কিনা ভাবছি। ... বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যত কালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে; এবং কবিতায় নাট্য। (জীবনানন্দ, ১৪১৩ : ১২১)

কবিতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তির সূত্রে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য রচিত হবার সম্ভাবনা দেখলেন জীবনানন্দ। বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় অর্জিত দত্তের (১৯০৭–১৯৭৯) *যুধিষ্ঠির* (১৯৪৬); সুশীল রায়ের (১৯১৫–১৯৮৫) *কালান্তক* (১৯৪৬); অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১–১৯৮৬) *সর্বনাম* (১৯৬৬) প্রভৃতি কাব্যনাট্যিক প্রয়াস তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের সমসাময়িক প্রায় সকল কবিই অভিনব এ প্রকরণে অবগাহন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। পাশ্চাত্যের কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে পরিচিতি না হয়েও উপযুক্ত কবি-সাহিত্যিকগণ স্বতঃপ্রণোদিত সত্তায় কাব্যনাট্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেন।

প্রতীচ্যের আধুনিক কাব্যনাট্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যনাট্যের সংযোগ ঘটে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে দিলীপ রায় (১৯৩১–২০১০), রাম বসু (১৯২৫–২০০৭), কৃষ্ণ ধর (১৯২৮–২০২২) আলোক সরকার (১৯৩৩–২০১৬), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩–২০২০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪–২০১৮), মঙ্গলাচারণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০–২০০৩), তরুণ সান্যালের (১৯৩২–২০১৭) লেখনীস্পর্শে। কাব্যনাট্যের তত্ত্বগত ও মঞ্চায়ন কৌশলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিয়ে কাব্যনাট্য রচনা করেন দিলীপ রায় *সার্কাস*, *দুই আর দুই*, *সংলাপ ত্রিকোণামিতি*, *একটি নায়ক* প্রভৃতি কাব্যনাট্য। রাম বসু অপর এক শক্তিমান কাব্যনাট্যকার। '*একগুচ্ছ কাব্যনাট্য ও চার চোখ* কাব্যনাট্য সংকলনে: কাব্যনাট্যকাররূপে রাম বসু জীবনসমগ্রের কাছে যেতে চান, তাকে পেতে চান।... কবি ও নাট্যকার হিসেবে তাই জীবনবাদী, আলোর বার্তাবহ। (তরুণ, ২০০৭ : ৮৭) সমকালীন সমাজ, সংকট, পুরাণ সমস্তই তাঁর কাব্যনাট্যে প্রতিভাত হয় রূপকী অভিব্যঞ্জনায়। কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষক কৃষ্ণ ধর কবিতা ও নাটকের যৌথ দাবি নান্দনিকভাবে মেটানোর শিল্পদৃষ্টি নিয়ে তিনি কাব্যনাট্য রচনায় ব্রতী হন। *এক রাত্রির জন্য*, *নতুন দেশে*, *পদধ্বনি পলাতক*, *নিহত গোধূলি*, *যদিও সন্ধ্যা*, *বাতি ঘর*, *বধ্যভূমিতে বাসর*, *অন্ধকারে যুঁই ফুলের গন্ধ*, *বিরুদ্ধ বাতাস*, *ঘরে ফেরার দিন*, *বন জ্যোৎস্না*, *দ্বিতীয় নায়িকা*–সহ অসংখ্য কাব্যনাট্যে:

> ... ব্যক্তিচিত্তের সংকট যেমন প্রকটিত, তেমনি সমাজচেতনাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অবক্ষয়িত সমাজের ঘূর্ণাবর্তে অসহায় বিপন্ন মানুষ ভালবাসার মঞ্চে উজ্জীবিত হলে সব সংকট দূর হয়ে যাবে। মানুষ আবার

> মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে– এ দৃঢ় প্রত্যয়ে কবি আস্থাবান। চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব দান করে কৃষ্ণ ধর আধুনিক কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যেই তাঁর রচনাগুলিকে মণ্ডিত করেছেন। (কণিকা, ১৯৯৪ : ১১০–১১১)

কাব্যনাট্যকার আলোক সরকার মুখ্যত কবি। মানুষের সামাজিক সত্তাকে যথাযথ মূল্য দিয়ে তিনি সমাজের উর্ধ্বে ব্যক্তি সত্তার স্থান দেন। আধুনিক নাট্যের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানে, ব্রতী এ নাট্যকার বেশ কিছু কাব্যনাট্য লিখেছেন *মায়াকাননের ফুল* (১৯৫৭), *বৃষ্টি* (১৯৫৮), *সিঁড়ি* (১৯৫৯), *অশ্বত্থ গাছ* (১৯৫৯), *একটি বিচ্ছেদ* (১৯৬১), *উপস্থিত* (১৯৭২), *সেইঘর* (১৯৭৩)। এসব কাব্যনাটক রচনায় তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ নির্মাণে। বিশেষত, সংলাপের প্রতি তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তত্ত্বনিষ্ঠ কাব্যনাট্য রচনা করেন তরুণ সান্যাল। অসংখ্য কাব্যনাট্যের স্রষ্টা তরুণ সান্যাল কাব্যনাট্য বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন, যা কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গুরুত্ববহ। *জলের গল্প*, *মৃত্যুতে জীবন চেনা*, *সাঁকের অস্থির জলে*, *মাটি*, *দেবী দর্শন*, *সময়ের হাতে*, *কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম গান্ধারী*, *কার মুখে আলো পড়েছে*, *সফলতা*, *সখাসখী সংবাদ*, *মানব জমিন*, *আকাশে পাখিরা*, *বনবিবি* প্রভৃতি কাব্যনাট্যের নামকরণ থেকে তাঁর সময়-সমাজ ও জীবন অনুধ্যানের গভীরতা ও বৈচিত্র্য অনুমেয়। এমনই মাটি ঘেঁষা ও জীবন-অনুধ্যানী আরেক কাব্যনাট্যকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩–২০২০)। রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার মিশেলে তিনি *বারান্দা*, *শেষ প্রহর*, *নাম-ভূমিকায়*, *বাঁশের কেল্লাটা চলছে*, *প্রত্যাবর্তন*, *উত্তরমেঘ*–ইত্যাদি কাব্যনাট্য রচনায় তিনি ছন্দের ও সংলাপের নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিষয়ের অন্তর্মুখিতায়, নাট্য-ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যে এবং ভাষার বহুমাত্রিক প্রয়োগে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা কাব্যনাট্যের বিকাশের ইতিহাসে আরও অসংখ্য কাব্যনাট্যকারের অবদান রয়েছে। মনীন্দ্র রায় (১৯১৯–২০০০), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩–১৯৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪–২০১২), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪–২০১২), উত্তম দাশ (১৯৩৯–২০১৪), পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১–১৯৯৭) প্রমুখ স্বকীয় মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলা কাব্যনাট্যের ধারাকে ঋদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছেন। তাঁদের লেখনীস্পর্শে বাংলা কাব্যনাট্য স্বাতন্ত্র্যসূচক শিল্পপ্রকরণে উন্নীত হয়েছে।

১.৬ বাংলা কাব্যনাট্যের প্রস্তুতি পর্ব

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের ফল হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে বাংলা ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে আসে। ইংরেজ বণিকতন্ত্র দ্রুতই রাজতন্ত্রে রূপ নেয়। শাসন-শোষণের নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে ইংরেজরা ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। জয়া চ্যাটার্জী জানান: 'ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের যুক্তি ছিল

ভারতকে শাসন করার জন্য ভারতীয়দের চেয়ে ব্রিটিশরাই বেশি 'উপযুক্ত', কারণ তাদের আছে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব।' (জয়া, ১৯৯৯ : ১২) ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই রুখে দাঁড়িয়েছে বাঙালি।

> আসল কথা হল, ভারত সূচ্যগ্র ভূমিখণ্ডও ইংরেজকে বিনাযুদ্ধে দখল করতে দেয় নি। সেইজন্যেই ১৭৫৭ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত একটানা সংগ্রাম তাকে চালতে হয়েছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। (নরহরি, ১৯৭৮ : ২৬০)

ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল ইংরেজের সহায়ক শক্তিরূপে। ইংরেজ শাসন যে এদেশের মানুষের মন ও চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করছে, তা ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম অনুধাবন করে। তাঁরা উপনিবেশকে অস্বীকার করতে পারেননি, আবার মেনে নিতেও পারেননি। তাঁদের চৈতন্যে ছিল একদিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রতি আপোষকামিতা, অপরদিকে উপনিবেশের বিরুদ্ধে সুপ্ত দ্রোহচেতনা। এ দোলাচল ও বৈপরীত্যের ফলে বাঙালির স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি হচ্ছিল না। এ সময়ে রেনেসাঁসের প্রভাবে: ' বাঙ্গালী নতুন করে নিজেকে চিনতে পারলো। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গরিমার মানদণ্ডে নিজের সম্পর্কে তার প্রশ্ন জাগলো।' (নীলিমা, ১৯৬৪ : ০৯) ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার অঙ্কুরোদগম হয়। উনিশ শতকের স্বদেশ-স্বসমাজের সংস্কারের জন্য ও মঙ্গলচেতনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছেন রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩) তাঁদের একজন। যাবতীয় সংস্কারের প্রয়োজনে তিনি কলমকে অস্ত্রে পরিণত করেন। তাঁর লেখায় সংস্কৃতানুকারিতার পরিবর্তে সহজবোধ্যতা প্রাধান্য পায়, যা বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের নিজস্ব গতিপথের সম্ভাবনা তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে-র অভিমত স্মর্তব্য:

> ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপী জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। (সজনীকান্ত, ২০০৭ : ০৯)

মূলত তাঁর হাতে প্রয়োজনধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র পথের অভিযাত্রার সূচনা ঘটে। তাঁর *বেদান্ত গ্রন্থ* (১৮১৫), *উপনিষদের বাংলা গদ্যানুবাদ* (১৮১৬–১৯), *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩), *পথ্য প্রদান* (১৮২৩) রচনাসমূহে শাণিত যুক্তি ও বুদ্ধির বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাংলা গদ্য। মূলত 'গদ্যভাষার আগামী সমৃদ্ধির ইঙ্গিত তিনিই দিয়েছেন।' (অরুণকুমার, ২০০০ : ৭৬)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৭৮৭–১৮৪৮) উপনিবেশের সৃষ্ট নানা সংকট দ্বিধান্বিত করেছে। ধর্ম ও সমাজচেতনার আলোকে তিনি দ্বিধান্বিত মন নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন। 'বিপরীত চিন্তার নানাবিধ বিরোধ-সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মতো ভবাণীচরণের সাহিত্য-প্রয়াস এবং স্ফুলিঙ্গের মতোই তা দগ্ধীভূত অঙ্গার-অবশেষ।' (আবুল, ১৯৮২ : ২১৭) *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩) *নববাবুবিলাস* (১৮২৫), *দূতীবিলাস* (১৮২৫), *নববিবিবিলাস*

(১৮৩১) প্রভৃতি নকশাধর্মী রচনায় তিনি বৈচিত্র্য আনেন বাংলা গদ্যে রসবোধ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শব্দ প্রয়োগ-সূত্রে। অরুণকুমার তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরে বলেন:

> প্রাক্-বিদ্যাসাগর পর্বের বাংলা গদ্যে লঘুতা ও ক্ষিপ্রতা সঞ্চারে, ব্যঙ্গরস ও বিদ্রূপ প্রয়োগে, সরসতা ও লালিত্য সাধনে ভবানীচরণের কৃতিত্বের পরিচায়ক রূপেই এদের সার্থকতা। ব্যঙ্গপ্রধান গদ্যের তিনিই প্রথম শিল্পী। (অরুণকুমার, ২০০০ : ৭৮)

সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভাবমুক্ত মৌখিক ভাষারীতি সৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর (১৮১২-৫৯) ভূমিকা রয়েছে। বলা যায়, তিনি বিদ্যাসাগরের জন্য সাহিত্যিক গদ্যের প্রস্তুতি ক্ষেত্র তৈরি করেন। আধুনিকতাস্পর্শী সাহিত্যিক ভাষার স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯০) বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী। *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *বোধোদয়* (১৮৫১) *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *সীতার বনবাস* (১৮৬০) *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯) *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭৩) প্রভৃতি রচনায় বিদ্যাসাগর শৃঙ্খলাবদ্ধ, সাবলীল, নমনীয়, লালিত্যময় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত ভাষার গ্রন্থনা করেন। কথ্য-ভঙ্গি, সরসতা, আবেগ, ব্যক্তি হৃদয়ের একান্ত অনুভূতির সঙ্গে বাংলা ভাষার পরিচয় তাঁর হাত ধরে। ইংরেজের প্রতি প্রত্যক্ষ বিদ্বেষী মনোভাব তিনি দেখাননি কিংবা বলা চলে দেখানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তাঁর যাপিত জীবনের সঙ্গী ছিল চটি জুতো আর চাদর; যা ঔপনিবেশিক মনন ও পরিচ্ছদের প্রতি এক নীরব প্রতিবাদের স্মারক। প্রকৃতপক্ষে:

> বাংলা তথা ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞানে শিক্ষায় সমৃদ্ধিতে উদ্ভাসিত হবে, এবং জগৎসভায় আসন লাভ করবে, বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেন সেই সম্ভাবনারই নীরব প্রস্তুতি। (অরবিন্দ, ১৯৫৫ : ৭৪)

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪–১৮৮৩) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০–১৮৭০) যথাক্রমে আলালী ভাষা বা টেকচাঁদী ভাষা ও হুতোমী ভাষারীতি তাঁদের স্বকীয়তার চিহ্ন। উভয়ের রচনায় সরলরৈখিক কাহিনি, ভাষিক অলংকরণের সঙ্গে উপভোগ্যতার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যুগ্ম মানসতার সংশ্লেষ অভিনব সাহিত্য-প্রকরণ নির্মাণ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩)। পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর মোহ ও মোহভঙ্গ ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধুসূদনের প্রচেষ্টায় প্রচলিত কাব্য ও নাট্য ফর্মে গুণগত পরিবর্তন আসে। মহাকাব্যে নতুন রস ও আধুনিক ব্যক্তি-সত্তা সৃজনে, সাহিত্যে বাঙালিত্ব ধারণে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা আনেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে 'প্রাচীন ভারতের মহীয়সী অঙ্গনারা বাংলা কাব্যে ও সমাজ-জীবনে নতুন আদর্শরূপে আবির্ভূতা হলেন। বাংলার ঘরে ঘরে এই পৌরাণিক বীরাঙ্গনাদের চারিত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কবি আত্মাকে প্রতিনিয়ত

যে মর্মজ্বালা অনুভব করতে হয়েছিল তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বন্দিনী নারীর মর্মদহনের ছত্রে ছত্রে।' (নীলিমা, ১৯৬৪ : ১১)

প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত:

> মধুসূদনের জীবনে চিন্তা ছিল জাতীয় কবিতা, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় মহাকাব্য এবং জাতীয় রুচি। ... ঐতিহ্যবোধ তাঁকে বাধ্য করেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথে পথে পরিভ্রমণ করতে। (শিশিরকুমার, ২০১৩ : ৯৯)

ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলায় অনিবার্যভাবে রূপান্তর-প্রক্রিয়া শুরু হয়। অর্থনৈতিক অসাম্য, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রম-ভঙ্গুরতা ও বণিকতন্ত্রের ক্রমযাত্রা, ব্রিটিশ শিল্প কারখানায় কাঁচামালের যোগানদাতা রূপে বাংলাকে ব্যবহার, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট নব্য মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উত্থান, সর্বোপরি সর্বভারতীয় কল্যাণকামী জীবনদৃষ্টিতে কুঠারাঘাত প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক ও রূপান্তরকামী সমাজ-মানসতার জন্ম দেয়। এর প্রভাব পড়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। এ সময়ের অন্যতম শিল্পপ্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪)। চাকুরিসূত্রে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অংশ ছিলেন বলে প্রত্যক্ষভাষ্যে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কমলাকান্তকে আফিমখোর হতে হয়। স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে যা বলা সম্ভব নয়, আফিমখোর কমলাকান্তকে দিয়ে বঙ্কিম তা বলিয়ে নেন। যুগোচিত বৈপরীত্য বঙ্কিম-মানস এভাবে ধারণ করেন, তাঁর চেতনবিশ্বে স্থান পায় সময়ের দ্বন্দ্ব ও রূপান্তরশীলতার চিহ্ন:

> রোমান্সের কাঠামোয় তাঁর সাহিত্যবিশ্বের সীমারেখা অঙ্কিত; উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত রেনেসাঁসীয় আধুনিকতা, রোমান্টিসিজম, উপযোগিতাবাদ, সনাতন ধর্ম, অনুশীলন তত্ত্ব, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি পরস্পর বিপ্রতীপ জীবনবোধের দ্বান্দ্বিক সমাবেশে তাঁর মানসজগৎ পরিণতিপ্রাপ্ত। কিন্তু এ জটিল মনোসমীকরণের বিতর্কপ্রবণ প্রান্তসমূহকে অভিন্ন বিন্দুতে সন্নিবেশিত করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর নন্দনচেতনা।" (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০০৮ : ভূমিকা অংশ)

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ভাষার গাঁথুনিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা-সূত্র অঙ্গীভূত করেন স্বাধীন রূপে এবং অভিনব প্রকরণে। কথাশিল্পে, প্রবন্ধে, জীবনচরিতে তথা তাঁর সমস্ত সাহিত্যধারার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন 'সরলতা ও স্পষ্টতা'। উনিশ শতকীয় সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন। ভাষার বৈচিত্র্যময় ও সুনিপুণ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে বঙ্কিম বাঙালির প্রাণের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখনীতে: ' লেখার ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিল।' (সুকুমার, ২০১৫ : ৭৬)

বিদ্যাসাগরের শিল্পিত গদ্য বঙ্কিমের হাতে উপন্যাসশিল্পের বাহন হয়ে ওঠে। উপনিবেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান এবং বাহ্যিক ও মানসিক বন্ধনের মোচন ঘটাতে সমকালীন নাট্যকারদের চেতনা বঙ্কিমচন্দ্র পরিপক্ব গদ্যকাঠামোর আশ্রয়ে উপন্যাসশিল্পে তুলে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্র *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *সীতারাম* (১৮৮৭) প্রভৃতি উপন্যাসে এবং বেশ কিছু প্রবন্ধে স্বদেশের মুক্তি ও হিতকামিতার স্বরূপ তুলে ধরেন। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতাপে ক্রমশ ম্রিয়মান বাঙালির চিত্তে, বিশেষত হিন্দুর বাহুবল ও আত্মিক জাগরণ ঘটাতে বঙ্কিম সচেষ্ট হন। রাজসিংহ উপন্যাস বিশ্লেষণ-সূত্রে উদয়চাঁদ দাশ মন্তব্য করেন:

> ঔপনিবেশিক ভারতে বসে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, পুঞ্জীভূত শক্তির আশ্রয় হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশের পদানত থাকার লজ্জাবোধে ব্যথিত এবং অপমানক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ভারতবর্ষে যে-শক্তির খোঁজ করে পাননি, অন্যদিকে যে আদর্শ নায়ক-পুরুষকে বর্তমানের মধ্যে রেখে সরাসরি আখ্যানে আনা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে দুষ্কর ছিল; তারই রূপচিত্র ইতিহাস-কল্প-ইতিহাসের টানাপোড়েনে 'হিন্দুবীর-চূড়ামণি' হয়ে দেখা দিয়েছিল। (উদয়চাঁদ, ২০১৬ : ৬৩)

বঙ্কিমের সৃজিত ভাষারীতিতে প্রাণিত হয়েছেন পরবর্তী সময়ের লেখকগণ: কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯৯০), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪–১৮৮৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭–১৯১৯), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩–১৯৩২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪–১৯১৯) প্রমুখ। উনিশ শতকীয় গদ্যগ্রন্থসমূহ মূলত ব্যাকরণ, পাঠ্যবই, অভিধান, অনুবাদ। সাহিত্যের বিবেচনায় এসব রচনা পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ না হলেও এগুলো বাংলা ভাষাকে ক্রমশ আধুনিক কাঠামো প্রদান করেছে। উনিশ শতকের কাব্য, নাটক, প্রহসন এবং উপন্যাসশিল্প আধুনিক কাব্যনাট্যের জন্য তৈরি করেছে উপযুক্ত ভাষার সম্ভাবনা। এসব ভিন্ন সাহিত্য সংরূপগুলো আধুনিক যুগোপযোগী চিন্তন প্রক্রিয়ায়, ভাষার নিহিতার্থের নান্দনিক প্রয়োগবৈচিত্র্যে, বাক্যের বিচিত্র বিন্যাসে, শব্দের কারুকার্যে মূলত কাব্যনাট্যের ভিত্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং এসব রচনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য।

১.৭ বাংলা কাব্যনাট্যের সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা

যে-কোনো ভূখণ্ডের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি-ইতিহাস-দর্শন অনিবার্যভাবেই সে-ভূখণ্ডের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। উল্লিখিত বিষয়সমূহের ধারাবাহিকতা, ক্রম-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য পাল্টায়। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা শেষে নীহাররঞ্জন রায় এ সিদ্ধান্তে

উপনীত হন: 'এ-পর্যন্ত যে-সব ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম তাহা বাঙালীর গভীর চরিত্র ও জীবন দর্শনগত, যে-চরিত্র ও জীবন দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙালী-জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে।' (নীহাররঞ্জন, ১৪২০ : ৪২০) প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মসমূহ বিশ্লেষণ-সূত্রে তৎকালীন সমাজ-দর্শন-ধর্ম-রাজনীতি, মানুষের জীবনাচার, খাদ্যাভ্যাসসহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনানুষঙ্গের পরিচিতি পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয় যুগের প্রবণতাসমূহ, নবজাগরণের প্রভাবে সৃষ্ট নতুন জীবন-বৈশিষ্ট্যসমূহ, নতুন সাহিত্য প্রকরণ তথা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রচ্ছাপ। মূলত:

> নতুন যুগের নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্রে মানুষের নতুন মানসপ্রকৃতি, নতুন জীবনাদর্শ, নতুন ভাবধারা নতুন শিল্পকলা সাহিত্য স্থাপত্য নীতিরুচিবোধ আচারব্যবহার নিয়ে নতুন সংস্কৃতি পুষ্ট লাভ করে। (বিনয়, ১৩৫৫ : ০১-০২)

নবজাগরণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে নানান পরিবর্তন আনে, যার প্রভাবে শিল্প-সাহিত্যের ভাব ও প্রকরণ বদলায়। নবজাগরণের প্রভাবে সাহিত্যের বিবিধ প্রকরণে সংযুক্ত হয় বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাসূত্র, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ। 'বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা সমাজ-জীবনের যে অংশকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল মোটামুটিভাবে সেই অংশকে পটভূমিকা করে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারেরা এগিয়ে এলেন নব সৃষ্টি প্রতিভার উদ্যোগ নিয়ে।' (নীলিমা, ১৯৬৪ : ১৯-২০) এ সময়ে সামাজিক কুপ্রথা ও সংস্কার, জাতীয়তাবাদী চেতনা, সনাতন ধর্মের পুনরুত্থান, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির অসংযত জীবনাচরণ উপজীব্য করে নাটক রচিত হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২–১৮৬৬) *কুলীন কুলসর্বস্ব* (১৮৮৫), মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক ও প্রহসনসমূহ, দীনবন্ধু, মিত্রের (১৮৩০–১৮৭৩) *নীলদর্পণ* (১৮৬০), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), বিপিন মোহন সেনগুপ্তর (জন্ম-মৃত্যু অজানা), *হিন্দু মহিলা* (১৮৬৬), *কৌরব বিয়োগ* (১৮৫৮), *ভানুমতী-চিত্তবিলাস*, (১৮৫৩), *রজতগিরিনন্দিনী* (১৮৭৪), তারাচরণ শিকদারের (জন্ম–মৃত্যু অজানা) *ভদ্রার্জুন* (১৮৫২) প্রভৃতি নাট্যকর্ম সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ ভাবনার স্মারক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাজবাস্তবতাকে সরাসরি প্রকাশ না করে শিল্পান্বিত আবরণের আশ্রয় নেন। বিশেষত, তাঁর প্রহসন দুটিতে বাস্তবতার প্রতীকীমণ্ডিত পরিবেশন সেকালের পক্ষে মধুসূদনের অগ্রগামী শিল্পমানসের পরিচায়ক।

> বাইরে ছিল সাধুর আকার,
> মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
> পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
> ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।। (মাইকেল, ২০১৫: ২৬৪)

কবিতার প্রতীকী আবরণে এখানে বকধার্মিক শ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করেন মধুসূদন। সাধারণ নাটকে যা সরাসরি বলা চলে কাব্যনাট্যে তা শিল্পময় আড়ালের প্রত্যাশী, কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কখনও কমেডির কৌশল অনিবার্য হয়ে ওঠে। মধুসূদন সে-কৌশল অবলম্বন করেন আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের সূচনার পূর্বেই। অপরদিকে, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নাট্যকারগণ নাট্য-অনুষঙ্গ অন্বেষণ করেন *রামায়ণ-মহাভারত*-লৌকিক পুরাণ ও যাত্রার বিষয়বস্তু থেকে। কেননা:

> ওই জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মিত বয়ানকে ভেঙে প্রাচীন ভারতবর্ষের এক স্বর্ণযুগের ছবিকে তুলে আনা। (উদয়চাঁদ, ২০১৬ : ৫৪)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪–১৯১১), মনমোহন বসু (১৮৩১–১৯১২), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩–১৯২৭), মন্মথ বসু (১৮৯৯–১৯৮৮) এ ধারাটিতে সমৃদ্ধ করেন। ইংরেজ শোষণের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ক্রমশ সুদৃঢ় হচ্ছিল। এতে উদ্বিগ্ন ইংরেজরা শোষণের নতুন পথ অনুসন্ধান করে। শিক্ষিত বাঙালির কর্মদক্ষতা ও চাকুরি প্রাপ্তির হার শাসকগোষ্ঠীকে চিন্তিত করে যে, 'জনসাধারণের কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবার জন্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স বাইশ থেকে উনিশ করা হ'ল। সচেতন দেশবাসী আন্দোলন উপস্থিত করলো। ফল ফললো। পুনরায় পরীক্ষার্থীর বয়স বাইশ বৎসরই নির্দিষ্ট করা হ'ল। ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবন এমনিভাবে নিপীড়িত হ'তে লাগলো।' (নীলিমা ১৯৬৪ : ১৭৫) দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার বোধ আরও দৃঢ় হয়।

> The pressure of a uniform British administration, and of western thought, would ultimately result in the growth of Indian nationalism and in a demand for self-government, was apparent to the wisest British administrations early in the nineteenth century. (Percival, 1952 : 245)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের ক্রম-প্রসার জমিদারতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুঁজিতন্ত্রের পথ সুগম করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ধনবাদী শ্রেণি, ভূমি ব্যবস্থাপনায় নতুন মানদণ্ড, পুঁজির আধিপত্য, ক্রম-ক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কোম্পানির আশীর্বাদপুষ্ট নব্য ধনিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে অসন্তোষ, ক্ষোভ। এর ফলস্বরূপ ১৭৬০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ-বিরোধী প্রতিরোধ ও সংগ্রামের বেশ কিছু আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন, চাকমা বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, সিধু-কানুর সশস্ত্র বিপ্লব, ওয়াহাবী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, সিপাহি বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত-ছাড় আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি উপনিবেশিত ও সংক্ষুব্ধ বাঙালির প্রতিবাদী প্রয়াস। সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭–১৮৫৮) সূচনা ঘটেছিল ব্রাউন বেস বন্দুকের বদলে এন্‌ফিল্ড বন্দুক ব্যবহারের সূত্র ধরে। দমদম, মিরাট

ও আম্বালায় এ বন্দুক চালনা শেখানো হত। এ বন্দুকে কাগজে মোড়া শুয়োর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত গুলির ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিরা অস্বীকৃতি জানায়। তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

> ঠিক এই অবস্থায় দমদমে একদিন বারুদখানার একজন নিম্নজাতীয় খালাসী জল পান করবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ সিপাহীর কাছে তার লোটা চেয়ে বসল। সিপাহী তার লোটা দিতে অস্বীকার করাতে খালাসীটি উদ্ধত ভাবে উত্তর দিল: ''তুমি তোমার জাত নিয়ে খুব গর্ব করছ। কয়েকদিন সবুর কর, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকবে? খালাসীর এ রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে টোটার প্রশ্নটি সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করে সিপাহীদের মধ্যে, প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা উত্তেজনা ও আশঙ্কা সৃষ্টি করল। (প্রমোদ, ১৯৫৭ : ২৯)

ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির সচেতনতার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৮৮৫ সালে প্রথমে ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে এটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এ রূপ নেয়। কংগ্রেস সর্বভারতীয় কল্যাণকামিতার আহবান জানিয়েছিল।

> মৃত্যুঞ্জয় বীর্যের বার্তা বহন করাই ছিল কংগ্রেসের ভূমিকা। সেদিন বিপ্লবী ও সাম্যবাদী, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, চাষী, মজুর ও আদিবাসী, নিম্নবিত্ত কৃষক ও কোটিপতি শিল্পমালিক, বাঙালী ও পাঞ্জাবী, হিন্দু ও মুসলমান সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি। (অমলেশ, ১৯৮৫ : ভূমিকা)

ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইংরেজ কর্মচারী এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯–১৯১২), উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬), দাদাভাই নওরোজি (১৮২৫-১৯১৭), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮–১৯২৫), মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪–১৮৯৬), দিনশ এদুলজি ওয়াচা (১৮৪৪–১৯৩৬), মহাদেব গোবিন্দ রানা দে (১৮৪২–১৯০১), উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (১৮৩৮–১৯১৮) প্রমুখ। প্রথম সভাতে তাঁদের দাবিসমূহ ছিল: ভারতের জন্য স্বতন্ত্র আইন সভা, ইংল্যান্ডের মত ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা, বিদেশি কাপড়ের ওপর শুল্ক ধার্য করা প্রভৃতি। রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি তখনকার নাট্যকারদের রচনায় সাহিত্য-সংস্কৃতির মুক্তির বারতা, স্বাদেশিকতার সুস্পষ্ট বাণী ইংরেজ শক্তির মনোবল নড়বড়ে করে দেয়। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম-মৃত্যু অজানা) *চাকর দর্পণ* (১৮৭৫), *জেলদর্পণ* (১৮৭৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯–১৯২৫), *পুরু-বিক্রম* (১৮৭৪), *সরোজিনী* (১৮৭৫), উপেন্দ্রনাথ দাসের (১৮৪৮-১৮৯৫), *শরৎ-সরোজিনী* (১৮৭৪), *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*

(১৮৭৫) ইত্যাদি নাটকে স্বাদেশিকতার, আত্মমুক্তির বাণী ও ইংরেজ বিদ্বেষী চেতনার পরিস্ফুটনের ফলশ্রুতিতে ১৮৭৬ সালে ইংরেজ সরকার অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে।

> '... এবং উহাতে যেমন নাট্যকলার উন্নতি ব্যাহত হইল, নাটক রচনায়ও খুবই শঙ্কা ও শিথিলতা আসিল।' (হেমন্ত, ১৩৫৪ : ১৪৩)

এমন সংকটকালে বাংলা নাটকের হাল ধরেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪–১৯১১)। তিনি বিভিন্ন নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং নাটক লিখে বাংলা নাটকের ধারাকে সচল রাখার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বপ্রণোদিত হয়েই। *রাবণবধ* (১৮৮১), *অভিমন্যুবধ* (১৮৮১), *রামের বনবাস* (১৮৮২), *সীতার বনবাস* (১৮৮২), *সীতাহরণ* (১৮৮২), *অজ্ঞাতবাস* (১৮৮৩) প্রভৃতি পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনা করে তিনি চিরস্মরণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) ও রুশ বিপ্লব (১৯১৭–১৯২৩) বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধের ফলে:

> যুদ্ধজয়ী ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্ববৃহৎ কলোনি হিসেবে যুদ্ধের অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার ভারতকে আত্মস্থ করতে হয়। (ভীষ্মদেব, ২০২১ : ৩২)

অপরদিকে, রুশ বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সাম্য-জীবনভাবনায় উজ্জীবিত হয় বিশ্ব। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন, ভারত-ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি বাংলার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবন প্রভাবিত করে। 'অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের কার্যকারণ ও পরিণাম তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত। ভারতীয় রাজনীতির এই ঐতিহাসিকপর্বের অমূল্য অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীচিত্তের সযত্ন পরিচর্যায় লাভ করেছে শিল্প-প্রমূর্তি। *ধাত্রী দেবতা* এবং *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে শিবনাথ ও দেবনাথ চরিত্রের ক্রমবিকাশধারায় এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারাক্রম অঙ্গীকৃত হয়েছে। *ধাত্রী দেবতা*-র অহিংস-অসহযোগী শিবনাথের *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম*-এর দেবনাথ-চরিত্রে উত্তরণের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের সফল শিল্পাভিব্যক্তি চিরায়ত-গৌরবে হয়েছে অভিষিক্ত।' (ভীষ্মদেব, ২০২১: ৩৬) অনতিবিলম্বে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল সারা বাংলা। এ আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫) *জাগরী* (১৯৪৫) ও *ঢোঁড়াইচরিতমানস* (প্রথম চরণ ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১) উপন্যাস রচনা করেন।

সময়-উত্থিত দ্বন্দ্বসমূহ ও অভিজ্ঞতা কবিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের মানসচৈতন্যে সক্রিয় ছিল। স্বাদেশিকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা বোধের সমন্বয় সাধনে রবীন্দ্র-শিল্পমানস উদ্‌গ্রীব। এ সময়ে রামমোহন রায়, গান্ধীজি যেমন, বাঙালির প্রাণের কাছাকাছি এসেছেন; রবীন্দ্রনাথও তেমনি নব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হন।

> A new pride was born, a new hope was nourished, and soon Gandhi and Togore held before their countrymen a torch, lit, indeed, by western fires, but up held by Indian hands. (Percival, 1952 : 488)

বাংলা সাহিত্যের ভাব-অনুষঙ্গী শিল্পিত ভাষা নির্মিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রতলস্পর্শী চেতনার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়েছে ভাষার সমস্ত সম্ভাবনার স্তর। রবীন্দ্রনাথের ভাষার বৈচিত্র্যময় নান্দনিক প্রয়োগসামর্থ্যের নেপথ্যে রয়েছে উনিশ শতকীয় বাংলা গদ্যের ভূমিকা। ঔপনিবেশিত সমাজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-মানসের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে স্পষ্টভাবে সুচিহ্নিত। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের রূপায়ণে নিজস্ব দর্শনবোধের সঙ্গে ভাষার বৈচিত্র্যময় বেণীবন্ধন রচনা করেন তিনি। একথা প্রণিধানযোগ্য যে:

> রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা এতদূর বাড়াইয়া দিয়াছেন যাহা কোনো ভাষায় কোনো একজন লেখক করিতে পারেন নাই। শুধু বুদ্ধির উসকানি দিয়ে ক্ষান্ত না হইয়া মনের গহন অন্তঃপুরে পৌঁছিয়া চিত্তের– এমন কি প্রাণের– গভীরতর অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া রবীন্দ্র বাক-রীতির অনন্যসাধারণ মৌলিক গুণ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাই স্বয়ংপ্রভ মনোজ্ঞ। (সুকুমার, ২০১৫ : ১২৪)

জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ, মানবতাবোধ, কল্যাণবোধ, প্রেম-প্রকৃতির বর্ণিল রূপায়ণ, শিক্ষা চিন্তা, সমাজ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি রবীন্দ্র-মানসের চেতনাসমূহ অনন্যসাধারণ ভাষাবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আর তাঁর সমস্ত চেতনার উৎসভূমি ঔপনিবেশিক প্রতিবেশ। ছোটগল্পে উপনিবেশিক গ্রাম জীবনের চিত্র অঙ্কন, উপন্যাসশিল্পে জাতীয়তাবাদ, স্বদেশি আন্দোলনের রূপ উন্মোচন, প্রবন্ধাবলিতে ঔপনিবেশিকতার কঠোর সমালোচনা করেও রবীন্দ্রনাথ যেন ক্ষান্ত হননি। ঔপনিবেশিক সময়ে বিক্ষুব্ধ, রূপান্তরশীল ব্যক্তি-মানসের সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনে কবিতা ও নাটকের সমবায়ী এক নতুন শিল্পপ্রকরণ নির্মাণ করেন। কাব্যনাট্য হল সেই অভিনব শিল্পপ্রকরণ। কাব্যনাট্যসমূহের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালির আত্মিক জাগরণ, স্বশক্তিকে বলীয়ান হওয়ার প্রত্যয়। ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীর আরও সুদৃঢ় অবস্থান সুনিশ্চিত করতে চান কাব্যনাট্যের ফর্মে: কাব্যনাট্যসমূহের নারী চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সত্য প্রতীয়মান হয়।

পূববর্তী সাহিত্যিকদের উত্তরাধিকার ধারণ করে রবীন্দ্রনাথের সূচনা ঘটে সাহিত্যের জগতে পথচলার। সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে রবীন্দ্র-মানস ছিল হিন্দু জাতীয়বাদী চেতনাপুষ্ট। বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশ ও স্বকালের আন্দোলন-সংগ্রাম-মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন নিজস্ব শিল্পবিশ্বাসের জগৎ। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি আস্থাবান ছিলেন। তবে, পরবর্তী সময়ে কেবল চরকা কাটা আর খদ্দর পরিধান

করার মাধ্যমে দেশের মুক্তি আসবে বলে তিনি মনে করেন না। এ আন্দোলনের চরমপন্থা, গোপনীয়তার চেষ্টা এবং জনবিচ্ছিন্নতা ভাবিয়েছে কবিকে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

> রাজনীতির আলোচনা বা সমালোচনা কবিজীবনের চরম কর্তব্য তো নয়ই, পরম আনন্দও নয়। রাজনীতির উত্তেজনা কখন মন থেকে সরে গেল। ... কবি ও কর্মীর মধ্যে মতের ও কর্মপদ্ধতির সর্বৈব মিল হতে পারে না। স্বরাজ জিনিসটা কী, কোন্ উপায়ে সেটা লভ্য– লোকের কাছে সবই অস্পষ্ট।... রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন তাঁর নিরালা শান্তিনিকেতনে, তাঁর ছাত্রমণ্ডলীতে। সেখানে এক নীড়ের মধ্যে বিশ্বকে বাঁধবার উদ্দেশ্যে সর্ব জাতির ও সর্ব ধর্মের লোককে আহ্বান করেছেন। (প্রভাতকুমার, ১৪২০ : ১১৭)

এ ঐক্যের শক্তিই রবীন্দ্র-মানসের অন্যতম প্রখর চেতনা হিসেবে চিহ্নিত। একদিকে ব্রিটিশের অপশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে সমন্বয়ী মনোভাবনা নিয়ে স্বদেশের কল্যাণ কামনা– এ যুগ-বৈপরীত্য রবীন্দ্র-মানস এড়াতে পারেনি।

> উপনিবেশ-বিরুদ্ধতায় প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য– যা আজও ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনযাপনে দুর্মর অনমনীয় অবস্থান নিয়ে এক প্রবল বাস্তবতা হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথে বহু আগেই অধিক সংখ্যক জনমানুষের ঐক্যবদ্ধতায়, শান্তি ও সামঞ্জস্যীকরণের সমতা (সাম্যতা নয়) স্থাপনের আয়ুধরূপে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছিল। (বেগম আকতার, ২০২১ : ৪৩)

রবীন্দ্র-চেতনবিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত তথা ভাবাদর্শ তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন ফর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ তাঁর অভীপ্সা জীবনার্থের চিহ্নায়ক। *কালান্তর* (১৯৩৭) ও *ভারতবর্ষ* (১৯০৫) প্রবন্ধগ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে ঔপনিবেশিক শক্তির মত্ততা ও প্রতাপ এবং পরাক্রমশালী এ শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলার ইঙ্গিতও দেন। *কালান্তর* প্রবন্ধগ্রন্থের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে ইংরেজশক্তিকে ভারতবর্ষের কর্তা মান্য করে বলেনঃ

> কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতা-প্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তেরই লীলা চলিতেছে ... (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৫ : ৭৩)

উপন্যাসশিল্পে রবীন্দ্রনাথের দর্শনবিশ্ব পরিস্ফুট হয়েছে আরও ব্যাপক পরিসরে। *গোরা* (১৯১০), *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসসমূহের রবীন্দ্রনাথ ঘটনা সংস্থানে, চরিত্র নির্বাচনে, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে এবং ভাষাবিন্যাসে স্বকালের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা ও সামূহিক সংকটের চিত্র আঁকেন। 'হিন্দুধর্ম থেকে সর্বাস্তিবাদী মানবধর্ম এবং হিন্দুজাতীয়তাবাদ থেকে

বিশ্বজাগতিকবাদ–রবীন্দ্রনাথের জীবনার্থ সন্ধানের দীর্ঘ দ্বন্দ্বময় গতিপথ যেমন *গোরার* পরিপ্রেক্ষিত, তেমনি *চতুরঙ্গ* রবীন্দ্রনাথের অরূপ অধ্যাত্মরসে নিমজ্জনদশা থেকে সত্যকর্ম ও বিশ্বকর্ম-উপলব্ধিজাত মনুষ্যত্ববোধে উত্তরণের নিগূঢ় ইতিকথা।' (সৈয়দ আকরম, ১৪২১ : ১৯৮–১৯৯) *ঘরে-বাইরে* এর বিমলার 'মনে হতে লাগল, আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হওয়ার জন্য।' বিমলার আত্মকথা'য় বিমলার মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও নিঃসঙ্গতার কার্যকারণ আবিষ্কার করেন এভাবে:

> মানবচরিত্রে স্তরসংকুল যেসব সম্ভবপরতা আছে, মানবচরিত্রের মধ্যে যে চিরন্তনত্ব বর্তমান–ঘটনা, বহির্জগৎ ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সংঘাতে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। উপনিবেশিত বাংলাদেশের অশক্ত নবজাগরণের গর্ভজাত কিছু মানুষের অস্তিত্বের সংকট, ব্যক্তিত্বের অন্তর্জ্বালা এ উপন্যাসে হয়েছে উন্মোচিত। এ প্রশ্নে ঘরে-বাইরে চতুরঙ্গ-এর ঘনিষ্ঠ, এবং যোগাযোগ-স্পর্শী। (সৈয়দ আকরম, ১৪২১ : ২২৪)

একইভাবে,

> উপনিবেশিত ভারতবর্ষের উদীয়মান বণিকতন্ত্রের প্রতিভূ মধুসূদনের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রতিনিধি বিপ্রদাস ও তার বোন কুমুদিনীর শ্রেণীদ্বন্দ্ব বৈবাহিত সম্পর্কসূত্রে কীরূপে অমীমাংসিত ব্যক্তিস্বরূপের সংকটে পরিণত হল তারই শিল্পরূপ *যোগাযোগ* উপন্যাস। (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০০৮ : ৮৯)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনা, দর্শন, বোধ এবং বিশ্বাস প্রভৃতিকে কেবল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা উপন্যাসশিল্পে ধারণ করে নিরস্ত হননি। তিনি পুরনো প্রকরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে তাঁর শিল্পিত অভীপ্সার সমস্ত প্রান্তকে নাট্যপ্রধান ফর্মে ধারণ করতে চাইলেন, যেখানে কবিত্বশক্তিও সম-তাৎপর্য নিয়ে পূর্ণমাত্রায় বিচরণ করবে। কাব্যনাট্য সেই শিল্পপ্রকরণ, যেখানে নতুন পরিচয়ে, নতুন ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং:

> এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্যে যথার্থ কাব্যনাটক লিখতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ।... যেহেতু আপাদমস্তক তিনি কবি, তাই কাব্যনাটক লেখার যোগ্যতা তাঁর সংশয়াতীত। তাছাড়াও গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সুতরাং আশা করতে দ্বিধা নেই, তিনিই হবেন বাংলা সাহিত্যের আদি কাব্যনাট্যকার। অবশ্য এও ঠিক বাংলায় প্রথম কাব্যনাট্য লেখার চেষ্টা তিনিই করেছেন। তাঁর আগে কাব্যনাটকের নামে যা লেখা হয়েছে, তা কাব্য এবং নাটক উভয়গুণেই ব্যর্থ। (তরুণ, ২০০৩ : ৪৯)

ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা-সত্য-ন্যায়-সাম্য প্রতিষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭৬) আমৃত্যু দ্রোহীচেতনা লালন করেন। ব্যক্তিচিত্তের দ্রোহচেতনা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও কুণ্ঠাহীন চিত্তে তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেন,

তা আর নজরুলের একক ভাষ্য হয়ে থাকে না; হয়ে ওঠে সর্বমানবের, সর্বকালের। ব্রিটিশ দুঃশাসনের বিরোধিতার ভাষ্যে, সংগ্রাম ও সংক্ষোভের সংশ্লেষে নজরুলের সমস্ত উচ্চারণ প্রতিভাত হয়েছে বাঙালি জীবনে বহুপ্রত্যাশিত মঙ্গলময় বারতায়।

সাম্যের গান গাই।
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন–
তাই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন। (কাজী নজরুল, ২০১৮ : ৯১)

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের "রাজা-প্রজা" কবিতার মত ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নজরুল, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে অনুরণিত হচ্ছে যেন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি। 'আমার পথ' প্রবন্ধে জানান: ' 'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। ... আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। ... রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না।' (কাজী নজরুল, ২০১৮ : ৪২০) পরাধীনতার গ্লানিতে অধঃপতিত বাঙালি জাতিকে নজরুল এভাবে উদ্দীপ্ত ও আশান্বিত করেন। উপনিবেশের সৃষ্ট যন্ত্রণা, বিপর্যয়, উন্মূল চেতনা, অবক্ষয় ও শঙ্কা মানসচৈতন্যে ধারণ করে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) নির্মাণ করেন বিশ্বাসহীনতার, নির্জনতার জগৎ। মর্মপীড়িত জীবনানন্দ ক্রমশ আত্মমগ্নতায় ডুব দিয়েছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠি যথার্থই বলেন:

> এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ। ... বলতে কি, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ-যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে ওঠে। (দীপ্তি, ২০০৭ : ১১৭)

'আমি যদি হতাম বনহংস/ বনহংসী হতে যদি তুমি'– বিনাশীকালের প্রেক্ষাপটে কবির এ প্রত্যাশার অন্তরালে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। বিরূপ এ পৃথিবীতে কবির আশ্রয় শেষপর্যন্ত প্রকৃতির কাছে। একইভাবে, ঔপনিবেশিকতার বিষবাষ্প থেকে মুখ ফিরিয়ে পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক শিল্পভুবন গড়ে তোলেন কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩–১৯৭৬)। *ওগো পুষ্পধনু* (১৯১৮) কাব্যনাট্যসহ অন্যান্য রচনায় ঔপনিবেশিক জীবনের রূঢ়তার বিপরীতে তিনি আঁকেন গ্রামজীবনের সহজ-সরল, শান্ত-সুনিবিড় ছবি। বাংলার লোকজীবনের রূপায়ণে তাঁর সদর্থক শিল্পমনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়-খ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০), মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১) প্রমুখের ভাবনাবিশ্বের একটি অংশজুড়ে রয়েছে প্রান্তিক, ব্রাত্য, আদিবাসী জীবনের উদ্ভাসন। *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিত*, *আরণ্যক*, *ইছামতী*, *চাঁদের পাহাড়* প্রভৃতি উপন্যাসের বিধৃত হয়েছে মানব-প্রকৃতি-অস্তিত্বের আখ্যান। ঔপনিবিশেকতার ছোঁয়াচ থেকে একটু দূরবর্তী জীবনাবর্ত নির্বাচনের নেপথ্যে রয়েছে বাঙালির নিজস্ব জীবন-সংস্কৃতিতে প্রোজ্জ্বল করার শৈল্পিক অভিপ্রায়। উপনিবেশের ফলে সৃষ্ট সংকটসমূহের মধ্যে রয়েছে: বনভূমি উজার, প্রকৃতি থেকে মানব সমাজের বিচ্যুতি, কৃষি জমি হ্রাস ও নগরায়ণের সৃষ্টি; এসবের বিপরীতে পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভূতিভূষণ লেখনী ধারণ করেন। ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষু, নির্মম শোষণে বিধ্বস্ত আদিবাসী জীবনাবর্তের চিত্র পরম মমতায় এঁকেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর *হাঁসলী বাঁকের উপকথা*'য় উপনিবেশের ফলে রূপান্তরিত মানব ও সমাজের স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে শৈল্পিক অভিদ্যোতনায়। এভাবেই 'জীবনভাষ্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেলে গড়ে ওঠে কথাভাষ্য; কথাভাষ্যে ছড়িয়ে থাকে জীবনের নানা রং ও রূপ, ফলে তা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে লেখকের স্বতন্ত্র শিল্প প্রয়াস।' (মোমেনুর, ২০২২ : ১৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানবপ্রবাহ, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ– এসবের ফলে সর্বত্র হতাশা, অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দেয়। যুগের দাবির কাছে পুরাণ-অনুষঙ্গী নাট্যধারার আবেদন ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। এসব সংকট-জাত পীড়িত মানবপ্রবাহের উপস্থাপনায় নাটক প্রখর বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। তখন সময়ের দাবিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। উৎপল দত্ত (১৯২৯–১৯৯৩), বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬–১৯৭৪), শম্ভু মিত্র (১৯১৫–১৯৯৭) এ ধারার নাট্যব্যক্তিত্ব। ১৯৪৭ এর দেশভাগের সূত্রে গণনাট্য থেকে বাংলা নাটক নবনাট্যের দিকে যাত্রা করে। এ ধারার পুরোধা শম্ভু মিত্র। তিনি 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নাট্যগোষ্ঠী গঠন করেন নতুন জীবন বোধ ও নতুন সমাজ বিগঠনের প্রত্যয় নিয়ে। এটিই থার্ড থিয়েটার নামে পরিচিত। সময়ের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট নতুন মানবের স্বরূপ উন্মোচনে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পগুণান্বিত নাটক রচনা ছিল এ নাট্যগোষ্ঠীর মৌল উদ্দেশ্য। রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে মিথিক অনুষঙ্গের সঙ্গে সমকালীন জীবন ও রাজনীতির শিল্পান্বিত উপস্থাপনায় তাঁর *চাঁদ বণিকের পালা* কাব্যনাটকটি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিভাগোত্তর মানুষের বহুকৌণিক সংকটের রূপাবয়বে নাট্যকারগণ মিথের শরণ নেন। এ পর্যায়ের শক্তিমান কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪)।

> বুদ্ধদেব বসু তাঁর দীর্ঘ কর্ম ও সাহিত্যজীবনে বরাবরই এড়িয়ে গেছেন রাজনীতিকে। যদিও তাঁর নিজস্ব একটা রাজনীতি ভাবনা আছে। যে কালে তিনি সাহিত্য রচনা করছিলেন তখন রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিবেশের দারুণ দুঃসময় গেছে, সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়েছে। (মুনিরা, ২০২১ : ৪৮)

সমাজ ও জীবন অন্তঃস্থ দ্বন্দ্বসংকুলতায় বুদ্ধদেব-মানস ভিন্ন শিল্পরূপে, ভিন্ন বিষয়বৈভবে আগ্রহী হন। কেননা: 'যুদ্ধোত্তর জীবনকে তিনি দর্শনায়িত করতে চাননি, জীবনের গায়ে জড়াতে চাননি আরোপিত কোন মূল্যচেতনা–বরং কালিক বৈনাশিকতায় মানবজীবন যে হয়ে উঠেছে বিপন্নও উন্মূলিত, ...' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৩৩০) বুদ্ধদেব সে-জীবনকে কাব্যনাট্যের ফর্মে সন্নিবেশিত করে তৃপ্তি পেলেন যেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নাট্যধারায় উৎকর্ষ লাভ করেন বুদ্ধদেব বসু।

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা কাব্যনাট্যের বীজ রোপিত। তারপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন কবির হাতে কাব্যনাটক নতুন মাত্রা পায়। এক আধুনিক কাব্যনাট্য আন্দোলনের অন্যতম কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কাব্যনাটকে প্রকাশিত হয়েছে 'জীবিতের যন্ত্রণা'; আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা, উপলব্ধির গভীরতা, অস্তিত্ব, জীবনের রহস্য ইত্যাদি। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৩৮)

তিনি সময়ের রূঢ় বাস্তবতা, রূপান্তরিত ব্যক্তি সত্তা, আধুনিক মানুষের অন্তর্দেশের স্বরূপ উন্মোচনে মিথ-পুরাণের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যিক জগতে আবগাহন করেন। মিথ-পুরাণের ছায়াতলে আধুনিক জীবনমনস্কতার রূপাবয়ব নির্মাণে বুদ্ধদেব বসু সফল। কবিতার ও নাটকের শিল্পিত ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রেখে শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় শিখরচুম্বী কাব্যনাট্যসমূহ রচনার কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর কাব্যনাট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩) প্রভৃতি। বস্তুত:

> আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের শ্রেষ্ঠতম, শিল্পী কবি বুদ্ধদেব বসু। বাংলা কাব্যনাট্যের রূপকল্প গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। (মাহবুব, ২০০৯ : ১৭)

বাংলা কাব্যনাট্যের ধারাবাহিকতায় অসংখ্য কাব্যনাট্যকারের অবদান অবশ্যস্বীকার্য। নুরুল মোমেন (১৯০৮–১৯৯০), ফররুখ আহমদ (১৯১৮–১৯৭৪), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২–২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫–২০১৬), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩–২০১০), আবিদ আজাদ (১৯৫২–২০০৫), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬–১৯৯১), আবুল হাসান (১৯৪৭–১৯৭৫) সহ আরও অনেক কাব্যনাট্যকার নির্মাণ করেন বাংলা কাব্যনাট্যের ঋদ্ধ ইতিহাস।

সহায়কপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ — ১৯৬৩, *নাটকের কথা*, প্রথম প্রকাশ, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

অমলেশ ত্রিপাঠী — ১৯৮৫, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

অনুপম হাসান — ২০১০, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক বিষয় ও প্রকরণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অরবিন্দ পোদ্দার — ১৯৫৫, *ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক*, প্রথম প্রকাশ, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ২০০০, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার — ২০১৬, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২য় সংস্করণ ডিসেম্বর দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আবদুল মান্নান সৈয়দ — ১৯৮০, *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আনোয়ার পাশা ও মুহম্মদ আবদুল হাই — ২০১৪, *চর্যাগীতিকা* (সম্পাদিত) স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা

উদয়চাঁদ দাশ ২০১৬, '' 'রাজসিংহ': আখ্যানের টানাপোড়েনে'', *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ* প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

উইলিয়াম শেকসপিয়র ২০০৯, *শেকসপিয়র রচনা সমগ্র*, অজয় দাশগুপ্ত ও অরবিন্দ চক্রবর্তী (ভাষান্তর), সর্বাধুনিক সংস্করণ, পুনশ্চ, ৯/এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৪১৬, *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উৎপল দত্ত ১৯৯৮, *উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ* ১ম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ নাট্যচিন্তা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

উত্তম দাশ ১৯৮৯, *কাব্যনাট্য*, প্রথম প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা

কণিকা সাহা ১৯৯৪, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ২০১২, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পঞ্চাশ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪ রত্নবলী, কলকাতা

১৯৫৯, *ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

কাজী নজরুল ইসলাম ২০১৮, *নজরুল রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জয়া চ্যাটার্জী ১৯৯৯, *বাংলা ভাগ হল*, আবু জাফর (অনূদিত), প্রথম সংস্করণ, এল্ অ্যালমা পাবলিকেশনস, কলকাতা

জিয়া হায়দার ১৯৯৫, *নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশ ১৪১৩, *কবিতার কথা*, দশম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০৯, *কবিতার বহুস্বর*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০৩, *বাংলা কাব্যনাট্য: রূপ ও রীতি*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা

২০০৭, *কাব্যনাট্য-বিভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, সুপ্রিম পাবলিশার্স, ১০ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

দীপ্তি ত্রিপাঠি ২০০৭, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫, *কাব্যের মুক্তি এবং তার পর*, প্রতিভাস প্রথম সংস্করণ, প্রতিভাস, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৯, *বুদ্ধদেব বসু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, প্রথম বিগ বুক্স সংস্করণ, বিগ বুক্স, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ ১৯৭৮, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা*, ৪র্থ সংস্করণ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৬৪, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় ১৪২০, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, অষ্টম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী ২০০৬, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪২০, *রবীন্দ্রজীবনকথা*, দ্বাদশ মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা

প্রমোদ সেনগুপ্ত ১৯৫৭, *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রো, কলিকাতা

বড়ু চণ্ডীদাস ১৪১৪, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ (সম্পাদিত), একাদশ সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা

বাদল সরকার ১৪২১, *নাটক সমগ্র* প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা

বিনয় ঘোষ ১৩৫৫, *নবজাগৃতি*, প্রথম সংস্করণ, *বাংলার* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পরিমার্জিত সংস্করণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল ২০২১, *রবীন্দ্রনাথের এশিয়া দর্শন*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

২০১৪, *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, প্রথম প্রকাশ, অবসর, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী ২০২১, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি*, কথাপ্রকাশ, কথাপ্রকাশ প্রথম সংস্করণ ২০২১, ঢাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২০১৫, *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত), সপ্তম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা

মাহবুব সাদিক ২০০৯, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

মার্টিন কেম্পশেন ২০১৮, *অনুভবে অনুধ্যানে মার্টিন কেম্পশেন*, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), দ্বিতীয় মুদ্রণ, কারিগর, ৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ ২০১৩, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* (সম্পাদিত), দ্বাদশ মুদ্রণ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মুনিরা সুলতানা ২০২১, *বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসমালোচনা মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

মোমেনুর রসুল ২০২২, *সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ব্যক্তি-সমাজ-রাজনীতি ও শিল্প-ভাবনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান ২০০৮, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪২৫, *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

শম্ভু মিত্র ১৪২২, *চাঁদ বণিকের পালা*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

শান্তনু কায়সার ২০১৩, *কাব্য ও নাট্য কাব্যনাট্য*, প্রথম প্রকাশ, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

১৯৮৫, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শিশিরকুমার দাশ ২০১৩, *মধুসূদনের কবিমানস*, প্রথম এবং মুশায়েরা সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭২, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, ১ম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৪, *ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার*, প্রথম প্রকাশ, আশা প্রকাশনী, কলকাতা

সনৎকুমার মিত্র ১৩৬০, *শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক*, প্রথম প্রকাশ, জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩/২ মণীন্দ্র মিত্র রোড, কলিকাতা

সজনীকান্ত দাস ২০০৭, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৩৬৯, *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব*, ২য় সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

সাইফুল ইসলাম ২০০৩, *রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ* প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সুকুমার সেন ২০১৫, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা

সুখেন বিশ্বাস ২০১০, *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১১, *নন্দনতত্ত্বের প্রাচ্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সেলিম আল দীন ১৯৯৬, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন ১৪২১, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম ধ্রুবপদ প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক ২০১২, কাব্যনাট্য সংগ্রহ, পুনর্মুদ্রণ, চারুলিপি প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ২০০৮, *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৪১৫, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, কলকাতা

হেমন্ত নাথ দাশগুপ্ত ১৩৫৪, *বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত*, প্রকাশকঃ শ্রীমনীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, ১২৪/৫ বি রসা রোড, কলিকাতা

ক্ষেত্রগুপ্ত ১৩৬৬, *প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থ নিলয়, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

ক্ষুদিরাম দাস ২০০৫, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

August Strindberg 1924 *Miss Julie & other Plays,* Boni and liveright inc, New York

Aristotle's Poetics 1819, N. Bliss (translated) 21, water lane, fleet street, London

Bernard Shaw 1991, *Pygmalion*, Jacqueline Fisher (edited) Logman

Bertolt Brecht 1939, *Mother courage and her children*

Constantin, Stanislavsky 1936, *An Actor Prepares* Elizabeth Elizabeth Reynolds Hapgood (translated)Two Manchester Square, London

Denis Donoghue 1966, *The Third Voice*, Princeton University Press, New Jersy

John Howard Lawson 1960, *Theory And Technique of Playwriting*, Hill and WANG, New York

Longinus 1907, *On The Sublime*, W. Rhys Roberts (edited), second edition, Cambridge: at the university press

Sir Percival Griffiths 1952, *The British Impact on India*, first published, Macdonald, London

T.S. Eliot

1921, *The Sacred wood: Essays on Poetry and criticism*, Alfred knopf, New York

1961, *On Poetry and Poets*, London: faber and faber

1950, *Poetry and Drama*, Faber & Faber Ltd, 24 Russell square London

1951, *Selected Essays*, London: faber and faber

1961, On *Poetry and Poets*, New York, The Noonday Press

1920, *The scared wood essays on poetry and criticism*, Methuen & Co. Ltd, London

William Henry Hudson

1913, *An Introduction to the study of Literature*, Second Edition Enlarged, London, George G. Harrap & Company

William Wordsworth & Coleridge 1802, *Lyrical Ballads*, Vol:1, Third Edition, London

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের মিথস্ক্রিয়া

বর্তমান গবেষণার অভিলক্ষ্য হলো বাংলা কাব্যনাট্যের সমৃদ্ধ ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর অবদান-অবস্থান এবং তাঁদের সৃজিত শিল্পবিশ্বাসের প্রাকরণিক বিন্যাসের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য অন্বেষণ। নির্বাচিত কাব্যনাট্যকারগণ স্বকাল ও সমাজের বহির্বাস্তবতাকে ধারণ করে মানব মনের গভীরতম রহস্যের অভিমুখে ধাবিত হন; আর এক্ষেত্রে তাঁদের মুখ্য অবলম্বন স্বোপার্জিত শিল্পবিশ্বাসের জগৎ। কাব্যনাট্যে তাঁদের স্বকীয় ভাবাদর্শের শিল্পরূপায়ণ প্রক্রিয়া তাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য সুচারুরূপে বিভাজন করলে এখানে মূলত দুটি চিন্তাধারার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়: **ক)** ভাবাদর্শিক দিক এবং **খ)** নাট্যিক দিক। একদিকে ভাবাদর্শ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানবিশ্ব ও তাত্ত্বিক বিবর্তন; এ দিক বিবেচনায় বলা যায় কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের স্বোপার্জিত ভাবাদর্শের বিগঠনে বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ শতকীয় বিভিন্ন সাহিত্যিক মতবাদের প্রভাব রয়েছে অবধারিতভাবে। সঙ্গত কারণেই এ অধ্যায়ে কাব্যনাট্যকারদ্বয়ের কাব্যনাট্যসমূহে ভাবাদর্শ কীভাবে শিল্পসম্পৃক্ত হলো, তা অনুধাবনের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে মানবতাবাদী চর্চা (humanism) ও উত্তর-উপনিবেশবাদী পাঠ (post-colonial reading) প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় নির্বাচন করা হয়েছে। অপরদিকে এ অভিসন্দর্ভের মৌল উপজীব্য যেহেতু কাব্যনাট্য, তাই নাট্যিক তত্ত্বের কাঠামো-সূত্র হিসেবে অভিনেতা নেটওয়ার্ক তত্ত্ব (actor-network theory) বিবেচনা করা হয়েছে। এ তত্ত্বের আলোকে ভাবাদর্শের, চিন্তার বিবর্তনে কাব্যনাট্যের কুশীলব এবং নাট্যস্রষ্টার সঙ্গে কীভাবে সাযুজ্য স্থাপন করে, তা বিশ্লেষিত হয়েছে। কাব্যনাট্যকারগণের ভাবাদর্শের গভীরতা ও বৈচিত্র্য অন্বেষণ বিশ্লেষণের কৌশল হিসেবে প্রয়োজন বিবেচনায় বর্তমান গবেষণায় সংযোজিত হয়েছে চিহ্নতত্ত্ব (semiotics) ও আখ্যানতত্ত্ব (narratology)।

ক. তত্ত্বীয় কাঠামো

১. মানবতাবাদী চর্চা (humanism)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাবিশ্ব সংবেদনশীল ও বহুমাত্রিক প্রান্তস্পর্শী। প্রেম, প্রকৃতি, মানবীয়বোধ, দেশাত্মবোধ, কল্যাণচেতনা, সমাজনীতি, রাজনীতি, মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহের উজ্জ্বল প্রান্ত। উপনিবেশিত জীবনচর্যা, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, পুঁজিবাদের কদর্য রূপ, দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন– কোনো কিছুই রবীন্দ্রনাথকে মানবিকতা-বিচ্যুত করেনি। তাঁর কবিতা, গান, কথাশিল্প, প্রবন্ধশিল্প, নাট্যসাহিত্য, বিশেষত কাব্যনাট্যে রবীন্দ্র-মানসের এ বোধ আরও দীপ্ত ও শানিত। মূলত রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরকামী ও

বৈচিত্র্যমণ্ডিত শিল্পবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও ক্রম-বিকশিত। তিনি আত্মকেন্দ্রিকতার মার্গ থেকে মানবপ্রবাহের নিকটতম হন মানবপ্রেমের আন্তরধর্মের টানে। অসীম সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা হিসেবে মানুষকে বিবেচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের অবমূল্যায়ন তাঁকে করেছে চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথিত। রবীন্দ্র-চিত্তের আকুল আকুতি তাই– 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'; শেষজীবনেও এর প্রবহমানতা ছিল এভাবে– 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক'। ব্যক্তিজীবনের গহন গভীর বেদনা, সমাজ-রাষ্ট্রের সংকট, তিমিরাচ্ছন্ন প্রতিবেশ, সমস্ত কিছু সত্তার অন্তর্নিহিত মানবীয় বোধ দিয়ে অতিক্রম করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। নান্দনিক ভাবনার সূত্র, ঈশ্বর অনুসন্ধান, মহাজাগতিক সৌন্দর্য ও রহস্যের অনুধ্যান কিংবা বিজ্ঞান ভাবনা সমস্ত কিছুর মৌল উৎস মানব ও মানবের কল্যাণকামিতা। ফলে রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা ব্যক্তিক সীমা পেরিয়ে বিশ্বমানবিক হয়ে উঠেছে। মানুষের সীমা ও অসীমতাকে মেনে নিয়ে সমগ্র মানবকে পাঠ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ– 'মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থানপতন-বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আট্‌কে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ১০৯)

অপরদিকে, বুদ্ধদেব বসু বিশ শতকীয় আধুনিক জীবনভাবনার সঙ্গে চিরন্তনকালের জীবনবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় পুরাণের নানা অংশকে কাব্যনাট্যের বিষয় করে তোলেন। তিনি পুরাণের ঘটনা-অংশ এবং চরিত্রসমূহকে আধুনিক মানবীয় বৈশিষ্ট্যে শিল্পসমন্বিত করে তোলেন অভিনব শিল্পরস সৃষ্টির অভীপ্সা থেকে। নিজস্ব শিল্পজিজ্ঞাসা ও জীবনজিজ্ঞাসার তাগিদ থেকে বুদ্ধদেব পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও চরিত্রের অনুভবে মানবীয় বোধ সঞ্চারিত করেন। এটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব মানব অধ্যয়ন প্রক্রিয়া, যা মানবতাবাদেরই নতুনতর ব্যাখ্যা।

মানবজাতি, মানবধর্ম, মানবকল্যাণ, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মানবতাবাদ (humanism)। মানবতাবাদ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আলোকপাত করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বমানবের কল্যাণকামিতা এর মৌল উপজীব্য। মানুষের সক্ষমতার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, তার সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার যথাযথ মূল্যায়ন এবং স্বাধীনতা ও কল্যাণকামিতা সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানবের সামূহিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন মানবতাবাদের লক্ষ্য। ``Humanism Philosophy`` প্রবন্ধে K. Suresh Kumar বলেন: `Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives.

Humanism stands for the building of a more humane society through and ethics based on human and other natural values in a spirit of reason and free inquiry through human capabilities. Humanism is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.` (K. Suresh 2017 : 81)

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীয় শব্দ 'ইউমানিস্তা' থেকে 'হিউম্যানিজম' শব্দের উদ্ভব ঘটে। ১৮০৬ সালে জার্মান ভাষায় 'হিউম্যানিসাস' এবং ১৮৩৬ সালে ইংরেজি ভাষায় 'হিউম্যানিজম' শব্দের প্রচলন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে 'হিউম্যানিজম' বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তবে, সভ্যতার ইতিহাসে মানবতাবাদের ধারণা আরও পুরনো। গ্রিক সফিস্টদের চিন্তাদর্শ ছিল মানবকেন্দ্রিক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রিক দার্শনিক থেলিস ও ক্রেনোথানিক অলৌকিকতার বিপরীতে বস্তুজগতের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন। গ্রিক সফিস্ট প্রটেগোরাস-এর `Man is the measure of all things of things that are are, and of things that they are not.` –উক্তির মধ্যে মানবতাবাদের সম্ভাবনার বীজ নিহিত। তাঁর সমসাময়িক সফিস্ট হিপিয়াস জীবনকে শিল্পের ন্যায় গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রটেগোরাস-পরবর্তী সময়ে ধর্মতন্ত্র, চার্চতন্ত্রের বিপরীতে সক্রেটিস, প্লেটো, ব্রিটিশ দার্শনিক জন উইক্লিফ (১৩২০–১৩৮৪) প্রমুখ মানবতাবাদের ভাবনাকে এগিয়ে নিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গৌতম বুদ্ধের পালি সাহিত্যে অলৌকিকতার প্রতি সন্দেহ পোষণ মূলত মানবীয় ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। চৌদ্দ শতকের শেষের দিক থেকে ষোলো শতকের শুরুতে চার্চতন্ত্রের পতনের পর প্রতীচ্যের জ্ঞানকাণ্ডে নতুন ভাবনা, তত্ত্ব ও আবিষ্কার রেনেসাঁকে অনিবার্য করে তোলে। ইতালীয় এ রেনেসাঁসের সারকথা ছিল: জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মীয় ও অলৌকিকতার কর্তৃত্ব তথা প্রভাবমুক্ত করা।

> রেনেসাঁ এনে ছিল ব্যাপক জাগরণ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ। রেনেসাঁতে মানবতাবাদের পুনরভ্যুদয় হ'লো। ব্যক্তির মর্যাদা ছিল প্রাচীন সফিস্ট, এপিকিউরান, স্টোইক ও প্রথম পর্যায়ের খ্রিষ্টীয় চিন্তার অন্যতম অঙ্গ। রেনেসাঁতে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনরায় স্বীকৃতি পেলো। মানবতাবাদীগণ শুধু যে প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ফিরিয়ে আন্‌লেন তা নয়– ধর্মীয় ঐতিহ্যকেও মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে বিচার করলেন।... মানুষের জয় মানবতাবাদের জয় : মানুষের জয়ই মানবতাবাদ : আর কিছু নয়। (বসুধা, ১৩৬৭ : ৩১)

ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে মানুষের মূল্যায়ন, বুদ্ধি ও যুক্তির আহ্বান ইতালীয় রেনেসাঁসের ফসল। ইতালীয় দার্শনিকদের বুদ্ধির স্বাধীনতা ও চর্চা এবং আরব পণ্ডিতদের যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা এ রেনেসাঁকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

স্মর্তব্য, তখন গ্রিসের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাদর্শ আরবের দার্শনিকেরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ ও অনুশীলন করেছিল। বাণিজ্য-সূত্রে ইউরোপ ও আরবের যোগাযোগের ফলে দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান-প্রদান হয়। আরব্য দার্শনিক আভিসেনা (৯৮০ খ্রিস্টাব্দ–১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ও আভেরাস (দ্বাদশ শতাব্দী) প্রমুখের মুক্ত চিন্তন প্রক্রিয়া আরব, স্পেন এমনকি ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১১৯৪–১২৫০), রজার বেকন (১২১৪–১২৯৪), ত্রয়োদশ শতকের এ্যালাবার্টস ম্যাগনাস প্রমুখ আরব্য দর্শনবিশ্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হন। এরই ফলস্বরূপ দক্ষিণ ইতালির রেনেসাঁস। ঈশ্বর ভাবনা ও অতিপ্রাকৃত সত্তার বিপরীতে সৃষ্টি হলো বৈজ্ঞানিক চিন্তাসমূহ যা পরবর্তী সময়ে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছু কাল পরে খ্রিস্টীয় সংস্কারচেতনার অংশ হিসেবে বৈরাগ্যবাদ প্রবল আকার ধারণ করলে ইউরোপে নৈতিক অবক্ষয়জনিত সংকট দেখা দেয়। ফলে, পুনরায় মানবতাবাদের উত্থান ঘটে। প্রচলিত খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এর পুনর্জন্ম ঘটে। এ আদর্শকে সনেট-কবি পেত্রার্ক প্রথম সাহিত্যে তুলে ধরেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অগ্রাহ্য করে গড়ে ওঠা এ রেনেসাঁসের চেতনা সমাজ ও জীবনের সর্বস্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তখন রেনেসাঁ-বিরোধী চেতনার জন্ম হয়, বিশেষত জার্মানিতে। জার্মানির অন্যতম চিন্তক ইরেসমাস (১৪৬৬–১৫৩৬) যিনি মানবতাবাদের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সংযোগ স্থাপন করতে চাইলেন। তাঁর মতে, মানবতাবাদ বিদ্রোহ বা বিপ্লব নয়; এর মধ্যে সামঞ্জস্যতার গুণ নিহিত রয়েছে। তিনি ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার সমন্বয় করতে চাইলেন। তৎকালীন ধর্মযাজকগণ এর বিরোধিতা করেন। পরবর্তী সময়ে নিকোলাস কুসেনাস (১৪০১–১৪৬৪), লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯), কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), বেনিডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২–১৬৭৭), জন লক (১৬৩২–১৭০২), জ্যাঁ জ্যাক্স রুশো (১৭১২–১৭৭৮) থমাস পেইন (১৭৩৭–১৮০৯) অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮–১৮৫৭), লুডউইগ ফিউয়েরবাক (১৮০৪–১৮৭২), চার্লস ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২), কার্ল মার্কস (১৮১৮–১৮৮৩), ফ্রেডরিক নীট্‌শে (১৮৪৪–১৯০০), জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫–১৯৮০) সহ অসংখ্য তাত্ত্বিকের চিন্তনবিশ্ব মানবতাবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া, ফরাসি বিপ্লব (১৯১৭) মানবতাবাদের ইতিহাসে মাইলফলকস্বরূপ। এ বিপ্লবের ফলে দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙলো, নারীর প্রতি অসাম্য-অসমঅধিকার ঘুচলো, কর্মের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা প্রদানের সূচনা ঘটলো, মানুষের আচরণ-উচ্চারণ-পোশাক-পরিচ্ছদ তথা চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হলো। এ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানবীয় শক্তির ও আত্মোবোধের উদ্বোধন সূচিত হয়। সর্বোপরি, এ বিপ্লব এনে দেয় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা– যা মানবতাবাদের ধারণা সমৃদ্ধ করে। সংকটাকীর্ণ জীবন ও জগতকে কল্যাণময়, মসৃণ, আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মানবতাবাদীগণ যুগে যুগে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

> মানবতাবাদের দায় ও দায়িত্ব এমন এক রাষ্ট্র ও সমাজ-বিগঠনের পথনির্ধারণ– যাতে সমাজ ও ব্যক্তির, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সমন্বয় ঘটে, এবং রাষ্ট্রও তদনুসারে সমাজে রূপলাভ করে– বস্তুত সুসমন্বিত সমাজশক্তিই রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (বসুধা, ১৩৬৭ : ১৮৫-১৮৬)

বিশেষত, অগাস্ট কোঁৎ-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন, কার্ল মার্কসের `Man is the root of Mankind`, সার্ত্র-এর `Uphold man... as the supreme value`– প্রভৃতি মানবতাবাদের পথ সুদৃঢ় ও প্রশস্ত করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবাদের নতুন ধারা সৃষ্টি করেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তথা মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭–১৯৫৪)। এটি নব্য মানবতাবাদ (new humanism) নামে পরিচিত। মানবতাবাদের এশীয় এ অভিজ্ঞান পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর হাতেই। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও ক্ষমতাশালী দেশগুলো ক্ষান্ত হয়নি। ফলে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধের শঙ্কা ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

> পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার মহাসংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। তখন মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সংকটের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন এবং সংকট ত্রাণের উপায়পদ্ধতির সন্ধান দিলেন। নব মানবতাবাদ মানবসভ্যতার এই সংকট ত্রাণেরই দর্শন। (মানবেন্দ্রনাথ, ১৯৬৩ : ০৩)

বিশ্বময় আধিপত্যকামী শক্তির রোষানল, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট প্রভৃতির ফলে মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে নতুন করে দেখবার ও ভাববার অবকাশ পান। তাঁর ভাবনাবিশ্বে সভ্যতা-প্রাচীন মানবতা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিভাত হয়। তাঁর ভাষ্যে `New Humanism is meant to be a complete system. Based on the ever expanding totality of scientific knowledge, it cannot indeed be a closed system. It will not be a dogmatic system claiming finality and infallibity. It will be a logical integration of the knowledge about the various aspects of existence showing how it is in the nature of man to be rational and moral, and therefore capable of building free harmonious and just social order' (M.N. Roy, 1981 : 10) ধ্বংসোন্মুখ, অমঙ্গল-অবিশ্বাস ও পারমাণবিক আক্রমণের আতঙ্কে শঙ্কিত পৃথিবীকে তিনি মঙ্গলের, আশ্বাসের বাণী শোনালেন মানবিকতার আধারে। আধুনিক সভ্যতার পরিবর্তন-বিবর্তনের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি মানবতাবাদের নিজস্ব ধারার সূচনা করেন। তিনি বলেন:

> Any effort for a reorganization of society must begin from the unit of society. From the root, so to say. Such an effort to develop a new philosophy of revolution, on the

basis of the entire stock of human heritage, and then to elaborate the theory and formulate the principles of the practice of political action and economic reconstruction, therefore, can be called Radicalism. Radicalism thinks in terms neither of nation nor of class; its concern is man; it conceives freedom of the individual. Therefore, it can also be called New Humanism, new, because it is Humanism enriched, reinforced and elaborated by scientific knowledge and social experience gained during the centuries of modern civilization. (M.N. Roy, 1981 : 36−37)

মানবেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ চেতনার অন্তঃস্রোতে বাহিত অসহিষ্ণুতা ও অহমিকা আবিষ্কার করে পরবর্তী সময়ে তিনি আস্থাশীল হন মার্কসবাদী জীবনভাবনায়। প্রৌঢ়ত্বের দাঁড় প্রান্তে এসে মানবেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা ও সত্যানুসন্ধানের আন্তরগরজ থেকে পূর্ববতী ভাবনাসমূহ অতিক্রম করে পরম শান্তি খুঁজে পান মানবিকতার পথে। নব্য মানবতাবাদ তাই কেবল ইতিহাসের বা তত্ত্বাশ্রয়ী জীবন পরিক্রমা নয়; এটি তাঁর চেতনার ক্রম-পরিবর্তনশীল গভীর অনুভবের নাম। মানুষ ও মানবতাই তাঁর শেষ ভিত্তি বা আদর্শ তথা বিশ্বাসে পরিণত হয়।

ব্যক্তিমানুষ মানবজাতির মূল– এ প্রত্যয়ের ওপর নব্য মানবতাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ব্যক্তিকে স্থান দিতে হবে। ব্যক্তি-মানুষ মুক্তি প্রয়াসী, সত্যান্বেষী; যুক্তিবাদী। মানুষের প্রকৃতিগত এ বৈশিষ্ট্য সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি মানুষের প্রকৃতিগত মুক্তির অর্থ ব্যক্তির অন্তর্গত শক্তি বিকশিত হবার অন্তরায়সমূহ বিলুপ্তিকরণ। ব্যক্তির মুক্তি প্রসঙ্গে ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করেন মানবেন্দ্রনাথ: ক) প্রাকৃতিক, খ) সামাজিক ও গ) মানসিক। **প্রথমত,** ব্যক্তি-মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সাহায্যে প্রাকৃতিক বাধাসমূহ জয় করতে সক্ষম হয়। তবে, এটি সকল ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ নানাবিধ কারণে সকল মানুষ শিক্ষার সমান সুযোগ পায় না । **দ্বিতীয়ত,** সমাজস্থ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ব্যক্তিসত্তায় চাপিয়ে দেয়া সমাজসত্তা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষাকাতরতা প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী। এসব বাধা কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিজন-পরিবেশ-পরিস্থিতির স্বচ্ছন্দ, সম্প্রীতিমূলক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের চেতনার অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদিতা ও বুদ্ধিমত্তা মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে এবং ব্যক্তিকে অন্যায়-অধীনতার বিরুদ্ধে সচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলে। **তৃতীয়ত,** ব্যক্তির

স্বভাবজাত বা মনোগত বাধা। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন ব্যক্তির আত্মশক্তির জাগরণ এবং ভাবাবেগসমূহের যথা: ক্রোধ, লোভ, ভয়, সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, প্রেম, লজ্জা, অনুশোচনা প্রভৃতির যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ বাধা অতিক্রম করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বাধা অতিক্রম করলেও ব্যক্তি যদি তৃতীয় বাধা অতিক্রমে সমর্থ না হয়, তবে ব্যক্তির আত্মিক মুক্তি ঘটবে না। এ ত্রিবিধ অন্তরায় অতিক্রমের উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন শিক্ষাকে। শিক্ষা লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি এসকল সংকট কাটিয়ে উঠলে তার সুফল ক্রমান্বয়ে পরিবারে, সমাজে, দেশে সর্বোপরি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। মুক্তিকামী মানবগোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি এক রাষ্ট্র, এক বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত পরিচয় ছাড়িয়ে মানুষের বিশ্বমানবিক পরিচিতিকে গুরুত্ব দেন তিনি। তিনি ব্যক্তির মুক্তিকে সমাজদর্শন ও বিশ্বদর্শনের মূল প্রেরণা হিসেবে বিবেচনা করেন। ধর্মীয় (theocentric) মানবতাবাদের বিপরীতে তিনি এভাবে সৃষ্টি করেন পার্থিব (anthropocentric) মানবতাবাদ। তাঁর মানবতাবাদের ধারণা বিশ্বজনীন।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তির স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করার প্রয়াসী। সমাজস্থ নিচু তলার মানবপ্রবাহ নিয়ে তিনি সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চান। কিন্তু সমাজে তিনি লক্ষ করেন ক্ষমতা উপরের স্তরের কতিপয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত। এর ফলে সমাজ ও জীবন এবং সর্বোপরি মানবতা বিপন্ন হয়। সমবায়ী মনোভাব ও ক্ষমতা কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তিনি এ বিপন্নতা থেকে ব্যক্তি, সমাজ তথা বিশ্বকে মুক্ত করার প্রত্যাশী। এছাড়া তিনি মানুষের মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং ব্যক্তির সৃজনীশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের ওপর গুরুত্বরোপ করেন। শাস্ত্র-আশ্রিত, ধর্মতত্ত্বশাসিত জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির ফলে মানুষ ক্রমশ আশা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষ এসকল সংকট অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে সমাজে-রাষ্ট্রে-বিশ্বে স্থায়ী অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়। তাঁর মতে, যুক্তি মানুষের সাধারণ ধর্ম। যুক্তির মানদণ্ডে তিনি নৈতিকতা বিচার করার কথা বলেন। এ যুক্তির সঙ্গে সহমর্মিতা, সহানুভূতি, ভালোবাসার মিশেল ঘটলে তার অভিযাত্রা মানবমুখী নিঃসন্দেহে।

মানবেন্দ্রনাথের নব্য মানবতাবাদ ২২টি সূত্রে গ্রন্থিত। সূত্রগুলোতে রয়েছে: **১)** জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম প্রভৃতি সমষ্টিসত্তাবাদ খণ্ডন ক'রে ব্যক্তি-মানুষকে সার্বভৌমত্ব প্রদান; **২)** নব মানবতাবাদের গতিবিজ্ঞানের (historiology) প্রসঙ্গ; **৩)** ব্যক্তির মুক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা; **৪)** ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসন্ধান; **৫)** ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান, বিশেষত মার্কসের ইতিহাসের গতিবিজ্ঞানের সার্বভৌমত্ব খণ্ডন; **৬)** ইতিহাসের গতিবিজ্ঞান সূত্রসমূহের অংশবিশেষ; **৭)** কমিউনিজম সোস্যালিজমের অন্তঃসারশূন্যতা উদঘাটন ক'রে

আদর্শ সমাজের প্রকৃত স্বরূপ কী হওয়া উচিত তা বিধৃত হয়েছে; **৮)** সপ্তম সূত্রের অনুসৃতি; **৯)** কমিউনিস্টদের প্রতাপ, স্বৈরাচারী, মনোভাব, সাম্যবাদের নামে মন ভোলানো অর্থনীতির জাল প্রভৃতি; **১০)** কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমালোচনা; **১১)** দশম সূত্রের অনুসৃতি; **১২)** পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি ও লিবারেলিজমের সমালোচনা ও খণ্ডন; **১৩)** দ্বাদশ সূত্রের অনুসৃতি; **১৪)** ব্যক্তি-মানুষের বিকশিত হয়ে উঠবার পথের বাধাসমূহ উল্লেখিত হয়েছে; ত্রুটিমুক্ত রাষ্ট্র ও অর্থ অর্থনীতির উল্লিখিত নতুন প্রকল্প অনুমানের তাগিদ আলোচিত হয়েছে এ সূত্রে। এখানে প্রচলিত রাষ্ট্রসমূহকে উল্টো পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ এসব রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা থাকে মাথায়, প্রতিনিধিদের হাতে; আর তলায় থাকে শূন্য,জনসাধারণের হাতে কিছু থাকে না। প্রতিনিধিরা প্রতিনিধি মাত্রই থাকেন–সার্বভৌমত্ব লাভ করেন না। এ তত্ত্বে রাষ্ট্রকে তাই সিধা পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; **১৫)** বিপ্লব মানেই পুরাতনকে ভেঙে নতুন ভাব ও ভাবনায় উজ্জীবিত হওয়া এবং মুক্ত মানুষের সমবায়ে মুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত; **১৬)** কাঙ্ক্ষিত আমূল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার পদ্ধতি ও কর্মসূচি (methodology) বিধৃত; **১৭)** প্রচলিত অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতকরণ; **১৮)** নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা; **১৯)** মুক্ত মানুষের সমাজ গড়তে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, বিশেষত অনাসক্ত মানুষের প্রচেষ্টা; **২০)** গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কিত; **২১)** সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞতা-পদ্ধতির আলোকে পরিচালিত হবে; সভ্যতার গতিবিজ্ঞানের পুরাতন ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে নিখুঁত গতিবিজ্ঞান রচনা করা; **২২)** এই নব মানবতাবাদ বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মতবাদের মূল প্রত্যয় হলো: এক মুক্তমনা নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ। (স্বদেশরঞ্জন: ১৯৬৩) মূলত, নব্য মানবতাবাদের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তি-মানুষকে সমষ্টিসত্তায় হারিয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে এবং ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত ক'রে মানুষকে স্বয়ংনিয়ন্তা হবার আহবান জানিয়েছেন। এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

উত্তর মানবতাবাদ (posthumanism) মানবতাবাদের আধুনিকোত্তর ধারণা। এটি এমন একটি দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা ঐতিহ্যগত মানবতাবাদী ভাবনাসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশ শতকের শেষের দিকে এবং একবিংশ শতকের শুরুর দিকে বিকশিত হয়ে উত্তর মানবতাবাদের ধারা বর্তমানেও প্রবহমান। এটি দর্শন, শিল্প সাহিত্য, চলচ্চিত্র পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, প্রাণী ও নৈতিকতা, প্রযুক্তি প্রভৃতি আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। ইতালীয় দার্শনিক ও নারীবাদী তাত্ত্বিক রোসি ব্রাইডোত্তি (জন্ম: ১৯৫৪), আমেরিকান পণ্ডিত ডোনা জেনি হারাওয়ে (জন্ম: ১৯৪৪), আমেরিকান সাহিত্য সমালোচক এন. ক্যাথরিন হেইলস (জন্ম: ১৯৪৩), আমেরিকান শিক্ষাবিদ

ক্যারি ওলফ (জন্ম: ১৯৫৯), আমেরিকান শিক্ষাবিদ ফ্রান্সেসকা ফেরান্ডো (জন্ম: ?) ফরাসি দার্শনিক গিলস ডেলিউজ (১৯২৫–১৯৯৫), ফরাসি মনোবিশ্লেষক ফেলিক্স গুয়াত্তারি (১৯৩০–১৯৯২), মিশেল ফুকো (১৯২৬–১৯৮৪), আমেরিকান নারীবাদী জুডিথ বাটলার (জন্ম: ১৯৫৬), আমেরিকান পদার্থবিদ ও নারীবাদী তাত্ত্বিক কারেন বারাড (জন্ম: ১৯৫৬), দার্শনিক উইলিয়াম ডেসমন্ড (জন্ম: ১৯৫১) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক। প্রচলিত মানবতাবাদী ধারা মানুষের সৃষ্টিগত ও প্রজাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপস্থাপনায় মহিমান্বিত। উত্তর মানবতাবাদ এ ধারণার বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত মতাদর্শ। এটি সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান–এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানব-বিষয়ক নতুন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি মানুষ-প্রাণী-প্রকৃতি-প্রযুক্তির মধ্যে আন্তঃসংযোগের সূত্র অন্বেষণ করে। 'The Future of the literary text in the posthuman condition' প্রবন্ধে Samita Mishra বলেন:

> Humanism Was based on exceptionalism. The humans were believed to be the only creation of God blessed with a thinking mind, a reasoning intellect and a power to make sense of the world around them. The human was therefore considered superior to all other living and nonliving things. …Among humans also there was a hierarchy on the basis of gender, and race and colour. Women and the coloured people were not given full status as humans. Posthumanism is a reaction to this exclusiveness of humanism and is born out of a realization that the human self does not live in isolation from or domination over the nonhuman lives and objects. (Samita, 2022 : 72)

জোসেফ ডেভিড ক্লার্কের মতে:

> It has grown into a diverse and influential discipline within the humanities. As a mode of philosophical, critical, and political engagement with our contemporary condition in the twenty-first century, posthumanism analyses our understanding and engagement with other lifeforms and artefacts which are situated within a network of our ontologies. Posthumanism is at times an epistemological investigation into what we call knowledge and how that knowledge is produced. At other times it is an ontological investigation into the practices and processes connected to our humanity, or posthumanity. (Joseph, 2022 : 07)

বাস্তবিক অর্থে, আধুনিক জীবন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। মানুষকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান প্রয়োগ করে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে হয়। বিশ্বায়নের এ পর্যায়ে প্রযুক্তিগত জগৎ ব্যতীত মানুষের সংজ্ঞায়ন আর সম্ভবপর নয়। এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি, সাইবারনেটিক প্রক্রিয়া, রোবট টেলোলজি প্রভৃতির আর

মানুষের লক্ষ্যসমূহ একই বিন্তুতে মিলিত হয়েছে। যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য প্রায় ঘুচে গেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান পরিসর জ্ঞান উৎপাদনের সমস্ত প্রান্তস্পর্শী হয়ে উঠেছে। উত্তর মানবতাবাদ পরিবর্তমান এ সময়ের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে মানুষের শারীরবৃত্তীয় ও মনোজাগতিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে, তা বিশ্লেষণ করে। তবে, এটি অ-মানবীয় দর্শন নয়। রোসি ব্রাইডোত্তির ভাষ্যেঃ

> In other words, to be posthuman does not mean to be indifferent to the humans, or to be de-humanized. On the contrary, it rather implies a new way of combining ethical values with the well-being of an enlarged sense of community, which includes one's territorial or environmental inter-connections. (Rosi, 2013 :190)

প্রচলিত মানবতাবাদী দর্শন মানুষের অস্তিত্বকে গৌরবান্বিত করার ফলে বস্তুবিশ্বের অন্যান্য প্রাণী ও বস্তসমূহ তুচ্ছ তথা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে আধিপত্যপ্রবণ। উত্তর মানবতাবাদীগণ এ ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন এবং মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুর বিভাজন চূর্ণ করে দেন। তাঁরা মানুষকে তার পরিপার্শ্ব এবং পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী ও উপদানসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়; বরং সমন্বিত করে পাঠ করার আহবান জানান। এর ফলে প্রচলিত জ্ঞান; পরিচিতি ধারণাসমূহ পাল্টে গিয়ে সামাজিক গঠনসমূহ, জাতি, লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ক নতুন পাঠ নির্ণীত হয়। তাছাড়া অর্থ ও ক্ষমতার প্রতাপে আধুনিক যুগের মানুষ বনভূমি ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক আক্রমণসহ নানাবিধ উপায়ে বাস্তুতন্ত্রকে বিপন্ন ও বিষাক্ত করে তুলেছে। এর ফলে মানুষ-প্রকৃতি-প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ও সামঞ্জস্যতার সম্পর্ক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এ তত্ত্ব এসবের সমালোচনা করে এবং পরিবেশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ কিংবা বস্তুকণার প্রতি মানবিক দৃকপাতের কথা বলে। সুতরাং বলা যায় মানবতাবাদের ধারণাসমূহের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে এবং মানবতাবাদকে একটি পরিবর্তমান, আন্তঃসম্পর্কীয় ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। মানবতাবাদের আরেকটি আধুনিক ধারা হলো নারীবাদী উত্তর মানবতাবাদ (Feminist Posthumanism)

মানবতাবাদ (Humanism) ও মানব-কেন্দ্রিকতার (anthropocentrism) সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে নারীবাদী উত্তর মানবতাবাদ। এটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক রূপ। 'Four Theses on Posthuman Feminism' Rosi Braidotti বলেনঃ 'From Many Wollstonecraft to Simone de Beauvoir, the political case for women's and other minorities' emancipation has argued along the lines of a notion of eqality that assumes an unproblematic belonging to the same category of humanity. This

position tended to view the natural order as servitude, violence, and brutality : nature as the naturalization of inequities.' (Richard, 2016 : 21)

আধুনিক নারীবাদী চিন্তাধারার এ শাখাটি নববস্তুবাদ (humanism) এবং উত্তর গঠনবাদের (new msaterialism) এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এটি দেহ, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও অমানবিক সত্তার আন্তঃসম্পর্কে গুরুত্ব দেয়। কেবল ভাষা বা সাংস্কৃতিক নির্মাণের মধ্যে এ নারীবাদ আবদ্ধ নয়। এটি রাজনীতিতে নারীসত্তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলো। এটি নারীসহ সকল বস্তু, জীব ও পরিবেশের সামগ্রিক উপাদানের প্রতি ন্যায্যতা ও সহাবস্থানের প্রতি আলোকপাত করে। এ সমতা, ন্যায্যতার জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে, মানুষ হিসেবে 'পুরুষকে' বিবেচনায় নেওয়া- এ চিন্তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রোসি ব্রাইডোত্তি, ডোনা জেনি হারাওয়ে, ক্যঅরেন বারাও, জুলিয়া ক্রিস্টোভা প্রমুখ এ ধারার তাত্ত্বিক। তাঁরা মানবতাবাদকে লিঙ্গ, জাতি, ক্ষমতা ও সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণিবৈষম্যের জন্য দায়ী করে। "Posthuman feminism can be understood on the hand as a response to other contemporary ideas and theories of Posthumanism. ... Feminist Posthumanism, as both asberg, Braidotti, and other argue, explicitly counter this popular version of posthumanism that desires disembodiment and the overcoming of worldly bodily difference." (Astrida, 2017 : 09−10)

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। বর্তমান সয়ে এ নিবিড় সম্পর্ক আরও প্রগাঢ় ও স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। মানুষ ক্রমশ প্রকৃতি-প্রতিবেশ, প্রাণীকুল-জীবজগৎ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু, আনন্দ- বেদনা, অগ্রসরতা-অনগ্রসরতা সমস্ত কিছু পারস্পরিক হয়ে উঠছে। আধুনিক জীবন ও সময়কে নারীবাদী উত্তর মানবতাবাদ এভাবেই ব্যাখ্যা করে।

সর্বোপরি বলা যায়, মানবতাবাদ মানবকেন্দ্রিক দর্শন। এটি মূলত মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সহযাত্রী। সার্বিক বিবেচনায় মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে: **প্রথমত**, মানুষকে মানুষ হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান; **দ্বিতীয়ত**, এ মতাদর্শ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষের; **তৃতীয়ত**, ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি সাধন– যা বৃহৎ পরিসরে পরিবার-সমাজ-দেশ-জাতি তথা সমগ্র বিশ্বের উন্নতি; **চতুর্থত**, যুক্তি-জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা জীবনের সিদ্ধান্তের মাপকাঠি; **পঞ্চমত**, বিদ্বেষ-বিচ্ছেদ কিংবা হানাহানি নয়; সহজ ও আনন্দময় জীবন কাম্য; **ষষ্ঠত**, চিন্তা ও মত

প্রকাশের স্বাধীনতা; **সপ্তমত**, সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা হিসেবে মানুষকে মূল্যায়নের মাধ্যমে কল্যাণকামী সমাজ-রাষ্ট্র তথা পৃথিবী বিনির্মাণ।

প্রাচ্য জীবন প্রতিবেশ মানবতাবাদের আজন্ম সঙ্গী। প্রাচ্য জীবন ও সংস্কৃতিতে ভেদাভেদ নীতির বিপরীতে সমগ্র মানবপ্রবাহ অখণ্ড সত্তা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, হিন্দু দর্শন প্রভৃতি প্রাচ্য মানবতাবাদী দর্শনসমূহে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সমতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে মানুষকে মূল্যায়ন, প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক এবং ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ও আত্মজাগরণ সূত্রে মানবীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় চার্বাক দর্শনে মানুষের জাগতিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে মুখ্য বিবেচনায়, ব্যক্তি হিসেবে মানুষের চাহিদা ও স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করা হয়। মানবতাবাদের সন্ধান মেলে বৈদিক যুগে দেব-দেবীকেন্দ্রিক বন্দনার বিপরীতে মানবের জয়গান গাওয়াতে, উপনিষদে মানুষকে উচ্চমার্গ প্রদানে, রামায়ণ-মহাভারত ও ভগবদগীতায় মানবের উপস্থাপনায়। গৌতম বুদ্ধের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩) দর্শনে জীবের মুক্তি মানুষের সম্ভাবনাকে শনাক্ত করে। তাঁর দর্শনের কাব্যিক যেন চণ্ডীদাসের (আনুমানিক ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দ- আনুমানিক ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ) কণ্ঠে– 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' অধ্যাত্মবাদের প্রভাব কাটিয়ে মানবসম্প্রীতির বাণীতে স্নাত হয়েছে লালনের (১৭৭৪-১৮৯০) দর্শনবিশ্ব। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০০৫ সালে লালনের দর্শনকে তাই `A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity` হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। মূলত মানবতাবাদের বিকল্প নেই। 'কোনো রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজজীবনেও এর থেকে বড় আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না।' (আবুল ২০১৬ : ১৮) এ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কবি- সাহিত্যিকগণ সমাজের সবচেয়ে 'নিচুতলা'র মানুষকেও সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন। 'মেথর' কবিতায় কবি মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন:

> কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য-অশুচি?
> শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
> তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
> নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে। (অলোক ২০০১ : ৯৪)

আবার, মানবতাবাদে উজ্জীবিত বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬–১৯৭৮) মানবেতর জীবনের স্বরূপ তুলে আনেন মমতা-মিশ্রিত জীবনদৃষ্টি নিয়ে:

নিখরচার লঙ্গরখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো– *ফ্রি কিচেন*। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্য থেকে জনৈক ভিখারিনির তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অজানা শঙ্কায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁক হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃদ্ধ ভিখারি তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখে। (বিজন, ২০১৪ : ৯০)

নবান্ন (১৯৪৪) নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের এ মঞ্চনির্দেশনার নেপথ্যে নাট্যকারের মানবতাবাদী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় নিহিত। যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা মানবতার বাণী লিপিবদ্ধ করার দায় অনুভব করেন। *কালবেলা* (১৯৬২) নাটকের মেয়েটির কণ্ঠে নাট্যকার সাঈদ আহমদ (১৯৩১–২০১০) সে-বাণী তুলে ধরেন:

আসছে, ঐ সে আসছে। ঐ সে আসছে। আমি তোমাদের বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা। [খিল খিল হাসি এবং পরে কান্না।] (হাসনাত, ২০১২ : ১৫)

আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় জীবনের ভয়াল কালবেলায় মনুষ্যত্বের ছায়াতলে আশ্রয় নেন নাট্যকার। কখনও কখনও কাব্যনাট্যকারগণ মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় প্রতিভাত করেন। সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষায়* কাব্যনাট্যে ঈর্ষা একইসঙ্গে মানবিক ও পাশবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর ভাষ্যে: 'তিনটি চরিত্র আর তাঁদের দীর্ঘ সাতটি সংলাপে বয়ন করা হয়েছে এই নাটকের বস্ত্র; প্রচল বহির্ভূত এই করণ বিষয়টির তুলনায় বেশি কৌতূহলের বলে মনে হতে পারে, এমনকি এর পাণ্ডুলিপি কালে কারো কারো মনে হয়েছে; তাই এখানেই বলে রাখা দরকার, যে, কোনো চমক সৃষ্টির জন্যে নাটকের এ হেন রূপ আমি নির্মাণ করিনি; ঈর্ষার বিশুদ্ধ একটি মানবিক পরিস্থিতিই আমাকে ঠেলে দিয়েছে চরিত্র-সংখ্যা অন্তিম অবধি কমিয়ে রাখবার এবং অন্তর্মুখী দীর্ঘ সংলাপ বাঁধবার দিকে।' (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৩১০) চরিত্রত্রয়ের দীর্ঘ সংলাপ কাব্যনাট্যকারের মানবীয় জীবনবোধ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যুবতী চরিত্রের সংলাপে:

মানুষ অদ্ভুত জন্তু– নিজেকেই তৈরী করে, নিজেকেই ভাঙে–
এক হাত ভাঙে আর অন্য হাত ভাবে, ভাঙছে না, আসলে গড়ছে।
হয়ত ব্যাপারটা এ রকম যে, গড়া আর ভাঙা একই কথা–
অটুট কিছুই নয়, সমস্তই হবে ক্ষয়;
ক্ষয় থেকে পূর্ণিমার আবার উদয়;
ভাঙার ভেতর দিয়ে গড়বার দিকে যেতে হয়,

আবার গড়বার মধ্যে ভাঙনের চোরাস্রোত বয়। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৩৫৬)

জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, উত্থান-পতন এবং এরই মধ্যে জীবনকে যাপন করার আনন্দ ও বেদনাকে কাব্যনাট্যকার বাঙ্ময় করে তুললেন এখানে। ধ্বংস আর অভিনতুন নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা জীবনের সারথি যেন প্রতিটি মানবসত্তা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহে সমগ্রতলস্পর্শী মানবভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪) কাব্যনাট্যে সমাজ-সংসার থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে আড়াল করে রাখা গুহাবাসী সন্ন্যাসীর অন্তর্লোক সামান্য বালিকার সান্নিধ্য-সূত্রে আলোকিত হয় মানবতার বোধে; *রাজা ও রানী* (১৮৮৯)– কাব্যনাট্যে তে বিধৃত হয়েছে যে, যে-প্রেম মানবের প্রতি দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিসত্তাকে ভুলিয়ে রাখে, সে-প্রেম খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী; *বিসর্জন* (১৮৯০) কাব্যনাট্য-আখ্যানে শাস্ত্রীয় ও প্রচলিত বলি প্রথার বাণী নয়, বরং কেন্দ্রস্থ সত্যে স্থাপিত হয়েছে মানবীয় বোধ। একইভাবে, বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যসমূহেও মানবতার সূত্রসমূহ স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। পুরাণের ঘটনা বা চরিত্রের এবং আধুনিক মানবমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম, যন্ত্রণা প্রভৃতি বুদ্ধদেবের দার্শনিক অনুধ্যানের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত শেষপর্যন্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্যে সুস্থিত হয়েছে। তাই, তাঁর সৃষ্ট কাহিনি বা চরিত্রসমূহ আমাদের নিকট দূর অতীতের পুরাণকথা হিসেবে নয়, বরং সমযুগীয় হয়ে ধরা দেয়।

২. উত্তর-উপনিবেশবাদী পাঠ (post-colonial reading)

সময়-উত্থিত দ্বন্দ্ব ও অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশের সময়ের মানুষ। তবে ফল্গুধারার মতো উপনিবেশ ভাঙার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস নিবিড়ভাবে প্রোথিত ছিল রবীন্দ্র মননে। উপনিবেশিত সমাজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-মানসের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে তাই সুচিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোগল্পে ঔপনিবেশিক গ্রামজীবনের চিত্র অঙ্কনে, উপন্যাসশিল্পে জাতীয়তাবাদ, স্বদেশি আন্দোলনের রূপ উন্মোচনে এমনকি প্রবন্ধশিল্পে ঔপনিবেশিকতার কঠোর সমালোচনা করেও অতৃপ্তি অনুভব করলেন যেন। ঔপনিবেশিক সময়ে বিক্ষুব্ধ, রূপান্তরশীল ব্যক্তি-মানসের সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনে তিনি কবিতা ও নাটকের সমবায়ী এক নতুন শিল্পপ্রকরণ নির্মাণ করেন। কাব্যনাট্য হল সেই অভিনব শিল্পপ্রকরণ।

অন্যদিকে, বিশ শতকীয় জীবনে ও বোধে ঔপনিবেশিকতার প্রতাপ ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এ শতকের দুটি মহাযুদ্ধ জন্ম দেয় অনিকেতবোধ, হতাশা, উৎকেন্দ্রিকতা। অপরদিকে আধুনিকবাদী জীবনদৃষ্টি বিশ শতকীয় সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন আনে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও অনিকেতচেতনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে পুরাণের জগতের প্রতি। আধুনিক জীবনবোধ, মানসতা, দ্বন্দ্ব-সংকুলতা, ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতা ও স্বকীয় দার্শনিক অনুধ্যানের জগৎ বুদ্ধদেব পুরাণের আশ্রয়ে কাব্যনাট্যের ফর্মে তুলে আনেন। কাব্যনাট্যসমূহে তিনি প্রাচীন মিথকথাকে নিজস্ব দর্শনভাবনার অনুপ্রেরণায় রূপান্তর ঘটান। কাব্যনাট্যের রূপকল্পে বিনির্মাণধর্মী নন্দনচেতনা সৃজনে তাঁর পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য। আধুনিক যান্ত্রিক, অবক্ষয়ী ও অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার বিপরীত বয়ান সৃজনে তিনি বিচরণ করেন পুরাণরাজ্যে। মানবজীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে সমীকৃত করে তিনি বর্তমান সময়ের সংকটের মীমাংসা-সূত্র অন্বেষণ করেন। তাঁর চেতনার এ প্রান্তটি উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যভাবনা দিয়ে ব্যাখ্যাত ও মূল্যায়িত হবার অবকাশ রয়েছে। তাঁর দার্শনিক অনুধ্যানের জগৎ মিথকথার আশ্রয়ে সুস্থিত হয়ে অভিনতুন ব্যঞ্জনা মাত্রা লাভ করে। তাঁর কাব্যনাট্যের আলোকে ঔপনিবেশিকতার চাপে রুদ্ধশ্বাস সমাজ ও জীবনের ভিন্ন ও উপনিবেশোত্তর পাঠ নির্ণয় করা যায়।

আধিপত্য মানসিকতাপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী (imperialism) তত্ত্বদর্শনের ওপর ভিত্তি করে উপনিবেশবাদ (colonialism) গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় আধিপত্য প্রবণতা বিশ্বকে দুটি রেখায় বিভাজিত করেছে: শাসক-শাসিত, পূর্ব-পশ্চিম, কেন্দ্র-প্রান্ত, সাদা-কালোসহ এমন যুগ্ম বৈপরীত্যের প্রথম অংশ ইউরো-কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় অংশ পৃথিবীর বাকি অংশকে নির্দেশ করে। 'ইয়োরো-কলোনিয়ালিজম প্রায় চারশ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পরাধীন রাষ্ট্রগুলোতে সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও মানসিকভাবে শোষণের পাশাপাশি তাদের সম্ভাবনাকে অবদমিত করেছে।' (বেগম আকতার ২০১৪ : ১৯০) উপনিবেশিক শক্তির অধীনতা থেকে কোনো দেশ বা ভূ-খণ্ডের মুক্তি লাভ, বিশেষত রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে বি-উপনিবেশীকরণ (decolonization) বলে। এতে উপনিবেশবাদের প্রকৃত অবলুপ্তি ঘটে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি লাভের পরবর্তী সময়কে ইতিহাসবেত্তাগণ উত্তর-উপনিবেশিক (post-colonial) সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ ধারণার সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে।

> Post-colonialism (or often Post colonialism) deals with the effects of colonization on cultures and societies. … Although the study of the controlling power of representation in colonized societies had begun in the late 1970s with texts such as Said's Orientalism, and led to the development of what came to be called colonialist discourse theory in the work

of critics such as spivak and Bhaba, the actual term `Post-Colonial` was not employed in these early studies of the power of colonialist discourse to shape and form opinion and policy in the colonies and metropolis. Spivak, for example, first used the term `Post-colonial`, in the collection of interviews and recollections published in 1990 called the post-colonial critic. (Bill, Grareth and Helen, 2007 : 168)

উপনিবেশের সৃষ্ট নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে উপনিবেশিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন বিধ্বস্ত হয়। 'তবু অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলোর মতো উপনিবেশিক শোষণের প্রতিস্পর্ধী উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জেগে ওঠে, জেগে থাকেও।... কীভাবে উপনিবেশোত্তর চেতনা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য শেকল ভেঙে ফেলছে, তারই প্রতিবেদন সামাজিক ও নান্দনিক ইতিহাসে গড়ে উঠছে অহরহ। ... সাহিত্যে-সঙ্গীতে-ছবিতে-ভাস্কর্যে নতুন দৃষ্টির উদ্ভাসন হয়ে চলেছে; উপনিবেশের করাল গ্রাসে নিঃসাড়-হয়ে-যাওয়া মনের খোলনলচে পাল্টে দিয়ে জেগে উঠছে নতুন অঙ্কুর।' (তপোধীর, ২০০৭ : ১৩৮) 'নলেজ' ও 'পাওয়ার'-এর অতিকেন্দ্রিকতার ফলে উপনিবেশিক শক্তির নিগড় শক্তিশালী ছিল। উপনিবেশের সৃষ্ট শৃঙ্খল, বয়ান সবই উপনিবেশিতরা বিশ্বাস করতে শুরু করে। সর্বগ্রাসী চাপ ও প্রতাপ নিয়ে উপনিবেশিকতার আবির্ভাব এবং জন্মলগ্নেই এর ভাঙনের সূচনা। উপনিবেশিক যুগের অবসানে গভীর ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ (post-colonialism) এর উদ্ভব ঘটে। ব্রিটিশ উপনিবেশের সংঘাত ও সংস্পর্শে এর জন্ম। 'ফলে এটা সাধারণ কোনো শব্দ নয়, এর মধ্যে রয়েছে অন্তর্গূঢ় সুগভীর আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাত্রা।' (বেগম আকতার ২০১৪ : ২০৫)

বিশ শতকের আশির দশকে এ প্রত্যয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুরুর দিকে এটি কালসূচক প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি চেতনাসূচক ও অনুভূতিসূচক এবং বৌদ্ধিক প্রত্যয়ে পরিণত হয়। এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫–২০০৩), হোমি ভাবা (১৯০৯–১৯৬৬), গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪২), ফ্রানজ ফ্যানন (১৯২৫–২৯৬১), হেনরি লুই গেট্স (জন্ম ১৯৫০), রণজিৎ গুহ (১৯২৩–২০২৩) প্রমুখের চিন্তাদর্শ এ সাহিত্য মতবাদকে পরিপুষ্ট প্রদান করে। এডওয়ার্ড সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) গ্রন্থের মাধ্যমে উত্তর-উপনিবেশবাদের সূচনা ঘটে। মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার বিপরীতে– 'উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী ও বিনির্মাণপন্থী। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে-সমাজের নানা ক্ষেত্রে উপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্যপ্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে, তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দ্যের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য।' (তপোধীর, ২০০৭ : ১৪১) হোমি ভাবা মনে করেন:

> Postcolonial Criticism bears witness to the unequal and uneven forces of culture representation involved in the contest for political and social authority within the modern world order. (Homi, 1994 : 171)

উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশের অভ্যস্ততার জগৎ ভেঙে নতুন জগৎ, নতুন বয়ান, নতুন কাঠামো নির্মাণে আগ্রহী। উপনিবেশের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মূলোৎপাটনে দৃঢ় প্রচেষ্টা এবং বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ আবশ্যক। পাশ্চাত্যের সৃষ্ট বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে ফ্রানজ ফ্যাননের আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ যেন এরই প্রতিধ্বনি:

> I, the man of color, want only this: That the tool never possess the man. That is, of one by another. That is be possible for me to discover and to love man, wherever he may be. ...My final Prayer: O my body, make of me always a man who questions!' (Lam 1986 : 231−232)

তাঁর এ প্রার্থনা সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িতের মর্মবাণী যেন। ফলত, নিরুদ্ধ, প্রান্তিক, নিরুচ্চার মানব প্রবাহ উপনিবেশের খোলস থেকে মুক্তি পেতে সোচ্চার হয়। উপনিবেশের সৃষ্ট পরিচিতি ও পূর্ব পরিচিতি এ দুয়ের দোটানায় উপনিবেশিত সংকর পরিচয়ের (hybrid identity) সংকটে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। উপনিবেশের সৃষ্ট `other` থেকে তারা `we`-তে রূপান্তরিত হয়। মূলত `European imperialism indeed developed European opposition.' (Edward, 1994 :166) তাছাড়া কেবল অর্থনীতির মানদণ্ডে উপনিবেশের খণ্ডিত বা আংশিক প্রভাব নিরূপিত হয়। উপনিবেশের ক্ষমতাকাঠামোয় পিষ্ট হয় উপনিবেশিতের সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক পরিসর। মূলত, ঔপনিবেশিকতা অন্তর্মূলে অভিঘাত হানে।

> Colonialism imposed its control of the social production of wealth through military conquest and subsequent political dictatorship. But its most important area of domination was the mental universe of the colonised, the control, through culture, of how people perceived themselves and their relationship-to the world. Economic and political control can, never be complete or effective without mental control. To control a people's culture is to control their tools of self-definition in relationship to others. For colonialism this involved two aspects of the same process: the destruction or. the deliberate undervaluing of a people's culture, their art, dances, religions, history, geography, education, orature and literature, and the conscious elevation of the language of the coloniser. The domination of a people's language by the languages of the colonising nations was crucial to the domination of the mental universe of the colonised. (Ngugi, 1994 :16)

বিশ্বায়ন, উন্নয়ন, মহাকাশ বিজয়ের নামে বিশ্বময় নয়া উপনিবেশবাদের (neo-colonization) দুর্ভেদ্য জাল ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ। ঔপনিবেশিক শক্তি যখন প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে, তখন এর বিরুদ্ধে মূল্যবোধ আরও শাণিত, সংহত ও প্রত্যয়নিষ্ঠ হচ্ছে– যা নতুন জীবনাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। নতুন সম্ভাবনার পথ হবে বিমানবিকতা থেকে মানবিকতায়, অধীনতা থেকে স্বাধীনতায়, নিরুত্তাপ থেকে উত্তাপে। মূলত 'উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং উপনিবেশের প্রভাব নির্বীজ করার লক্ষ্যে উদ্ভূত সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা ও আন্দোলন।... চরিত্রের দিক থেকে এটি একটি পাল্টা জ্ঞানভাষ্য (counter discourse)।' (ফয়েজ, ২০১৪ : ১১) উপনিবেশী জ্ঞান, আদর্শ ও বিন্যাস প্রক্রিয়ার বিপরীতে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ তাই সুস্পষ্ট চারিত্র্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: **প্রথমত**, উপনিবেশের বিরুদ্ধে এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন; **দ্বিতীয়ত**, এটি আত্মপরিচয় সংকট ও হীনমন্যতার বিপরীতে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, বলিষ্ঠতা ও আত্মমর্যাদার কথা বলে; **তৃতীয়ত**, এটি বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উপনিবেশ পরবর্তী রাজনৈতিক-সামাজিক-সাস্কৃতিক-অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করে; **চতুর্থত**, এটি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতমুখী: এখানে প্রাচ্য মুখ্য, পাশ্চাত্য গৌণ; **পঞ্চমত**, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুগত-অবস্তুগত সম্পদ ও সাফল্যে মানুষের সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চিতের প্রতি এটি আলোকপাত করে; **ষষ্ঠত**, উপনিবেশকালে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, মতাদর্শ ও ধারণার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন জীবনব্যবস্থা নির্মাণের আহবান জানায়; **সপ্তমত**, শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরে প্রতিরোধী ও প্রতিবাদী জীবন-কাঠামোর কথা বলে; **অষ্টমত**, নারীর যথাযথ ও সমুন্নত অবস্থান নিশ্চিত করা; **নবমত**, ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতধর্মী ভাষাকাঠামো নির্মাণ করা; **দশমত,** উপনিবেশের ফলে সৃষ্ট উন্মূলিত মানবপ্রবাহের সত্তাকেন্দ্রিক সংকট সুচিহ্নিত করা; **একাদশত**, অপরতার বোধ (otherness) থেকে জাতিকে আমার বোধে (we) উন্নীত করার প্রয়াস; **দ্বাদশত**, ঔপনিবেশিক সময়পটে এ মতাদর্শ তাই সর্বোতভাবে শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের উত্থান কামনা করে; **ত্রয়োদশত**, সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং তা ক্রমে গণ-বিপ্লবে রূপান্তরিত করা; **চতুর্দশত**, স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা জোরদার করা; **পঞ্চদশত**, দেশীয় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সৃষ্টি করা প্রভৃতি।

ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে বাংলা সাহিত্যে জনসংস্কৃতি ও জনমানসের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। একই সঙ্গে বদল ঘটে ভাবের ও ভাষার। ঔপনিবেশিকতার দমন-পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে বাঙালি সাহিত্যিকগণ ইউরোপ-শাসিত সাহিত্যরুচির বিকল্প বিষয় ও প্রকরণাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। উপনিবেশ নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বাঙালির প্রকৃত অস্তিত্বকে সংকীর্ণ করে– এ বোধে তাড়িত হয়ে তাঁরা নিজস্ব জীবনভাবনা অনুসন্ধান করেন। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার বৈচিত্র্যময় প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। বিকল্প প্রকরণ, স্বর-স্বভাব ও বিন্যাসের

সূত্রে বাংলা সাহিত্যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা সন্নিবেশিত হয়। উপনিবেশিত বাঙালি জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার বিপরীতে গ্রামজীবনের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে শিল্পীসত্তায় ধারণ করেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩–১৯৭৬)। অপরদিকে, ঔপনিবেশিক সময়পটের বিপরীতে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪) নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্য বেছে নেন। এছাড়া:

> নাটকেও উপনিবেশোত্তর চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ করি নাট্যকার ও পরিচালকদের প্রাকৃতায়নে, বিকল্প বাস্তব ও বিকল্প নাট্য গ্রন্থনার সন্ধানে। আর, সেই সঙ্গে বিকেন্দ্রায়নের প্রবণতায় পরনির্ভরতা কেটে যাচ্ছে। নাটকে সময় ও সমাজের দেশজ রূপ খোঁজার ক্ষেত্রে দ্বিধা নেই বলে দর্শকও হয়ে উঠছেন নাট্যকৃতি গ্রন্থনার সহযোগী। (তপোধীর, ২০০৭ : ১৬৩)

উদাহরণস্বরূপ: বাদল সরকারের (১৯২৫–২০১১) *বাকি ইতিহাস* (১৯৬০) নাটকের সীতানাথ ও শরদিন্দুর সংলাপে বিশ্বময় উপনিবেশের সৃষ্ট সংকটের স্বরূপ উঠে এসেছে এভাবে:

> সীতানাথ: হ্যাঁ, বাকি ইতিহাস। পরীক্ষা নয়। চাকরি নয়। কণা নয়। বাসন্তী নয়। বাকি ইতিহাস! দাঙ্গার ইতিহাস! মহাযুদ্ধের ইতিহাস! রাশি রাশি বছরের হত্যা নির্যাতন যন্ত্রণার ইতিহাস! কুরু-পাণ্ডব সিকন্দর নীরো চেঙ্গিস খা নেপোলিয়ন হিটলারের ইতিহাস। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলোসিয়মের বালিতে, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোশিমার পোড়া মাটিতে লেখা রয়েছে। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস!... তুমি কিছু করতে পারো না। আমি কিছু করতে পারিনি। কারো কিছু করবার নেই। নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ–সব কিছু চলবে, সব কিছু মানুষই করবে– তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু'বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এরা সবাই মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো। এরা সবাই জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।
>
> শরদিন্দু: তবু তো বাঁচছে?
>
> সীতানাথ: বাঁচবার ভান করছে। ...
>
> শরদিন্দু: না, এ হয় না! এ হতে পারে না! ইতিহাসের আর একটা দিক আছে! যুদ্ধের ও পিঠে শান্তি আছে! নির্যাতনের ও পিঠে ভালোবাসা আছে! ... (বাদল, ১৪২০ : ৯৩–৯৪)

একইভাবে, সাঈদ আহমদের *তৃষ্ণায়* (১৯৬৪–৬৬ সালের মধ্যে লেখা) নাটকে শোষণের রূপকধর্মী উপস্থাপনা লক্ষণীয়। গাধা চরিত্রের সংলাপে:

... হাজার বার বলেছি বাবা রাক্ষসের মতো এত খেয়ো না। একেবারে সহ্য করতে পারবে না, বিশেষত এই জঙ্গলে আর বেশি খাবার নেই। জান তো আমরা ফাঁদে পড়েছি। মানবসন্তানেরা ব্যূহ ভেদ করে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। যত ইচ্ছা জমি নিজেদের কব্জায় করে নিচ্ছে। ...এইত কেবল সেদিন, এক মাকড়সা এক পিঁপড়ে খেলো। সেই মাকড়সাকে বিড়াল খেলো, বিড়ালটাকে কুকুর খেলো, আর কুকুর গেলো হায়নার মুখে, সর্বশেষে হায়না সাবাড় হলো বিরাট এক বাঘের পেটে। (সাঈদ, ২০১২ : ৮৫)

রবীন্দ্র-কাব্যনাট্যসমূহের মাধ্যমে বাঙালির আত্মিক জাগরণ, স্বশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। উপনিবেশের সৃষ্ট সমাজ কাঠামোর বিপরীতে সমাজ পুনর্গঠন চিন্তার চিহ্ন তাঁর প্রায় প্রতিটি কাব্যনাট্যে স্পষ্ট। কলোনিশাসিত সমাজপটে নারীর জাগরণ, নারীশক্তির উদ্বোধন, 'রাজা'-র সমাজ সম্পৃক্ততাকে অনিবার্য বিবেচনা করেন তিনি। ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীর আরও সুদৃঢ় অবস্থান সুনিশ্চিত করতে চান কাব্যনাট্যের ফর্মে: কাব্যনাট্যসমূহের নারী চরিত্রের (*প্রকৃতির প্রতিশোধ*-এর বালিকা, *বিসর্জন*-এর অর্পণা, *রক্তকরবী*-এর নন্দিনী কিংবা *মালিনী*-এর মালিনী) প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সত্য প্রতীয়মান হয়। প্রসঙ্গত, *রক্তকরবী* (১৯২৬) নন্দিনী ও স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব গ্রহণ করা রাজার কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো:

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপা কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে। (রবীন্দ্র ১৪০৬ : ৭৭)

রাজার মূল দায়িত্ব রাজ্যের ও প্রজার সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। এ কাব্যনাট্যের রাজা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। মূল দায়িত্ব থেকে রাজা নিজেকে বিবিক্ত রেখে আত্মনির্মোকের মধ্যে স্বেচ্ছা বন্দিত্ব গ্রহণ করে, যা মানবীয় বোধের বিচ্যুতি ঘটায়। অপরদিকে, রাজা চরিত্রের মৌলস্বভাবে সমস্তকিছু দখল বা কুক্ষিগত করবার প্রবণতা নন্দিনীর 'চাঁপা কলির মতো আঙুলটি'র কাছে পরাজিত হয়। নন্দিনী যক্ষপুরীর অন্ধকার কুঠুরিতে জ্বলে ওঠা আলো। রাঙা আলো মশাল নিয়ে নন্দিনী মুক্তির বাণী প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করে যেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা তাই এখানে ঔপনিবেশিক সমাজের প্রতীকী চরিত্র আর নন্দিনী সেই প্রবল প্রতাপশালী ঔপনিবেশিক সমাজের ভাঙনের আয়ুধ।

উপনিবেশোত্তর সময়ে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথকথাকে কাব্যনাট্যসমূহের আয়ুধ হিসেবে গ্রহণ করেন বুদ্ধদেব বসু। কাব্যনাট্য *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৮) কাব্যনাট্যে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরুণী বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর সাক্ষাৎ নাট্য-

আখ্যানের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত, যা উভয়কে নতুন বোধ ও আস্বাদে উজ্জীবিত করে। তপস্বীর আশ্রম থেকে ফিরে এসে তরঙ্গিণী বেশবাসে উদাসী, যত্নহীন এবং সমাজ-নির্ধারিত পরিচয়ে অতৃপ্ত। মাতা লোলাপাঙ্গীর নিকট পিতৃপরিচয় সম্পর্কে জানতে চায়, চন্দ্রকেতুর সান্নিধ্যে তার অনাগ্রহ দেখা দেয়:

> **তরঙ্গিণী**। চন্দ্রকেতু, সত্যি বলো– আমি রূপবতী? (*চন্দ্রকেতুর কাছে এগিয়ে এসে*) দ্যাখো– নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি তা দেখতে পাচ্ছো? (*লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুকে ইঙ্গিত করলে*) আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো–আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি– আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো? ... চন্দ্রকেতু, তুমি কাব্য পড়েছো! তুমি বিদগ্ধ, তুমি সজ্জন। কিন্তু আমি যা চাই তা কি তুমি দিতে পারবে? আমি চাই আনন্দ–প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ– প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখোনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫১-৫২)

ঋষ্যশৃঙ্গের সান্নিধ্যে তরঙ্গিণীর আত্মজাগরণ ঘটে, বারাঙ্গনা থেকে প্রণয়িণীতে রূপান্তরিত হয় সে। তরঙ্গিণীর মতো ঋষ্যশৃঙ্গও মানবিক বোধ ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উভয়ের আন্তরধর্মে পরিবর্তন ঘটে। সর্বব্যাপী প্রেমের অনুভবে তারা আধুনিক মানবে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পুরাণাংশকে আধুনিক জীবনের আলোয় নবরূপে সৃষ্টি করেন বুদ্ধদেব বসু। নারীর আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠায় উপনিবেশোত্তর সমাজ অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়ক বিবেচনা করেন তিনি। তাঁর *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) কাব্যনাট্যে শূদ্র নারী অঙ্গনা প্রেমে, স্নেহে, বিনয়ে ও মাতৃগৌরবে অনন্য হয়ে ওঠে। মূলত আত্মবোধ উত্তীর্ণ মানবিক চেতনা এবং আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা লালিত অভিনব বোধ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের বিশেষত্ব নির্দেশ করে।

উপরি-উক্ত শিল্প-মতবাদের সঙ্গে বর্তমান গবেষণায় সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে অভিনেতা-নেটওয়ার্ক তত্ত্ব (actor-network theory)। কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়নের সূত্রে কাব্যনাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ বা তাঁর গৃহীত উপকরণসমূহ কাব্যনাট্যকারের সঙ্গে কতটা সংশ্লিষ্ট হয়ে ওঠে, কিংবা কতটা নিয়ন্ত্রিত হয় তা এ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সমাজ অধ্যয়নের সূত্রে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন হিসেবে ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে উদ্ভব ঘটে অভিনেতা-নেটওয়ার্ক তত্ত্বের। 'A key feature of actor-network theory is its agnosticism to the nature of the things, people, principles etc., that contribute to the actant's makeup and agency ... Indeed, nonhumans. (Probable the theory's signature notion) also make a

difference, and ANT gives credit to my being, irrespective of its nature. that has an effect in the situation under study. (Nicolas, 2017 : 03)

এটি মানব-অমানব, সামাজিক-প্রযুক্তিক সমস্ত বিষয়কে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। এ তত্ত্ব মতে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের সমস্তকিছু ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এ তত্ত্ব বিশ্বাস করে এ সম্পর্কের বাইরে কিছু নেই। এতে সামাজিক পরিস্থিতি তৈরিতে বস্তু, ধারণা, প্রক্রিয়া, জীবজগৎ সমস্তকিছুকে গুরুত্ব দেয়। এ তত্ত্ব মতে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপই জগতের প্রধান বিষয়। সামাজিক ও প্রাকৃতিক স্তরের সত্তাসমূহ। উপাদানসমূহ কীভাবে অভিনয়ে মিথস্ক্রিয়া ঘটায়- এটি তা বিশ্লেষণ করে। এখানে অভিনেতা কেবল মানুষ নয়; যেকোনো প্রাণী, সত্তা, বস্তু, ধারণাকে বোঝায়। 'Actor- network Theory is an approach emphasizing that the capacity to Produce effects, that is, agency, is not a properly of certain bounded entities such as humans, but instead an emergent, relation, property of a network of actants, both human and nonhuman. (Dragos, 2024 : 01) ব্রুনো ল্যাটোর (১৯৪৭–২০২২), জন ল (১৬৭১–১৭২৯), মাইকেল ক্যালন (জন্ম ১৯৪৫) প্রমুখের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অধ্যয়নের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে এ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন দার্শনিক মিশেল সেরেস (১৯৩০–২০১৯), আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী হ্যারল্ড গার্ফিনকেল (১৯১৭–২০১১), মিশেল ফুকো (১৯২৬–১৯৮৪), সমাজবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল টার্ডে (১৮৪৩–১৯০৪) প্রমুখের চিন্তাদর্শ দ্বারা।

মানুষ, বস্তু, প্রাণী কিংবা ধারণাসমূহ চলমান এবং জটিল নেটওয়ার্ক বা সংযোগ তৈরি করে। প্রাণী, উদ্ভিদ, ভূতত্ত্ব, যন্ত্র অর্থনৈতিক পণ্য, বস্তুগত কাঠামো, প্রাকৃতিক ঘটনা, পরিবহন কাঠামো, পাঠ সমস্ত কিছু নেটওয়ার্কের আওতায় অভিনেতার মর্যাদা লাভ করে। নির্দিষ্ট অভিনেতার সঙ্গে পরিপার্শ্বের সম্পর্কগুলো জটিল জাল (Network) তৈরি করে। এ সম্পর্ক-জাল ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে নতুনত্ব লাভ করে। অভিনেতা-নেটওয়ার্কসমূহ অসীম সংযোগ জালে গ্রন্থিত থাকে। এটি সামাজিক ঘটনাবলিতে মানুষের কার্যকলাপকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না; বরং মনে করে মানুষ-বস্তু-ধারণার এক নতুন ও জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফল। প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের চেয়ে এখানে মানুষের কার্যকলাপ নতুনরূপে মানব-অমানবীয় উপাদানের সমন্বয়ে বিবেচিত হয়। মানবীয় ও বস্তুগত নেটওয়ার্কগুলো একত্রিত হয়ে কীভাবে সামগ্রিকভাবে কার্যকলাপ সংগঠিত করে; কোনো কিছুর গঠনে সমগ্রতা আনে এটি তা বিশ্লেষণ করে। এক্ষেত্রে সম্পর্কগুলো বারংবার সম্পাদিত হতে থাকে; নয়তো নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ে। মানুষ বস্তুবিশ্বের ও

প্রকৃতিজগতের অন্যান্য উপাদানকে নির্জীব হিসেবে বিবেচনা করে যা এ তত্ত্বের মানবতাবিরোধী দিক। এটি এমন একটি তত্ত্ব যার ক্ষমতার উৎস হিসেবে মানুষের মতো নির্দিষ্ট সত্তায় সীমায়িত নয়। এটি বিচিত্র ও পরিবর্তিত হয়। মানব ও অ-মানব সমস্ত কিছুর আধারেই এর ক্ষমতা-সূত্র নিহিত। বাস্তবতাকে তাই সমাজ ও প্রকৃতির নিরিখেই কেবল বিচার করা নয়। সমাজবিজ্ঞান ছাড়াও নগর অধ্যয়ন, নার্সিং, জনস্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিশ্ব দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণে, সাহিত্য বিশ্লেষণে এ তত্ত্ব প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের (১৯০৬–১৯৭৮) *নবান্ন* (১৯৪৪); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী*, *মুক্তধারা;* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮–১৯৫৬) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪–১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের ওপর এ তত্ত্ব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

খ. বিশ্লেষণ-কৌশল

১. চিহ্নতত্ত্ব (semiotics)

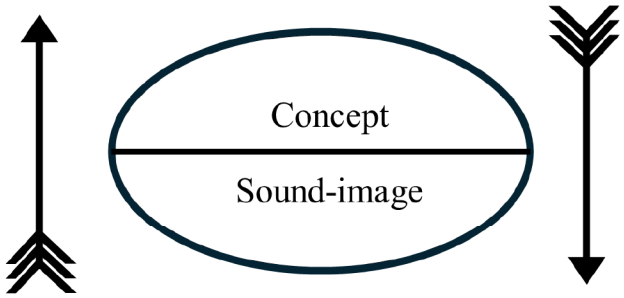
শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের বিশ্লেষণ-কৌশল হিসেবে চিহ্নতত্ত্ব (semiotics) পরিচিতি পেয়েছে। এটি শিল্প-সাহিত্যের হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। আমাদের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত কাণ্ডকে বিশিষ্ট চিহ্নের আশ্রয় পরিস্ফুট করে চিহ্নতত্ত্ব। 'ইয়োরোপে যাকে 'সেমিয়োলজি' (semiotics) বলে চিহ্নিত করা হয় আমেরিকায় তাকে সেমিয়োটিক্স (semiotics) বলে নির্দিষ্ট করা হয়। চিহ্নের যে কোনো সিস্টেমকে নিয়ে আলোচনা করে যে বিজ্ঞান তাকে সেমিয়োলজি বা সেমিয়োটিক্স বা চিহ্নবিজ্ঞান বলে।' (রমেশচন্দ্র, ২০২৩ : ০৯) মূলত, এটি সাহিত্যের বিজ্ঞাননিষ্ঠ পাঠ নির্ণয়ের কার্যকরী কৌশল। 'Semiotics is concerned with everything that which can be taken as significantly substituting for something else.' (Eco, 1976 : 07)

মানবসভ্যতার সূচনালগ্নে গুহাজীবন থেকেই চিহ্নের সঙ্গে মানুষের বসবাস। সময়ের পরিক্রমায় চিহ্নের সঙ্গে মানবজীবনের সংশ্লিষ্টতা ক্রমশ বেড়েছে। জীবনে-সমাজে সংস্কৃতিতে সংপ্রোথিত চিহ্নের বিশ্লেষণে মানুষের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। 'প্রতিমা, প্রতীক, সঙ্কেতসহ যাবতীয় চিহ্নের বর্ণনা ও ব্যাকরণ 'সেমিওলজি' নামক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। গ্রীক শব্দ 'সেমেইয়ল' আর 'লোগোস' সমাসবদ্ধ হয়ে এই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। 'সেমিওলজি' শব্দটা ১৭৫২ সাল থেকেই ফরাসী ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তখন সেমিওলজি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশ। ... ১৯১০ সালে সুইস

ভাষাবিজ্ঞানী Ferdinand de Saussure (১৮৫৭–১৯১৩) শব্দটিকে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন।' (খোন্দকার, ২০০৩ : ৯৩)

গ্রিক-রোমান সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রে চিহ্নের ধারণার সূত্রপাত ঘটে। মানুষের যাবতীয় আচরণ ও উচ্চারণে চিহ্নের এক অনিবার্য উপস্থিতি রয়েছে। অসংখ্য মনীষার ভাবনাসূত্র চিহ্নতত্ত্বকে পরিপূর্ণ ও ঋদ্ধ করেছে। সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনন্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭–১৯১৩), আমেরিকান দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পার্স (১৮৩৯–১৯১৪), ড্যানিশ ভাষাতত্ত্ববিদ লুই হেল্‌মস্লেভ (১৮৯৯–১৯৬৫), রুশ নৃতত্ত্ববিদ লেভি স্ট্রোস (১৮০৮–১৯৮০), ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক এমিল বেনভেনিস্তে (১৯০২–১৯৭৬), মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫–১৯৭৫) জাক দেরিদা (১৯৩০–২০০৪), তাত্ত্বিক ও দার্শনিক রঁলা বার্ত (১৯১৫–১৯৮০), জাক লাঁকা (১৯০১–১৯৮১) প্রমুখের ভাবনাসমূহ চিহ্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে ক্রমশ সমৃদ্ধ ও নান্দনিক করেছে। তবে, সোস্যুর এবং পার্স-এর চিহ্নতাত্ত্বিক অভিমত বেশ সুদৃঢ়। সোস্যুর ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পার্স দর্শন ও গণিতের আশ্রয়ে চিহ্ন বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। `We learn from Semiotics that we live in a world of signs and we have no way of understanding anything except through signs and the codes into which they are organized. ... Living in a world of increasingly visual signs, we need to learn that even the most realistic signs are not what they appear to be.' (Daniel, 2007 : 10) সোস্যুরের মনে করেন, ভাষা মূলত চিহ্নের সমাবেশ। `A Science that studies the life of signs within society is conceivable; Semiology would show what constitutes signs, what laws govern them.' (Ferdinand, 1959 : 16) চিহ্নের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

> The linguistics sign unites, not a thing and a name, but a concept, and a sound image. ... The linguistic sign is then a two sided Psychological entity that can be represented by the drawing:



(Ferdinand, 1959 : 66)

চিহ্নতত্ত্বের প্রধান বিবেচ্য ৩টি দিক: ক) চিহ্ন (sign), খ) সংহিতা (code) এবং গ) সংস্কৃতি (culture)। চিহ্নতত্ত্বের মূল হলো চিহ্ন (sign)। সোস্যুর মনে করেন ভাষার প্রতিটি শব্দ মূলত চিহ্ন। 'প্রকৃত চিহ্নতাত্ত্বিকের কাছে জীবন তো চিহ্নের অগাধ অবাধ সমুদ্র।' (তপোধীর, ২০০৫ : ১৬২) চিহ্নের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ভিন্ন বলে প্রতিটি চিহ্ন ও পৃথক ও স্বতন্ত্র। চিহ্নের বস্তুগত ও অবস্তুগত-দুটি দিক রয়েছে। এর বস্তুগত দিক দ্যোতক (signifier) এবং অবস্তুগত দিক দ্যোতিত (signified) হিসেবে পরিচিতি। 'সোস্যুরীয় (১৯১৬) মতানুসারে, চিহ্নায়ক কিংবা চিহ্নায়িত কোনোটিই সংশ্লিষ্ট পার্থিব বস্তুকে গঠন করে না বরং বিশেষ সংস্কৃতি এবং সমাজ প্রতিবেশে এদের পারস্পরিক সহযোজনীয় (association) সৃজিত চিহ্নের মাধ্যমে উক্ত বস্তুটি প্রতিফলিত হয়।' (বেগম আকতার ২০১৪ : ৩৩২)

প্রতিটি চিহ্নের অর্থ নির্মাণের সামর্থ্য বিশ্লেষণ-সূত্রে পার্স চিহ্নের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো : ক) চিত্রধর্মী (iconic) খ) সূচকধর্মী (indexical) গ) প্রতীকধর্মী (symbolic)। চিত্রধর্মী (iconic): দ্যোতক-দ্যোতিত অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: বই– বইয়ের সাধারণ ও প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করে। সূচকধর্মীতে (indexical) দ্যোতিতের ব্যাখ্যা যৌক্তিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে। বই– বইয়ের দোকান, লাইব্রেরি, বই পড়া প্রভৃতি নির্দেশিত হয়। প্রতীকধর্মীতে (symbolic) দ্যোতক-দ্যোতিতের সম্পর্ক বিমূর্ত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হয়। বই– জ্ঞানের প্রতীক, আলোর প্রতীক। বইয়ের সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে জ্ঞানের বা আলোর সম্পর্ক নেই। দ্যোতক-দ্যোতিত প্রচলিত অর্থকাঠামো পরিবর্জন করে অভিনতুন অর্থ-ভাবনার জন্ম দেয়। ফলে সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির সামূহিক প্রান্তসমূহ চিহ্নতত্ত্বের আওতায় নান্দনিক ব্যাখ্যা যোগ্যতা লাভ করে।

> The nature of the signifier suggests raughly the same remarks as that of the signified. (Ferdinand, 1986 : 47)

সংহিতা (code) চিহ্নকে অর্থপূর্ণ করে। 'A code is a system of signification ...' (Eco, 1976 : 08) প্রতিটি চিহ্ন সংহিতা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমাজ-মানসে ও সংস্কৃতিতে সংপ্রোথিত থাকে সংহিতা। সংহিতায়ন ব্যবস্থা (coding) রচনার ভাষাকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: রাক্ষস ভারতীয় জীবন প্যার্টানে ভয়ংকর ও নেতিবাচক প্রতীতির জন্ম দেয়। সংহিতার জন্ম সংস্কৃতিতে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশে। চিহ্ন ও সংহিতাসমূহের প্রয়োগকারীরা বা যাপনকারীরা এ সংস্কৃতি ও প্রতিবেশ (culture) নির্মাণ করে। ফলে চিহ্নের বিশ্লেষণে সংস্কৃতির ভূমিকা রয়েছে। সংস্কৃতির মাধ্যমে চিহ্নের স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রায়োগিক দিক নির্ধারিত হয়। চিহ্নতত্ত্ব মানুষের চিন্তাজগৎ বিবর্তনের সমবয়সী। কেননা মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, ভাবনাবিশ্ব রচনার প্রকরণে প্রাসঙ্গিকতা পায়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের ভাবনাজগৎ প্রতিফলিত হয়। সুতরাং `Without signs there is no ideology. ... Everything ideological possesses semiotic value.` (Mikhail and Voloshinov, 1973 : 09)

চিহ্নভাবনায় প্যারাডাইম ও সিনট্যাগম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় 'প্যারাডাইম' ও 'সিনট্যাগম'। 'চিহ্ন ব্যাখ্যার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি হলো উপাদান নির্বাচন (বা প্যারাডাইম) এবং তার সুশৃঙ্খল সংযোজনের (বা সিনট্যাগম্) যৌথরূপ। ... প্রথমটি বিশেষ প্রতিবেশে একগুচ্ছ চিহ্নতাত্ত্বিক নমুনার মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করে এবং দ্বিতীয়টি নির্বাচনকৃত উপকরণসমূহকে বিশেষ কাঠামোয় সজ্জিত করে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৩৩৪) চিহ্নের অর্থগত দিক ব্যাখ্যার দুটি প্রত্যয় ব্যাচ্যার্থ (denotation) ও ব্যঞ্জনার্থ (connotation)। প্রথমটিতে অর্থের অভিধানগত রূপ; আর দ্বিতীয়টিতে অর্থের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা নির্দেশিত হয়। দ্বিতীয়টির মাধ্যমে যাবতীয় চিহ্নের নান্দনিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়।

রচনার প্রয়োগকুশলতা নির্ণয়ের কৌশল হিসেবে ভাষাতাত্ত্বিক বোধের সঙ্গে সাহিত্যতাত্ত্বিক বোধের সংযোগ ঘটিয়ে সোস্যুর এ তত্ত্ব দেন। নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দর্শন সংস্কৃতি প্রভৃতি তাঁর চিহ্নতত্ত্বের পরিসর বিস্তৃত করেছে। চিহ্নতত্ত্বের চিন্তা পদ্ধতি প্রচলিত 'চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে চিহ্নবিজ্ঞান কথার অন্তরালে ন্য কথা, রূপের অন্তরালে অন্য রূপ, সম্পর্কের অন্য সম্পর্ক আবিষ্কার করতে শেখায়। ... পুরোনো পাঠ থেকে ঝলসে ওঠে অভাবনীয় পাঠকৃতির নবীন রৌদ্রবলয়।' (তপোধীর, ২০০৫ : ১৮০) চিহ্নতত্ত্ব কাঠামোবাদের সূত্রে গড়ে উঠেছে। কাঠামোবাদে খণ্ড খণ্ড উপাদান, অনুষঙ্গ কীভাবে সমগ্রতার সংগঠনে ভূমিকা রাখে সেটি ব্যাখ্যা করে। খণ্ড খণ্ড উপদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত না হলে সমগ্রের অনুসন্ধান বৃথা। খণ্ড খণ্ড অনুষঙ্গের যথার্থ ব্যাখ্যা সমগ্রকে অর্থবহ হয়। চিহ্নতত্ত্বের অভীষ্টও একই:

> জীবন মানে যেহেতু অংশের সঙ্গে সমগ্রের নিরন্তর গ্রন্থনা, জীবনের মূল অন্বিষ্ট সংযোগ। এভাবে চিহ্নবিজ্ঞানের পাঠ হয়ে ওঠে জীবনের পাঠ। (তপোধীর, ২০০৫ : ১৭৬)

২. আখ্যানতত্ত্ব (narratology)

শিল্প-সাহিত্যের রূপায়ণ-প্রকৌশল বিশ্লেষণের অন্যতম কৌশল আখ্যানতত্ত্ব। শিল্পীর বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মের নান্দনিক ও দার্শনিক প্রান্তসমূহ অনুধাবনের এ প্রক্রিয়ায় পাঠককে দীক্ষিত হতে হয়। এটি উদ্ভবের পূর্ব থেকে আখ্যান

রচিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। 'আখ্যান বা গল্পের অভাব মানসমাজে কোনো দিন থাকেনি। পুরাণ, মহাকাব্য, লোককথা থেকে শুরু করে বহুবিধ আখ্যানের বিচিত্র সম্ভার বহন করে মানবসমাজ।' (মুনিরা : ২০২৩ : ২২) আর তাই 'কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমার পরিসরেই শুধু নয়, আখ্যান খুঁজে পাওয়া যাবে দর্শনে, ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানশাখায়, রাষ্ট্রতত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে এবং সংস্কৃতিতত্ত্বে তো বটেই। আখ্যানতত্ত্ব দিয়ে সমাজ ও মানবমনের নানা সমাবেশ ও চেনাজানাকে নতুন করে বোঝা সম্ভব, তেমনি সেগুলো মূল্যায়নের নিরিখও গড়ে তোলা সহজ।' (বেগম আকতার, ২০১২ : ১২) ভাষা সংগঠন, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, চিহ্নবিজ্ঞান প্রভৃতির সূত্রে এর উদ্ভব। কাঠামোবাদের আশ্রয়ে বিকশিত হলেও আখ্যানতত্ত্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। '... একালের আখ্যান-ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানের জন্ম হয়েছিল, যাকে অ্যাখ্যানতত্ত্ব বা 'ন্যারেটোলজি' বলে চিহ্নিত করা চলে। ...আখ্যানের গঠন ও রীতিকে, তার রূপায়ণ প্রক্রিয়া থেকে বুঝে নেওয়ার এক তাগিদ তৈরি করে এ তত্ত্ব।' (অমিতাভ, ২০১০ : ০৩) ফ্রান্সের টোডোরভ তাঁর *Grammar of the Decameron* (১৯৬৯) গ্রন্থে প্রথম `Narratologic` শব্দটি ব্যবহার করেন। ভাষার আশ্রয়ে ভাবনাসমূহ পরম্পরায় সজ্জিতকরণ এবং তা কীভাবে পাঠকের চৈতন্যকে আন্দোলিত ও আকৃষ্ট করে– আখ্যানতত্ত্ব তা বিশ্লেষণ করে। `Such theory helps us understand, analyse and evaluate narratives.' (Mieke, 2017 : 03) Jan Christoph Meister ``Narratology`` প্রবন্ধে এ সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেন এভাবে: `Narratology is a humanities discipline dedicated to the study of the logic, principles, and practices of narrative representation.' (Jan, , 2014 : 623) *Beginning Theory* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> ... which we can define more closely as the study of how narratives make meaning, and what the basic mechanisms and procedures are which are common to all acts of story-telling. Narratology, then, is not the reading and interpretation of individual stories, but the attempt to study the nature of 'story' itself, as a concept and as a cultural practice. (Peter and Helen, 2007 : 214–215)

আখ্যানতত্ত্ব স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে টেক্সটের উপাদান, চরিত্র, কথন প্রণালি, কাহিনির বিন্যাস কৌশল, বাচন প্রভৃতি নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে। এর রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস। `According to Plato, the lyric genre is restricted to the use of diegesis and the dramatic genre to the use of mimesis, with only the epic genre combinning both. This fundamental distinction of the two principal modes of narrating not only anticipated the 20th -century opposition showing vs. telling, but it also prefigured one

of the three analytical dimensions adopted by Genette [1972] (1980), namely voice.' (Jan, 2014 : 626–627) আরিস্টটলের কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় চরিত্র ও ঘটনা কাহিনির (Story) দুটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 'মূল কাহিনি বিভিন্ন `event` ঘটনার যে পারম্পর্যে বিন্যস্ত হয়, সেই বিন্যাস কাহিনির সারাৎসারকে এক গাঠনিক সংসক্তি প্রদান করে। ওই বিন্যাসই হল `Action` নিরূপিত `Plot`।' (নবেন্দু, ২০১৬ : ৩৫৭) ফ্রেডরিখ ফন স্পিলহেগেন (১৮২৯–১৯১১) আখ্যানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত-পূর্বক `Novel` ও `Novella`-এর মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করেন। প্রথম ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসগত (Taxonomic) পার্থক্য তুলে ধরেন তিনি। এবং তিনি প্রথম ঘোষণা করেন `... the ideal narrative never alerts the reader to the ongoing process of narration.' (Jan, 2014 : 627)

রাশিয়ান কাঠামোবাদী তাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ (১৮৯৫–১৯৭০) *The Morphology of Folktale* (1928) গ্রন্থে মোটিফ নির্ভর আখ্যান বিশ্লেষণ-সূত্রে ৩১টি `Function` এর উল্লেখ করেন। প্রতিটি কাহিনিতে সব `Function` একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে না। এসব `Function`-এর `Sub-Function` থাকতে পারে। অর্থাৎ, তিনি লোককাহিনিকে নানা ভাগে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করেন। এসব খণ্ড বা `Function` কাহিনির ন্যারেটিভকে কতটা গতিশীল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে– তা তুলে ধরেন প্রপ। প্রপসহ কাঠামোবাদীগণ আখ্যানকে মূলত `Encoding` অর্থাৎ স্রষ্টা বা লেখকের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা আখ্যানকে বিবেচনা করেন Story with a storyteller হিসেবে। পরবর্তী সময়ে আখ্যানকে `decoding` তথা পাঠকের, দর্শকের দিক থেকে বিবেচনা করেন তাত্ত্বিকগণ। `encoding` এর কাহিনির পরম্পরা ভেঙে `decoding` এ কাহিনির উপাদানসমূহ অর্থবৈচিত্র্য ও প্রয়োগরীতিতে অনন্য হয়ে উঠেছে। কীভাবে বলা হচ্ছে, কতটুকু বলা হচ্ছে, কোনটিকে বা কাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কেন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে প্রভৃতি 'প্যারাডিগম্যাটিক' বিষয় গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে। আধুনিক আখ্যানতাত্ত্বিক সেম্যুর চ্যাটম্যান (১৯২৮–২০১২) আখ্যান বিশ্লেষণে গল্প (story) ও বর্ণনা (discourse) ও দ্বিস্তরিক কাঠামোকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি মূলত রুশ ফর্মালিস্ট ও ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্টদের দ্বিস্তরিক ধারণাকে তিনি আরও সুসংহত রূপ দেন। তাঁর মতে আখ্যান বিশ্লেষণে গল্প ও বর্ণনার পার্থক্য নির্ণয় করা জরুরি বিষয়। গল্পে থাকে আখ্যানের বিষয়বস্তুর ক্রম-বিবরণ; আর বর্ণনায় থাকে আখ্যানের প্রকাশগত দিক তথা ঘটনার বিন্যাস, দৃষ্টিকোণ, ভাষা, সময়ের বিন্যাস প্রভৃতি। গল্প থেকে বর্ণনা কীভাবে গঠিত হয় এবং এর গঠনে কোন উপাদান গুরুত্ব পায় সে-বিবেচনায় আখ্যানের অভিমুখ আলাদা হয়ে যায়। কোনো গল্প-উপাদান স্থির নয়, একটি অনায়াসে আরেকটির স্থান নিতে পারে–এটি আখ্যান বিন্যাসের প্যাটার্ন। এরই আলোকে আখ্যানের অভিমুখ পৃথক হয়।

এছাড়া ফরাসি আখ্যানতাত্ত্বিক জেরাল জিনেট (১৯৩০–২০১৮) পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণায় নতুনত্ব আনেন *Narrative Discourse* গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে।

> Gerard Genette's *Narrative Discourse* is invaluable because it fills this need for a systematic theory of narrative. As the most thorough attempt we have to identify, name and illsustrate the basic constituents and techniques of narrative...' (Gerard, 1980 : 07)

আখ্যান বিশ্লেষণে তিনি ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বিন্যাস-স্থিতিকাল-পুনরাবৃত্তি; এর গঠনগত ও ভাষাবিন্যাসগত বিশ্লেষণ; বর্ণনাকারীর ভূমিকা ও বর্ণনার প্রক্রিয়া বা রীতি; দৃষ্টিকোণ; সময় প্রভৃতির গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি `Narrative Perspective` বা `Point of view` এর নাম দেন 'ফোকালাইকেশন' (focalization)। এটি দুই ধরনের: ক) অন্তর্মুখী ফোকালাইজেশন (internal focalization) ও খ) বহির্মুখী ফোকালাইজেশন (external focalization)। প্রথমটিতে চরিত্রের মনোজগত-বিশ্লেষণ মুখ্য; দ্বিতীয়টিতে চরিত্রের বহির্জাগতিক কার্যকলাপ প্রধান।

> Focalization is the relationship between the vision, the agent that see and that which is seen. This relationship is a component of the content of the narrative text: A says that B sees What C is doing. (Mieke, 2017 : 135)

অ্যাখ্যানে সময়ের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করে তিনি falshback' ও `flashforword` রীতির অবতারণা করেন। তিনি অ্যাখ্যান বিন্যাসের দুটি ধরনের উল্লেখ করেন: ক) ঘটনার সূক্ষ্ম, অনুপুঙ্খ এবং প্রত্যক্ষ বিন্যাস (mimetic) খ) ঘটনার স্বল্পদৈর্ঘ্য, রিপোর্ট-জাতীয় এবং পরোক্ষ বিন্যাস (diegetic)। প্রতিটি অ্যাখ্যান এ দুই ধরনের কাহিনি বিন্যাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়। একটি প্রধান অ্যাখানের (primany narrative) সঙ্গে এক বা একাধিক উপ-অ্যাখ্যান (secondary narrative) সংযুক্ত থাকতে পারে। তাছাড়া:

> একটি ন্যারেটিভ-এ কী ঘটেছে, শুধু তা-ই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার পাশাপাশি কী ঘটা উচিত ছিল, কী ঘটতে পারত– এ সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ। ... ন্যারেটিভ-এ অনুপস্থিত ন্যারেটিভ-উপস্থিতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপস্থিতিসমূহ লেখকের চয়নের কারণেই উপস্থিত। আর লেখক চয়ন করেন উপস্থিত ও অনুপস্থিতির এক যুগ্ম একক থেকেই। (নবেন্দু, ২০১৬ : ৩৬০)

কাহিনি (narrative) যার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, তাকে কাহিনির কথক (narrator) বলে। কথক কাহিনির ভেতরে ও বাইরে থাকতে পারে। কাহিনির বাইরের কথককে সর্বজ্ঞ কথক, আর কাহিনির ভেতরের কথক আত্মকথক বলা হয়। কথকের ওপর দৃষ্টিকোণ এবং দৃষ্টিকোণের ওপর কাহিনির অবয়ব নির্ভর করে। আখ্যানের সংরূপগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যস্থতায় কথক (narrator) থাকে। এটি তিন ধরনের: সর্বজ্ঞ কথক, আত্মকথক, চরিত্র কথক বা ভূমিকানুগ কথক। আখ্যানে কথনের ভঙ্গি নির্ভর করে কথকের দেখার ভঙ্গির ওপর। কথক যেভাবে দেখছে, সেভাবেই বর্ণনা করবে। এ দেখার ওপর আখ্যানের অবয়ব নির্ভর করে। 'কে বলছে' (who says) এর চেয়ে 'কে দেখছে' (who sees) আখ্যানে সেটি গুরুত্ব পায়। চরিত্রের ক্ষেত্রে পাঠ পরিসরে (textual duration) চরিত্রের উপস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

রলাঁ বার্ত (১৯১৫–১৯৮০) `The Death of the Author` (1967) প্রবন্ধে আখ্যান বিশ্লেষণে অভিনবত্ব আনেন। লেখককে বাদ দিয়ে লেখাকে গুরুত্ব দেয়ার ধারণার পূর্বসূত্র তিনি পেয়েছিলেন মালার্মের (১৮৪২–১৮৯৮) কাব্যভাবনায়। তাঁর 'লেখকের মৃত্যু'র ঘোষণার বিপরীতে 'পাঠকের জন্ম' সুনিশ্চিতির মাধ্যমে আখ্যানতত্ত্ব উত্তরাধুনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এতে লেখকের উদ্দেশ্য নয়, বরং পাঠকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে পাঠকের ভূমিকা হবে নৈর্ব্যক্তিক: তা অর্থ অনুধাবনের নয় বরং নতুন ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত অর্থ উন্মোচনের। একারণে অর্থ ও অর্থের বহুমাত্রিকতা বা বহুত্ববাচকতা পাঠকের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং অর্থের বহুত্বের অভিমুখ ক্রমশ আত্মবাচক হয়ে ওঠে। এভাবে বার্ত মূলত `language` এর ধারণাকে `metalanguage` এ উন্নীত করেন।

> অ্যাখ্যান গঠনের চূড়ান্ত স্তর বা 'ডিসকোর্স-এর স্তর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার্ত এমন এক `Second Linguistics`-এর ধারণাকে অনিবার্য ভেবেছিলেন যা কিনা বাক্যের সীমাকে পেরিয়েও প্রসারিত হবে। বাক্য ও বাচনের একটি সমসত্ত্ব সম্পর্কের ধারণায়, সেই `Second Linguistics`-এর দূর-প্রসারী ভূমিকা নিরূপিত হওয়া সম্ভব, যা একটি পদ্ধতিগ্রাহ্য তত্ত্বভূমির জন্ম দিতে পারে, যেহেতু, A discourse is a long 'sentence' ... Just as a sentence ... is a short 'discourse. (অমিতাভ, ২০১০ : ১৪)

জাঁক দেরিদা (১৯৩০–২০০৪) ন্যারেটিভিটির বি-কেন্দ্রিক ধারণার সূত্রপাত ঘটান; যা অ্যাখ্যানতত্ত্বসহ কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিপ্লবস্বরূপ। তিনি ভাষার সম্ভাবনার ওপর বিশেষ গুরুত্বরোপ করেন। দেরিদা `language`-কে `mark' শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি ভাষার চিহ্নকের (signifier) প্রচলিত ধারণা পাল্টে নতুন অর্থের ইঙ্গিত দেন। তাঁর মতে, কোনো শব্দের বা অর্থের নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না, বরং তা পার্শ্ববর্তী শব্দ বা চিহ্নের

সঙ্গে পার্থক্য, প্রসঙ্গ ও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করে। তিনি এক চিহ্নের সঙ্গে অন্য চিহ্নের, এক সিগনিফায়ারের সঙ্গে অন্য সিগনিফায়ারের সম্পর্ক নির্ণয় করেন ডিফারেন্স ও ডিফারেল (deferral)-এর সূত্রে। ডিফারেন্স অন্য বিষয় বা চিহ্ন থেকে একটি বিষয় বা চিহ্নকে আলাদা করে। আর ডিফারেল নির্দেশ করে অর্থের বহুমাত্রিকতা। আবার তিনি অর্থের দ্বিমুখী বৈপরীত্যের (সাদা-কালো, ছেলে-মেয়ে, ন্যায়-অন্যায়, পূর্ব-পশ্চিম, বড়-ছোট) প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে `hierarchy` ভাঙতে চান। তাঁর প্রচেষ্টায় অর্থের অভিনবত্ব ও বহুত্ববাচকতা উন্মোচিত হয়।

আখ্যানতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ হলো: কাহিনি (narrative), চরিত্র (character) ও চরিত্রায়ণ (characterization), দৃষ্টিকোণ (focalization), সময় (time), সংস্থান (ssettings)। এসব উপাদানের মধ্যে মধ্যস্থতা সৃষ্টি হয় আখ্যানের মাধ্যমে। উল্লিখিত উপাদানসমূহের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে রচনার সংরূপ নির্ণীত হয়। চরিত্রায়ণকে আখ্যান-ব্যাখ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাশ্রয়ী অ্যাখ্যান গতি পায়। চরিত্রায়ণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় ঘটনা-সময় ও গঠনের আন্তঃসম্পর্ক। চরিত্রায়ণে বৈপরীত্যময় আয়োজন আখ্যানকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

চিহ্নতত্ত্ব ও আখ্যানতত্ত্বের আলোকে টেক্সট বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি নমুনা-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। চিহ্নতত্ত্বের আলোকে নমুনা-বিশ্লেষণে সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) এবং আখ্যানতত্ত্বের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালা* (১৯৭৭) কাব্যনাট্য নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এ কাব্যনাট্যটির কেন্দ্রীয় চিহ্ন হলো মুক্তিযুদ্ধ। এর কাহিনির বিন্যাস, চরিত্রায়ণ, ভাষা, নামকরণ প্রভৃতিতে অসংখ্য দ্যোতক-দ্যোতিতের মাধ্যমে এ চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া প্রবহমান থেকেছে। মুক্তিবাহিনির আগমনবার্তায় সতেরো গ্রামের জনমানুষের শঙ্কা 'পায়ের আওয়াজ' ও 'মানুষ আসতে আছে'-এর মধ্য দিয়ে চিহ্নায়িত হয়:

> মানুষ আসতে আছে ছিপ ডিঙি শালতি ভেলায়
> মানুষ আছে লাঠি ভর দিয়া ধুলা পায়
> মানুষ আসতে আছে বাচ্চাকাচ্চা-বৌ-বিধবা-বইন
> মানুষ আসতে আছে আচানক বড় বেচইন' (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ১৭)

এ কাব্যনাট্যে 'পায়ের আওয়াজ' দ্যোতক কখনও প্রচ্ছন্নে; কখনও সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। 'পায়ের আওয়াজ' দ্যোতকের মধ্য দিয়ে অভিদ্যোতিত হয়েছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালির যূথবদ্ধ প্রতিবাদী চেতনা। যুদ্ধকালীন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনার চেয়ে সৈয়দ হক আগ্রহী হন ঘটনার ফলে সৃষ্ট জীবনবোধ ও বিশ্বাসের সুচিহ্নায়নে। পীর চরিত্রের সংলাপে:

> সে তো কয় নাই দিমু না তদের দ্যাখা
> সে তো কয় নাই
> খোড়লে সানধাই
> শিয়ালের মতো পলাইয়া যাই
> নিজের গেরাম থিকা? (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ১৯)

কিংবা, মেয়ের সংলাপে:

> সে ক্যান ফালায়া গেল আমার জীবন
> হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাঁসের মতন? (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৪৬)

উদ্ধৃত সংলাপদ্বয়ে উপমা-চিহ্নের আশ্রয়ে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছে। প্রথমটিতে শেয়ালের ধূর্তামির সঙ্গে মাতবরের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতাকে গ্রন্থিত করেন কাব্যনাট্যকার। দ্বিতীয়টিতে পাকিস্তানি সৈন্যের নির্মম কপটতা 'খাটাশের' প্যারাডাইমে উন্মোচিত হয়েছে। সম্ভ্রম হারিয়ে মেয়েটির গ্লানিকর অভিজ্ঞতা এবং বেদনার্ত অন্তর্জগৎ 'খাটাশে খাওয়া হাঁসের' প্যারাডাইমে সজ্জিত হয়েছে। একইভাবে:

> হঠাৎ আছাড় দিয়া আসমানে দেখা দিল চান এক ফালি কদুর লাহান।
> কি জানি কিসের ডরে ছ্যাঁৎ কইরা উঠল পরাণ।' (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৪৫)

এখানে কাব্যনাট্যকার লোকজীবন থেকে আহরিত 'আছাড় দিয়া' 'আসমান', 'কদুর লাহান', 'ডর', 'ছ্যাৎ' প্রভৃতি প্যারাডাইমের মাধ্যমে চিত্রকল্প-চিহ্ন নির্মাণ করেন। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* এ বিধৃত জনযুদ্ধের মূলে ছিল সমাজের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন-প্রত্যাশা। মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীন বাঙালি ভূখণ্ড ও পতাকা পেয়েছে। তবে, বাঙালির সার্বিক মুক্তি ঘটেনি; কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-প্রত্যাশা পরিপূরিত হয়নি। মাতবরের কণ্ঠে যেন তারই প্রতিধ্বনি:

না হয় জালেম আমি, কও দেখি, একবার
বুকে হাত দিয়া কও, জালেম কি জন্মাবে না আর?
কোনো দেশে? কোনো বংশে? আবার? আবার?
আমার জীবন নিয়া তবে কও কি হবে তোমার? (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৫৯)

চিহ্নতত্ত্বের কাঠামোবাদী ভাবনায় কেন্দ্রীয় দ্যোতক যখন সমাজ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে সার্থক চিহ্নায়ন হয়ে উঠতে পারে না, কাব্যনাট্যকারের প্রত্যাশা যখন বাস্তবতাকে ছাপিয়ে যায়; তখন তাঁর চৈতন্যে নতুন ভাবনার সঞ্চার হয়। মাতবরের সংলাপে তাই যুগান্তরের শোষণের স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

চিহ্নতত্ত্ব কাঠামোবাদী ধারণার সূত্রে সৃষ্টি হলেও এটি নিজস্ব ব্যাখ্যান কৌশলে উন্মুক্ত। তাছাড়া এটি বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাকে ব্যাখ্যা কাঠামোয় সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। তথাপি এর কাঠামোভিত্তিক ধারণায় টেক্সটের ব্যাখ্যা সীমায়িত হয়ে পড়ে। সৈয়দ হকের শিল্পমানস প্রচলিত কাঠামো, বিশ্বাসকে ভেঙে নতুন প্রত্যাশায় চিরজাগরূক। গ্রামবাসী তাই বলে– 'কবর দিলেও তবে উঠাবো সে লাশ খুঁইড়া আমরা আবার। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২ : ৫৯) উপনিবেশোত্তর চেতনায় অনুপ্রাণিত সৈয়দ হক মূলত 'শেকল ভাঙার গান' গাইলেন যেন। সমালোচক যথার্থই বলেন:

> নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিলে স্পষ্টত বোঝা যাবে যে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ নাটকের মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধকে ছাড়িয়ে অন্যদিকে মোড় দিয়েছে। সে মোড় বা অভিলক্ষ্য মানুষের সূক্ষ্মভাবনার বা বোধ উপলব্ধিজাত। (মোস্তফা, ২০০৮ : ১৬০)

আখ্যানতত্ত্বের আলোকে *চাঁদ বণিকের পালা* কাব্যনাট্যের নাট্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করা হবে। শম্ভু মিত্র *মনসামঙ্গল* এর অতি পরিচিত আখ্যানকে বিশ শতকের ষাটের দশকের জীবনপটে নতুন বিন্যাসে উপস্থাপন করেন। বাংলার গাঙ্গুর নদীর তীরে অবস্থিত চম্পকনগরীর অধিবাসীদের উচ্ছল ও কোলাহলপূর্ণ উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে এ নাট্য-আখ্যান গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় বস্তুনিষ্ঠতার বিপরীতে এ কাব্যনাট্যে মন্ময় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোর সন্ধানে মানুষের অন্তহীন অভিযাত্রার অন্তর্বয়ন করেন। নাট্য-আখ্যানের সূচনা থেকে সমাপ্তিতে পর্যন্ত অন্ধকার সময়ের বিপরীতে আলোর পথে পাড়ি দেয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। তৃতীয় পর্ব (শেষাংশ):

> চাঁদ: আমার ক'জনা প্রেতের মতন চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব। আমাদের কেউ নাই, কিছু নাই। নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব।– প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ! কতো বাঁও জল দেখ। তল নাই?– পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী

তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও– পাড়ি দেও– সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চে এইটুকু অলোকিত ছবি যেন মঞ্চের গভীরে পিছিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যায়। (শম্ভু, ১৪২২ : ১৬৩)

এ নাটকের একদিকে সমাজ ও জীবনের নিষ্ঠুরতা; অপরদিকে রয়েছে প্রেম-সংগীতের পেলবতা। চরিত্রায়ণে এ বৈপরীত্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন কাব্যনাট্যকার। চাঁদ-সনকা গার্হস্থ্য জীবনের, বেহুলা লখিন্দর প্রেমের, শিব-মনসা আলো-আঁধারের প্রতিরূপক হিসেবে চিহ্নিত এ আখ্যানে। শম্ভু মিত্রের নাট্য-প্রকৌশলের পারঙ্গমতায় পৌরাণিক মূল্যবোধ ভেঙে চরিত্রগুলো আধুনিক জীবন প্যাটার্নে সাবলীল হয়ে উঠেছে। সনকার 'তুমি মোরে চিরকাল অবজ্ঞা করেছ সদাগর। ছোট বল্যে, হীন বল্যে। আজ প্রমাণিত হয়্যা গেছে তুমিও ছোট।'; কিংবা– লখিন্দরের 'মানুষের তো এট্টা কোনো পরিচয় থাকা চাই। নাকি, আমরা কেবল মুকুরের সুমুখে দাঁড়্যায়ে নানাবিধ ভূমিকায় অভিনয় কর্যে-কর্যে যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ নাই কোনো?' প্রভৃতি সংলাপের মধ্যে চরিত্রের আধুনিক মানস লক্ষযোগ্য। শম্ভুর সৃষ্ট আধুনিক মানসের বেহুলার উপলব্ধি তাই:

এই নগরীর হাওয়াট্যা কেমন যেন টান-টান, ধনুকের ছিলার মতন। এই ঠাঁয়ে তোমরা সবাই যেন প্রচণ্ড অস্থির। এরি মাঝে আমারে তো শান্ত হতে হবে, শান্তি দিতি হবে। (শম্ভু, ১৪২২ : ১৩৩)

লোকজ উপকরণের আশ্রয়ে আধুনিক জীবন-মনস্কতার অনুসন্ধান করেন কাব্যনাট্যকার। শব্দপ্রয়োগেও এ বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত। 'সামান্য লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যাবে এ ভাষা কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। লেখকের কলমে অতি আয়াসে গড়ে উঠেছে এক নতুন ভাষা– যে-ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দ। এর ফলে এই পুরাণকাহিনীতে যেমন মধ্যযুগীয় বাতাবরণ আভাষিত হয়, তেমনই সার্বিক দেশজ সুবাসও পাওয়া যায়– যা এই কাহিনীতে অপরিহার্য ছিল।' (শম্ভু, ১৪২২ : সামান্য নিবেদন) চিরচেনা আখ্যানকে নিজস্ব স্টাইলে পরিবেশনে কাব্যনাট্যকারকে মানসিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল বলে কি এ কাব্যনাট্যের বল্লভ বলে:

তাই নিয়মভাঙার এই উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা কখনো তো কোনো সমাজেই প্রশ্রয় পেতে পারেনাক। তাই প্রভু, নিয়মের একপারে আমি, অন্যপারে চাঁদ। (শম্ভু, ১৪২২ : ১১)

এখানে সমাজের প্রচল নিয়ম-নিগড় ডিঙিয়ে যাওয়ার মধ্যে উপনিবেশের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে অঙ্গুলিহেলেনের আভাস নিহিত। উপনিবেশের সৃষ্ট অন্ধকারের বিপরীতে এ নাট্যাখ্যানে তাই পাড়ি দেওয়ার, সংগ্রামশীলতার অনুষঙ্গ যোজিত হয়েছে। মঞ্চনির্দেশনায় কাব্যনাট্যকার অভিব্যঞ্জিত করেন সংগ্রামশীলতা।– 'আলো আর আঁধার মিশিয়ে

একটা জাল যেন ফুটে ওঠে মঞ্চে। রাত্রের নীলচে আভাও যেন হালকা হয়ে সবটার ওপরে। আর তারই মধ্যে কে যেন একটা প্রেতের মতো ঘুরছে। হাতে তার একটা লাঠি। (শম্ভু, ১৪২২ : ১৪১) মূলত, এভাবেই নাট্যাখ্যানের বিশ্লেষণে অনিবার্য-সূত্রে প্রাসঙ্গিকতা পায় চিহ্নতত্ত্ব, আখ্যানতত্ত্ব, মানবতাবোধ, উত্তর-উপনিবেশিক ভাবনা। এসবের জৈব সমন্বয়ে আখ্যান বিশিষ্ট রূপাবয়ব লাভ করে।

সহায়কপঞ্জি

অর্ক চট্টোপাধ্যায় ২০১৬, 'ন্যারেটোলজি তত্ত্বে ও প্রয়োগে', *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, নবেন্দু সেন (সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ, রত্নবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা

অমিতাভ দাস ২০১০, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অলোক রায় সম্পাদিত ২০০১, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব ২০২১, *পথের শেষ কোথায়*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আবুল ফজল ২০১৬, *মানবতন্ত্র*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

আমীনুর রহমান ২০১৪, 'ইম্পিরিয়ালিজম থেকে পোস্টকলোনিয়ালিজম', বেগম আকতার কামাল (সম্পাদিত), *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান– 'উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান– 'চিহ্নতত্ত্ব: সাহিত্যের চিহ্ন-অধ্যয়ন',

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০৭, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা

২০০৫, *সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, কলকাতা

ফয়েজ আলম ২০১৪, *উত্তর-উপনিবেশী মানস*, ২য় সংস্করণ সংবেদ, ঢাকা

বসুধা চক্রবর্তী ১৩৬৭, *মানবতাবাদ*, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা

বাদল সরকার ১৪২০, *নাটক সমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল ২০১২, *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

বিজন ভট্টাচার্য ২০১৪, *নবান্ন*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসু নাটক সমগ্র*, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৬৩, *নব মানবতাবাদ*, স্বদেশরঞ্জন দাস (অনূদিত) দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

মুনিরা সুলতানা ২০২৩, *দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান ২০০৮, *সৈয়দ শামসুল হকের সাতিহ্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৬, *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ* দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০২৩, *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিয়োলজি সস্যুর থেকে দেরিদা*, তৃতীয় মুদ্রণ, তবুও প্রয়াস, কলকাতা

শম্ভু মিত্র ১৪২২, ত্রয়োদশ সংস্করণ, *চাঁদ বণিকের পালা*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

শিশির ভট্টাচার্য্য ২০০৩, 'সেমিওলজি ও ঈশ্বর', *একবিংশ পত্রিকা*, খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত) ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাঈদ আহমদ ২০১২, *সাঈদ আহমদ রচনাবলি ১ম খণ্ড*, হাসনাত আবদুল হাই (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক ২০১২, পুনর্মুদ্রণ, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

Astrida Neimanis 2017, *Bodies of water Posthuman Feminist Phenomenology*, Bloomsbury Academic, New York

Bill Ashcroft 2007, Second edition, *Post-colonial studies The Key concepts,* Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Routledge, London and New York

Daniel Chandler	2007, 2nd Edition, *Semiotics The Basics*, Routledge, Taylor & Francis Group London and New York
Dragos simandan	2024, *Actor-network theory,* Springer Nature Link, Switzerland
Edward W. Said	1994, *Culture and Imperialism*; vintage Books, New York
Ferdinand De Saussure	1959, *Course in General Linguistics,* Ferdinand De Saussure, Charles Bally and Albert Sechehaye (Edited), Philosophical library, New York
Frantz Fanon	1986, *Black Skin, White Masks, Frantz Fanon*, Charles Lam Markmann (translated), Pluto Press; 345 Archway Road, London
Gerard Genette	1980, *Gerard Genette Narrative Discourse An Essay in Method*, Jane E. Lewin (translated) Cornell university press, Ithaca, New York
Homi K. Bhabha	1994, *The Location of Culture,* Routledge, II New Fetter Lane, London
Jan Christoph Meister	2014,``Narratology``, *Handbook of Narratology* Peter Huhn, Jan Christoph Meister, John Pier, wolf Schmid (edited), 2nd edition, volume i & ii, Boston

Joseph David Clark — 2022, *Posthumanism in Literary Studies: The Nomad and Anthropocentrism,* Bangor University

K. Suresh Kumar — 2017, *Humanism Philosophy* Global Journal For Research Analysis, Voume-6, Issue: 9, Special Issue September

M.N. Roy — 1981, *New Humanism*, second edition 10), Ajanta Publications, Third Reprint India

Mikhail Bakhtin, V.N. Voloshinov — 1973, *Marxism and the philosophy of Language*, seminar press, New York

Mieke Bal — 2017, *Narratology Introduction to the theory of Narrative*, university of Tronto press, Toronto Buffalo London

Ngugi wa Thiong'o — 1994, *Decolonising the Mind*, Zimbabwe Publishing House (Pvt.) Ltd. Reprinted

Nicolas Bencheri — 2017, The Internation Encyclopedia of Organizational communication, Actor-Network Theory, New York

Peter Barry and Helen Carr — 2007 *Beginning Theory* edited, 3rd edition, Manchester university Press

Richard Grusin ed. — 2016, *Anthropocene Feminism*, university of Minnesota Press, London

Rosi Braidotti — 2013, *The Posthuman*, polity Press, 65 Bridge Street, Cambridge

Roland Barthes — 1986, *Elements of Semiology Roland Barthes* Annette Lavers and Colin Smith (translated)Eleventh printing, Hill and wang, New York

Samita Mishra — 2022, *`The Future of the literary text in the posthuman condition'* International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol-7, issue: 3, May-June

Umberto Eco — 1976, *A Theory of Semiotics*, Indiana University Press, London

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

৩.১ গবেষণা কাঠামোর রূপরেখা

বর্তমান গবেষণার অভিলক্ষ্য হলো অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচিত কাব্যনাট্যকারদের রচিত কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের শিল্পিত প্রতিফলনের প্রবণতা, বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য নিরূপণ করা। অর্থাৎ, এ গবেষণায় কাব্যনাট্য পাঠের বিশ্লেষণ কৌশল, কাব্যনাট্যের গঠন-প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত কাব্যনাট্যকারদ্বয়ের চিন্তাকৌশল যথোপযুক্ত পদ্ধতির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিবেচনায় এটি একটি গুণগত গবেষণা। মূলত, `Systematized effort to gain new knowledge we call research.' (Redman & Mory, 1933 : x) গুণগত গবেষণায়– `Here researchers struggled with how to locate themselves and their subjects in reflexive texts. …Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists of a set of interpretive material practices that make the world visible.' (Lisa ed., 2008 : 311) গুণগত পদ্ধতিতে গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা (approach) অনুসৃত হয়ে থাকে, যার অন্যতম হলো অবভাসতত্ত্ব (Phenomenology)– ভিত্তিক বিশ্লেষণ-কৌশল। বর্তমান গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছে অবভাসতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণকে। অবভাসভিত্তিক গবেষণায় যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এখানে সেভাবে কাব্যনাট্যকারগণের স্বোপার্জিত শিল্পবোধ ও যাপিত অভিজ্ঞতার প্রান্তসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। কাব্যনাট্যকারগণের শিল্প-অভিজ্ঞতা ও কাব্যনাট্য সৃজনে তাঁদের চেতনবিশ্বের শিল্পরূপায়ণের প্রকৃতি অনুসন্ধানে; কোন সমাজ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাব্যনাট্যকারগণ তাঁদের মনোভাবনা উপস্থাপনযোগ্য করে তোলেন, তার স্বরূপ অন্বেষণে; কোন ধরনের ভাষিক বিশেষত্বে কাব্যনাট্যকারগণের ভাবনাবিশ্ব কাব্যনাট্যের ফর্মে রূপান্তরিত হয়, তার প্রক্রিয়া অনুধাবনে; কাব্যনাট্যকারগণের অভিলক্ষ্য নির্ণয়ে; সর্বোপরি কাব্যনাট্যকারগণের শিল্পবোধের সংহত রূপ শনাক্ত করতে অবভাসতত্ত্বের প্রয়োগ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহে ভাবাদর্শ কীভাবে অন্তর্বয়িত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ এ গবেষণার প্রধান অনুপ্রেরণা। এ গবেষণায় দুটি প্রধান দিক লক্ষণীয়: ভাবাদর্শ এবং অন্তর্বয়ন। এর প্রথমটি বিমূর্ত, অপরটি মূর্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *রক্তকরবী*, *মালিনী* প্রভৃতি কাব্যনাট্যে কাল্পনিক, রূপক ও ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যান নির্বাচন করেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের এসব কাব্যনাট্যে রূপক-প্রতীকধর্মী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ প্রকাশ ঘটেছে। অপরদিকে, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, *কালসন্ধ্যা*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *প্রথম পার্থ*, *সংক্রান্তি*

প্রভৃতি কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসুর ভাবাদর্শে স্থিত মিথ ও মিথায়নের সন্নিবেশ ঘটেছে। এসব কাব্যনাট্যের আখ্যানসমূহ গৃহীত হয়েছে প্রধানত পুরাণ থেকে। উভয় কাব্যনাট্যকারের নাট্যায়ন কৌশল, সৃজন প্রক্রিয়া, শিল্পাবেগ, দর্শন প্রভৃতির আলোকে ভাবাদর্শ অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োজন। কাব্যনাট্যকারদ্বয়ের সামান্য ও অভিন্ন পদ্ধতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে অবভাসতত্ত্ব গৃহীত হয়েছে। কেননা, অবভাসতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রপঞ্চ যাপিত অভিজ্ঞতার (Lived Experience) বিশ্লেষণ, যা মূলত কাব্যনাট্যকারগণের ভাববিশ্বের অন্তর্গত। এ গবেষণায় কাব্যনাট্যকারদ্বয়ের কাব্যনাট্যের তালিকা প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের আলোকে তাঁদের কাব্যনাট্যসমূহে বিধৃত ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি অবভাসতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায়, চিহ্নতত্ত্ব ও আখ্যানতত্ত্ব এর ভিত্তি হওয়ায় এবং গবেষণায় গবেষকের চিন্তন সম্পৃক্ততার সূত্রে এটি একটি গুণগত গবেষণা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৩.২ গবেষণা নক্শা: অবভাসতত্ত্ব (Phenomenology)–ভিত্তিক বিশ্লেষণ-কৌশল

দর্শনশাস্ত্র জগৎকে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করে: ক) অবভাস (phenomenon) বা প্রত্যক্ষযোগ্য জগৎ এবং খ) অপ্রত্যক্ষযোগ্য জগৎ (Noumenon)। অবভাসতত্ত্ব (phenomenology) জগৎ-জীবনের প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কীয় মতবাদ, যা অবভাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু বা বিষয় অনুধাবনের কথা বলে। অবভাসিক ভাবনায় বস্তুজগৎ ব্যক্তির চেতনাবিশ্বের আলোকে অস্তিত্বশীল ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। এ মতবাদ বস্তু বা জ্ঞানের যতটুকু মানুষের আওতাধীন,ততটুকু স্বীকার করে। ব্যক্তির চৈতন্যে বস্তুর বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ অনুভববেদ্য হওয়ার প্রক্রিয়া এতে গুরুত্ব পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মানিতে অবভাসতত্ত্বের সূচনা ঘটে। এ তত্ত্বের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন জার্মান গণিতবিদ ও দার্শনিক আলবার্ট এডমন্ড গুস্টাফ হুসার্ল (১৮৫৯–১৯৩৮)। রেঁনে দেকার্ত, জন লক, বার্কলি, কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকের বস্তুবিশ্ব সম্পর্কিত দার্শনিক ব্যাখ্যা হুসার্লকে অগ্রগামী চিন্তায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। হুসার্ল, মার্টিন হাইডেগার, মরিস মারলিউ পন্টি প্রমুখের চিন্তাশীলতার মধ্য দিয়ে এ তত্ত্ব বিকশিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ইউরোপীয় জীবনবোধে অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা ও মতাদর্শিক সংকট প্রবল হতে শুরু করে। দর্শনবিশ্বে এর প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে। এ সময়ে প্রথাগত দর্শন চিন্তাকে নাড়িয়ে দিয়ে অবভাসতত্ত্বের সূচনা করেন হুসার্ল। এ তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি দর্শনকে বিজ্ঞানের উচ্চতা দান করেন। সামূহিক অনিশ্চয়তা ও সংকটের সময়ে তিনি এ তত্ত্বের মাধ্যমে অনিশ্চয়তার বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। Terry Eagleton হুসার্লের

অবদানকে মূল্যায়ন করেন এভাবে– `To establish certainty, then, we must first of all ignore, or `put in brackets', anything which is beyond our immediate experience; we must reduce the extend world to the contents of our consciousness alone. This, the so-called `phenomenological reduction', is Husserl's first important move. … all realities must be treated as pure `phenomena', in terms of their appearances in our mind, and this is the only absolute data from which we can begin. … Phenomenology is a science of pure phenomena.' (Terry, 2003 : 48) হুসার্ল মনে করেন বস্তুর স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে নয়, বরং বস্তু কীভাবে ব্যক্তি-মানসের চেতনায় প্রতিফলিত হয়– সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা মানুষের চিন্তাজগৎ বস্তুকেন্দ্রিক। চিন্তন ক্রিয়া এবং চিন্তন বিষয় বা বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক নিরর্ভশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। অভিজ্ঞতার বাইরের জগৎ চেতনার জগতে অগ্রাহ্য করা হয়। হুসার্ল *Philosophy of Arithmetic* গ্রন্থে সংখ্যার ধারণাকে বস্তুজগৎ বিশ্লেষণে কাজে লাগিয়েছেন। *The Idea of Phenomenology* গ্রন্থে হুসার্ল বলেন–

> The method of the critique of cognition is the phenomenological method, Phenomenology as the general doctrine of essences, within which the science of the essences of cognition finds its place. (William & George, 1973 : 01)

তিনি আরও বলেন– `Having assured ourselves of the field of pure cognition, we can now investigate it and start a science of pure phenomena, a phenomenology. Is it not obvious that this must be the basis for the solution to the problems which have been agitating us? Thus it is clear that I can only attain insight into the essence of cognition if I look at it myself, and if it itself is given to me to "see", as it really is. I must study it immanently and by pure inspection within the pure phenomenon, within "pure consciousness".' (William & George, 1973 : 36) অবভাসতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে–

> উইলিয়াম রীজ (William Rease) তাঁর Dictionary of Philosophy and Religion-এ অবভাস-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন: 'সাধারণভাবে, মানুষের চেতনায় পরিব্যাপ্ত অবভাসগুলোর বিশ্লেষণ- কেন্দ্রিক দর্শনের অনুগামী হলো অবভাস-বিজ্ঞান। [In general, Phenomenology is an approach to philosophy centering on analysis of the phenomena which flood man's awareness.] (সুনীল, ১৯৬৫ : ১১)

মানুষ আজন্ম স্ব-চেতনায় রঙে উজ্জীবিত সত্তা হিসেবে চিহ্নিত। অন্তর্গত চেতনা মানুষকে চারপাশের বস্তুবিশ্বের প্রতি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশ্ব ব্যক্তি-চেতনার রঙে রঙিন হয়ে মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়। বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের চেতনায় পূর্ব ধারণা থাকে। বস্তুবিশ্বে কী আছে তা জানা নয়, বরং মানুষের বোধে বা চেতনায় কী আছে তা জানা– অবভাসতত্ত্বের অভিলক্ষ্য। তাই 'হুসের্ল বলেন যে দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিৎ চেতনার বিশ্লেষণ। এর কারণ এই যে, বাহ্য ও আন্তর জগতে যা কিছু আছে, তা-ই আছে চেতনায়।' (সুনীল, ১৯৬৫ : ০৭) এ কারণে `Husserl rejected the belief that objects in the external world exist independently and that the information about objects is reliable.' (Thomas, 2004 : 04) তাঁর নিকট নয়, বস্তুর অবভাস গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি মনে করেন মানুষের চেতনা বস্তুবিশ্বের আলোকে গড়ে ওঠে।–

> By "things" (Sachen) Husserl meant not real (concrete) objects, but the ideal (abstract) forms and contents of experience as we live them, not as we have learned to conceive and describe them according to the categories of science and received opinion. Phenomenology is thus a descriptive, not an explanatory or deductive enterprise, for it aims to reveal experience as such, rather than frame hypotheises or speculate beyond its bounds. (Donald, 2012 : viii)

অর্থাৎ, এতে মানুষের বস্তুবিশ্বনির্ভর চেতনায় বস্তুবিশ্ব যতটুকু ধরা দেয়, ততটুকুই বাস্তব বলে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ, অবভাসতত্ত্ব মানবীয় বোধের সঙ্গে বাস্তব জগতের সংযোগ তৈরি করে। হুসার্ল বিশ্লেষণ করে দেখান যে, চেতনা কীভাবে অবভাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। অবভাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থ যেহেতু চেতনা থেকে জাত, সেহেতু তিনি চেতনাকে বিশ্লেষণের কথা বলেন। ফলে যা আমাদের আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ নয়, তা হ্রাস করতে হবে। তাঁর মতে চেতনা বস্তু আশ্রিত। কোনো বস্তু জ্ঞানের বিষয় হলে তাতে চেতনা থাকে। এ চেতনার আলোচনা মূলত সারসত্তার (Essence) আলোচনা। এ সারসত্তা শাশ্বত, চিরন্তন, দেশ-কাল-অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। অর্থাৎ, বিশ্বে কী আছে তা জানা নয়; বরং মানুষের বোধ কী উপস্থিত– তা অনুসন্ধান করা হুসার্লের লক্ষ্য ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী পদ্ধতিতে বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক দেখার দৃষ্টি তথা অভিজ্ঞতার স্বরূপ প্রকাশের প্রক্রিয়া আমূল পাল্টে দেন। সুতরাং, পূর্বানুমান ব্যতিরেকে বস্তু-সত্তা, বিষয় বা চেতনার বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ অবভাসতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

সাহিত্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে অবভাসতত্ত্ব প্রয়োগবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। এ পদ্ধতি শিল্পী-সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি-অনুভূতি তথা যাপিত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। এটি রচনার বিষয়গত অভিজ্ঞতার গভীরতা ও সমৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে। এটি অবভাস বা তথ্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি অন্বেষণসূত্রে অবভাসের অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার করে। 'এমনকি জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটে অবভাস-বিজ্ঞান জ্ঞান-ক্রিয়ার পথ থেকে পূর্বানুমানগুলোকে সরিয়ে দিয়ে মূল ('raw') অভিজ্ঞতা বা অবভাসের কাছে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে।' (সুনীল, ১৯৬৫ : ১৬) কেননা `Phenomenological criticism is an attempt to apply the phenomenological method to literary works. As with Husserl's 'bracketing' of the real object, the actual historical context of literary work, its author, conditions of production and readership are ignored; Phenomenological criticism aims instead at a wholly `immanent' reading of the text, totally unaffected by anything outside it.' (Terry, 2003 : 51) মূলত, অবভাসতত্ত্বে একটি নির্দিষ্ট অবভাসকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ এবং অভিনব অর্থ নির্মিতিতে সহায়তা করে। এ কারণে এ বিশ্লেষণ কৌশল গুণগত গবেষণাকে সুসংহত ও শক্তিশালী এবং গভীর বিশ্লেষণক্ষম করে তোলে।

> This theoretical framework provides a solid foundation for literary analysis, as both literature and phenomenology deal with human experience, emotions, and consciousness. The application of phenomenology to literature requires addressing the subjective experiences of characters, the emotions they evoke in readers, and the complex interactions between texts and readers. (Kaniphnath & Rupesh, 2024 : 05)

আধেয় বিশ্লেষণের সঙ্গে এটি একীভূত হয়ে গবেষণার অনুসন্ধান সূক্ষ্ম, সমৃদ্ধ এবং নান্দনিক করে তোলে। অবভাসতত্ত্বে তিনটি দিক গুরুত্ববহ:

ক) শিল্পী-সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার ও আকাঙ্ক্ষার লিপিবদ্ধ রূপের বহিঃপ্রকাশ।

খ) শিল্পে বা রচনায় সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা সম্মিলনে তা নির্দিষ্ট অর্থের দিকে প্রধাবিত হয়। এখানে লেখকের আকাঙ্ক্ষার এবং পাঠকের আকাঙ্ক্ষা সমভাবে সম্পর্কিত হবার অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তবে, লেখকের আকাঙ্ক্ষা বোদ্ধা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

গ) এ অনিশ্চয়তা বোদ্ধা পাঠকের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সক্রিয় পাঠ-কৌশল সূত্রে দূরীভূত হয়।

অর্থাৎ, অবভাস পদ্ধতিতে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য অবভাসের প্রকৃত সারসত্তা (Essence) অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আধেয় বিশ্লেষণ-সূত্রে গবেষক অধিক পরিপক্ব ও গভীর উপলব্ধি আবিষ্কারে সক্ষম হন। Woodruff Smith তাঁর ``Consciousness with Reflexive Content'' প্রবন্ধে যেকোনো মননশীল কাজে অভ্যন্তরীণ চেতনার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন `to analyze (describe, interpret, analyze) our own familiar forms of conscious experience – as we experience them from our own– first person perspective within the horizon of our familiar circumstances.' (David & Amie, 2005 : 94) তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের সচেতন পাঠ-বিশ্লেষণের জন্য এ তত্ত্ব কার্যকরী উপায়। অপরদিকে মারলিউ পন্টি গুরুত্ব দেন টেকস্টের চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের সূত্রকে। অন্যান্য তাত্ত্বিকদের ভাবনায়ও এর সাহিত্যক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা উঠে এসেছে।

> According to Drew Leder and Vivian Sobchack who extended this notion, argued that literature can evoke embodied experience, thereby encouraging deeper engagement with the text. ...These Perspectives highlight the the ability of Phenomenology to unravel the complex layers of literary meaning. (Kaniphnath & Rupesh, 2024 : 02)

সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড অবভাস বিশ্লেষণ সূত্রে বিষয়ের নিউক্লিয়াসে পৌঁছানোর নান্দনিক প্রয়াস অবভাসতত্ত্বে নিহিত। অবভাসতত্ত্বে চেতনা ইচ্ছাকৃত কাঠামোয় চরিত্রগুলো নিজস্ব জগতে পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া (interact) ঘটায়। অবভাস চরিত্রগুলোর আবেগ, উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণা অধ্যয়নের পথ দেখায়। মূলত এর লক্ষ্য হলো ব্যক্তি কীভাবে তার চারপাশের বস্তুবিশ্বকে উপলব্ধি বিশ্লেষণের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। এটি পাঠ (text) ও পাঠকের (Reader) সঙ্গে গতিশীল (dynamic) ও নিমগ্ন (immersive) সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা পাঠককে আরও সুগভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও অনুসন্ধানে উৎসাহী করে। এ কথা তাই প্রণিধানযোগ্য যে–

> অবভাস-বিজ্ঞান সাহিত্যিকের মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে প্রথম থেকেই প্রচলিত ক্রমকে বদলে দিয়েছে। অর্থাৎ পারস্পরিক মনোভাবই ছিল লেখকের মানস ও বোধের আলোকে সাহিত্যের অধ্যয়ন করা। অবভাস-বিজ্ঞান, লেখকের মানস ও বোধকে বুঝতে সাহিত্যকেই আধার করা উচিত, এই ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছে। যেন সাহিত্য হল সাহিত্যিকের বোধের চাবি কাঠি, যা হদিস দেয় কীভাবে তার বোধ বাস্তবকে বুঝতে পেরেছে এবং সাহিত্যের স্তরে তার কী পুনরান্বেষণ করেছে। (গোপীচন্দ, ২০১৩ : ২০৪)

অর্থাৎ, শিল্পের বা রচনার অর্থ, সৌন্দর্য, স্বরূপ ও আবেদন পাঠকের, ব্যক্তির অনুভবের জগতের আলোয় অর্থবহ ও অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। ফলে 'লেখক আর প্রতিবেদনের পক্ষে সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারলেন না! বরং ধীমান পাঠক হয়ে উঠলেন তাৎপর্যের নিয়ন্তা।' (তপোধীর, ২০০৭ : ৭১) বলা যায়, এটি এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যার অর্থনির্মিতি পাঠকের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং, সাহিত্য অনুধাবন ও বিশ্লেষণের কার্যকরী দার্শনিক কাঠামো এটি। সাহিত্যিক পাঠককে (Text) বোধগম্য, ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ এবং পাঠক ও পাঠের মধ্যে নান্দনিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে এ কাঠামো। অভিজ্ঞতার বিষয়গত সারমর্মকে অবিচ্ছেদ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অবভাসতত্ত্ব মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা বোঝার একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে।

এ পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য অবভাসসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধরণার প্রস্তুতি থাকা জরুরি। অবভাস সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবভাসের প্রকৃতি ও অনুধাবন করতে হয়। `The aim of the researcher is to describe as accurately as possible the phenomenon, refraining from any pre-given framework, but remaining true to the facts.' (Thomas, 2004 : 05) এ প্রক্রিয়ায় গবেষক পূর্ববর্তী ধারণা ও অনুমান দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অবভাসের সঙ্গে বিশুদ্ধতম ভাবনার মিথস্ক্রিয়া ঘটায়। ফলে গবেষণায় স্পষ্টতা ও মৌলিকত্ব যোজিত হয়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থের এককগুলো তালিকাবদ্ধ করে গবেষককে এসবের অন্তর্গত অন্তর্নিহিত সারসত্তা (Essence) তুলে আনেন। বিষয় বা অবভাসসমূহ কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে সুসংহত আখ্যান গড়ে তোলে– অবভাসতত্ত্ব তা অনুসন্ধানে গবেষককে সবিশেষ সহযোগিতা করে।

চরিত্রের সংলাপ, আবেগ, অভিজ্ঞতা, ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতিকে মুক্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে নিরীক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি (platform) এটি। আমরা জানি, সাহিত্য উপলব্ধির জগতের সঙ্গে বাস্তবতার সেতু রচনা করে। উপলব্ধির জগতে চরিত্রগুলো কীভাবে বাস্তবতার বিশ্বে রূপ পায় এটি তা অনুসন্ধান করে। `Phenomenology facilitates a nuanced analysis of characters by revealing their inner dialogue, emotions, and lived experiences. This approach allows us to understand characters beyond their actions and uncover the underlying motivations and complexities that shape their behavior.' (Kaniphnath & Rupesh, 2024 :07) তাছাড়া বিষয়গত (subjectivity) ওপর গুরুত্বারোপ করে বলে চরিত্রসমূহের আবেগ অন্বেষণ সহজতর হয়। এটি উপলব্ধি জগতের সঙ্গে পাঠকের অভিজ্ঞতার জগতের মেলবন্ধন ঘটায়।

অবভাসতত্ত্ব ভাষাকে কাঠামোগত উপাদান হিসেবে নয়, বরং গতিশীল ও বৈচিত্র্যময় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। কেননা, ভাষায় সংযুক্ত থাকে নানা পরিস্থিতিগত অভিব্যক্তি, বিষয়ের অন্তঃশায়িত অর্থ-তাৎপর্য এবং ভাষার ক্ষমতায়ই অবভাসগুলো ব্যঞ্জনাঋদ্ধ হয়ে ওঠে। এটি প্রথাগত দৃষ্টিকোণের (Traditional Point of View) বদলে পাঠককে মুক্তভাবে ভাষা, ছন্দ, শব্দ বিশ্লেষণের অনুপ্রেরণা দেয়। অর্থাৎ, পাঠকই সাহিত্যকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। অবভাসতত্ত্ব পাঠককে পাঠের (text) সঙ্গে সংযুক্ত হতে এবং নিজস্ব ব্যাখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ নির্মিতিতে উৎসাহিত করে। তাছাড়া এটি মানুষের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। লেখকের অভিপ্রায় ও কাঠামোগত বিশ্লেষণকে চ্যালেঞ্জ করে অভিনতুন অর্থ সৃষ্টির। এটি পাঠকের অভিজ্ঞতা, আবেগ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিবেচনাসূত্রে সামগ্রিক গবেষণাকে উৎসাহিত করে। প্রকৃতই সমাজে, জীবনে, সাহিত্যে, মনোবিজ্ঞানে, ধর্ম ও দর্শনে অবভাসতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।–

> Phenomenology explores the subjective nature of literary texts and serves as a powerful tool for enriching analysis by revealing character consciousness, the commotional landscape, and the complex interplay between perception and reality works ... As literature continues to shape our understanding of the human condition Phenomenology Provides, Powerful tools to unlock hidden layers of its meaning and significance. As scholars and enthusiasts continue to explore the mysteries of literary narratives, the relevance of Phenomenology in literary analysis remains a fascinating approach to research. (Kaniphnath & Rupesh, 2024 : 08–09)

সাধারণভাবে, অবভাসতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণে গবেষক একটি সুনির্দিষ্ট অবভাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট কাঠামোর অনুসরণ বা সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে। বর্তমান গবেষণায় উল্লিখিত পন্থার যথার্থ প্রয়োগের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হবে। এই গবেষণা প্রশ্নটি হলো:

> রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের নাটকায়ন ও প্রকরণে তাঁদের নিজ নিজ নাট্যিক ভাবাদর্শের যে প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

গবেষণা প্রশ্ন অনুযায়ী কাব্যনাট্যকারগণের চেতনাজগৎ কাব্যনাট্যে কীভাবে অন্তর্বয়িত হয়েছে, তা অনুধাবনের জন্য পাঠ বিশ্লেষণ (Textual Analysis) করতে হবে। কাব্যনাট্যসমূহের পাঠ বিশ্লেষণের জন্য চিহ্নতত্ত্ব ও

আখ্যানতত্ত্বকে বিশ্লেষণ আয়ুধ (Research Tool) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিশ্লেষণ আয়ুধদ্বয়ের আশ্রয়ে বর্তমান গবেষণায় কাব্যনাট্যসমূহের নাট্যায়ন কৌশল, উপস্থাপন প্রক্রিয়া, ভাষা, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প প্রভৃতি বিশ্লেষিত হবে।

৩.৩ প্রতিপাদ্য প্রমাণের মাপকাঠিসমূহ

- পরিবেশন প্রক্রিয়া
- নাট্যায়ন কৌশল
- শৈল্পিক ভাষাকাঠামো
- প্রকরণ বিন্যাস

উপরি-উক্ত মাপকাঠিসমূহ প্রয়োগ করে বর্তমান গবেষণাকর্মের চতুর্থ অধ্যায়ে দুটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহ বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

গোপীচন্দ নারঙ — ২০১৩, *গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব*- সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), দ্বিতীয় মুদ্রণ সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য — ২০০৭, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

সুনীল কুমার সরকার — ১৯৬৫, *অবভাস-বিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ*, অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা

David woodruff smith, Amie L. Thomasson — 2005, *Phenomenology and philosophy of Mind,* Consciousness with reflexive content, David Woodruff Smith (editors) USA oxford up Inc

Edmund Husserl — 1973, *The Idea of Phenomenology* William P. Alston and George Nakhnikian (translated), Fifth impression, The Hague Martinus Nijhoff

Kaniphnath Malhari kudale & Mr. Rupesh Kotte — 2024, *Exploring Phenomenology in Literary Analysis: A Novel Theoretical Framework*, Literary voice Peer Reviewed Journal of English studies, Nubmer-2, Volume-1

Lisa M. Given — 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* volume 1& 2, A Sage Reference publication

L.V. Redman & A.V.H. Mory — 1933, *The Romance of Research*, The Wiliams & Wilkins Company

Maurice Merleau-Ponty — 2012, *Phenomenology of Perception Maurice Merleau Ponty,* Donald A. Landes (translated), Routlegde, Taylor & Francis Group, London and New York

Terry Eagleton — 2003, *Literary Theory An Introduction*, Second Edition, Forth Printing, The university of Minnesota Press

Thomas Groenewald — 2004, *A Phenological Research Design Illustrated*, International Journal of Qualitative Methods, 3 (1), April

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের অন্তর্বয়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ভাবাদর্শের রূপক-প্রতীকায়ন

৪.১

বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় স্বকীয় নাট্যশিল্পদৃষ্টি ও নিরীক্ষামূলক নাট্যপ্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য বিভাবনার বিশিষ্টতা হলো: কাব্যনাট্যে মৌল প্রতিপাদ্যরূপে গৃহীত ভাববিশ্বের রূপক-প্রতীকাশ্রিত আড়ালে নান্দনিক উপস্থাপনা প্রকৌশল। প্রকৃত অর্থে 'শিল্পীর জীবনধারণা সৃজনশীল কল্পনার সঙ্গে একাত্ম হলে সৃষ্টি হয় সার্থক সাহিত্য।' (মুনিরা, ২০২৩ : ০১) ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা, যুগের সংকট কিংবা চিরন্তন মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নে তথা শিল্পলোকের যাবতীয় প্রকাশের ধারায় তিনি স্বতন্ত্র স্বর ও ভঙ্গিমা রেখেছেন। মূলত: 'রবীন্দ্রনাথের স্নায়ুতন্ত্রের নিজস্ব ধর্মে গ্রন্থী-কেন্দ্রের মৌল অভিজ্ঞানে জীবন হল সমাজ ও সময়ের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, মূল্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধ্রুপদী অনুষঙ্গ।' (সৈয়দ আকরম, ২০১০ : ১৫) কাব্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃজন-মানসে এ প্রবণতা কাব্য ও নাট্যশিল্পের যৌথ সংশ্লেষে নির্মিত কাব্যনাট্যের অবয়বে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। শিল্পের আধারে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রকাশের ভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায় তারই ভাষ্যে: 'বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পারো তা হলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়– আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিস আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিস। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা; তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৮ : ১৩২) কাব্যনাট্যে তিনি সত্যের ব্যঞ্জনা রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে পরিবেশন করেছেন। তাই দেখা যায় যে:

> আধুনিক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্মচিন্তার যে সংকট এবং অমানবিক ক্রোধ আর সুপ্ত নয়। হিংসায়, রক্তের হোলিখেলায় তা ব্যক্ত। তার সরল মানবিক সমাধান অনেক আগেই করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কাব্যনাটকের চরিত্রে এবং ভাবনায় তা পরিস্ফুট ... (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৬)

৪.১.১ কাব্যনাট্য পরিচিতি: বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কাব্যনাট্যের অন্যতম সৃজনক্ষম নাট্য-প্রজ্ঞার নাম। 'রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ অর্থাৎ রবীন্দ্রমানসক্রিয়ার সৃষ্টিশক্তি, জিজ্ঞাসু-শক্তি ও চেতনাসামর্থ্যকে বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যিক পরিপ্রেক্ষিতের পুনর্বিবেচনা বাঞ্ছনীয়, বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন তার পরিবেশ-পটভূমি। স্মরণীয়, প্রতিভার আন্তরশক্তিগঠনের সক্রিয়

উপাদান হল ঐতিহ্য, পারিবারিক-পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিক সাধনা।' (সৈয়দ আকরম, ২০১৪ : ০২) তিনি জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান ঠাকুর পরিবারে।

> তাঁর জন্ম হয় (১৮৬১) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তাঁর তিরোভাব হয় ঐ গৃহেই। আশি বৎসরের উপর এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল; বহু স্মৃতি-বিজড়িত সে বাড়ি বাঙালি এখনো তাঁর জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ) ও মৃত্যুদিনে (২২ শ্রাবণ) দেখতে যায়। (প্রভাতকুমার, ১৪২০ : ০৫)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দীর্ঘ পরিক্রমায় জানা যায়: 'ও-পাড়ার নাম ছিল মেছোবাজার; জোড়াসাঁকো নাম হয় পরে।' (প্রভাতকুমার, ১৪২০ : ০৪) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর চতুর্দশতম সন্তান। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে অনেকটা অনাদরে। এ প্রসঙ্গে তিনি *জীবনস্মৃতিতে* লিখেছেন: 'আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীন। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাকে, অন্যদিকে একটা মস্ত স্বাধীনতা– সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো-সাজানো-গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ০৮) পিতা-মাতার স্নেহ-সান্নিধ্য থেকে তিনি অনেকাংশে বঞ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন: 'বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ৪৮) এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের অভিমত:

> মাতা সারদাদেবী এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী– সব সময় মন দিতে হয় সংসারের কাজে– কর্তা থাকেন বিদেশে। ... এ ছাড়া শেষ সন্তান (বুধেন্দ্রনাথ) ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সারদাদেবীর শরীরও যায় ভেঙে; সে শিশুর অকালমৃত্যু হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথ মায়ের, দিদিদের বা বউদিদিদের যত্ন খুব পেতেন তা নয়। ভৃত্যমহলেই দিন কাটে অযত্নে অনাদরে। ঘরে আটকা থাকেন; জানলার নীচে একটা পুকুর, তার পুব ধারে পাঁচিলের গায়ে বড়ো একটা বটগাছ, দক্ষিণ দিকে নারিকেল গাছের সারি। শিশুর সময় কাটে ছবির মতো এই দৃশ্য দেখে। (প্রভাতকুমার, ১৪২০ : ০৫)

কলকাতার ঔপনিবেশিক সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। তাঁর বারবার স্কুল বদলের ঘটনা এরই ইঙ্গিত দেয়। তাঁর ভাষ্যে: 'আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ৩৩) শেষপর্যন্ত গৃহশিক্ষকই হলো তাঁর পিতার একমাত্র ভরসা। বর্ষাস্নাত একসন্ধ্যায় কবি যখন বৃষ্টি উপভোগ করছেন তখন গৃহশিক্ষক অঘোরবাবু আগমন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: '... বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। ...

এমনসময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ২৭) তথাপি গৃহশিক্ষকদের হাত ধরেই তাঁর প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছিল। *জীবনস্মৃতি*-সূত্রে জানা যায়: 'বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থচিন্তা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধ পড়া হইয়া গিয়াছে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ৪০) কিংবা:

> আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। ... রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। ... আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ৭৫)

বহির্পৃথিবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটে ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপে কলিকাতা ছেড়ে পেনেটিতে আশুতোষ দেবের বাড়িতে আশ্রয়-সূত্রে। এটি তাঁর প্রথম বাহির-যাত্রা। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান: 'কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাইরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ৩১) তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভ্রমণপিপাসু। ১৮৭৩ সালে সদ্য উপনয়নপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসেন। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন প্রথম নাটক 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি তিনি জীবদ্দশায় হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া ১৮৭৪ সালে লেখেন 'অভিলাষ' (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত); ১৮৭৫ সালে লেখেন 'হিন্দুমেলার উপহার' (অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) নামক কবিতা। সুতরাং দেখা যায় যে, তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় কবি হিসেবে। *জীবনস্মৃতি*-তে উল্লেখ আছে: ''কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। ... আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না– তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ০৫) আশৈশব লালিত কবিত্বের অপ্রতিরোধ্য গতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য প্লাবিত করে রয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ যে কবি-সার্বভৌম, তার সুচিহ্নিত প্রকাশ সাহিত্যরূপ-নির্বিশেষে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনায় অমোঘভাবে প্রতিফলিত।' (ভীষ্মদেব, ২০০৪ : ৭৪) এ কবিসত্তার অসামান্য নান্দনিক স্ফূর্তি ঘটেছে তাঁর পরবর্তী সময়ে রচিত কাব্যনাট্যসমূহে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাঙালি সমাজে ও সাহিত্যে ত্রিবিধ ধারা প্রবহমান ছিল: **ক)** প্রাচ্যকেন্দ্রিক ধারা; **খ)** পাশ্চাত্য-নির্ভর ধারা; এবং **গ)** উল্লিখিত দুই ধারা সমন্বয়ে সৃষ্ট নতুন ধারা। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় ধারা একজন প্রাতিস্বিক প্রতিভা ছিলেন। শৈশব-কৈশোরের বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক পঠন-পাঠন তাঁর আদর্শিকতার মৌল ভিত্তি করে দিয়েছিল। 'উপনিষদ্ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা নিয়েছেন আজীবন...' (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ২০) তাছাড়া: 'ঔপনিষদিক পারিবারিক পরিবেশে লালিত হলেও রবীন্দ্র-চেতনার উৎসে রয়েছে বিচিত্র বিদ্যা ও জ্ঞানসাধনার পটভূমি। তিনি যেমন একদিকে দেবেন্দ্রনাথের কাছে বেদ-উপনিষদের অপৌরুষেয়তার ধারণা লাভ করেছিলেন, যার সূচনা রামমোহনের উপনিষদের বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে; তেমনি নিউটন (১৬৪২–১৭২৭), চার্লস ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২) সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬–১৯৩৯), সি.জি. ইয়ুং (১৮৭৫–১৯৬১), টমাস হাকসলি (১৮২৫–১৮৯৫), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬–১৮৭৩), জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮–১৮৩২), বের্গ সঁ (১৮৫৬–১৯৩৯) প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দর্শনের পরিচয়ও নিয়েছিলেন।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৩)

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমাজ-রাজনৈতিক আবর্তন-পরিবর্তনও রবীন্দ্র-চিত্তে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুত, 'রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা সুদীর্ঘকালের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জটিলতার স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্য দিয়ে বহমান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ধনবাদী সমাজের উৎকর্ষ, তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তর ও অপকর্ষ-অবক্ষয়, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথের সমকালেই সংঘটিত হয়।' (সৈয়দ আকরম, ১৪২১ : ২৩) নানা প্রতিকূলতাকে তিনি অতিক্রম করেন সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে। 'বাঙ্গালি জীবনে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক যুগেই রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক মনের বাইরে আসেন।' (পার্থপ্রতিম, ২০১৭ : ৩৯) এর প্রচ্ছন্নে রয়েছে তাঁর বেড়ে ওঠার প্রতিবেশ। 'দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিবারে জন্মেছিলেন যার আবহাওয়ায় ছিল গভীর ধর্মীয় অনুভবশীলতা, অথচ প্রথাসিদ্ধ নিয়মাচারের বন্ধন থেকে তা মুক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল্যবোধ মেনে নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে এতটুকুও মানসিক টানাপড়েন সহ্য করতে হয়নি; শুধু সাহিত্য নয়, সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদর্শাবলি যা লিপিবদ্ধ আছে সে-সব দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।' (হুমায়ুন, ২০১৭ : ২৯) ফলে:

> পরাধীন দেশের মানুষ হিসেবে যে সময়ে এবং যে সমাজ, পরিবেশ ও পরিবারে তাঁর জন্ম প্রথম দিকে তার চৌহদ্দির মধ্যেই এবং পরে অনেক সময়ে বেশ কিছুটা তাকে অতিক্রম করেও তাঁর সদাজাগ্রত চৈতন্য প্রত্যক্ষ করেছে সেই রূপান্তরের নানা পর্যায়। আর যুগসন্ধিকালের দ্বন্দ্ব ও জটিলতার ছাপ পড়েছে তাঁর সমগ্র মননে, তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তাতেও, আর প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে। (চিন্মোহন, ২০১৭ : ০৯–১০)

বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যধারার রীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্যক ধারণা রাখতেন। তাঁর প্রাচ্য নাট্যজ্ঞানের এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের সমকালীন নাট্যরীতির বিবিধ জ্ঞান ও লব্ধ অভিজ্ঞতা। 'স্বভাবতই তার চিন্তা ও মননে তাঁরই পরিবারের সাহিত্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়ের প্রভাব পড়লেও কবির নিজস্ব চিন্তা ও চেতনা লক্ষণীয়।' (কমলেশ, ২০১৫ : ১১) 'গীতিনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৮১-তে রচিত *বাল্মীকিপ্রতিভায়*।' ... ঠাকুরবাড়ির তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, অগ্রজদের নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যরচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরপর রচনা করেন *কালমৃগয়া*, *মায়ার খেলা*।' ... রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে সংগীত অবলম্বন করেন নাটকীয়ত্ব প্রকাশের জন্য, এবং অংশত তাতে কবিতাও প্রযুক্ত।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৫৭) রবীন্দ্রনাথের নাট্যতৃষ্ণা পরবর্তী স্তরে এসে স্থিত হয় নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্যের ফর্মে। 'বিচিত্রি প্রকৃতির বহু নাটক তিনি লিখিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই সব নাটকের কোন কোন পর্যায়, যেমন কাব্যনাট্যগুলি, তাঁহার গান ও কবিতার পরেই বা সঙ্গেই সমান অমরতার আসন দাবি করিবে ... (প্রমথনাথ, ১৩৬১ : ০১) রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য রচনার অভীপ্সা সম্বন্ধে বলা যায়:

> নাট্যরূপের বিধিবদ্ধ ফর্মে কাব্যনাট্যের চর্চায় একদিকে ফর্মের হাত থেকে মুক্তি, অন্যদিকে সেই মুক্তিকে নতুন ফর্মের অভিমুখী করে তোলা– এ ধরনের অর্জন হয়ে ওঠে সম্ভবপর। যে শিল্পী বিচিত্ররূপের মাধ্যমে সৃজনশীল হয়ে ওঠেন, তাঁর ক্ষেত্রে কাব্যনাট্যরচনা কখনো তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকলার নির্যাসকে শতদলের মত প্রস্ফুটিত করার মুহূর্তটি পেয়ে যায়, কখনো-বা প্রকাশ-কৌশলের জটিল গ্রন্থিগুলি করে দেয় উন্মোচিত ও স্বচ্ছন্দ। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৫৯)

বস্তুত কবিসুলভ কল্পনাপ্রতীতি, সংবেদনশীলতা, ব্যঞ্জনাময়তা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় আত্মদর্শনবোধের মিথস্ক্রিয়ায় অভিনব ভাবের উৎসারণ ঘটিয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর অনুভূতিরাশিকে নাট্যফর্মে শিল্পান্বিত আড়ালে তুলে ধরলেন, তা বিস্ময় জাগায়। কাব্যনাট্য তাঁর স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা ও রূপচিন্তার অভিনতুন জগৎ। কাব্যনাট্যের ফর্মে তাঁর কাব্যকলা ও নাটকলা একই ফর্মে অঙ্গীভূত হয়ে তা আবার নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলি তাঁর নাট্যরচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহুস্তরের একটিমাত্র।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে বিবেচিত হন। একজন বিদগ্ধ নট ও নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচিতি পাওয়া যায়, তার সূত্রপাত ঘটেছে ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে

ইউরোপীয় নাট্যভাবনার প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক লিখেছিলেন। ইউরোপীয় আধুনিক নাট্যভাবনা রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *হঠাৎ নবাব* ও *অলীকবাবু* প্রভৃতি নাটকে কৈশোরক পর্যায়ে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। অল্প বয়সে বিকশিত তাঁর এ প্রতিভার স্বাক্ষর পরবর্তী নাট্যপ্রয়াসে লক্ষ করা গেছে। ''তাঁর প্রথম নাট্য রচনা 'বাল্মিকী প্রতিভা'– গীতি নাট্য। এরপর কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্য নাট্য, তত্ত্বনাটক, রূপক সাংকেতিক নাটক প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। নাটকের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু ও ভাব পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রেও তিনি যুগান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন।" (কৃষ্ণা, 2019 : 30) ১৮৮১ সালে মঞ্চস্থ হওয়া *বাল্মীকিপ্রতিভা* নাটকের ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায়, ১৮৮২ সালে লিখিত *কালমৃগয়া* নাটকে অন্ধমুনির ভূমিকায়, ১৮৮৯ সালে *রাজা ও রাণী* নাটকের বিক্রমদেবের চরিত্রে, *বিসর্জন* নাটকের ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নে রঘুপতির ভূমিকায়, ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তরুণ জয়সিংহের চরিত্রে, *বৈকুণ্ঠের খাতা* নাটকে কেদারের চরিত্রে, ১৯১১ সালে *শারদোৎসব* নাটকে সন্ন্যাসী চরিত্রে, ১৯১১ সালে *রাজা* নাটকের রাজা ও ঠাকুরদাদা চরিত্রে, ১৯১৫ সালে *ফাল্গুনী* নাটকের অন্ধবাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। অভিনয়ের এসব অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কেননা কাব্যনাট্য রচনাকালে এর অভিনয়োপযোগিতা বিষয়ে কাব্যনাট্যকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। একজন অসামান্য অভিনয়শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্যের এ শর্তটিকে যথাযথ মূল্য দিতে পেরেছিলেন। সুতরাং বলা যায় বিষয়-ভাবনা, শিল্পদৃষ্টি ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্যের পথনির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য।

> দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণের পরিবর্তে এদেশীয় পটভূমিতে সৃষ্টিশীল মননচেতনার দ্বারা কাব্যনাটক রচনার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। (অনুপম, ২০১০ : ১৬)

কাব্যনাট্যশিল্পে তিনি কবিতা এবং নাটকের বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী অন্বয়ের সঙ্গে শিল্প-সংযোগ ঘটিয়েছেন জীবন, সময় এবং অভিজ্ঞতার। এ কাব্যনাট্যকারের সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার সৃজন-সামর্থ্যে কবিত্বশক্তির রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব। সহজাত সৃষ্টিশীল সাহিত্যমানসের সঙ্গে অধীত বিদ্যা ও লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর স্বোপার্জিত শিল্পবিশ্বাসের জগৎ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে মাধ্যমেই বিচরণ করেন, তাতে অনিঃশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর অন্তর্দেশবাহিত কবিসত্তার সংযোজন ঘটে সহজাতভাবেই। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত: 'কাব্যনাটক রচনার এই প্রয়াসে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়তা নিহিত। কারণ, টি এস এলিয়ট তখনো ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাটক কথাটির প্রচলন ঘটান নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকে এলিয়টের কাব্যনাটক বিষয়ক তত্ত্ব অনুসৃত হয় নি। বরং

এলিয়টের পূর্বে ডব্লিউবি, ইয়েটস যে কাব্যনাট্যতত্ত্বের কথা বলেছিলেন তার সাথে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকের তাত্ত্বিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই বিবেচনায় বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটক শাখার পথ চলা শুরু হয়েছিল স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে।' (অনুপম, ২০১০ : ১৬–১৭) মূলত রবীন্দ্রনাথের সহজাত ও স্বোপার্জিত শিল্পীসত্তায় স্থিত সমাজ-সংস্কৃতির অমোঘ বাস্তবতার রূপায়ণ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবল কবিচেতনা: এ দ্বিবিধ চেতনার সমন্বয়বিন্দু তাঁর রচিত কাব্যনাট্যসমূহ। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বকাল ও সমাজের বহির্বাস্তবতাকে ধারণ করেও কাব্যনাট্যে মানবের অন্তর্দেশের গভীরতম রহস্যের অভিমুখী হন; আর এক্ষেত্রে মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে তাঁর স্বোপার্জিত শিল্পবিশ্বাস। স্বসৃজিত শিল্পবিশ্বাসের অংশ হিসেবে জীবনে ও সাহিত্যে সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধের যে সাধনায় রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু আস্থাশীল ছিলেন, তার সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার অনিবার্য সংঘাতকে রূপক-প্রতীকের শিল্পান্বিত আড়ালে ব্যক্ত করলেন কাব্যনাট্যে। কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং বিষয়ানুগ প্রকরণ-বিন্যাস নির্মাণে, কবিতার ভাষায় নাট্যশিল্পের আবেগ, উৎকণ্ঠা ও গতিবেগ সঞ্চারে, গদ্যের আধারেও সৃষ্টিশীল কবি-কল্পনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ অনন্যতর। বস্তুত: 'বাঙালির চেতনাবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনকার প্রভাতসূর্যের মতোই সম্ভাবনা ও প্রেরণার নতুনতর বিস্ময়।' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : গ্রন্থাভাষ)

সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও নাট্যপ্রতিভা সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয়েছে। কবিত্বশক্তি তাঁর মজ্জাগত। সাহিত্যের যেসব মাধ্যমে তিনি লেখনী ধারণ করেন, তার কোনোটিতেই তিনি কবিসত্তার প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাঁর নাটকসমূহ কবিতার সংস্পর্শে আরও বেগবান, প্রাণবান হয়ে উঠেছে।

> প্রাসঙ্গিক সূত্র হিসেবে মনে রাখা দরকার যে, তিনি তাঁর কবিসত্তাকেই নাট্যরূপের পরিব্যাপ্তি দিয়েছিলেন। আত্মপ্রকাশের-অন্তর্গত চাপের সঙ্গে এই ব্যাপ্তির একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যার অভিপ্রকাশ ঘটেছে গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য-নাট্যকবিতা-নৃত্যনাট্য রচনায়, মঞ্চায়নে এবং অভিনয়ে। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৫৫)

তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় আখ্যানে, চরিত্রে, সংলাপে অনিবার্যভাবেই সংযুক্ত হয়েছে কাব্যধর্ম; যা রবীন্দ্রসাহিত্যে তো বটেই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। বাঙালির পরিচিত নাট্যরীতি ভেঙে তিনি নাট্যশাখার ভিন্ন কাঠামো নির্মাণ করেন; যেমন: কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাটক। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্য পরিণতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। ঠাকুর পরিবারের নাট্য-অনুকূল পরিবেশ, ইউরোপীয় নাট্যভাবনা, স্বরচিত বিভিন্ন নাটকে অভিনয় প্রভৃতি তাঁর নাট্য-মানসকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। রবীন্দ্র-ভাবনাবিশ্বের উজ্জ্বল প্রান্তসমূহ মানবপ্রেম, কল্যাণচেতনা, প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা, দেশাত্মবোধ, সমাজনীতি,

রাজনীতি, মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, গীতময়তা, চিত্ররূপময়তা, রোমান্টিক সৌন্দর্যের ধারণা প্রভৃতি সঙ্গে নাট্য-অভিজ্ঞতার শিল্প-সংশ্লেষ ঘটেছে অনবদ্য সব কাব্যনাট্য রচিত হয়েছে। এভাবে তিনি:

> ধীরে ধীরে কিন্তু সম্পূর্ণতই তিনি বাংলা নাটকের খোল-নলচে বদলে দিয়েছিলেন। (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ১২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশকিছু নাটকর্মে কাব্যময়তা ও নাট্যময়তা সংশ্লেষণ গভীর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হওয়ায় তাঁর নাটকের ধরন নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা* (১৩৬৬) গ্রন্থে *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায়-অভিশাপ*, *গান্ধারীর আবেদন*, *সতী*, *নরকবাস*, *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা* প্রভৃতি নাট্যপ্রয়াসকে কাব্যনাট্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। সাধনকুমার ভট্টাচার্য *রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা* (২০০৬) গ্রন্থে *বিদায়-অভিশাপ*, *চিত্রাঙ্গদা*-কে কাব্যনাট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী* প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'এই নাটকগুলির রচনার পেছনে প্রধানভাবে সক্রিয় নাট্যপ্রেরণা, তবে রবীন্দ্রনাথের মত স্বভাবসিদ্ধ কবিধর্মের সুষ্ঠু ও সময় সময় মাত্রতিরিক্ত প্রয়োগেই নিজ নাট্য-অভিপ্রায়ের সিদ্ধি খুঁজিয়াছেন।' (শ্রীকুমার, ১৩৭৩ : ১৯৫) কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবেচনায়: '' ' রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', মালিনী', ও 'তপতী'–এই চারখানি নাটক যে বিশেষভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ম ও কল্পনা-কবিত্বের পরিচয়বাহী, তাহা আমি এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।' (কনক, ১৯৫০ : নিবেদন অংশ) নীহাররঞ্জন রায়ের বিবেচনায় *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী* –কে কাব্যনাট্যরূপে আখ্যায়িত করেন। কণিকা সাহা *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ* গ্রন্থে *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী*, *শারদোৎসব*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী* প্রভৃতি নাট্যপ্রচেষ্টার কাব্যনাট্যিকতার ওপর আলোচনা করেন। তরুণ মুখোপাধ্যায় *বাংলা কাব্যনাট্য: রূপ ও রীতি গ্রন্থে প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী* প্রভৃতি রচনার কাব্যনাট্যিক বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। অশোককুমার মিশ্র ''কাব্যনাট্যের শ্রেণীতে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'মালিনী''– কে রেখেছেন। (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৪) এ প্রসঙ্গে দেবাশিস ভট্টাচার্যের অভিমত:

> বক্ষমান গবেষণায় অনুসন্ধানের বিষয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকের বাক্‌প্রতিম পর্যালোচনায় তাঁর কোন মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে তা উদঘাটন করা। *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, এবং *মালিনী* এই আলোচনার পাঠ্যবস্তু (text)। (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৬)

শান্তনু কায়সার কাব্য নাটক (১৯৮৫) গ্রন্থে *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *বিদায় অভিশাপ*, *রাজা ও রানী*, *চিত্রাঙ্গদা* ও *মালিনী*-কে কাব্যনাট্য বলেছেন। হরনাথ পালের অভিমত: 'একটি নাটকীয় কাঠামোতে কবিচিত্তে সঞ্জাত কোন একটি বিশিষ্ট ভাবচিন্তাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় 'ভগ্ন হৃদয়' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪),

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯১), 'মালিনী' তে (১৮৯৬)। (হরনাথ, ১৩৬৭ : ০২-০৩) তাছাড়া ''রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা, যেমন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটককে 'কাব্যনাটক' বলে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে আছে *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *মালিনী* এবং ডাকঘর।' (তরুণ, ২০০৩ : ৫০–৫১) কৃষ্ণা ঘোষ *বিদায় অভিশাপ*, *গান্ধারীর আবেদন*, *নরকবাস*, *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ*, *চিত্রাঙ্গদা* প্রভৃতি রচনাকে কাব্যনাট্য হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন: 'এগুলির মধ্যে কাব্যের মন্ময়তা, আবেগ ও কল্পনার সঙ্গে নাটকের তন্ময়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্র ও ঘটনার চমক-একই সূত্রে আবদ্ধ।' (কৃষ্ণা, 2019 : 30) কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী মনে করেন:

> *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রাণী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, *মালিনী*-র মতো খানদানী কাব্যনাটকের পাশে ডাকঘর টেকনিক্যালি কাব্যনাটক না-হয়েও অন্তর্চরিত্রে কোনো অংশে কম কাব্যিক নয়। যেমন নয় *শারদোৎসব*, *রাজা* বা *ফাল্গুনী*। ফলে আলোচনার সুবিধার্থে এইসব নাটকের জন্য একটি পৃথক নাম দেওয়া জরুরি। আগেই যাকে বলেছিলাম 'কাব্যিক নাটক'। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩৫)

এ প্রসঙ্গে সাইফুল ইসলামের অভিমত: 'কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ধারায় *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *রাজা ও রানী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *বিদায়-অভিশাপ* (১৮৯৪), *মালিনী* (১৮৯৬), *গান্ধারীর আবেদন* (১৯০০), *নরকবাস* (১৯০০), *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ* (১৯০০) প্রভৃতিতে কবি হৃদয়ের অনিঃশেষ আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ২৬৫) অনুপম হাসানের বিবেচনায়: ''তাঁর গদ্য সংলাপাত্মক 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬) প্রভৃতি নাটকে কাব্যনাট্যের উপাদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। এই নাটকগুলো দৃশ্যত গদ্যভাষায় রচিত হলেও সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য, কাব্যের উত্তুঙ্গ সীমাকে স্পর্শ করেছে। এসব নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত ভাষা কাব্যধর্মী এবং নাট্যাভ্যন্তরে কাব্যময়তা জড়িয়ে আছে। ... রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করায় কাব্যনাটকের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। (অনুপম, ২০১০ : ১৫–১৬) অশ্রুকুমার সিকদারের মতে:

> রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ই বোধ হয় বাংলায় প্রথম খাঁটি কাব্যনাট্য। ভাষা ও অন্তঃপ্রকৃতি দুই দিক থেকেই। এই নাটকে বস্তুজগতের দর্পণ রচিত হয় নি, এখানে নাট্যকার ধরতে চেষ্টা করেছেন একটি সত্যের স্বরূপকে। মানতেই হবে, নাট্যভাষার সন্ধানে এখানে রবীন্দ্রনাথ সার্থক হন নি পুরোপুরি। তবু প্রকৃতিপন্থী নাটক থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই। পরে তিনি লিখলেন শেক্সপীয়রীয় প্রথানুকরণে 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। (অশ্রুকুমার, ২০১৬ : ৩৫৪)

এ প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামালের অভিমত: 'কাব্যনাট্যের উক্ত রূপতাত্ত্বিক ধারণা ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অনবহিত থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন। ... তাঁর নাট্যরচনায় শিল্পচেতনার আভ্যন্তর প্রণোদনাই সক্রিয় ছিল বলে নাট্যরূপের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীন, অন্তত স্বকীয় রূপাদর্শের নির্মাণলক্ষ্যে কাব্যনাট্যকে অনুসন্ধেয় করতে পেরেছিলেন। পুনর্লিখন ও পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যপ্রবাহ আত্মনির্ভর আঙ্গিক রচনার বাসনাকে গ্রহণ করেছিল।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬০) তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন:

> প্রথা ও প্রেম, জড় ও প্রাণ, রূপ ও ব্যক্তিত্ব–এসব ভাবাদর্শ-সংঘাত *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন*, *চিত্রাঙ্গদা*, *মালিনী* নাটকের বহির্তথ্য মাত্র, অন্তর্গত বিষয়রূপে চিত্রিত হয়েছে ব্যক্তিহৃদয়ের আত্মদ্বন্দ্ব, চিত্তের উন্মুখ-স্পৃহা, প্রাতিস্বিক দৃষ্টিলোক, এমনকি প্রকৃতিচেতনার কাব্যময় প্রকাশও হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে ব্যঞ্জনাময়। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬০)

আর *রক্তকরবী* প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত: '*রক্তকরবী*র জীবনমুক্তির প্রকল্প পরিবেশিত হয়েছে কাব্যময় ব্যঞ্জনা ও অনুষঙ্গের রূপকল্পে। কাব্যনাটকে দেশজ মহান ক্ল্যাসিকের পুনরুদ্ধার ঘটে এবং প্রবহমান যৌথ জীবনের প্রাত্যহিক ছন্দকেও ব্যবহার করা হয়। অতীতের রূপকগুলি বর্তমানের চাঞ্চল্যে পুনর্জীবিত হয়ে ভাবনাটির সঙ্গে দর্শককে একাত্ম করে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৭২) বর্তমান গবেষণাকর্মে বেগম আকতার কামালের চিহ্নিত কাব্যনাট্যসমূহ আলোচ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

- ***প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪)**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সন্ধ্যাসংগীত* (১৮৮২) ও *প্রভাতসংগীত* (১৮৮৩) প্রভৃতি রচনার প্রেক্ষাপটে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* আলোর পথে কাব্যনাট্যিক অভিযাত্রার স্মারক-সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। '' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্য রচনার সূচনা করেন।'' (শান্তনু, ১৯৮৫ : ৩৯) এ কাব্যনাট্যে রবীন্দ্র-মানসের সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব পরীক্ষিত হয়েছে। 'সীমা যে সীমাবদ্ধ নয়, তা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে ক্ষুদ্রকণার মধ্যে সংহত করে দেখায় সেই সীমার মধ্যেই অসীমের ব্যঞ্জনাকে কিংবা বিশেষের মধ্যে সেই অসীমের রূপ অনুসন্ধানই কবির দার্শনিক চেতনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ২৬) বালিকা ও সন্ন্যাসী চরিত্রের আন্তঃযোগাযোগের সূত্রে এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও প্রকৃতির পরিসরে মানব মুক্তির সূচনা ঘটিয়েছেন। 'তপস্বী স্নেহ-মমতাকে নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী ছিল, কিন্তু তার ফলে যে-আত্মিক সংকটে তাকে নিমজ্জিত হতে হলো তা থেকে প্রেমধর্মের

ভিতর দিয়েই উদ্ধার হতে হয়েছিল তাকে।' (হুমায়ুন, ২০১৭ : ৯৬) অর্থাৎ এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন:

> যখন অসীম থেকে সীমার বাঁধনে বন্ধন স্বীকারের জন্য এসেছেন ছুটে তখন পরিস্থিতি গিয়েছে বদলে। রূপের কাছে অরূপের সাধনার পরাভব ঘটেছে–কারণ কেবল রূপ কিংবা অরূপ একক ভাবে সফল নয়। উভয়ে মিলে আসে পূর্ণতা। (অশোককুমার, ২০১১ : ২৬২)

- ***রাজা ও রানী* (১৮৮৯)**

প্রেমের মুক্তি কেবল যুগলের একান্ত যাপনের মধ্যে নয়, কর্মপরিসর-বিচ্যুত প্রেম প্রাণহীন ও অসুন্দর: এ ভাবপ্রকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃজন করলেন *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্য। 'একান্ত ভোগসর্বস্ব প্রেম নানা বিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮) রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রেমদর্শন এ-জাতীয় বিকৃতির পরিপন্থী। '... বিষয়বস্তুর দিকে থেকে এ নাটকের কাহিনী গুরুগম্ভীর সন্দেহ নেই। কারণ কাশ্মীর রাজকন্যা জালন্ধরের রানী সুমিত্রা আর জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের সম্পর্কের টানাপোড়েন 'রাজা ও রানী' নাটকের মূল বিষয়।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৯) এ নাট্য-আখ্যানের শিরোনামায় ধৃত দুই চরিত্রের মনোজাগতিক টানাপোড়েনের কাব্যনাট্যিক বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। মূলত: 'রানী রাজার সর্বগ্রাসী আকর্ষণের বস্তু হইলেও এই একান্ত প্রেমনিবেদনে রানী তৃপ্তি পান নাই।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১১৯) কেননা এ নাট্য-আখ্যানের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের মৌল অভীপ্সা চিহ্নি করা চলে এভাবে: '*রাজা ও রানী* নাটকে প্রাপ্তির প্রাত্যহিকতায় প্রেমানুভূতির মৃত্যু লক্ষ করা যায়। এই জন্যে নাট্যকার প্রাত্যহিকতার পরিমণ্ডল থেকে নর-নারীর প্রেমানুভূতিকে সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৪৪)

- ***বিসর্জন* (১৮৯০)**

শাস্ত্রীয় ধর্মের যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন মানবিক বোধের দ্বন্দ্ব ও অন্তিমে মানবিকতার জয়ের আখ্যান *বিসর্জন* কাব্যনাট্য। 'ঘটনার দ্রুতগতি ও নাটকীয়ত্বে ইহাকে রোমান্টিক ট্র্যাজেডির পর্যায়ে ফেলা যায়, আবার ভাববস্তু ও ভাষার সাদৃশ্যে এবং কাব্যসম্পদের উৎকর্ষে ইহাকে কাব্যনাট্যের অন্তর্গতও করা যায়।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৪২) কেননা:

> রবীন্দ্রনাটকে গতিপ্রবাহ সৃষ্টি হয় একটি কবিকণ্ঠের আহ্বানকে অবলম্বন করে, ঘটনার ক্রিয়া সেখানে নিষ্ক্রিয়ই বলা চলে। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬৩)

এ নাট্য-আখ্যানও মানবপ্রেমেরই এক শাশ্বত উচ্চারণ। প্রেম ও প্রভুত্বের চিরাচরিত ভাবদ্বন্দ্বের নাট্য-আখ্যান এটি। এতে: 'রঘুপতির প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। রাজা প্রেমকে জয়ের মাল্য প্রদান করতে চান কিন্তু রাজপুরোহিত প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। নাটকের শেষে রঘুপতির চৈতন্য উদয়ের মধ্য দিয়ে প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৬৩) অর্থাৎ, ''বাস্তবিকই 'বিসর্জন' প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে– হিংসাত্মক আচারের বিরুদ্ধে– এক কথায় শাক্ত-উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে-তীব এবং সার্থক একটি প্রতিবাদ। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নাটকখানিতে সমসাময়িক সমাজেরই ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্বকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং নাট্যকার বিশেষ একটি পক্ষ অবলম্বন করেছেন।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১১৬) রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সর্বকল্যাণময় প্রেমের পক্ষেই। তাই বলা যায়: '' 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে আইডিয়াকে জয়ী করিতে চাহিয়াছেন, উহা সর্বপ্রসারী প্রেম।'' (কনক, ১৯৫০ : ৮৬)

- *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২)

মহাভারত-এর বনপর্বের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের বিষয়ভাবনায় বিধৃত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য থেকে এর বিষয়বস্তু গৃহীত হলেও রবীন্দ্রনাথের এ নাট্য-আখ্যান আধুনিক জীবনবোধ ও হৃদয়বৃত্তির সংকটের আধার। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য: '' 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের বাহ্যিক প্রেরণা কোনো অভিনয় অনুষ্ঠানের তাগিদ কিনা, তা ঠিকভাবে জানা যায় না বটে, কিন্তু প্রেরণা অনুমান করতে তেমন বেশি কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারীর মর্যাদা প্রভৃতি সর্বজন আলোচ্য বিষয় ছিল। ইউরোপীয় নারী-সমাজ এবং আমাদের নারী-সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ইউরোপীয় নারীর স্বাধীন সত্তা বা ব্যক্তিত্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অনেকের কাছে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা তখন বহুকাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর চরিত্র-শক্তিকে নারী-জীবনের পরম গৌরব বলে মনে করতেন।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১১৭) এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে:

> রবীন্দ্রনাথ পুরাণজাত এমন বীর্যবান নায়িকাকে শৌর্যে বীর্যে বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতায় অনন্য ক'রে তুলতে পারলেন। চিত্রাঙ্গদা তাঁর ব্যতিক্রমী সৃষ্টি বৈকি। (সাদ, ২০১৮ : ৮৪)

- *মালিনী* (১৮৯৬)

ধর্মের সত্য ও শাশ্বত রূপের উদ্ভাসন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের অন্যতম মৌল প্রেরণা। আচার সর্বস্ব, ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ আনুষ্ঠানিকতামণ্ডিত ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি। '' 'মালিনী' নাটকের প্রেরণা সম্বন্ধে-নাট্যকার

নিজেই অনেক কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে পৌরাণিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক কথায় শাক্ত ধর্মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে এর মিল খুবই অন্তরঙ্গ।" (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১১৮) *বিসর্জন* কাব্যনাট্যের আখ্যানে যে ভাববস্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে বিন্যস্ত হয়েছে; *মালিনী* নাট্য-আখ্যানে তা সংহত হলেও সুদৃঢ়। মালিনী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্ক্ষিত হৃদয়ধর্মের সারসত্তার অনুসন্ধান করেছেন। মূলত: "অখণ্ড শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানুষের সত্যধর্ম। ইহা মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্ম পৃথিবীতে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে বিগলিত করে। যে-ধর্ম মানুষের অন্তরকে উদার মহৎ করে, যে-ধর্ম মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা উৎসারিত করে। তেমনি এক ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" (কনক, ১৯৫০ : ১৪৭)

- ***রক্তকরবী* (১৯২৬)**

রক্তকরবী কাব্যনাট্যের আখ্যান প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে: 'অবরুদ্ধ আত্মা কি করে? সে নিরন্তর মুক্তি পাইতে চায়, তাহার রুদ্ধ অবস্থাকে ভাঙিয়া বাহির হইতে চায়। তাই মানুষ বিরাট কতু-শক্তিকে পদানত করিলেও, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার শত আয়োজনের মধ্যেও প্রকৃত তৃপ্তি পায় না, শান্তি পায় না–আনন্দ পায় না। তাহার বৃহত্তর অংশ-পরিপূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহার তো সার্থকতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, শান্তি নাই; তাই সে আরো চাই, আরো চাই করিয়া নিরন্তর ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন, পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও শান্তি সে কখনই পায় না। আত্মার মুক্তিতেই মানুষের পরিপূর্ণ জীবনোপলব্ধি– প্রকৃত আনন্দ ও সন্তোষ লাভ হয়। বদ্ধ আত্মার মুক্তি ঘটিলেই তাহার জীবনের আনন্দময় স্বরূপকে ফিরিয়া পায়।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ৩১১–৩১২) এটি রবীন্দ্রনাথের বদ্ধ আত্মায় আলো সঞ্চারের কাব্যনাট্যিক প্রয়াস। এ কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপুরীর ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় খনিশ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণা, ক্রোধ, সংঘাত ও বিদ্রোহের আখ্যানে মানবীয় শুভচেতনা, বদ্ধতার বিপরীতে মুক্ততার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন স্বকীয় শিল্পভাবাদর্শ ও প্রকরণকৌশল অবলম্বনে। 'রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পরিচিত, আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে *রক্তকরবী* (১৯২৬)। এ নাটকের নান্দনিক সৌন্দর্য অসাধারণ।' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ৩০৬) এ কাব্যনাট্য-আখ্যানে:

> নন্দিনীর আহ্বানে রাজার শ্রেণীবন্ধন লুপ্ত হয়, সে আহ্বানও সম্মিলিত শক্তির ধারক, সামাজিক সংহতির প্রতীক। এরকম মুক্তির প্রকল্প *বিসর্জন বা রাজা* নাটকেও পূর্বাপর অঙ্কিত হয়েছিল, সেখানে জয়সিংহের আত্মবিসর্জন ছিল ব্যক্তির মানসিক তদন্ত ও আত্মসিদ্ধান্তের সূচক, রঘুপতির মুক্তিলাভও ছিল একক ব্যক্তির মানসপরিবর্তন মাত্র।

*রক্তকরবী*র অদৃশ্য চরিত্র রঞ্জনের আত্মোৎসর্গ অনুরূপ অর্থে একমাত্রিক নয়, তার আত্মদান মানবপ্রজাতির বৃহৎ তাৎপর্যের মধ্যে অঙ্গীভূত। মানুষকে গভীর কিছু পেতে হলে বড় কিছুর আত্মোৎসর্গ ঘটাতে হয়। আত্মবিসর্জনকে মানবগোষ্ঠীর সমবেত মুক্তির অপরিহার্য নিদানরূপেই রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছেন। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৭২)

৪.১.২ রোমান্টিকতা, মানবতাবাদ, বিশ্বায়িত জীবন দর্শন ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজনসত্তা রোমান্টিক অনুভাবনায় সদা সক্রিয় ছিল। 'বাংলা কবিতায় রোমান্টিকতার সর্বপ্লাবী প্রকাশ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের। ... কল্পনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা য়ুরোপীয়-কোলরিজীয় ধারণাকে অতিক্রম করে গেছে বিপুলভাবে। তাঁর কল্পনাতত্ত্বে সৃজনশীলতার মৌলধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় বৈষ্ণব লীলাবাদ এবং সত্যান্বেষণের অতিরিক্ত মাত্রিকতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে য়ুরোপীয় রোমান্টিকদের পার্থক্যসমূহের একটি হলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ঐক্যসূত্র সন্ধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা।' (খোন্দকার, ২০১৩ : ২৭) তাঁর কবিস্বভাবের এ বৈশিষ্ট্য কাব্যনাট্য সৃজনের শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে সক্রিয় থেকেছে।

> প্রাকযৌবনে বৈষ্ণবীয় প্রচ্ছদে কৃষ্ণ আর মৃত্যু তুল্যমূল্যে পরিগৃহীত হয়েছিল রোম্যান্টিকতা-পরিস্রুত রবীন্দ্রচেতনায়। মৃত্যুকে রোমান্টিক সংবেদনায় অনুভব ও প্রত্যক্ষ করবার এই মানসতা রবীন্দ্রচিত্তে প্রাক্-প্রৌঢ়াবস্থাতেও ছিল অক্ষুণ্ন। কিন্তু জীবনের মধ্য পর্যায় থেকে শেষ অবধি মৃত্যু রবীন্দ্রভাবনায় রোমান্টিকতা থেকে মিস্টিকতায়, দুঃখ-বেদনাসঞ্চারী সংরাগ থেকে প্রশান্তিময় উত্তরণে, 'প্রগাঢ়, দুর্ভেদ্য' মহান্ধকারের বিপরীতে নবজন্ম বা জন্মান্তরের আলোকবিভায় সমুদ্ভাসিত। (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৩২)

কালের সামূহিক সংকট উত্তরণে, ব্যক্তিহৃদয়ের দ্বন্দ্ব-বেদনায় ভিন্নতর মাত্রা যোজনায় কিংবা নর-নারীর হৃদয়-সংশ্লিষ্ট কাব্যনাট্য আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ মীমাংসা খুঁজেছেন রোমান্টিকতার আবহে। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে অর্জুনকে দেখে চিত্রাঙ্গদার অনুভাবনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> সরল সুদীর্ঘ দেহ
> মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
> সম্মুখে আমার– ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
> ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
> চক্ষের নিমেষে। ...
> 'শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের

বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩০–৩৩১)

তাছাড়া 'রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল বিষয় মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের, প্রকৃতির, বিশ্বজগতের সম্পর্কটাই সেখানে মুখ্য, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক গৌণ।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ২৯) মানবজীবনের পটে ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন তিনি। 'মানবিকতা তাঁর সকল সৃষ্টির প্রাণ, বিশ্বজন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।' (বসুধা, ১৩৬৭ : ১৪৮) উল্লেখ্য:

> মানুষের ধর্ম আর মানবসত্য এক। রবীন্দ্রনাথের বোধি ও অভিজ্ঞতা থেকে তা উৎসারিত। পৃথিবীর কোনো সাহিত্যের কোনো কবি বা সাহিত্যিকের পক্ষে এসব ধর্মজিজ্ঞাসার পরিচয় আমরা পাই না। ... প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষের বাইরের সমৃদ্ধি, যে সত্যে আত্মার সমৃদ্ধি সেই গুহাহিত শক্তিকে সাধনা করে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। (গৌতম, ২০২৩ : ৬৬)

যুক্তিহীন বিশ্বাস এবং আচার-সংস্কারের যান্ত্রিকতা ও শূন্যতা কাব্যনাট্যকারকে পীড়া দিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের যেসব কাব্যনাট্য বিশ্লেষিত হয়েছে, সেগুলোর সারবস্তুতে এ মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বিশেষত, *বিসর্জন* ও *মালিনী*-র নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথর ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণ করেন। '' 'বিসর্জন'-এর মধ্যে দেখা যায় যুক্তিহীন শাস্ত্রাচার ও চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে চিরন্তন মানবধর্মের সংঘর্ষ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ শাস্ত্রধর্মের সাথে বিশ্বধর্মের দ্বন্দ্ব-পুঁথির বিধানের সাথে প্রেমের বিধানের বিরোধ। এই দ্বন্দ্বে পরাজিত বিপুল শক্তিশালী রঘুপতির জীবনের ট্রাজেডিই এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। 'মালিনী'তেও এই দ্বন্দ্বই রূপায়িত।'' (কমলেশ, ২০১৫ : ৫১) দৃষ্টান্তস্বরূপ, রঘুপতি প্রথানুগত্য অতিক্রম করে মানবধর্মের প্রকৃত আলোয় আলোকিত হয়।

কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২১)

প্রথাবদ্ধ ধর্মভাবনা অতিক্রমণের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বমানবে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব, আর মানুষের ধর্ম হল মানুষের পরিপূর্ণতা, এবং এই পরিপূর্ণতাবোধ রবীন্দ্রমানসের বিশ্বানুভূতি ও সমগ্রতাবোধে ঐকান্তিক।' (সৈয়দ আকরম, ১৪২১ : ২৭) সর্ব-মঙ্গলময় ভাবনায় উজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ তাই কালে কালে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন।

> আজকের যুগে মানবতাবাদের সপক্ষে সেদিনের মনস্বী রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও রোমা রোলার আদর্শ সর্বৈব প্রাসঙ্গিক। আজো ধনতান্ত্রিক বীভৎসতায় গড়ে ওঠা ফ্যাসিস্ট দানবের আগ্রাসন শুভবুদ্ধির অগ্রযাত্রাকে বারবার বাধাগ্রস্ত করছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণা সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। বলা হয়, মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান। কিন্তু সভ্যতার শিরে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার নিঃস্বের ওপর বিত্তবানের বঞ্চনা এখনও দানবীয় মূর্তিতে সক্রিয়। মানবতাবাদ ও মানবাধিকারের জন্যে আজও রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন ও রোমা রোলাঁর চেতনার শরণ হতে পারে আলোর দিশারি-অন্ধকার অপনোদনের হাতিয়ার। (অনীক, ২০১২ : ৩০১)

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও পঠন-পাঠনের সূত্রে আহরিত জ্ঞানের সূত্রে বৈশ্বিক বোধে সমৃদ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি সমন্বয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন: এর ইতিবাচকতাকে জীবনে ও শিল্পে ধারণ করার প্রয়াস যেমন পেয়েছিলেন; তেমনি এর নেতিবাচকতাও চিহ্নিত করেন, তবে তা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নয়। 'ইংরেজ নিজেদের প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, কিন্তু প্রিয় করে তোলেনি, এটি তাঁর সিদ্ধান্ত।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ৫২) তাই তাঁর আজীবনের সাধনা ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে; যোগাযোগে নয়। কেননা:

> রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা সম্পর্কেই মৌলিক প্রশ্ন তোলেন: ইয়োরোপ আর আমাদের দেশের ইতিহাস যে এক ছন্দে গায়কীতে চলেনি, একথা অপকটেই বলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিমের মানবসভ্যতায় যে সদর্থক ভূমিকা তাকে কেবল প্রতীচ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদ বলে খারিজ করেননি। সংযোগের এক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে তিনি বুঝেছিলেন পশ্চিমের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ বিস্তার যেমন ইতিহাস তেমনি ঐ পশ্চিমের মধ্যেই এর বিরোধী স্বর আছে। পশ্চিমের শিল্প-সাহিত্যে কান পাতলে সে স্বর শোনা যায়। পশ্চিম আমাদের এখানে এসেছে উপনিবেশের বিকারের মধ্য দিয়ে, তার ধনতান্ত্রিক আলোকদীপ্তি আমাদের দেশে ছড়িয়েছে ঔপনিবেশিক অন্ধকার। কিন্তু ঐ অন্ধকারের আড়ালে থেকে গেছে অন্য আলো। রবীন্দ্রনাথ ঐ আলোকে প্রত্যাখ্যান করেননি, জাতীয়তাবাদী ঝোঁকে পশ্চিমের বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজ ইতিহাসে স্বাধীনভাবে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাদের চরিত্ররই বদল ঘটিয়ে। উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদীদের মতো রবীন্দ্রনাথ এও ভাবতেন না যে, দেশজ সাংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিন্যস্ত খণ্ডীকৃত সংগ্রামই শেষ কথা। (পার্থপ্রতিম, ২০১৭ : ৩৫)

তিনি যেন জানতেন: 'সীমাবদ্ধ-শোষিত-কুণ্ডলায়িত উপনিবেশেই প্রসারিত হয়েছিল বুদ্ধি ও কল্পনার সীমা, পরিশীলিত হয়েছিল মানবসভ্যতার উত্তরাধিকার ও নতুন সৃজনের দ্বিরাবর্ত। ইয়োরোকেন্দ্রিক বুর্জোয়ার জীবনাদর্শ ও চিত্তজগৎ, তাদের বণিক-পুঁজির আগ্রাসী বিস্তার ও প্রভুত্ববাদের স্নেহশাসন-প্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছিল আমাদের ভাববিপ্লব আর রূপরচনার বৃক্ষলতা-গুল্ম।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৬৭) প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে: 'সমাজ-বিপ্লবী গ্রামসির মতে, আত্মসমীক্ষাই হচ্ছে উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রাথমিক সূত্র; মানুষের আত্মবোধ ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাই হচ্ছে বেঁচে থাকার সংজ্ঞার্থ। এ লক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের সবটুকু পরিসরই নিবেদিত, সমস্ত সৃষ্টিকর্মে তিনি খুঁজেছেন আত্মসমীক্ষার দেশজগৎ-কল্পনাবিশ্ব, নরনারীর সম্পর্ক ও প্রথাধর্মের বিকল্প রূপ।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৭০)

পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে প্রাচ্য নাট্যরীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে কখনওবা প্রথমোক্ত রীতি অতিক্রমণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নাট্যমানস স্বস্তি অন্বেষণ করেছে, কিংবা বলা চলে শিল্পের প্রতি দায়বোধ রক্ষা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যের সমৃদ্ধ আঙ্গিকসমূহ, বিশেষ করে যাত্রা, পাঁচালি, লোকগল্প, পালা প্রভৃতি তাঁর নাটকের আঙ্গিক বিনির্মাণে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর এই সচেতন প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে *রক্তকরবী* নাটকের নাম করতে পারি। কারণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটকটির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'নন্দিনীর পালা'। তবে রবীন্দ্রনাথ এসকল নাট্যআঙ্গিক প্রয়োগ করে বাঙলা নাট্যের সহস্র বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে অঙ্গীকরণ করেছেন।' (কমলেশ, ২০১৫ : ০৮) নাটকের রীতি পাল্টে দিয়ে কিংবা চরিত্রায়ণ কৌশলে তাঁর এ শিল্পপ্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে।

> এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, উপনিবেশ-পূর্ব অতীতের চেতনা তো থাকবেই, কিন্তু তার শৃঙ্খল যেন না থাকে। ঔপনিবেশিক যুগ যেহেতু আমাদের দেশকে সত্তা ও ইতিহাসছাড়া করেছে, তাই দেশকে সৃষ্টি করতে হবে– যে সৃষ্টি অন্তর্জগতের, মনকে অ-ঔপনিবেশিক করার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের রথের রশি তাই শূদ্ররাই টানে, যারা ঔপনিবেশিক আলোকায়নের শিকার নয়। (চিরঞ্জীব, ২০১৬ : ১৯৭)

ফলে উপনিবেশের কাঠামোয় থেকে এর বিরোধী চেতনার উৎসারণে সর্বতোভাবেই রবীন্দ্রনাথ প্রতীকী শিল্পচেতনার আশ্রয় নেন। বর্তমান গবেষণায় বিশ্লেষিত প্রতিটি কাব্যনাট্য-আখ্যানের প্রসঙ্গে এ সত্য প্রতীয়মান হয়। এমনকি 'প্রথাগত নাটক রচনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের মুক্তির কথা ভাবেন।' (দেবাশিস ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ১৫) সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণীয়: 'রবীন্দ্রনাথ, বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক

ভাবনা, অর্থাৎ প্রাচ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন নিজের বা ভারতীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তেমনি গড়ে তুলেছেন মতাদর্শিক-বৌদ্ধিক প্রতিরোধ; আর এভাবেই তাকে উপনিবেশবিরোধী উত্তর-আধুনিক ভাবুক হিসেবে উপস্থিত হতে দেখি। (মাসুদুজ্জামান, ২০১২ : ৩০৪)

৪.১.৩ কাব্যনাট্যের আখ্যানতাত্ত্বিক বিবেচনা

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের ক্রম-রূপান্তরশীল নাট্যপ্রয়াসের উজ্জ্বল প্রান্ত কাব্যনাট্যসমূহ। 'সৃষ্টিশীল প্রতিভা নিরবলম্ব বা স্বয়ম্ভু নয়– ঐতিহ্য, পরিবারবৃত্ত এবং সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতির মৃত্তিকা-গভীরে শেকড় সঞ্চার করেই তার উৎসারণ। কোনো শিল্পী ব্যক্তিত্ব এসব কারণেই অন্তর্জগতে কখনো হয়ে ওঠে বিপন্ন, বিচূর্ণ, অস্থির; কিংবা সুস্থির থাকে অবিচলিত জীবনবোধে।' (মোমেনুর, ২০২২ : ৩৩২) আর তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে স্থিত সময় ও সভ্যতা বিষয়ক বিবিধ ভাবপ্রকল্প, রোমান্টিকতার বোধ, মানবতার বোধ, আন্তর্জাতিকতা দৃষ্টিভঙ্গি, কলোনিয়াল শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধের সাধনা, প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা, বিশ্বায়িত জীবন দর্শন রূপক ও প্রতীকী শিল্পচেতনার সংশ্লেষে কাব্যনাট্যের আখ্যানসমূহ বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তিনি 'রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে যখন এক বহির্মুখ, বাস্তব আখ্যানভাগকে অবলম্বন করে ঘটনাসঙ্কুল দীর্ঘ নাটক লিখেছেন, তখন দেখা যায় পাত্র-পাত্রীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা মূলত একটা বিশিষ্ট আদর্শ ও ভাবের দ্বন্দ্ব, ঘটনাবহুল আখ্যানের পিছনে সেই তত্ত্বই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় । কাব্যনাট্যেও সেই ভাব ও আদর্শের দ্বন্দ্বই পরিলক্ষিত হয়। তারপর কবি বাস্তবপন্থী আখ্যানভাগ ত্যাগ করে তার নিগূঢ়ভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশের জন্য নতুন এক আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।' (কমলেশ, ২০১৫ : ৫২-৫৩) এ গবেষণায় তাঁর কাব্যনাট্যসমূহের আখ্যানতাত্ত্বিক বিবেচনা তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষিত হয়েছে।

ক) আখ্যান পটভূমি: নাট্যসূত্র ও দর্শন

খ) নির্মাণ পরিকল্পনা ও সৃজনের মূলনীতি

গ) কাহিনি বিন্যাস

. আখ্যান পটভূমি: নাট্যসূত্র ও দর্শন

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্র-মানসে বিপরীতমুখী দুটি বোধ ক্রিয়াশীল: **ক)** পার্থিব বোধ ও **খ)** অপার্থিব বোধ। অর্থাৎ কখনো তিনি বাস্তব পৃথিবীর বুকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট, কখনও ভাবময় আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি। 'অন্তর্দৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ জগৎ

ও জীবনকে সত্য করিয়া দেখিয়াছেন, খণ্ডের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে।' (চারুচন্দ্র, ১৩৬৭ : ৪৭) এ দুটি বোধের প্রথমটি বাহির পানে হাতছানি দেয়, অপরটি ঘরের পানে। এটি হলো রবীন্দ্রনাথের সীমা ও অসীমের জীবন অভিজ্ঞান। 'সীমা থেকে অসীমে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে অভিযাত্রায় যার কবিদৃষ্টি সর্বদা আত্মজাগর, তিনি কেবল পারেন দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেকে বিশ্বজনীন করে প্রকাশ করতে। রবীন্দ্র-সৃষ্টিলোকে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সমাজ-সন্নিধান সবসময়ই সর্বমানবের আদর্শকে ঘিরে আন্দোলিত হয়েছে।' (অনীক, ২০১২ : ২৯৩) বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের ঐকান্তিক যোগের স্মারক *প্রকৃতির প্রতিশোধ* কাব্যনাট্য। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'– এই ভাবতত্ত্ব।" (কনক, ১৯৫০ : ০৬) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ১৬১)

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্যন্তিক যোগ এ নাট্য–আখ্যানের পটভূমিকার সূত্র ও দর্শন পরিস্ফুট করবার মৌল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত '*প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪) নাটকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত কবিতা ও নাটককে মিশ্রিত করেন এবং সীমা-অসীম তত্ত্বের রূপাদর্শ নিরূপণে হয়ে ওঠেন অনুভাবিত।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬০) *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১৮৮১) নাটকের সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন একই কথা:

> একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে উৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১)

সীমা-অসীমের দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে কাব্যনাট্যকার রবীন্দ্রনাথ জগৎ-জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় দার্শনিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এ কাব্যনাট্যে। 'আসলে বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংঘাতে গ'ড়ে-ওঠা নাটক এটি নয়, এ-নাটক সৃষ্টি

হয়েছে বিপরীত ভাবের সংঘাতে।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮২) অর্থাৎ, নাট্য-আখ্যান পটভূমিকায় রূপান্বিত হয়েছে রবীন্দ্র-চিত্তের দুই বিপরীত ভাবদ্বন্দ্ব: সীমা-অসীমের মিলন সাধন।

> রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর সীমা-অসীমের মিলন সাধনের সুর। (অশোককুমার, ২০১১ : ২৫৯)

বিপরীত ভাবের এমন শিল্প-সামঞ্জস্য নির্মাণ রবীন্দ্র-মানসের সহজাত প্রবণতা। বলা যায়: 'সামঞ্জস্য-চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবনার্থের অঙ্গীভূত।' (ভীষ্মদেব, ২০০৪ : ৭৮) কারোয়ারের সমুদ্রবেলার অভিজ্ঞতাকে এ আখ্যানে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সমন্বয়ে উপস্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা-সূত্রে জানা যায়:

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল–এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম–বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ১৬১–১৬২)

প্রকৃতি-বিচ্যুত আত্মমুখী জীবনযাপনের অস্বস্তি ও আনন্দহীনতা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি আনন্দ ও স্বস্তি ফিরে পেলেন বিশ্বপ্রকৃতির বুকে বিচরণের মধ্যে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে বন্ধ জীবন হইতে মুক্তির আনন্দ ব্যক্ত।' (কনক, ১৯৫০ : ১৬) এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও নাটকের মিশ্রণ ঘটিয়ে সীমা ও অসীমের তত্ত্বীয় কাঠামোকে নান্দনিক রূপ দেন। বালিকা চরিত্রের অন্তর্লোকের আলোয় শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসীর অন্তর্লোক আলোকিত হলো। সংসারের সীমার মধ্যেই অসীমের সন্ধান পেয়ে সন্ন্যাসীর জীবন সার্থক হয়ে উঠল, তাঁর মুক্তি ঘটল। 'রবীন্দ্র রচনা আসলে বিশিষ্ট মনের বিশিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়ার ইতিহাস। জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথের মন বা ব্যক্তিত্ব যেমন বিশিষ্ট, তেমনি ক্রমবিবর্তনশীল বাঙালী সমাজের বিশেষ একটি পর্ব হিসাবে রবীন্দ্র-পরিবেশও বিশিষ্ট। সুতরাং রবীন্দ্র-মানস যেমন নিরপেক্ষ নয়, রবীন্দ্র-পরিবেশও তেমনি অনির্দিষ্ট এবং অহেতুক কিছু নয়।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১০৭) রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে এরই প্রতিধ্বনি:

> জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত। তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য

> খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। ... শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৫)

এ মুক্তি স্বয়ং কবির। একে বলা যায় কবির আত্ম-অনুসন্ধানের নাট্যরূপ। আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মমুক্তির যে পথ রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানে খুঁজে পেলেন, তা একেবারে অভিনব। এ অনুসন্ধানের সূত্রে '' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে বৈরাগ্য-বিরোধিতা ব্যক্ত করেছেন তাতে পরিবেশের চাহিদাই ফুটে উঠেছে।'' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১১৫) এ কাব্যনাট্যের ভাবসত্য, দর্শনবোধ সমস্তই প্রকৃতির আশ্রয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। অর্থাৎ:

> তাঁর নাটকে পরিবেশের চাহিদায় তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছেন সেই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর নাটকে যে চিন্তা বা দার্শনিক ভাবনা ও দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে তা ঐ যুগেরই দার্শনিক সমস্যাকে, রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সংস্কারকে প্রতিফলিত করেছে এবং সেই চিন্তায়, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি পক্ষে যোগ দিয়েছেন এবং অন্য পক্ষকে আক্রমণ করেছেন–এক কথায় তিনি পরিবেশের সঙ্গেই বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছেন। (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১০৯)

এই বোঝাপড়ার শিল্পিতরূপে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন তাঁর মুক্তির প্রকল্প। মুক্তির প্রকল্প নির্মাণের ক্রমধারাও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে সুচিহ্নিত। ''... 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনও যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই নাট্যরূপ ব'লে গ্রহণ করা চলতে পারে। অবশ্য নাট্যরূপ দেবার প্রক্রিয়ায় ক্যানভাসটি বিস্তৃত হয়েছে এবং রঙের বৈচিত্র্যও বেড়েছে অনেকখানি। ইতিমধ্যে লেখক অবশ্য 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র কৈশোরক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠেছেন এবং অন্ততপক্ষে একটা মোটামুটি রকমের বিশ্বচেতনা আর পুরুষার্থের ধারণাও গ'ড়ে নিয়েছেন মনের মধ্যে।'' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৩) এতে সংগুপ্ত রয়েছে তাঁর পরিপক্ব শিল্পমননের প্রচ্ছাপ: যা অনায়াসেই পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা ও রীতি-প্রকৃতিকে অতিক্রম করে চলে। 'প্রথাবদ্ধ কাঠামোর বন্ধনমুক্তির প্রকল্প রচনায় সেসব আলোড়ন ও সন্ধান পরিব্যাপ্ত হয়েছে, আমরা এই মুক্তিকল্পনার মধ্যে কাব্যনাট্যের নিহিতরূপটি বুঝে নিতে পারি।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬১) এ কাব্যনাট্যের আখ্যানপটে আরেকটি যুগান্তরকারী সংকট উন্মোচিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে:

> এই নাটকের মধ্যে লেখকের অজ্ঞাতে একটি বৃহৎ সামাজিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছিল। সেটি হইতেছে 'অচ্ছুৎ' সমস্যা। ... এই সামাজিক ব্যাধি আত্মকেন্দ্রিক আত্মসংগ্রাম হইতে কম জটিল নহে। (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭৫)

আর এভাবেই: ''ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় কৃত্য ও আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে মানবতাবাদী যে চেতনা রবীন্দ্রনাথে বিকাশ লাভ করেছিল। তারই প্রাথমিক প্রকাশ ঘটেছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। তাই এখানে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কাব্যনাট্যগুলোর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।'' (শান্তনু, ১৯৮৫ : ৪০) সসীম-অসীমের দর্শন, মানববোধ, আত্মসংগ্রামের তত্ত্বকথা, সমাজের নিবিড় চিত্র সব মিলিয়ে বলা যায়: 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক।' (অনুপম, ২০১০ : ১৭) একইভাবে, রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র প্রেমদর্শনের আলেখ্য হিসেবে পরবর্তী কাব্যনাট্যটির আখ্যান পটভূমি তাৎপর্য লাভ করেছে।

রাজা ও রানী

এ কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমিতে স্থান পেয়েছে প্রেম বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের দর্শন ভাবনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমভাবনার নানা রূপ-রূপান্তর লক্ষণীয়। '' 'রাজা ও রানী'-রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র ভাবচক্রের মধ্যে ছিলেন। তখন প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রধানত তাঁহার ভাব ও চিন্তা কেন্দ্রীভূত। সেই ভাব ও চিন্তা 'মানসী'র অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এবং 'রাজা ও রানী' নাটকে সেই ভাব-চিন্তাই প্রকাশ পাইয়াছে।'' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৭) *রাজা ও রানী* রূপকথার কিংবা ইতিহাসের আখ্যান নয়। অর্থাৎ

> রূপকথার কাহিনী রাজা রানীর গল্পে মোড়া– দু'চারজন অন্যজনা সেখানে ঠাঁই পেতে পারে মাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' রূপকথার নয়, রূপের নাটক। তাই এতে বস্তু পৃথিবীর বিষয় ভাব আর আবেগ বড় স্পষ্ট। (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৫)

এ আবেগ রবীন্দ্রচিত্তের প্রেমভাবনা-সংশ্লিষ্ট। 'দেশের কাব্যসংসারে প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কামের বাহুপাশ হইতে কবি প্রেমকে উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়াছেন। ... নারী দেবী হইয়াছে ... কবি মিলনকে সংযত রাজশ্রী দান করিয়াছেন, বিরহকে তপস্যায় পরিণত করিয়াছেন।' (চারুচন্দ্র, ১৩৬৭ : ৩৪) এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে: 'রাজা ও রানীর মধ্যে দেখা যায় প্রেমকে সংকীর্ণ ভোগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে কেবলমাত্র লালসাতৃপ্তির উপায় স্বরূপ মনে করলে প্রেম হয়ে ওঠে জ্বালাময়, অতৃপ্তিকর ও নানা অনিষ্টের মূল। বিক্রমদেবের জীবনে এই ভোগাকাঙ্ক্ষামূলক প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগ প্রতিহত হওয়ায় প্রতিহিংসায় পরিণত হয়ে তার জীবনে দারুণ ট্রাজেডি সৃষ্টি করেছে। প্রেমের প্রতি কবির এ এক সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গি। 'ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে মানব, হৃদয়ের ধন কভু ধরা দেয় দেহে?' এই ভাবধর্মী শান্ত, সংযত, দেহাতীত, বিশুদ্ধ প্রেমই রবীন্দ্রনাথের প্রেম, এই

প্রেমই মানসীর যুগে যুগে নানা অনবদ্য লিরিকে আত্মপ্রকাশ করেছে।' (কমলেশ, ২০১৫ : ৫০–৫১) রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের সূচনায় সুস্পষ্টভাবে সে-কথা জানিয়েও দিয়েছেন:

> প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে দ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।' এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।–
>
> এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
> প্রেম মেলে না।
> শুধু সুখ চলে যায়
> এমনি মায়ার ছলনা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৬৭)

এ নাট্য-আখ্যানের পটভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ *তপতী* নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন: 'সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে– সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৬৯) অর্থাৎ, 'একান্ত ভোগলোলুপ প্রেমের মোহগ্রস্ত, বাস্তবপরিবেশ চেতনাহীন রাজার নিকট সত্যকার প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও এই মোহের শোচনীয় পরিণাম-প্রদর্শনই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২২) আবার, তিনি *বিসর্জন* কাব্যনাট্যে জীবরক্ত দিয়ে পূজা প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন মানবপ্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে।

বিসর্জন

বিসর্জন কাব্যনাট্যে আচারসর্বস্ব ধর্মের বিপরীতে মানবধর্মের সারসত্যকে দাঁড় করিয়ে যুক্তির মাধ্যমে মানবধর্মের বিজয় সূচিত হয়েছে। '' 'বিসর্জনে' দেখিয়েছেন– জ্ঞান-প্রেমহীন কর্মের অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাসের সংস্কারের-উপলব্ধিহীন আচারের বিকৃতির রূপ।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১৬২ বলিপ্রথার মতো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-আচার মানবের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না– রবীন্দ্রনাথ এ জীবনসত্যকেই বড় করে তুললেন আলোচ্য কাব্যনাটকে। 'এই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি হইতেছে–ধর্মের অর্থহীন অন্ধসংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথার সঙ্গে নিত্য-সত্য মানবধর্ম বা হৃদয়ধর্মের; মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের; মানষের রচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়ের পরম সত্য প্রেমের; হিংসার সঙ্গে

অহিংসার।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮) বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কখনো শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। তাঁর নিকট মানুষই সত্য ও চিরন্তন মূল্যবোধের আধার। "বিসর্জন নাটকে প্রেম ও প্রথার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সে দ্বন্দ্বে প্রেমের জয় দেখানো হইয়াছে।" (কনক, ১৯৫০ : ০৭) নাট্য-পটভূমিতে দ্বন্দ্ব চমৎকারিত্ব লাভ করেছে দুই প্রবল শক্তির প্রতিক্রিয়ায়। 'প্রথম পক্ষের শক্তিকে প্রাণরস যোগাইয়াছে চিরন্তন সত্য ও প্রেমের প্রতিমূর্তি অপর্ণা; দ্বিতীয় পক্ষের শক্তি যোগাইয়াছে রানী গুণবতীর অবোধ সন্তান-কামনা, অল্পবুদ্ধি নক্ষত্র রায়ের রাজ্যলোভ এবং গঙ্গলিকাপ্রবাহে ভাসমান সংস্কারচালিত প্রজাসাধারণ। দুই বিরুদ্ধশক্তির মাঝখানে জয়সিংহ কেবলই সন্দেহ-দোলায় দুলিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত উহার নিরসন করিতে না পারিয়া দ্বন্দ্বের মূলে আত্মবিসর্জন দিয়া মিথ্যা ধর্মবোধকে সচেতন করিয়াছে, রক্তস্রোতের মধ্যে অমৃতপ্রবাহ আনিয়া দিয়াছে।' (কনক, ১৯৫০ : ৮৭–৮৮) মূলত:

> আশি বৎসর বয়সে তিনি যে শেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন ('সভ্যতার সংকট') তাতে তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেন, 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।' এই বিশ্বাসের প্রথম আবেগোচ্ছল প্রকাশ আমরা পাই 'বিসর্জন' নাটকে। (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৯)

রেনেসাঁসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাটকে মানবধর্মের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। রেনেসাঁ ইউরোপের নবযুগ সৃষ্টিকারী ঘটনা। মধ্যযুগীয় পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ইহলৌকিক দৃষ্টি, মর্ত্য ও মানবপ্রীতি প্রভৃতি রেনেসাঁসের প্রধান প্রবণতা। রেনেসাঁসের ফলে মানুষ লাভ করেছে চিন্তার স্বাধীনতা। বেদাচার, শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের শাসন ও বন্ধন থেকে মানবের মুক্তি মিলল। রেনেসাঁসের ফলে যে মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটল, রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের কেন্দ্রীয় ভাবসত্য হিসেবে সেটিকেই গ্রহণ করলেন। তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুকূল অকল্যাণকর ধর্মবোধ বিপরীতে মানবীয় প্রেমময় ধর্মবোধ স্থাপন করে এই চেতনার প্রতিফলন ঘটালেন যে, মানুষের চেয়ে মানুষের গড়া সংস্কার বড় হতে পারে না। ''সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুর নিপুণ বিন্যাস-কৌশলে, ঘটনার দ্রুত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকারিত্বে পাত্রপাত্রীর অন্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত দ্বন্দ্বসংঘাতময়, বেগবান রূপের প্রকাশে, মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা তাঁহার বহু-পঠিত ও বহ-প্রশংসিত নাটক। রূপক-সাংকেতিক-গণ্ডীর বাহিরে যে-সমস্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।'' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮) *বিসর্জন*-এর মতো *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমি আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আখ্যানবস্তু নির্মাণে বৈশিষ্ট্য হিসেবে আবিষ্কার করা যায় যে, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার ভাববস্তু নির্মাণে কল্পনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি। শেকস্পিয়রের মতো তিনিও অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং নাটকের ভাব প্রাচীন সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্ন থেকে পাওয়া ভাব-বীজ অবলম্বনেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ৩২৭) *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের আখ্যানবস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে– তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক। এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২৭)

প্রকৃতিলোকে সঙ্গে *মহাভারত*-এর চিত্রাঙ্গদার কাহিনির অদল-বদল ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমি নির্মাণ করেন। 'চিত্রাঙ্গদার কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন মহাভারতের আদিপর্ব থেকে। ... নাটকের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর সেই প্রেমোপলব্ধিকেই কাব্যিক ভঙ্গিতে শিল্পিত করেছেন। (অশোককুমার, ২০১১ : ২৭) *মহাভারত*-এ অর্জুন দ্বাদশ বর্ষের বনবাস-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে: 'উলুপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তার পর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মণিপুর এলেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা

চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, 'আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি পুরুষের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকে আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে– এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পার। অর্জুন সেইরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং মণিপুরে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হ'লে চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন ক'রে পুনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন।' (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ১৪১৮ : ৯৩-৯৪) স্বকীয় শিল্পচেতনা ও জীবনভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমিকায় চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের পৌরাণিক অনুষঙ্গ পুনর্মূল্যায়ন করলেন। 'চিত্রাঙ্গদায় দেখা যায়, দেহের সৌন্দর্যের সাথে হৃদয়ের সৌন্দর্য, রূপজ মোহের সাথে সত্যকার প্রেমের, প্রণয়নীর সঙ্গে কল্যাণী গৃহিণীর, ঊর্বশীর সাথে লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানই রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।' (কমলেশ, ২০১৫ : ৫১) অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-বিশ্বাসের নিত্যসত্যের অভিব্যক্তি অনুভব করা যায় তাঁর এই *চিত্রাঙ্গদার* মধ্যে। (হরপ্রসাদ, ১৩৭০ : ২৩৭) এ কাব্যনাট্যে আখ্যান পটভূমি প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমত স্মর্তব্য:

> দেহের সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণের বস্তু, হৃদয়ের সৌন্দর্য তাহা অপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বস্তু। কারণ তাহা চিরন্তন। এই দেহ ও হৃদয়ের– ক্ষণিক ও চিরন্তনের মিলন হইলে প্রেম প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে–রূপজ মোহ সত্যকার প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এইটি মূলভাব। ইহার সহিত জড়িত হইয়া আছে আর একটি ভাব। নারীকে যথার্থভাবে পাইতে হইলে তাহাকে পত্নীরূপে, সহধর্মিণীরূপে পাইতে হইবে, কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভোগের পাত্রী করিয়া রাখিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ : ৬১)

এ কাব্যনাট্যে যেমন প্রেমদর্শনের সূত্রে নারীর উত্তরণ রয়েছে; তেমনি *মালিনী*-র নাট্য-আখ্যানে রয়েছে নবধর্মে পরিস্নাত নারীর জয়গান।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি পর্বে'র কবিতাবলি রচনা করছিলেন। ''এই সময়ে তাঁহার মধ্যে লৌকিক আচার-ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবীয় কল্যাণধর্মকে বড় করিয়া দেখিবার একটি ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। এই অনুভূত সত্য বা 'আইডিয়া'কে তিনি ইতিপূর্বে রাজা ও রানী'র এবং বিশেষ করিয়া 'বিসর্জনে'র মধ্যে রূপময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'মালিনী'র মধ্যেও দেখি অন্তর্লোকের সেই ভাবকে রূপবিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।'' (কনক,

১৯৫০ : ১২৬) একই ভাববস্তু নিয়ে বিসর্জন কাব্যনাট্য রচিত; তবে *মালিনী*তে আখ্যানবস্তুর সংহতি লক্ষণীয়। ''প্রথমদিককার নাটকে রবীন্দ্রনাথ এক একটা আইডিয়াকে গ্রহণ করলেও রসের ক্ষেত্রে এ নাটকগুলির গঠন এক এক ধরনের। আইডিয়ার কেন্দ্রে সব জায়গাতেই অবশ্য রয়ে গেছে এক চিন্তা তা মঙ্গল, মানবমঙ্গল চিন্তা। তা 'রাজা ও রানী'তে হোক, 'বিসর্জনে' কিংবা 'মালিনী'তে– মানবতার উজ্জ্বল আলো যে স্বচ্ছ প্রদীপের নিচে এসে পড়ে সে অংশ মায়াময় হয় বৈকি! 'মালিনী'তে এই মায়াময়তার ছোঁয়া রয়েছে।" (অশোককুমার, ২০১১ : ১২৯) রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে এ নাট্য-আখ্যানের পটভূমি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এ কাব্যনাট্যের 'সূচনা' অংশে আখ্যান পটভূমি প্রসঙ্গে কাব্যনাট্যকার জানিয়েছেন:

> তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। ... বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে। এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে। জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। ... কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল। ... কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হয় থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে, আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়ে ছিল গৌণরূপে ঈষৎগোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে। আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরের নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে। ... বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে', সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪২৯–৪৩০)

বিচারবিবর্জিত অর্থহীন ধর্মের সংস্কারে মানব আত্মা বন্দী থাকে। মনুষ্যত্বহীন লোকাচার ও সংস্কারজাল মানব সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পরিপন্থী। ''এই নাটকের দ্বন্দ্ববস্তুই হইতেছে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের সহিত বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। 'মালিনী' নাটকের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে- যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম, ব্রত-উপবাসই কি কেবল ধর্ম? সর্বজীবে প্রেম ও দয়াধর্ম কি তবে সত্যধর্ম নয়? 'মালিনী' নাটকের দ্বন্দ্ব শাস্ত্রধর্মের সহিত হৃদয়ধর্মের বা মনুষ্যত্ব-ধর্মের দ্বন্দ্ব।" (কনক, ১৯৫০ : ১৪৮) রবীন্দ্র-মানসের মানবধর্মকেন্দ্রিক ভাবনা এ আখ্যানপটে কাব্যনাট্যিক অভিব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে। 'অখণ্ড, শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মই মানবের সত্যধর্ম। লোকধর্ম, রাজধর্ম, সমাজধর্ম, শাস্ত্রধর্ম, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পতিধর্মী, পত্নীধর্ম ইত্যাদি সমস্ত ধর্মই সত্যধর্ম হইতে পারে যদি তাহা শাশ্বত সত্যের উপর, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা না হইলে সেগুলি খণ্ড, ক্ষুদ্র ধর্ম। ... ধর্মবোধের এই বিভিন্ন আদর্শই এই সব নাটক ও কাব্য-নাট্যের নাটকীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তি। মালিনীর মধ্যেও ধর্মের এই বিভিন্ন আদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মত-বিরোধের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হইয়াছে।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৪৪) লক্ষণীয় যে, 'কবি প্রথমে পাশ্চাত্য রোমান্টিক ট্রাজেডির আদর্শে নাটক লিখতে অগ্রসর হন। *রাজা ও রানী*, *বিসর্জন* এবং *মালিনী*তেও কবি সূক্ষ্ম, দ্বন্দ্বসংঘাতময় সুবিন্যস্ত আখ্যানভাগ গ্রহণ করলেও এর বাইরে বিরোধ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের একটা ভাব বা তত্ত্বের উত্থান পতন ও পরিণতির ধারা সুস্পষ্টরূপে আমাদের চোখে পড়ে।' (কমলেশ, ২০১৫ : ৫০) *রক্তকরবী* কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমিতেও রবীন্দ্রনাথের এ প্রবণতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

রক্তকরবী

রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম দিক বিপরীতমুখী ভাবদ্বন্দ্বকে শিল্পান্বিত করা। বন্ধন ও মুক্তি, অসত্যের অন্ধকার ও সত্যের আলো– *রক্তকরবী*র আখ্যানের পটভূমিতে এ ভাবদ্বন্দ্ব সক্রিয় থেকেছে। এ থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তি-সাধনাকে এত দায়িত্বপূর্ণ, এত সর্বব্যাপী এবং এত অপরিহার্য করে তোলা– রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোনো দার্শনিক কবি করেননি।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ৯৭) রবীন্দ্র-সত্তায় আত্মার মুক্তি বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। বস্তুত 'চিত্তের অবরুদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছিলেন।' (শাশ্বত, ২০১০ : ১৬৫)

অর্থ ও ক্ষমতার লোভ কীভাবে মানবজীবনের যাবতীয় অধিকার, স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যের বোধ ধ্বংস করে মানুষকে নিছক যন্ত্র ও উৎপাদনের অতি দরকারি উপকরণে পরিণত করে, রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* কাব্যনাট্য তারই বিরুদ্ধাচারণ ও প্রতিবাদভাষ্য। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় লোভের বন্ধনজালে জর্জরিত মানবাত্মার হাহাকারধ্বনিতে

পীড়িত রবীন্দ্রনাথ জানতেন: 'মুক্তি যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্যে নয়, মুক্তি যে আত্মপ্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করতে হবে। কেননা, আজ মানুষ যেরকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিল না।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৮ : ৯৩) রবীন্দ্রনাথ এর থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেন এ কাব্যনাট্যে।

> সহজ-স্বাধীন-শারীরিক আনন্দময় সত্তাকে বিস্মৃত হয়ে মরীচিকা-সদৃশ এই মায়াময় জড় সম্পদের আরাধনায় মানুষ কীভাবে মত্ত হয়ে পড়েছে, তা তাঁর হৃদয়ে যে ব্যথার জাগরণ ঘটিয়েছিল যক্ষপুরীতে রয়েছে তারই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততায় পৃথিবী আজ সর্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে চলেছে। যন্ত্রসভ্যতার কঠোর নিষ্পেষণে মানুষের প্রাণের স্ফূর্তি লুপ্তপ্রায়। মানবসমাজ পরিণত হয়েছে ধন উৎপাদনের এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রে। (অশোককুমার, ১৪১৭ : ৩৬০)

রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ব-সংঘাত উত্তরণের জন্য আত্মিক শক্তির উদ্বোধন কামনা করেন। মরকরাজের যক্ষপুরীতে উৎপাদন ও সৃষ্টিশীলতাকে বাদ দিয়ে অমানবিক শ্রম মানুষের স্বাভাবিকত্বকে বিনষ্ট করেছে; এমনকি মানুষ আত্মপরিচয় হারিয়ে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। খনিশ্রমিকদের সঙ্গে পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্বে সূচনা এখানেই। সম্পদলিপ্সু মকররাজ কর্তৃক খনিশ্রমিকদের নিঃশেষে শোষণ-পীড়ন ও প্রকৃতির প্রতি অবিচার– এ কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমি এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জানেন:

> লোভমোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিল সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়া তখন ফাঁক ছিল; সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আসত বলে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায় নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম করে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবার সাহস মানুষের চলে গেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৮ : ৯৩)

'জটিল অবান্তর' বাস্তবতাকে অতিক্রম করে 'সরল চিরন্তনকে' গ্রহণ করার শক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসেবে এ নাট্য-আখ্যানের সৃষ্টি। এ আখ্যানের দ্বন্দ্বের উত্তরণ-সূত্র এবং দার্শনিক ভিত্তিভূমি হিসেবে নন্দিনীর সন্নিবেশ ঘটেছে। এখানে প্রেক্ষাপটে নন্দিনী ব্যক্তিবিশেষ নয়; একটি চেতনার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাই: 'আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি, নাটকের নামকরণে *যক্ষপুরী* বা *নন্দিনীর পালা* নামের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত *রক্তকরবী* নামটি নির্বাচন করেছিলেন। *রক্তকরবী* জীবনের সেই স্বতঃচল সত্তা যা আপন শক্তিতে মানবরচিত সকল বিরুদ্ধতা জয় করে নিজেকে বিকশিত করে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৭৩) সামূহিক বিরুদ্ধতার বিপরীতে মানবের এ উত্থানই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। নাট্য-আখ্যানের এ চেতনাকে তিনি দেশ-কাল নিরপেক্ষতায় সংজ্ঞাপিত করেন। কেননা:

ভেবে দেখুন 'রক্তকরবী'র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ। নন্দিনী এবং অপরাপর চরিত্র যে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মানুষের এবং মানুষগত শ্রেণীর, এ-কথাটা মনে করিয়ে দেন কবি নিজেই। তবু তিনি দর্শকদের বলেন : 'শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান, এইটে মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। তাঁর পরামর্শ 'যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তাঁর সার্থকতা চলে যায়'। এইসব জ্ঞাপনে দর্শককে অনুভূতির জগতে মিলিয়ে নেবার আগ্রহই আছে, আবেগের দিক থেকেই তাকে টান দেবার অভিপ্রায়। (শঙ্খ, ২০০৯ : ২১)

খ. নির্মাণ পরিকল্পনা ও সৃজনের মূলনীতি

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য-পরবর্তী নাট্যনির্মাণকলার নিদর্শন হলো কাব্যনাট্য সৃজন। তাঁর প্রথম কাব্যনাট্যিক প্রয়াস *প্রকৃতির প্রতিশোধ*। 'কবির অন্তর্মুখী বালক বয়সটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছিলো ব'লে তিনি খানিকটা নির্জনতাবিলাসী হ'য়ে উঠেছিলেন।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮২) কারোয়ার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবির জীবনভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে এবং তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী শিল্পসাহিত্য চর্চায়। প্রসঙ্গত:

> সত্যেন্দ্রনাথের ছুটি ফুরাইলে তিনি কারোয়ারে ফিরিয়া যান, সেখানে তিনি আছেন ২৯ মে ১৮৮১ সাল হইতে। ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে ফিরিয়া যাইবার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বিরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ কারোয়ারে যাত্রা করেন। ... কারোয়ারের প্রাকৃতিক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মনকে যেমন নানা দিক হইতে স্পর্শ করিতেছিল, পারিবারিক মিলনোৎসবও মনকে তেমনি আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭০-১৭১)

নতুন ও উন্মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শে কবি নতুন নির্মাণকলা ও সৃজনধর্মে উৎসাহী হন। বস্তুত 'কারোয়ার বাস পর্বটা কবির জীবনে সার্থক হইয়াছিল– কবিতা নাটক গানে পূর্ণ।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭১) এ কাব্যনাট্যে কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব যে মুক্তির আবাহনগাথার রচনা করেন, তা মূলত তাঁর অন্তরস্থ নব স্বাদের ও মুক্তির ব্যঞ্জনা। '' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক যখন তিনি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স অল্প; এক সন্ন্যাসীর হৃদ্বৃত্তি প্রত্যাখ্যানের সাধনাকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।" (হুমায়ুন, ২০১৭ : ৯৬) এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মর্তব্য: 'বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্র সীমা থেকে তিনি ব্যক্তিকে একটি বৃহত্তর মানবিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন; হিংসা, লোভ, অহংকার ও প্রতাপের বন্ধন থেকে ভালোবাসা-বিশ্বাসের অন্তর্নাট্যকে খুঁজেছেন। ... এখানে বহিরঙ্গে ঘটনাকেন্দ্রিক মানবস্বভাবকে করা হয়েছে তাৎপর্যমণ্ডিত; নাট্য বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান মানবিক আবেগের সঞ্চালন করে সেই

তাৎপর্যের অন্তর্নাট্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬১) নতুন এ নির্মাণ পরিকল্পনা ও সৃজনের মৌল সূত্রসমূহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য স্মতর্ব্য:

> এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৬)

ষোলটি স্বতন্ত্র দৃশ্য সজ্জায় এ কাব্যনাট্যের আখ্যান বিন্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ নাট্য-আখ্যান দ্বিস্তরবিশিষ্ট। এর বহির্স্তর হলো ঘটনাকেন্দ্রিক এবং অন্তর্স্তর মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেন্দ্রিক। নাটকের বালিকা ও সন্ন্যাসী চরিত্রের আপাত কথোপকথনের অন্তর্দেশেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানবহৃদয়ের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার উন্মুখতার স্বরূপ উন্মোচন করেন। লক্ষণীয় যে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধের গল্পাংশ অতি সামান্য।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭২) সংসারত্যাগী গুহাবাসী সন্ন্যাসীর জগৎ-ঔদাসীন, বালিকা সংস্পর্শে জাগতিক সম্পর্কের অনুভবন, সন্ন্যাসীর প্রকৃতির রূপ-সুধা অবলোকনের ঐকান্তিক উৎসাহ, গুহার অন্ধকারে বিতৃষ্ণ সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি সন্ন্যাসব্রতের ইতি টেনে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও আনন্দ অন্বেষণে বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রম-আভাসিত করেছেন মানবমনের দ্বন্দ্বময় স্বরূপ। এমন দৃশ্যপরিকল্পনায় এ কথা প্রতিভাত হয় যে:

> ক্রমরূপান্তরিত মনোপ্রতিন্যাসের নাটক এটি। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে এগিয়ে, কখনও-বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চ'লে গিয়েও শেষ পযন্ত সন্ন্যাসীর সেই প্রাথমিক সর্ব্বব্যাপী অবজ্ঞা অপরিসীম ভালোবাসায় পরিণত হলো। (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৪)

অর্থাৎ, এ আখ্যান জুড়ে বদ্ধ মানবাত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ ঘনীভূত তথা শিল্পান্বিত হয়েছে। এর বহির্মুখী ঘটনার সমান্তরালে চলেছে অন্তর্মুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সন্ন্যাসীর অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বসংকুলতা ও নাট্য-আখ্যানের বহির্মুখী ঘটনার বৈপরীত্যময় উপস্থাপনায় সৃষ্টি হয়েছে নাট্যিক গুণ। দ্বন্দ্ব-উত্তীর্ণ সন্ন্যাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ নাট্য-আখ্যানকে কাব্যনাট্যের রীতি মান্যতায় উৎসাহী করেছে। নাট্যকারের বিশেষত্ব এই যে সীমা-অসীমের আইডিওলজিকে তিনি সরাসরি ব্যক্ত না করে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে নিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণরূপকে আবিষ্কারের মধ্যে যেমন নাট্যময়তা আছে, তেমনি সমাজঘনিষ্ঠ বাস্তবতার উপস্থাপন এ আখ্যানকে আকর্ষণীয় করে তোলে। 'মানুষের প্রেমে

অনন্তকে অনুভব তথা বিশ্বজগৎ ও বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি একাত্মতার অনুভব এ রচনার কাহিনী পরিকল্পনায় চরিত্র চিত্রণে ও নাট্যিক পরিস্থিতি নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ২৭) *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্যেও প্রেমানুভবের জগৎ সৃজনে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তার পরিচয় দেন।

রাজা ও রানী

রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষাধর্মী নাট্যমানসের অন্যতম দৃষ্টান্ত এ কাব্যনাট্য। '*মানসী* পর্বে কবি প্রেমকে যে দেহাতীত, শান্ত, সংযত ও বিশুদ্ধ আনন্দরস সম্ভোগমূলক রূপে নানা কবিতায় উপস্থাপন করেছেন তারই নাট্যরূপ *রাজা ও রানী*তে লক্ষ করা যায়। (সাইফুল, ২০০৩ : ২৬৫) রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে: 'একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক– রাজা ও রানী।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৬৭) সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এ 'বড়ো' নাট্য-আখ্যানের আকারের নয়; মাত্রাগতের। '' 'রাজা ও রানী' নাটকটি রচিত হয়েছিল মাত্র একমাসে। সে সময় নাট্যকার ছিলেন শোলাপুরে তাঁর মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৫) এটির নির্মাণকলায় ঐতিহাসিক আবহ থাকলেও কিংবা: '' 'রাজা ও রানী' নাটকের বিষয়বস্তু একটি কাল্পনিক উপাখ্যান, তবে স্থান ও পাত্রের অবস্থান ও নামের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক গন্ধ ও আভাস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস আছে।'' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১১০) এ কাব্যনাট্য সৃজনের বহু বছর পর রবীন্দ্রনাথের মনে হলো: যে ভাব অবলম্বন করে এ কাব্যনাট্য রচনা করেছেন, তা সুচারুরূপে ফুটে ওঠেনি। তিনি জানিয়েছেন: 'অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৬৯) *তপতী* নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে লেখেন:

> রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।... রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে– এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৬৯)

এ প্রয়াসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ক্রম-রূপান্তরশীল ও অতৃপ্ত নাট্যমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ভাব অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ *তপতী* নাটক নির্মাণ করেন। তবু, *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্যের নির্মাণ সৌকর্য বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এতে লিরিকের উচ্ছ্বাস থাকলেও, অর্থাৎ:

> যাকে রবীন্দ্রনাথ লিরিকের প্লাবন বলে বুঝেছিলেন, নাটককে তা যতখানি নিরাবেদনই করুক, কবিতায় তার চাইতেও সে কম। বোধ করি সেই প্লাবন রোধ করার জন্য তাঁর প্রথম জীবনের নাট্যপ্রেরণা বহুদিন অবধি কেবলই রূপান্তর

> খুঁজেছে। যা আপাতবিস্ময়ের তা হল, সে রূপান্তর তিনি সেধেছেন কেবলমাত্র কবিতারই আরও কাছে পৌঁছোবার ইচ্ছেয়। মঞ্চানুগত স্বভাববাদের হানি করতে হয় কবিতায় পৌঁছোতে গেলে, কুশীলবের কায়িক আচরণ মন্থর করে তুলতে হয় চিত্তভারে বা অতিবাচিকতায়। নাট্যক্রিয়ার উপরে বইয়ে তুলতে হয় নাট্যভাষা। সব কবিতার মধ্যেই নিহিত নাট্যমুখিতা রয়েছে যেমন সব নাটকেরই আছে অন্তর্গত কাব্যৈষা–এলিয়ট বলেছিলেন। সে কাব্যৈষাকেই কি রবীন্দ্রনাথ বিশদ করতে চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ নাট্যাচারে? (দেবীপ্রসাদ, ২০১৫ : ৮০)

প্রকৃতই তাঁর নির্মাণ কৌশল ও পরিকল্পনা বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ। 'গীতিকবিতার উচ্ছ্বাসে যদিও এর নাট্যগুণ অনেকাংশেই খর্ব হয়েছে তথাপি বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাসে 'রাজা ও রাণী'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য।' (অনুপম, ২০১০ : ১৯) পঞ্চম অঙ্কবিশিষ্ট এ কাব্যনাট্যের প্রথম অঙ্কে আটটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি, তৃতীয় অঙ্কে চারটি, চতুর্থ অঙ্কে চারটি এবং নয়টি দৃশ্য সংযোজিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এ কাব্যনাট্যে তিনি প্রতীচ্যের নাট্যরীতিতে প্রাচ্যের নাট্য-কৌশল আভাসিত করেন। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঞ্চম অঙ্কে নাট্য রচনার প্রথম প্রয়াস।

> এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রীতি, বিশেষ করে শেকসপীয়রীয় রীতির অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরিণত রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর বন্ধনে বাঙলা নাটকের প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এজন্যই তিনি পরবর্তীকালে *রাজা ও রানী* নাটকটি নতুন করে রচনা করেছিলেন *তপতী* শিরোনামে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা প্রায়শই দেখি ইউরোপীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা নাট্যোৎকণ্ঠার বদলে ভারতীয়, বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যের প্রভাব সূচিত হয়েছে। (কমলেশ, ২০১৫ : ০৮)

একই রীতি অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ সৃজন করেন *বিসর্জন* কাব্যনাট্য।

বিসর্জন

বিসর্জন কাব্যনাট্যের আখ্যান নির্মাণ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, 'রবীন্দ্রনাথের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল প্রথম বয়স থেকেই তিনি নিজের রচনাকে বারবার সংশোধন করেছেন। তা এতই সৃজনশীল ছিল যে প্রথম প্রকাশিত রচনা বা খসড়া রচনার সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পার্থক্য অনেক। যেন নতুন রচনা বললে ঠিক হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্যের শ্রেণিগত রূপান্তরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে নাটক, কবিতা থেকে নাটক, গল্প থেকে নাটক, কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য– এই সমস্ত (genre) বা সংরূপগত রূপান্তরের কথা এ

প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ৩২৭) *বিসর্জন* কাব্যনাট্যের আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের *রাজর্ষি* (১৮৮৭) উপন্যাসের আলোকে রচিত।

> এই নাটকের আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আছে। (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮)

উপন্যাসটির প্রথম আঠারো পরিচ্ছেদের গল্পাংশকে কাব্যনাট্যিক রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাট্য-আখ্যানকেও রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্ত শিল্পীসত্তা পুনরায় রূপান্তর করেন। '' 'বিসর্জন' নাটকটির জনপ্রিয়তার একটি বড় প্রমাণ নাটকটি রচনার প্রায় সাতাশ বছর পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Sacrifice'। এই নাটকেও রবীন্দ্রনাথ এর রূপান্তর ঘটিয়েছেন। পঞ্চমাঙ্কের এই নাটকটি অঙ্ক দৃশ্য বর্জিত সংহত রূপে প্রায় একাঙ্ক নাটকে পরিণত হয়েছে। এ নাটকে ঘটনার ভার অনেকটা কমানো হয়েছে–জনতা চরিত্র নেপথ্যে থেকে তাদের অস্তিত্ব বুঝিয়েছে, মুঘল সৈন্যদের আক্রমণ এবং অভিমানী গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ প্রসঙ্গ বাদ গিয়েছে।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ৯১) তবে *বিসর্জন* কাব্যনাট্যে কাহিনির সুনিপুণ বিন্যাস, ঘটনাপ্রবাহের গতিশীলতা, নাটকীয়তা, চরিত্রের মনোগত বিকাশ প্রভৃতি এটিকে একটি সার্থক কাব্যনাট্যের মর্যাদা প্রদান করেছে। মূলত: ''উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে নাটক। বিষয়ের বাঁধা রাস্তায় সংলাপের হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া। সবক্ষেত্রে এমন গত বাঁধা পথ ধরেননি নাট্যকার। 'বিসর্জন' পঞ্চাঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে চারটি দৃশ্য আছে। মোট একুশটি দৃশ্যে রচিত এ নাটকের বিষয় ইতিহাসের ভূমিতে দাঁড়ানো মানবজীবনের এক পরম দুঃখযন্ত্রণা ও উপলব্ধির প্রসঙ্গ। সে উপলব্ধি হলো হিংসার দ্বারা সবকিছু জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা যা সম্ভব।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ৮৯–৯০) এ কাব্যনাট্যের অঙ্ক বিভাজন, দৃশ্য-সজ্জা, নাট্যদ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রূপায়ণ বাংলা কাব্যনাট্যের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। 'বিসর্জনে'র গঠনরীতিকে যেভাবে অন্তিম যুক্তিসহ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা গ্রীক নাট্যকলারই বৈশিষ্ট্য।' (শান্তনু, ১৯৮৫ : ৪০) এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য:

> পূর্ণাঙ্গ নাট্য গঠনের পঞ্চাঙ্ক রীতি মেনে রচিত 'বিসর্জন'। পঞ্চ অঙ্কের এক একটি অঙ্কে রয়েছে যথাক্রমে সূচনা (exposition) বা উপস্থাপনা, জটিলতা (rising action) বা দ্বন্দ্বময়তা, চরমবিন্দু (climax) বা শিরোদেশ, পতন (falling action) বা অবরোহন এবং উপসংহার (catastrophe) বা পরিণতি। প্রথম যুগের নাটকে, মঞ্চ সাফল্যই প্রাপ্তি লক্ষ্য ছিল নাট্যকারের। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও মানবতা বিষয়ে এক গভীর বিশ্বাস ছিল এ নাটকের মর্মসত্য। 'রাজর্ষি'র মধ্যে যে কথা ছিল এ রকমভাবে আবদ্ধ তাকে প্রত্যক্ষ শিল্পে নিয়ে এসে

সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার আগ্রহ ছিল নাট্যকারের। আর সে কারণেই এ নাটকের বিষয় পরিমার্জনায় এবং আঙ্গিকের নব নব বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত। (অশোককুমার, ২০১১ : ৯৪)

সুতরাং বলা যায়: "কাহিনী ও প্লটের নাটকীয় গ্রন্থন, নাটকের সক্রিয় গতিশীলতায় বহু চরিত্রের ও ঘটনার সংযোগ, যথোচিত অঙ্ক ও দৃশ্যাযোজনা এবং প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত সুপরিকল্পিত নাট্যরীতি প্রয়োগের চেষ্টা এ নাটকের মধ্যে লক্ষিত হয়।" (কনক, ১৯৫০ : ১০০) এ কাব্যনাট্যটি কাব্যচ্ছন্দে রচিত হওয়ায় লিরিক-উপাদানের সন্নিবেশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানান:

রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারদিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৫৮)

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রখর কল্পনা শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য কাব্যনাট্যে। 'এই ক্ষুদ্র কাব্যনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ : ৬০) ১১টি স্বতন্ত্র দৃশ্যে এর আখ্যানভাগ বিন্যস্ত হয়েছে। '' 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী একটি সুনির্দিষ্ট প্লটে বিন্যস্ত হয়ে অখণ্ড আকার নিয়েছে। ঘটনার পারম্পর্যে কাহিনী অনিবার্য গতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ নাট্যের সমগ্র কাহিনী এক বছরের সময়কালের কার্যধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ।" (অশোককুমার, ২০১১ : ২৭-২৮) চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের নিটোল প্রেমের আখ্যানে স্থান-কাল-পাত্র ও ক্রিয়ার ঐক্যসূত্র সংরক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে: '*রাজা ও রানী* এবং *বিসর্জন* কাব্যনাটক দুটির তুলনায় *চিত্রাঙ্গদা* এবং *মালিনী* কিছুটা স্বতন্ত্র। প্রথম দুটি পূর্ণাঙ্গ পাঁচ অঙ্কের নাটক। শেকস্পিয়রিয় নাট্যরীতি এখানে গৃহীত হয়েছে। চরিত্রসজ্জা, বিষয়বস্তুর রূপায়ণ এবং রচনাশৈলীর ক্ষেত্রেও *রাজা ও রানী* এবং *বিসর্জন*– এর মধ্যে মিল আছে। আবার *চিত্রাঙ্গদা* এবং *মালিনী* কাব্যনাটক দুটির মধ্যেও রচনাশৈলী, ভাববিন্যাস এবং চরিত্র পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মিল লক্ষ করা যায়।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৬৫) এর নাট্য-আখ্যানের পরিণতি প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

'প্রথাসিদ্ধ tragedy– তে, বিশেষ করে শেকসপীয়রীয়ান ট্র্যাজেডির অন্ত্যে মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতির আধিক্য থাকে। বিচ্ছেদ, মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতি নাটকের শেষদৃশ্যকে বিষাদে ভরিয়ে দেয়– যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের অন্তঃদৃশ্যে ঘটেছে–'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে তেমনটি ঘটেনি। এখানে বরং নাটকের শেষে পারস্পরিক মিলনের প্রগাঢ়তার ইঙ্গিত রয়েছে। সেদিক থেকে এ নাটক কমেডি বা সুখান্ত নাটক। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতে হয় এ নাটকের

> প্রায় সারা অবয়ব বিষাদে আচ্ছন্ন। সে বিষাদ চিত্রাঙ্গদার, এই বিষাদই ধ্বনিত করেছে tragic সুর। অর্জুনকে পাবার আগে চিত্রাঙ্গদার আকুলতায় এবং পার্থকে বসন্ত-মদনের অনুগ্রহে পাবার পর তার দেহ ও মনের দ্বন্দ্বে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে। (অশোককুমার, ২০১১ : ৩০–৩১)

এর গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন: 'চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। (প্রমথ, ২০০১ : ১৯৭) মূলত এ নাট্য-আখ্যানের অন্যতম উৎকর্ষ চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপের সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি, সাবলীল ধ্বনিমাধুর্য। এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ' ইহার বাণীমূর্তি বাংলা সাহিত্যে এক চিরন্তন বিস্ময়।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ : ৮৪) বস্তুতপক্ষে:

> সচেতন চিন্তার বিপরীতে বা উদাসীন থেকে কেবল শিল্পের স্বার্থে, গল্পের খাতিরে ভিন্ন নারীসত্তা ও সামাজিকতা সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা প্রায় যায় না। বিশেষ ব্যতিক্রম হলো ভাদ্র ১২৯৮ বাংলা সালে লেখা ভাদ্র ১২৯৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাটক মহাভারতের ছোট একটি উপাখ্যানকে অনুষঙ্গ ক'রে চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাটক নির্মিত হয়। নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিশেষ কিছু ধারণা ধ্রুব হয়ে আছে তা শিল্প নৈপুণ্যে ভরা অতুলনীয় কাব্যনাটক 'চিত্রাঙ্গদা'-য় তার কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম ঘটে। (সাদ, ২০১৮ : ৮০–৮১)

তাছাড়া, *মালিনী*-র নাট্য-নির্মাণকলায় রবীন্দ্রনাথের প্রাতিস্বিকতা স্বীকার্য।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্যের আখ্যানভাগ চারটি স্বতন্ত্র দৃশ্যে বিভাজিত রয়েছে। এর আখ্যান অঙ্ক অনুসারে বিন্যস্ত নয় বলে নাট্যবিরতি নেই। নাট্য-আখ্যান গতিশীল থেকে নবধর্মের উদ্বোধন ও এর ফলে সৃষ্ট বিবিধ সংকটকে কেন্দ্র করে। সমালোচক যথার্থই বলেন:

> 'মালিনী' চারটি দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক। ইহার পরিসর যেমন সংক্ষিপ্ত, অ্যাখ্যানবস্তুও তেমনি সরল। 'সংহত, সংযত' এই নাট্যরূপের প্রতিটি দৃশ্যের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। (কনক, ১৯৫০ : ১২৮)

এ কারণে লক্ষ্যযোগ্য যে: '' 'মালিনী' নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ নাটকের গঠনভঙ্গি আপাতদৃষ্টিতে একাঙ্কের মতো হলেও আসলে কিন্তু এর মধ্যে একাঙ্কের অখণ্ডতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই। প্রতিটি দৃশ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এক একটি অঙ্কের মতো কাহিনীর ব্যাপ্তি।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ১২৮) তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অসুপ্রিয় ও মালিনীর চারিত্রিক ও আচরণে অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। পূববর্তী দৃশ্যের তুলনায় তারা বেশ পরিপক্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে এ দৃশ্যে। রাজদুহিতার উদাসীন বেশভূষা, রাজা ও মহিষীর

মালিনীকে নিয়ে উৎকণ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাণ্ডারীদের নবধর্মের প্রতি আগ্রাসী মনোভঙ্গি, ক্ষেমংকর-সুপ্রিয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন, ক্ষেমংকরের বন্দী হওয়া, আকস্মিকভাবে সুপ্রিয়কে আঘাত এবং সুপ্রিয়ের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ পুরো আখ্যানকে দ্বন্দ্বাত্মক ও গতিশীল রেখেছে। এর পরিণতি সম্পর্কে বলা যায়: "এমনিভাবে এক ধর্মীয় সংঘাত নিয়তি– তাড়নায় অকস্মাৎ এক মর্মান্তিক বিষাদান্তক পরিণতিতে সমাপ্ত হইল।" (কনক, ১৯৫০ : ১৪৬)

মালিনী কাব্যনাট্যের নির্মাণকলার অভিনবত্ব রয়েছে। '' 'মালিনী'র গঠনকৌশলে যে ঋজুতা তা গ্রীক ট্রাজেডির কাঠামোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদে বিষয়টি আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে।" (শান্তনু, ১৯৮৫ : ৪০) এ কাব্যনাট্যের নির্মাণকলার বিশেষত্ব নজরে এসেছিল শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইন (১৮৭২–১৯৪৫) ও গ্রিক পণ্ডিত ও কবি ট্রেভেলিয়ানের। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানান:

> বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। ... তার পরে একদিন ট্রেভেলিয়নের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যে রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন, এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি, কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি, তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। ... মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ণ সম্বন্ধে যে মত শুনেছিলুম
>
> এ হচ্ছে তাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪২৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে: 'রবীন্দ্রনাথ নিজে এ নাটককে শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অনুবর্তী বলেছেন। কেননা চরিত্রের দুর্ভাগ্যের দায় শেক্সপীয়র বিধাতা বা নিয়তির উপর ছেড়ে না দিয়ে চরিত্রের আচরণের ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। 'মালিনী' নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সে বক্তব্যের সমর্থন মিলবে! মালিনী, সুপ্রিয় আর ক্ষেমংকরের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মালিনী আইডিয়ার বাহক, আইডিয়ার প্রচারে তার কাজ শেষ। সুপ্রিয় নাকি কর্তব্যে কঠোর, বাক্যের ক্ষেত্রেই তার দ্বিধা–কিন্তু নাটকে দেখা গেছে বন্ধুকে দেওয়া কথার সত্যতা রক্ষা করতে সে পারে নি, সে পারে নি তাঁর বিশ্বাসটুকুকে ধরে রাখতেও। অন্যদিকে ক্ষেমংকর নাটকের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তার লক্ষ্যে এবং আদর্শে স্থির। কেবলমাত্র শুষ্ক আদর্শের বাহক তিনি নন-মালিনীর মতো কাজ শুরু করেই মানুষের মনে সামান্য দাগ ফেলেই ঘরে ফিরে বাইরে যাবার কথা ভুলে যান না তিনি। একবার ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করেন তাঁর উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে। সেদিক থেকে 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয়ের মৃত্যু একটা শকিং

এলিমেন্ট।' (অশোককুমার, ২০১১ : ১৩১–১৩২) এভাবেই রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র নির্মাণরীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরই ধারাবাহিকতা দেখা যায় *রক্তকরবী* কাব্যনাট্যে।

রক্তকরবী

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। জাপান, আমেরিকা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তিনি: 'স্বচক্ষে দেখেছেন–নেশানগুলি সংঘশক্তিবলে দুনিয়াটাকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে, দুর্বলকে শোষণ-শাসনে জর্জরিত করছে, যন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তাদের দম্ভের অন্ত নেই।' (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১২২) এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে *রক্তকরবী*র নির্মাণ পরিকল্পনায় উৎসাহী করে। '১৩৩০ সনের গ্রীষ্মাবকাশে কবি গেলেন শিলঙ পাহাড়ে; সেখানে লিখলেন 'যক্ষপুরী' নামে এক নাটক–কিছুকাল পরে সেটাই নূতন করে লিখে 'রক্তকরবী' নামে প্রকাশ করেন।' (প্রভাতকুমার, ১৪২০ : ১২২) এ ব্যাপারে ''শিক্ষার মিলন'' প্রবন্ধে তাঁর অভিমত :

> ... সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জা'নলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে– সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৫ : ১৭৩–১৭৪)

বস্তুগত বহুলত্বের অন্তঃসারশূন্যতা, কুশ্রীতাকে যক্ষপুরীর নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্ময় করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ জানান: 'নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৬৯) কিন্তু আখ্যানের পটে বাইরের ঘটনার অন্তরালের বাস্তবতাই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট। বস্তুনিষ্ঠতার চেয়ে কবির আত্মনিষ্ঠার প্রাধান্য দিয়েছেন তা বোঝা যায় তারই ভাষ্যে: 'এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৬৯) পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতালব্ধ সংকটকে রবীন্দ্রনাথ

প্রথাবদ্ধ স্থান ও কাল, অঙ্ক ও দৃশ্য দ্বারা বিভাজিত না করে প্রাচ্যদেশীয় সমাজপটে নিজস্ব নাট্যভাবনায় বিন্যস্ত করেন।

> ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৬৯)

রামায়ণের কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর চেতনা এতে সন্নিবেশিত হলেও তা কাব্যনাট্যের ভাববস্তুকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করেনি। যন্ত্র সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয় যে, তিনি নগরসভ্যতাকে উপেক্ষা করছেন। যন্ত্র যখন মানুষ ও মানবতার জন্য যূপকাষ্ঠে পরিণত হয়েছে, রবীন্দ্র-মানস তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। মানবতাকে অভিলক্ষ্য করেই বস্তুত তাঁর শিল্প-অভিযাত্রা। এছাড়া '*রক্তকরবীর* দেশ-কাল-ব্যক্তি ও ঘটনায় ভাবীকালের সত্যরূপ দর্শনের এরকম প্রসৃতমাত্রা রবীন্দ্রনাটকে পূর্বে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। স্থানকালপাত্রকে যে অসীমত্ব দিয়ে তিনি দেখেছেন, সেই অসীমত্ব এখানে অনিবার্য বাস্তবতার প্রকল্পনায় শুধু সম্ভাবনাকে নয়, ঘটনাকেও রূপবদ্ধ করেছে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৭১)

গ. কাহিনি বিন্যাস

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার গুহায় তপস্যামগ্ন থাকা সন্ন্যাসী দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপথে বের হয়। দিনের আলো, জনতা, ঘরবাড়ি প্রভৃতি দেখে সন্ন্যাসী অস্বস্তিবোধ করে। কেননা, জাগতিক কোলাহল থেকে সচেতনভাবে নিজেকে গুহাবাসী করে রেখেছে। তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাপ্রবাহে রয়েছেঃ ম্লেচ্ছো ও অনাচারী রঘুর কন্যার সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা; মন্দির রক্ষক কর্তৃক বালিকাকে অনার্যা অশুচি বলে বিতাড়িত করা এবং সন্ন্যাসীর বালিকাটিকে তার গৃহে পৌঁছে দেয়ার প্রসঙ্গ। চতুর্থ দৃশ্যে পথের পাশে ভগ্নকুটিরে সন্ন্যাসীকে 'পিতা' সম্বোধন করলে সন্ন্যাসীর অভূতপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে সন্ন্যাসী ও বালিকা গুহাদ্বারে; সপ্তম দৃশ্যে গুহা ছেড়ে সন্ন্যাসীর পর্বত শিখর থেকে বিশ্বপ্রকৃতি অবলোকন; অষ্টম দৃশ্যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি সন্ন্যাসীর আকর্ষণ অনুভব; দশম দৃশ্যে গুহার বাইরে আসে সে; একাদশ দৃশ্যে সন্ন্যাসী পথে; এ দৃশ্যে বালিকার মাধ্যমে বিশ্ব-সংসারের রূপ-রঙ-স্বাদ-গন্ধ উপভোগ করতে চায় সন্ন্যাসী; দ্বাদশ দৃশ্যে সন্ন্যাসী বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করে; ত্রয়োদশ দৃশ্যে ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে বালিকার জন্য দুশ্চিন্তা; চতুর্দশ

দৃশ্যে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসব্রত ত্যাগ; পঞ্চদশ দৃশ্যে পথে পথে বালিকার অন্বেষণ; ষোড়শ দৃশ্যে ধুলায় পতিত বালিকার মৃত্যু এবং সন্ন্যাসীর নতুন জীবনানুভবের মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাজা ও রানী

পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত এ কাব্যনাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথনে রাজার প্রেমজীবনের মগ্নতা ও তার সূত্রে রাজকার্যে অবহেলার চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপথে সাধারণ মানুষের কথোপকথনে রাজ্যের সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার চিত্র; তৃতীয় দৃশ্যে রাজার কেবল প্রেমজীবনে আচ্ছন্ন থাকায় সুমিত্রার অস্বস্তি; চতুর্থ দৃশ্যে সুমিত্রা রাজ্যের অরাজকতা প্রতিকারের জন্য উদগ্রীব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; পঞ্চম দৃশ্যে দেবদত্তের গৃহের চিত্র এবং ত্রিবেণীর পুরোহিত পদ লাভ; ষষ্ঠ দৃশ্যে অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যানে বিক্রমদেব, রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য, সুমিত্রা ও দেবদত্তের কথোপকথনে রাজার কর্তব্যে অবহেলায় রাজ্যের দুরবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র এবং উৎপীড়কদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য রানী অনুরোধ জানায় রাজাকে; সপ্তম দৃশ্যে রাজা মন্ত্রীকে নির্দেশ দেয় রাজ্য থেকে বিদেশিদের বিতাড়িত করতে; কিন্তু সুমিত্রার নির্দেশে উৎপীড়ক দলকে ভৈরবী-পূজায় আহ্বান করার প্রসঙ্গ; অষ্টম দৃশ্যে ত্রিবেদীর কুটিরে মন্ত্রী রানীর আদেশ নিয়ে উপস্থিতি প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জয়সেন, মিহিরগুপ্তকে পূজায় উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ জানানো; দ্বিতীয় দৃশ্যে তাদের বিদ্রোহ; তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রার পুরুষ ছদ্মবেশে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে জালন্ধর ত্যাগ; চতুর্থ দৃশ্যে রানীর জন্য রাজার আক্ষেপ এবং রানীর প্রতি রাজার আসক্তি প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গসমূহ বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পুরুষবেশে সুমিত্রার কাশ্মীর গমন, সুমিত্রা-শংকরের কথোপকথনে পূর্বজীবনের স্মৃতিমন্থন; দ্বিতীয় দৃশ্যে ত্রিচূড়ের ক্রীড়াকাননে কুমারসেন-ইলার পারস্পরিক প্রণয়-সম্ভাষণ; তৃতীয় দৃশ্যে ছদ্মবেশী সুমিত্রা ও কুমারসেনের সাক্ষাৎ; চতুর্থ দৃশ্যে যুদ্ধে কুমারসেনের যাওয়ার আদেশ লাভ এবং পঞ্চম দৃশ্যে ইলার নিকট থেকে কুমারসেনের বিদ্যায় গ্রহণের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এ অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ নাট্য–আখ্যানের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জালন্ধরের রণক্ষেত্রে বিক্রমদেব ও সেনাপতি চরের মাধ্যমে সংবাদ পায় সুমিত্রা যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দি করে নিয়ে এসেছে; দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবদত্ত-নারায়ণীর কথোপকথনে বন্দিদের বিদ্রোহ, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ; তৃতীয় দৃশ্যে কুমারসেনের শিবিরে সুমিত্রা, শংকর; কুমারসেন যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চায়; চতুর্থ দৃশ্যে বিক্রমদেবের শিবিরে জয়সেন ও যুধাজিৎ-এর কাশ্মীর আক্রমণের প্রসঙ্গ। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রেবতী-চন্দ্রসেনের আলাপচারিতা, কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে কুমারসেন কর্তৃক চন্দ্রসেনকে বিক্রমদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির অনুরোধ; দ্বিতীয় দৃশ্যে কাশ্মীরের হাটে সাধারণ মানুষের

মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ আলোচিত; তৃতীয় দৃশ্যে ত্রিচূড় প্রাসাদে অমরুরাজ ও কুমারসেনের কথোপকথনে ইলা-কুমারসেনের বিয়ের সম্ভাবনা নিঃশেষিত; চতুর্থ দৃশ্যে ত্রিচূড়ের অন্তঃপুরে ইলা সখীসমেত কুমারসেনের জন্য প্রতীক্ষারত; পঞ্চম দৃশ্যে রেবতীর নিকট সুমিত্রা রাজবিদ্রোহীতে পরিণত হওয়া এবং চরের মাধ্যমে বিক্রমদেব কুমারসেনের ত্রিচূড় যাত্রার প্রসঙ্গ অবগত হওয়া; ষষ্ঠ দৃশ্যে অরণ্যে কুমারসেন ও সুমিত্রা, অরণ্যে কাঠুরিয়া-মধুজীবী-শিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ; সপ্তম দৃশ্যে অমরুরাজ কর্তৃক বিক্রমদেবের নিকট ইলাকে সমর্পণ; ইলা কুমারসেনের স্মৃতিতে কাতর; বিক্রমদেব ইলাকে কুমারসেনের নিকট সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়, বিক্রমদেবের ভাবনার পরিবর্তন; অষ্টম দৃশ্যে অরণ্যবাসী সুমিত্রা ও কুমারসেন অনুচরের মাধ্যমে প্রজাদের নির্মম পীড়নের সংবাদে ব্যথিত, কুমারসেন বন্দি হয়ে রাজদণ্ড পেয়ে চায় না, সুমিত্রার নিকট কুমারসেন প্রাণ বিসর্জনের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে; এতে সুমিত্রা মুর্ছিতা হলেও কুমারসেন প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকে; নবম দৃশ্যে কুমারসেনের ছিন্ন মস্তক নিয়ে সুমিত্রা বিক্রমদেবের নিকট পৌঁছায়; রাজা বিক্রমদেবের অন্তর্দেশে পরিবর্তন এবং তার রানীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনির সমাপন ঘটে।

বিসর্জন

বিসর্জন কাব্যনাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রয়েছে রানী গুণবতীর সন্তান কামনায় একশ মহিষ ও তিনশ ছাগ বলিদানের প্রতিশ্রুতি; ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার ক্রন্দন; মন্দিরের সোপানশ্রেণিতে রক্তধারায় জয়সিংহের সংশয় এবং গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণার বেদনা প্রভৃতি ঘটনার সন্নিবেশ। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক জীববলি নিষিদ্ধ ঘোষণা; রঘুপতি, নয়নরায়, চাঁদপাল, মন্ত্রী প্রথাগত ধর্মীয় আচার আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যে। তৃতীয় দৃশ্যে জয়সিংহের দেবীর পূজা সম্পূর্ণের প্রতিজ্ঞা; চতুর্থ দৃশ্যে গুণবতীর বলি-পূজার পশু ফেরত আসা; গুণবতী-গোবিন্দ্যমাণিক্যের বিরোধের সূত্রপাত; পঞ্চম দৃশ্যে গুণবতীর পূজা দেখার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় প্রজা সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ; রঘুপতি কর্তৃক গোবিন্দ্যমাণিক্যকে অভিসম্পাত প্রদান প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রঘুপতি কর্তৃক নক্ষত্ররায়কে রাজহত্যার পরামর্শ প্রদান; ভ্রাতৃহত্যার পরামর্শে জয়সিংহ বিস্মিত, বিমূঢ়; জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয় দৃশ্যে অপর্ণা জয়সিংহকে বলিপ্রথার বিপরীত ভাবনায় জাগাতে চায়; তৃতীয় দৃশ্যে জয়সিংহ-অপর্ণার সাক্ষাৎ; রঘুপতি কর্তৃক মন্দির থেকে অপর্ণাকে তাড়িয়ে দেয়া, জয়সিংহকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় রঘুপতি; চতুর্থ দৃশ্যে বলি প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণায় পুনরায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সূচনা; রঘুপতি-নক্ষত্ররায়ের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা গোবিন্দমাণিক্যকে চাঁদপাল জানিয়ে দেয়; গোবিন্দমাণিক্যের অন্তর্দহন; গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহকে রঘুপতি মিথ্যাচার সম্পর্কে বোঝাতে

সক্ষম হলে জয়সিংহ রাজহত্যা থেকে বিরত থাকে; কিন্তু রঘুপতি দেবীর চরণ স্পর্শ করে জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করায় শ্রাবণের শেষ রাতে রাজরক্ত এনে দেয়ার প্রভৃতি ঘটনাবলি রয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রঘুপতি দেবী প্রতিমার মুখ ফিরিয়ে রেখে রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে; জয়সিংহের সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব; অপর্ণা পুনরায় জয়সিংহকে সত্যের পথে আহ্বান জানায়; রাজা জীবরক্তবলির বিরুদ্ধে; সাধারণ জনতাকে রাজা বোঝাতে চায় ভালোবাসা দিয়েই জননীর পূজা সম্ভব; অপর্ণা দেবী প্রতিমার মুখ ফিরিয়ে দিলে জনতার ভ্রান্তি দূর হয়; জয়সিংহ রঘুপতির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; দ্বিতীয় দৃশ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজারা গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে; গুণবতী নক্ষত্ররায়কে বোঝায় ধ্রুবকে হত্যা না করলে সে ত্রিপুরার রাজপদে অভিষিক্ত হবে; তৃতীয় দৃশ্যে ধ্রুবকে হত্যার নির্দেশনা দেয় গুণবতী; চতুর্থ দৃশ্যে জয়সিংহ-অপর্ণার কথোপকথনে জয়সিংহের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনের উন্মোচন; অপর্ণা তাকে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে বললেও কর্তব্যজালে বন্দী জয়সিংহ মন্দিরেই থেকে যায়; পঞ্চম দৃশ্যে নক্ষত্ররায়-রঘুপতি কর্তৃক ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজার আদেশ অমান্য করায় রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের আট বছরের নির্বাসন; মোঘল সৈন্যদের হাত থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বাঁচাতে রাজার যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি; জয়সিংহ তার পালিত পিতার ঋণ শোধের অঙ্গীকার; তৃতীয় দৃশ্যে মোঘল সেনা কর্তৃক নক্ষত্ররায়কে নির্বাসনপথ হতে অপহরণ; নক্ষত্ররায় পত্রযোগে গোবিন্দমাণিক্যকে ত্রিপুরা রাজ্য দখল ও গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসনের হুমকি প্রদানের ঘটনা গ্রন্থিত রয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীমন্দিরে অপেক্ষমাণ রঘুপতি; নিজ বক্ষে ছুরিবিদ্ধ করে জয়সিংহের আত্মবিসর্জন; রঘুপতির রূপান্তর; দ্বিতীয় দৃশ্যে গুণবতী-গোবিন্দমাণিক্যের বিচ্ছিন্নতা; গোবিন্দমাণিক্য বলি প্রথা নয় প্রেম দিয়ে গ্রহণ করতে চায় গুণবতীকে; তৃতীয় দৃশ্যে রাজার স্বেচ্ছা নির্বাসনের সুযোগে বলি দিয়ে দেবীর পূজার আয়োজন করে গুণবতী; চতুর্থ দৃশ্যে রঘুপতি কর্তৃক গোমতীর জলে দেবী প্রতিমা নিক্ষেপ; রঘুপতির নতুন জীবন-উপলব্ধি; রঘুপতির অপর্ণাকে জননী বলে গ্রহণ; অপর্ণার রঘুপতিকে পিতা বলে সম্বোধন; দেবতার আসনে মানুষের প্রতিস্থাপনার মধ্য দিয়ে *বিসর্জন* কাব্যনাট্যের কাহিনির সমাপ্তি দৃশ্য রচিত হয়।

চিত্রাঙ্গদা

১১ টি নাট্য-দৃশ্যে বিন্যস্ত এ কাব্যনাট্যের ১ নং দৃশ্যে অনঙ্গ-আশ্রমে চিত্রাঙ্গদা-মদন-বসন্তের আলাপচারিতায় চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা ও তার নারী হৃদয়ের বেদনা; মদন ও বসন্ত চিত্রাঙ্গদাকে এক বছরের জন্য অপূর্ব রূপ ও যৌবনের বর প্রদান করে। ২ নং দৃশ্যে মণিপুরের অরণ্যের শিবালয়ে অপূর্ব রূপ নিয়ে অর্জুনের সম্মুখে চিত্রাঙ্গদা; অর্জুন চিত্রাঙ্গদায় সমর্পিত; ফলে চিত্রাঙ্গদার দেহসৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে আত্মদ্বন্দ্বে পীড়িত হয়। ৩

নং দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা তার দ্বন্দ্ব-বেদনা মদনদেব ও বসন্তকে জানায়। ৪ নং দৃশ্যে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার আলাপচারিতায় চিত্রাঙ্গদা তার রূপের ক্ষণিকত্ব অর্জুনকে জানালে অর্জুন প্রেমকে গৃহে স্থানে দেয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। ৫ নং দৃশ্যে মদন-বসন্ত বর্ষ শেষের আহ্বানে উপস্থিত হয়; ৬ নং দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার সান্নিধ্যে আগ্রহ হারিয়ে মৃগয়ার যাবার কথা ভাবছে; ৭ নং দৃশ্যে মদনের নিকট রূপের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে প্রকৃত রূপে ফিরে যেতে চায় চিত্রাঙ্গদা। ৮নং দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের মোহভঙ্গের আভাস পায়। ৯ নং দৃশ্যে দস্যুদল কর্তৃক চিত্রাঙ্গদার রাজ্য আক্রমণের প্রসঙ্গ, বনচরের নিকট চিত্রাঙ্গদার গুণকীর্তন শুনে অর্জুন বিমোহিত; এক রাজ্যের রক্ষক রমণী এ তথ্য পেয়ে অর্জুন রাজকন্যার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়; প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেলে অর্জুন তাকে ত্যাগ করতে পারে এমন আশঙ্কা চিত্রাঙ্গদার; ১০ নং দৃশ্যে মদন বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদার আলাপে জানা যায় চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্য বরের শেষ-রাত্রি; ১১ নং দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত রূপে আত্মপ্রকাশের কাহিনি মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে রয়েছে: রাজান্তঃপুরে কাশ্যপ ও মালিনীর কথোপকথন, কাশ্যপের আশীর্বাদ: মালিনীর জীবনে কারামুক্তির দিন দ্রুতই আসবে; রাজমহিষীর প্রবেশ; মালিনীর সাধারণ বেশভূষার মহিষীর বেদনা; মালিনী নবতর ধর্মভাবনায় উদ্দীপিত হওয়ায় রাজা কাশ্যপ ক্ষিপ্ত; রাজ্যের প্রজারা মালিনীর নির্বাসন চায়; মালিনী তা মেনে নেয়, কাশ্যপ ও রাজ মহিষী বুঝলেন মালিনী পারিবারিক বন্ধনের অধীন নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাসমূহের মধ্যে রয়েছে: মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যা মালিনীর নির্বাসনের দাবি জানায়; ক্ষেমংকর, চারুদত্ত, সোমাচার্য সকলে নির্বাসন চাইলেও সুপ্রিয় এর প্রতিবাদ জানায়। সুপ্রিয় মালিনীর নতুন ধর্মবোধকে সম্মান জানায়, ব্রাহ্মণগণ তাই তাকে ধিক্কার জানায়। ব্রাহ্মণদের বাক্যবাণের কারণে রাজসৈন্যদল বিদ্রোহভাবে এগিয়ে আসার উপক্রমের সময় ব্রাহ্মণগণ 'সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী'কে আহ্বান করলে ম্লানবেশে মালিনীর প্রবেশ; মালিনী ব্রাহ্মণদের জানায় সে স্বেচ্ছায় নির্বাসন মেনে নেয়; মালিনীকে ঘিরে ব্রাহ্মণগণের জয়ধ্বনি; সুপ্রিয় তার কাঙ্ক্ষিত ধর্মের মূর্তি খুঁজে পেয়েছে মালিনীর মধ্যে, ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে বোঝাতে চায় এ দেবতার সন্ধান নয়– এ হলো মায়া; ক্ষেমংকরের দেশান্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, সুপ্রিয় তার সঙ্গী হতে চাইলে ক্ষেমংকর তাকে সঙ্গে নেয় না প্রভৃতি। তৃতীয় দৃশ্যে অন্তঃপুরে রাজা, রাজমহিষী ও যুবরাজ; এ সময়ে সৈন্যদল ও প্রজাগণের মালিনীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ; সকলে মালিনীকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো, রাজমহিষী কন্যাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত; মালিনীর জন্য স্বয়ম্বরসভার আয়োজনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি ঘটনাবলি সংযোজিত হয়েছে। চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় রাজ-উপবনে

মালিনী, সুপ্রিয় ও মালিনীর পরিচারিকাবর্গকে। মালিনী ও সুপ্রিয়ের আলাপচারিতা; পত্রযোগে সুপ্রিয়কে ক্ষেমংকর জানায় যে সে নবধর্মের মূল উপড়ে ফেলতে চায়; বন্দী ক্ষেমংকরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ; জীবনের শেষ ইচ্ছা হিসেবে সুপ্রিয়কে দেখতে চায় ক্ষেমংকর; সুপ্রিয় এলে ক্ষেমংকর তার আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করে; ক্ষেমংকর হাতের শৃঙ্খল দিয়ে সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত করে এবং সুপ্রিয়ের মৃত্যু হয়। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

রক্তকরবী

রাজা রহস্যাবৃত জালের অন্তরালে থাকায় তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ সর্দার ও মোড়লরা যক্ষপুরীর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। খোদাইকররা খনি থেকে তাল তাল সোনা তুলে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলছে প্রতিনিয়ত। রাজার কৌশলে এরা বাইরের পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন কঠিন নিয়মের শ্বাসরুদ্ধকর রাজ্যে নন্দিনী মুক্তজীবনের আবাহনগীতি নিয়ে হাজির হয়। তার আগমনে কিশোরের কাজের সময় চুরি নন্দিনীর জন্য রক্তকরবী ফুল আনা; নন্দিনীর সঙ্গে সময় কাটাতে অধ্যাপকের আনন্দ; নন্দিনীর মধ্যে বিশুপাগলার সহজ প্রাণের ছন্দ খুঁজে পাওয়া: প্রভৃতির ঘটনার মধ্য দিয়ে অনিয়মের ঢেউ উঠেছে খনিশ্রমিকদের জীবনে। এমনকি অন্ধকারে-আড়ালে থাকা মকররাজও নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে। জালের ওপারে নন্দিনী যেতে চাইলে রাজা তাকে ফিরিয়ে দেয়। নন্দিনী জালের আড়াল তুলে রাজাকে মুক্ত প্রাঙ্গণে বের হবার অনুরোধ জানালে সোনার স্তূপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। রাজা শক্তির জোরে সে নন্দিনীকে দখল করতে চায়। নন্দিনী রাজার শক্তিকে স্বীকার করলেও এবং তার শক্তির কাছে সে ধরা দেয় না। নন্দিনী রঞ্জনের প্রতীক্ষারত জেনে রাজা রঞ্জনকে ঈর্ষা করে। যক্ষপুরীর কঠোর বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিশুপাগলার খাপছাড়া, নন্দিনী ও রঞ্জনের মিলিত প্রচেষ্টায় বিপ্লবের সম্ভাবনা অনুমান করে সর্দার বিশুকে কৌশলে বন্দি করে। রক্তকরবীর গুচ্ছ কিশোরের হাতে দিয়ে নন্দিনী রঞ্জনের নিকট পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ জানায়। নন্দিনীকে রঞ্জনের খবর কেউ দিতে পারে না। নন্দিনী মরিয়া হয়ে রাজার দরজায় আঘাতের পর আঘাত করলে দ্বার খুলে যায়। তখন নন্দিনী দেখতে পায় তার দেয়া রক্তকরবী হাতে রঞ্জনের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। রাজার বিবেক জাগ্রত হলে সে মুক্ত জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে। কারা ভেঙে বিশুকে মুক্ত করা হলো। বিশুর মুক্তির খবর নন্দিনীর কাছে পৌঁছানোর আগেই সে রক্তকরবীর কঙ্কনটি মাটিতে ফেলে মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়েছে। বিশু কুড়িয়ে নেয় নন্দিনীর শেষ দান। তখন দূর থেকে ভেসে আসছে: পৌষের ফসল কাটার গান–এর মাধ্যমে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪.১.৪ চরিত্রায়ণ কৌশল

কাব্যনাট্য সৃজনে রবীন্দ্রনাথের মৌল চেতনা ভাববিশ্বের নান্দনিক উপস্থাপন। আখ্যান পটভূমির বিন্যাসে, নির্মাণকলায় এমনকি চরিত্রায়ণ কৌশলেও রবীন্দ্রনাথের এ বোধ সক্রিয় ছিল। 'হৃদয়বোধের ভাবতান্ত্রিক ভিত্তিমূলে গড়ে উঠেছে চরিত্রের কাঠামো এবং রবীন্দ্র-কবিপ্রাণের আত্মলোকই চরিত্রের দৃষ্টিলোকে হয়েছে সঞ্চরণশীল। চরিত্র ও সমস্যার সমাজনির্দিষ্ট রূপটি এর ফলে অপ্রত্যক্ষ হয়ে এক ধরনের রাবীন্দ্রিক অন্তর্বাস্তব শিল্পিত রূপ লাভ করেছে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬১) ফলে তাঁর পরিকল্পিত চরিত্ররা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভাবাদর্শের অন্তর্বয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের চরিত্রায়ণ কৌশল নাট্য-আখ্যানে চরিত্রের ভূমিকা বিবেচনায় দুইটি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। যথা: **ক)** মুখ্য চরিত্র; **খ)** নাট্য-সহায়ক চরিত্র। নাট্য-সহায়ক চরিত্রকে আবার দুটি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে: **ক)** প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র এবং **খ)** অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যনাট্যের নাট্য-আখ্যানে গুরুত্ব ও ভূমিকা বিবেচনায় চরিত্রসমূহকে **ক)** মুখ্য চরিত্র এবং **খ)** নাট্য-সহায়ক চরিত্র দ্বিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ নাট্য-আখ্যানে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে সন্ন্যাসী ও বালিকা। অন্যান্য চরিত্রসমূহ নাট্য-সহায়ক চরিত্র বলা যায়। নাট্য-সহায়ক চরিত্রগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগে করা হয়েছে: **ক)** প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: জননী, মন্দির রক্ষক, একজন বৃদ্ধা প্রমুখ **খ)** অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: কৃষকগণ, পথিকগণ, স্ত্রীলোকগণ, দুইজন ব্রাহ্মণ বটু, একদল মালিনী, বৃদ্ধ ভিক্ষুক, একদল সৈনিক, পুরুষগণ প্রমুখ।

এ নাট্য-আখ্যানের মুখ্য চরিত্র সন্ন্যাসী ও বালিকা। মুখ্য চরিত্রদ্বয় পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক নাম ব্যবহার করেননি। নাট্য-আখ্যানের পটভূমিতে এ কথা অনুমেয় হয় যে, এ দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ কোনো ভাবকে বিশ্ব চরাচরের পটে নির্বিশেষত্ব প্রদান করা রবীন্দ্রনাথের শিল্প-অভীপ্সা। এ দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার অবকাশ পান। '' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর প্রধান চরিত্র সন্ন্যাসী। আত্ম-অহংকারী এই সন্ন্যাসীর আত্মপ্রসন্ন স্বগতোক্তির মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর শুরু।'' (অনুপম, ২০১০ : ১৮) সন্ন্যাসী বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় সুধা ও সৌন্দর্য থেকে সচেতনভাবে নিজেকে দূরে রেখেছে। সন্ন্যাসী চরিত্রের এমন পরিকল্পনা এ কথা ভাববার কোনো অবকাশ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ভাবনা লালন করতেন। 'রবীন্দ্রনাথ কোনো

সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং মনুষ্যদেহের অনেকানেক জীবনচক্র অস্বীকারের যে-আদর্শ রয়েছে তা তিনি সুচিন্তিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' (হায়াৎ, ২০১৭ : ৩৯) তাছাড়া:

> 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবি আর 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী, দুজনেই তাঁদের কষ্টে অর্জিত নির্জনতায় আত্মমগ্ন ছিলেন বটে, কিন্তু দু-জনের সাদৃশ্য ঐটুকুইমাত্র। কবিটি ছিলেন বিষণ্ন এবং নিঃসঙ্গ আর সেইজন্য আত্মকরুণায় আপ্লুত; সন্ন্যাসীটি কিন্তু ছিলেন নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিষয়ে অহঙ্কারী এবং উল্লসিত। ক্ষুদ্রাকার এই নাটিকাটি শুরু হয় আত্মপ্রসন্ন সন্ন্যাসীর একটি স্বগতোক্তিতে। (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৩)

রবীন্দ্রনাথ আত্মমগ্ন সাধনার বিপরীতে বিশ্ব-সংসারের কোলাহল, সৌন্দর্যকে প্রতিস্থাপনের সূত্রে এ চরিত্রের পরিকল্পনা করেন সন্ন্যাসীর গুহাবন্দী জীবনের সীমায়িত অবস্থা, প্রাণহীনতার বিপ্রতীপে এ চরিত্র বিশ্ব-প্রকৃতির চঞ্চলতা, অসীমতাকে শিল্পময় করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর *জীবনস্মৃতিতে* উল্লেখ আছে: '...নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ১৬১) সন্ন্যাসীর নব-উপলব্ধি তাই:

> কেন এরা সরে মোরে করিছে প্রণাম,
> আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো–
> এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
> আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
> তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১৭–১১৮)

গুহার আঁধারে জীবনের আলো রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে দেন বালিকা চরিত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ 'সন্ন্যাসীর এই পরিণতি সম্ভব হ'লো একটি ক্ষুদ্র অনাথা সমাজচ্যুতা বালিকার মাধ্যমে।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৪) শ্রেণীবষম্যপীড়িত সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক শ্রেণি থেকে রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানের বালিকা চরিত্রটি গ্রহণ করেন। সে কেবল একটি চরিত্র হয়ে থাকেনি। নাট্য-আখ্যানের পটে 'অল্প পরেই আবার সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিমূর্তি হ'য়ে ওঠে বালিকাটি; তখন আর সে প্রকৃতির পরিহাস নয়, প্রকৃতির আনন্দের দূতী।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৫) সীমা-অসীমের দ্বন্দ্বের মীমাংসায় এ চরিত্রটির ভূমিকা অনন্য। 'আসলে চরিত্রটিকে সংসার প্রকৃতির প্রতীক অথবা বিশ্বপ্রেমের প্রদীপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৪) বালিকার কণ্ঠেই মানবতার মূল্যবান বাণী পরিস্ফুট হয়েছে। সন্ন্যাসীকে সে বলে:

আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।

শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া

বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১২)

স্বল্প পরিসরের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রতিটি চরিত্র রবীন্দ্র-ভাবের অনুষঙ্গী ও অনুগামী হওয়ার সূত্রে আখ্যানপটে আলো ছড়িয়েছে। যেমন: নাট্য-আখ্যানের দ্বিতীয় দৃশ্যে মালিনী চরিত্রের গান:

বুঝি বেলা বহে যায়,

কাননে আয় তোরা আয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯২)

মালিনীর এ গান রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের অনুগামী। সময় ফুরিয়ে যাবার আগে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধা উপভোগের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে এতে। একইভাবে, নাট্য-আখ্যানের তৃতীয় দৃশ্যে মন্দির-রক্ষকের সংলাপ:

দূর হ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি!

কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে! (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৯৪)

সমগ্র নাট্য-আখ্যানে মন্দির-রক্ষক এই একটিমাত্র সংলাপেই পুরো নাট্য আখ্যানে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সামাজিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয় সামান্য বালিকাও: রবীন্দ্রনাথ ধর্মের নামে প্রচলিত নির্মম অবিচারের স্বরূপ এখানে মন্দির রক্ষক চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। আবার মন্দির-রক্ষকের সংলাপের বিপরীতে জননীর সংলাপে কল্যাণময় জীবনবোধ বড় হয়ে দেখা দেয়।

আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়!

আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন!

মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,

অকল্যাণ যত-কিছু যাবে দূর হয়ে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৯৪)

মন্দির-রক্ষকের বিপ্রতীপ ভাবনার উদ্ভাসিত জননী চরিত্রটি। এভাবে ভাবের বৈপরীত্যসূচক চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ অনন্য হয়ে ওঠেন। চতুর্থ দৃশ্যে পথিক ও বালিকার কথোপকথন-সূত্রে পাঠক বালিকার সামাজিক পরিচিতি তুলে ধরবার উপায় হিসেবে প্রতিভাত হয় পথিকগণ। যেমন:

পথিক। কে তুমি গো?

বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি।

পথিক। পিতার কী নাম তব? কে তুমি বালিকা?

বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে?

তবে শুন পরিচয়– রঘু পিতা মম,

অনার্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।

চমকিয়া

পথিক। রঘুর দুহিতা তুমি? সুখে থাকো বাছা!

কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৯৭)

এ কাব্যনাট্যের চরিত্রসমূহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেন: 'প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী– তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ১৬২) আবার, প্রেমের নবতর অর্থ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্যে চরিত্রের বর্ণাঢ্য আয়োজন করেন।

রাজা ও রানী

এ কাব্যনাট্যের চরিত্রের তালিকা অনুরূপ এখানে উপস্থাপিত হলো: বিক্রমদেব: জালন্ধরের রাজা; দেবদত্ত: রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ; ত্রিবেদী: বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; জয়সেন, যুধাজিৎ: রাজ্যের প্রধান নায়ক; মিহিরগুপ্ত: জয়সেনের অমাত্য; চন্দ্রসেন: কাশ্মীরের রাজা; কুমার: কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র; শংকর: কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য; অমরুরাজ: ত্রিচূড়ের রাজা; সুমিত্রা: জালন্ধরের মহিষী ও কুমারের ভগিনী; নারায়ণী: দেবদত্তের স্ত্রী; রেবতী: চন্দ্রসেনের মহিষী; ইলা: অমরুর কন্যা প্রমুখ। এ কাব্যনাট্য-আখ্যানের মুখ্য চরিত্র বিক্রমদেব ও সুমিত্রা। প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্রগুলো হলো কুমারসেন, ইলা, দেবদত্ত, অমরুরাজ, ত্রিবেদী, জয়সেন, যুধাজিৎ, চন্দ্রসেন, রেবতী, শংকর, মন্ত্রী, মিহিরগুপ্ত প্রমুখ। আর অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্রসমূহ হলো নারায়ণী, অনুচরগণ, রানীর আত্মীয়

সভাসদ, পুরুষ ও স্ত্রী, সৈনিকগণ, ইলার সখীগণ, সেনাপতি, প্রহরী, কঞ্চুকী, হাটের লোকজন, কাঠুরিয়া, মধুজীবী, শিকারী, রামচরণ, নগরের ব্রাহ্মণগণ, কিনু নাপিত, মন্‌সুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, নন্দলাল, মন্নুরাম, হরিদীন, জরহর, শ্রীহর প্রমুখ। এ নাট্য-আখ্যানের একই ভাব অবলম্বন করে *তপতী*র চরিত্রসমূহ পরিকল্পিত হলেও:

> 'রাজা ও রানী'র মধ্যে রক্ত-মাংসের যে উষ্ণতাটুকু আছে, *তপতী*তে তাহা নাই। *তপতী*র পাত্র-পাত্রী একেবারে তত্ত্ব বা ভাবের প্রতীক-মূর্তি। (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৪)

এ নাট্য-আখ্যানের নামকরণের প্রচ্ছন্নে রয়েছে মুখ্য চরিত্রদ্বয়: সুমিত্রা ও বিক্রমদেব। এ দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানের মৌল উপজীব্যে পৌঁছে যান। আলোচ্য চরিত্রদ্বয় পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়:

> চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণে নাম প্রাধান্য পায়, এখানে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁদের প্রশাসনিক পদ। জালন্ধরের রাজা ও রানী কেমন–কীরকম হওয়া উচিত তাঁদের, ভিন্ন পরিস্থিতি তাঁদের মানস প্রকৃতির ভিন্নতায় কোন গিরিখাদের প্রান্তে এসেছে নিয়ে–তার চরমরূপ দেখানো এ রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। রাজার ধর্ম রাজ্য পরিচালনা, প্রজারক্ষণ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রজার প্রতি কর্তব্যপালন। অথচ রাজা ও রানী পদে থেকেও যেন নিজ নিজ ধর্মচ্যুত হয়ে তাঁদের পদের প্রতি তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদা দেখাতে পারেন নি। (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৭)

রাজা বিক্রমদেব চরিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রম-রূপান্তরের সূত্রে এ নাট্য-আখ্যানের ভাববিশ্বের অন্তর্বুনন ঘটেছে। এ কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর প্রেমানুভূতিকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেমদর্শনের পূর্ণ রূপ অঙ্কন করেন। '*প্রকৃতির প্রতিশোধে* অসীমের সন্ধানে যেমন সন্ন্যাসী বাস্তব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন রাজা ও রানী নাটকের বিক্রমদেবও তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৪৩) এ চরিত্র পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'প্রেম কেবল যুগল-জীবনের নিরবচ্ছিন্ন রসলীলা নয়, প্রেম প্রিয়তমের দুঃখ-বিপদে দেবতার অনিমেষ দৃষ্টি; প্রেম প্রিয়তমকে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্তপ্রকার সংকট হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে-কোনো স্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত; প্রেম খণ্ড বা ক্ষণিক উপভোগের বস্তু নয়, প্রেম সারাজীবনব্যাপী কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এই সত্যকার প্রেমের স্বরূপ 'প্রেম-স্বর্গচ্যুত' হতভাগ্য রাজা জীবনে প্রথম দেখিলেন। এই পরিবর্তিত মনে সেই 'শিশিরশীতল শুভ্রপ্রেম'-এর আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তখনই সুমিত্রার প্রেমকে রাজার যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি আসিল। যুদ্ধাদ্ধ, জয়, হিংসা হইল অর্থহীন, অনুতপ্ত মন উন্মুক্ত হইয়া রহিল সুমিত্রা জন্য।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২০) নাট্য-আখ্যানের প্রথম অঙ্কে বিক্রমদেব বলে:

> থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
> সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি।

অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই–

বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৯)

কিন্তু নাট্য-ঘটনার পরিক্রমায় বিক্রমদেবের আত্মোপলব্ধি:

শুন তবে মোর কথা

এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি

শুধু ভালোবাসিতাম; সে প্রেমের 'পরে

পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম

চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩৮)

কাব্যনাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের ভাবদর্শনের এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনুঘটক বা বলা যায় প্রভাবক শক্তি হিসেবে সুমিত্রা চরিত্র পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্র-মানসের প্রেমভাবনাকে সঞ্জীবনী সুধার মতো অন্তরে লালন এবং নাট্য আখ্যানের পটে তার বিস্তৃতি প্রদান করেছে সুমিত্রা চরিত্রটিই। প্রকৃত পক্ষে 'যথার্থ প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী কতদূর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহাই দেখি এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ২৭৮) বিলম্বে হলেও সুমিত্রা এ বোধে রাজাকে উপনীত করতে সমর্থ হয়েছে। 'সুমিত্রা 'রাজা ও রাণী'র কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। নাট্যকাহিনীতে নায়িকার সকল ঐশ্বর্য সুমিত্রা চরিত্রে সংযুক্ত হয়েছে। সুমিত্রা মনে করে, প্রকৃত প্রেমের বিষয়টি ভোগের মধ্যে নয় ত্যাগেই নিহিত।' (অনুপম, ২০১০ : ১৯) সুমিত্রা বিক্রমদেবকে আহ্বান জানিয়েছে এভাবে:

মহারাজ,

এখন সময় নয়– আসিয়ো না কাছে,

এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে। ...

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি–সকাতরে

প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন

নোস তোরা কেহ, আমি আছি– আমি আছি–

আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৮১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'রাজা ও রানী'র সুমিত্রা অনেকটা সংসারের নারীর অংশ দিয়ে গড়া, শক্তিশালী দৃঢ় তরুর গায়ে লতার মতো আশ্রয়প্রত্যাশী, অন্তরের তেজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও বাহিরে স্নিগ্ধ-মাধুর্যমণ্ডিত, নারীর হৃদয়-গৌরবের অধিকারিণী, স্নেহময়ী ভগিনী; 'তপতী'র সুমিত্রা একটা আদর্শ রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ; সুকঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেদ করিয়া মানবিক চিত্তস্ফুরণের বিদ্যুৎ-দীপ্তির অবকাশই তাঁহার চরিত্রে নাই, শেষের

দিকে একেবারে তিনি সমস্ত আসক্তিহীন, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন দেবকন্যা।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৫) নারীহৃদয়ের প্রেমভাবনাকে ভারতীয় মূল্যবোধের আলোকে পরীক্ষিত হয়েছে সুমিত্রা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রেমের প্রকৃত পথের সন্ধানে এ নাট্য-আখ্যানে বেশ কিছু চরিত্র সংযোজিত করেছেন কাব্যনাট্যকার। কুমারসেন ও ইলা চরিত্রের আয়োজনের মূলে রয়েছে প্রেমদর্শনের স্বরূপকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করা। কুমারসেনের সংলাপে:

তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে, পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়েরে চিরপূর্ণিমারে–
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২০৭)

কিংবা বিক্রমদেব ইলার হৃদয় তথা প্রণয় প্রত্যাশা করলে সে জানায়:

সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে–
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি; (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২০৬)

নাট্য-আখ্যানের পটভূমিতে এ জাতীয় প্রণয়ভাবনা-সূত্রে কুমারসেন ও ইলা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। 'ইলা ও কুমারসেনের প্রেম রাজাকে যুগলপ্রেমের আত্মত্যাগের মহিমান্বিত স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়তা করে। প্রেম কেবল যুগল জীবনের রসলীলা নয়, প্রেম সারাজীবনের আত্মদান ও আত্মত্যাগের প্রতীক, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অলংকার। (সাইফুল, ২০০৩ : ৪৫) অপরদিকে, চন্দ্রসেন ও রেবতী চরিত্রে সংযোজিত বৈষয়িক ও স্বার্থকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য। মূলত মানববৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যময় আয়োজন সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এ যুগল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এ নাট্য-আখ্যানে কুমারসেন চরিত্রের স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় এ দুই চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে। বিক্রমদেবের সঙ্গে কথোপকথনকালে চন্দ্রসেন জানায়:

গর্বিত কুমারসেন জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৪৭)

রেবতীর সংলাপেও: 'পারি নে লুকাতে আমি/হৃদয়ের ভাব।/ স্নেহের ছলনা করা/অসাধ্য আমার।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২২২) তার জীবনবোধের সূত্রেই 'রাজা ও রানী'র মূল কাহিনীর সাথে রেবতী চরিত্রের মানবিক প্রাণচাঞ্চল্য সঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষত রেবতী চরিত্রটি মানবিক আবেদন সঞ্জাত, তাই নাট্যঘটনায় অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নাট্যকাহিনীতে ত্রিবেদী চরিত্রটিও যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ও জীবন্তরূপে আবির্ভূত হয়েছে।' (অনুপম, ২০১০ : ২০) একই কথা প্রযোজ্য শংকর চরিত্রে ক্ষেত্রেও। নাট্য-আখ্যানে সুমিত্রা ও কুমারসেন চরিত্রকে স্নেহবন্ধনে রেখেছে শংকর চরিত্র। নাট্য-আখ্যানে যখন দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবল হয়ে ওঠে তখন সুমিত্রা ও কুমারসেনকে সে বলে: 'চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই / সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল-মাঝে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২১৯) তার এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সংলগ্ন সুনিবিড় জীবন-আকাঙ্ক্ষাকে স্মরণ করায়। দেবদত্ত চরিত্রটিও নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। উদাহরণস্বরূপ:

ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৮২)

বিক্রমদেবের বাল্যসখা দেবদত্ত চরিত্রটি রাজ্যের শাসন-কাঠামো বিষয়ে তার দূরদৃষ্টির পরিচয় নিহিত এখানে। সে রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তার বিপরীতভাবের চরিত্র ত্রিবেদী; আপাত নির্বোধের অন্তরালে রয়েছে তার ধূর্ত মানসিকতা। জয়সেন, যুধাজিৎ, মিহিরগুপ্ত, অমরুরাজসহ অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্রসমূহের আয়োজনে এ কাব্যনাট্যের নাট্যদ্বন্দ্ব, সম্পর্কের টানাপোড়েন, ক্ষমতার প্রতি আসক্তি সর্বোপরি প্রেমের নতুন পাঠ নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একটিমাত্র দৃশ্যের উপস্থিতিতেও কোনো কোনো চরিত্র নাট্য-আখ্যানের পটে প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। যেমন মধুজীবীর সংলাপ: ' সাবধানে থেকো যুবরাজ!/ তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত/ পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে যুধাজিৎ।/ বিশ্বাস কোরো না কারে কভু!' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩৫) আবার সুমিত্রা ও কুমারসেনের প্রতি শিকারীর সদাচারমূলক সংলাপ:

জয় হোক প্রভু!
ছাগ-শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে। ...
আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের

তুচ্ছ উপহার। আশীর্বাদ করো যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩৫–২৩৬)

লক্ষণীয়, প্রতিটি চরিত্রের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলেই স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতেও তারা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। *বিসর্জন* কাব্যনাট্যেও কাব্যনাট্যকারে এ প্রয়াস অক্ষুণ্ন থেকেছে।

বিসর্জন

বিসর্জন কাব্যনাট্যের মুখ্য চরিত্র চরিত্রগুলো হলো গোবিন্দমাণিক্য, গুণবতী, রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণা প্রমুখ। প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র নক্ষত্ররায়, নয়নরায়, চাঁদপাল প্রমুখ। অপ্রধান নাট্যসহায়ক চরিত্রসমূহ হলো: মন্ত্রী, পৌরগণ, ধ্রুব, চর, নেপাল, গণেশ, হারু, কানু, নিস্তারিণী, গোবর্ধন, অক্রূর, চিন্তামণি, ক্ষান্তমণি, প্রজাগণ, সভাসদ্‌গণ, প্রহরীগণ, পরিচারিকা প্রমুখ। 'যেখানে হিংসা থেকে অহিংসায় অপ্রেম থেকে প্রেমের পথে যাত্রা করেছে নাটকের প্রতিবাদী বিরূপ চরিত্রগুলি। ... অপ্রয়োজনীয়বোধে উপন্যাসের দুটি কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ধ্রুবর দিদি হাসি ও অপর্ণার বৃদ্ধ অন্ধ পিতার চরিত্র বাদ গিয়েছে নাটকে।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৮৯) নাট্য-আখ্যানের ভাববস্তু প্রতিফলনের সূত্রে 'বিসর্জন' নাটকের চরিত্রগুলি বিশেষত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।" (কনক, ১৯৫০ : ১০৯) গুণবতী চরিত্রের 'আপনার প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে অনুভব'- নাট্য-আখ্যানের সূচনা ঘটেছে এ আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে। একদিকে প্রাণের সংহারব্রত, অপরদিকে প্রাণের জন্য আকুতি এমন বৈপরীত্যময়তায় এ নাট্য–আখ্যানের চরিত্রসমূহ দ্বিবিধ ভাগে বিভাজিত হয়ে যায়। নাট্য-আখ্যানের প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে গুণবতীর বলে:

এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
তিন শত ছাগ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬২)

গুণবতীর বলির প্রতিজ্ঞা পুরো নাট্য-আখ্যানকে প্রভাবিত করেছে। নাট্য-আখ্যানের শুরুতে গুণবতীর প্রাণের মূল্যের ভিত্তিতে একদিকে রয়েছে গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ, অপর্ণা; অপরদিকে গুণবতী ও রঘুপতি। 'অপর্ণা ও গুণবতীর চরিত্র নাটকের নতুন সৃষ্টি।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮) ভাবজীবনের যে দ্বন্দ্ব এ আখ্যানে পরিবেশিত হয়েছে তাতে এ দুটি নারী চরিত্র সংযোজিত হয়েছে। মূলত 'বিসর্জনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৮০) গুণবতীর বলিপূজার বিপরীত বোধ নিয়ে নাট্য-আখ্যানে উপস্থাপিত হয় অপর্ণা চরিত্রটি। বলিপ্রথার নির্মমতা চিহ্নিত করে সে বলে:

মা তাহারে নিয়েছেন?

মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬২)

অপর্ণার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এ নাট্য-আখ্যানে মানবতার বোধের উদ্বোধন ঘটে। বস্তুত 'অপর্ণা বিসর্জন নাটকের প্রতীকী চরিত্র। প্রেম ও মানবতার প্রতীক হিসেবে এ নাটকে তাঁর আবির্ভাব।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৭২) এ নাট্য-আখ্যানে চেতনাগত স্বতঃসিদ্ধ প্রভাবে একটি চরিত্র আরেকটি চরিত্রের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করে। কেননা: 'নাটকের মধ্যে যে সংঘাতময় জীবনচ্ছবি আছে তাহা মানুষে মানুষে সংঘাত নহে। আদর্শের সহিত আদর্শের দ্বন্দ্বই এই নাটকখানিতে প্রকট।' (কনক, ১৯৫০ : ০৭) তাছাড়া সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা সামান্য বালিকার পক্ষে বহুচর্চিত বলিপ্রথার বিপরীতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ হয়ে উঠবার কথা নয়। কাব্যনাট্যকারকে তাই পরিকল্পনা করতে হয় ক্ষমতাশালী কোনো চরিত্র। এ ভাবনা থেকেই ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রটি নাট্য-আখ্যানে উপস্থিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার আর্তিতে তাই 'রাজা এতো গভীরতম বিচলিত হন এই আবেদনে যে তিনি তখনই তাঁর রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রে দেন। অনুমান করা যায় যে ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তিনি এই ধার্মিক আচারের অধার্মিকতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে দেখালেন যে মা কালী স্বয়ং ঐ-বালিকার বেশে রাজদ্বারে এসে প্রার্থনা করেছেন যেন পশুবলি বন্ধ করা হয়।' (আবু সয়ীদ ২০২১ : ৮৯) এ নাট্য-আখ্যানে বলিপ্রথার বিপরীতে রবীন্দ্র-মানসের কল্যাণময় প্রেমের বাণীর সঞ্চারক সে। প্রথা ও প্রতাপের বিপরীতে প্রেমের তথা মানবতার বাণী প্রতিষ্ঠায় বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন–উভয়ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের উদ্দেশ্যে গোবিন্দমাণিক্যের আহ্বান:

নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে

বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক,

উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত–

মা তোদের এমনি মা বটে! দণ্ডে দণ্ডে

ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে

তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে? ...

বুঝিতে পারো না! শিশু

দু দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও

তার জননীর বোঝে। সেও বোঝে, ভয়

পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে; সেও বোঝে

ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে; সেও

ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে। ...

বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা

জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯৭–২৯৮)

শেষপর্যন্ত নাট্য-আখ্যানে দেবতার স্থলে মানবের জয় প্রতিষ্ঠা পায়। 'শেষ পর্যন্ত রাজা ও রাণী উভয়েই উপলব্ধি করেন যে মন্দিরে নয়, শাস্ত্রে নয়, পরস্পরের মধ্যেই ঈশ্বরকে সন্ধান করতে হবে।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৯২) নাট্য-আখ্যানের দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়েছে রাজপুরোহিত রঘুপতি চরিত্র সংযোজনের ফলে। 'গোবিন্দমাণিক্যের মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি তাঁর ভাবাদর্শের মূর্তিমান প্রতিবাদ।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৯২) রাজরক্তে দেবী পূজা সমাপন হলে কবেল মুক্তি– এমন বিশ্বাস তার। নক্ষত্ররায় ও জয়সিংহকে সে জানায়:

মুক্তি নাই, মুক্তি নাই

কিছুতেই। রাজরক্ত আনিতেই হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৮৩)

যেকোনো কৌশলে, এমনকি কূট কৌশল অবলম্বন করে হলেও রঘুপতি পৌরহিত্যের জগৎ অধিকারে রাখতে চেয়েছে। রঘুপতি চরিত্র সম্পর্কে বলা যায়: 'বস্তুত রবীন্দ্র-নাটকে এমন প্রাণপ্রাচুর্যময় দুর্জয় শক্তিমান চরিত্র আর দ্বিতীয় নাই।' (কনক, ১৯৫০ : ১১৩) তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, 'ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন কেবল তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে মিলনের দ্বারাই অর্জিত হওয়া সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। 'বিসর্জন' নাটকে ব্রাহ্মণ রঘুপতি এ-কথা বুঝতে পারেনি যে ঈশ্বরচেতনার নির্যাস হলো প্রেম। তার নিজের মুক্তির জন্য প্রাণীহত্যাকে সে একটি উপায় বলে বিশ্বাস করেছে। তার পালিত পুত্র জয়সিংহ যখন প্রাণবিসর্জনের জন্য রঘুপতির জেদ মেটাতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করল, শুধু তখনই কেবল পুরোহিতটি তার জিজ্ঞাসার অর্থহীনতা বুঝতে পেরেছিল। নিজের প্রাণ দিয়ে জয়সিংহ

রঘুপতির হৃদয়ে প্রেমের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করেছিল।' (হুমায়ুন, ২০১৭ : ১০২–১০৩) রঘুপতির অর্থহীন ধর্মভাবনার চূড়ান্ত বলি হতে হয় জয়সিংহ চরিত্রটিকে। 'রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্যের মূল ছিল এতো গভীরে যে তাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৯০)। জয়সিংহ প্রথার নির্মমতা মেনে নিতে পারেনি, আবার পালিত পিতার ঋণ শোধের তাড়না থেকে অপর্ণার প্রেমের পথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্দির ছেড়ে যেতে না পারেনি।

> প্রথমেই জয়সিংহের চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন সার্থক চরিত্রসৃষ্টি খুব কম দেখা যায়। অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকীয় চরিত্রের প্রাণ। ইহাই চরিত্রকে জীবত করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে নিপীড়িত জয়সিংহের চিত্তের যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণে সৌন্দর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৩৪)

তার অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত সত্তা মুক্তি খুঁজেছে আত্মবলিদানের মধ্যে। 'কারণ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার মানবিক প্রতিবাদ ও জীবন মূল্যে জয়লাভ। জয়সিংহের আত্মদানে সে বক্তব্য পূর্ণ হয়েছে।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৯০) জয়সিংহের অন্তিম উচ্চারণ:

> রাজরক্ত
> চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
> মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটবে না
> তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
> ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
> মাতামহবংশ– রাজরক্ত আছে দেহে।
> এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
> হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
> অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষ্ণাতুরা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩১৭)

এ কাব্যনাট্যের আখ্যানের প্রেক্ষাপটে এটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত: 'চরিত্র চিত্রণে কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুধ্যানে *রাজর্ষি* উপন্যাস থেকে *বিসর্জন* ব্যতিক্রম, *রাজর্ষি* উপন্যাসে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। কিন্তু *বিসর্জন* নাটকে জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিসর্জন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়ায়

জয়সিংহই কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহ হয়েছে বিসর্জন নাটকের নায়ক।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৭০) প্রধান নাট্য-সহায়ক নক্ষত্ররায় ও নয়নরায় নাট্য-আখ্যানে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। ধর্মতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে রঘুপতির কপট ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে ওঠে নক্ষত্ররায়। রঘুপতি নয়নরায়কে সিংহাসনের প্রতি প্রলুব্ধ করে তোলে সে।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।

তাঁরি রক্ত চাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৮২-২৮৩)

অপরদিকে, গোবিন্দমাণিক্যের সহায়ক শক্তি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে সেনাপতি নয়নরায় ও দেওয়ান চাঁদপাল। নাট্য-আখ্যানে চাঁদপাল চরিত্র প্রসঙ্গে বলা যায়: "স্বল্প রেখার মাধ্যমেই এই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্রটি চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে।" (কনক, ১৯৫০ : ১২৪) উদাহরণস্বরূপ, চাঁদপালের সংলাপ:

মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০১)

স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের আয়োজনে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের ভাবাদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সংহত এবং সুস্পষ্টভাবে।

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের মুখ্য চরিত্র চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন। প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র মদন, বসন্ত। অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র বনচরগণ। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার সামগ্রিক রূপের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: 'এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপুরী।' (প্রমথ, ২০০১ : ১৯৫) কেননা: 'নারী সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ী জৈব উদ্দেশ্য অতিক্রম করে অন্তরের চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের পরিচয় ব্যক্ত করার জন্যে চিত্রাঙ্গদার রূপায়ণ।" (সাইফুল, ২০০৩ : ১১৩) চিত্রাঙ্গদার চরিত্র পূর্ণায়ত করে তুলবার প্রয়োজনে অর্জুন চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে নাট্য-আখ্যানে।

‘‘ ‘চিত্রাঙ্গদা’য় অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদাই প্রধান চরিত্র। চিত্রাঙ্গদার রূপজ প্রেমে মোহবিহ্বল ব্রতধারী সন্ন্যাসী অর্জুনের ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতায় আত্মবলিদান এই নাট্যকাহিনীর অন্যতম বিষয়বস্তু। কিন্তু তার জন্যে অর্জুনের মনে তেমন কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। রূপের পায়ে বিকলচিত্ত অর্জুনের অসহায় আত্ম-নিবেদনের মধ্যেই যেন তৃপ্তি। বরং চিত্রাঙ্গদার মনে আছে যন্ত্রণা। ... এ নাট্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত চরিত্র একমাত্র চিত্রাঙ্গদাই। তার দ্বন্দ্ব অন্তরের সঙ্গে বাইরের–রূপের সঙ্গে ভালোবাসার। ভালোবাসার স্বীকৃতি ভালোলাগায় না হৃদয়ানুভবে।’’ (অশোককুমার, ২০১১ : ২৮) চিত্রাঙ্গদা তাই আধুনিক মানসের প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে এ নাট্য-আখ্যানে।

> সচেতন ও বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে নারীর অধিকার মেনে নেওয়ার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবৃত্তিক সহমর্মিতার ভিতর দিয়ে এই মতবাদকে আবাহন করেছিলেন। তাঁর ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকে রাজনন্দিনী অর্জুনকে বলে দেন, তিনি দেবী নন যে উপাসনা করা যাবে, আবার খেলার সামগ্রীও নন যে মন গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। সুখে ও দুঃখে সঙ্গী হিসেবে যদি অর্জন তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর চিন্তা, অনুভব ও কর্মে অর্জুন যদি অংশ নেন, তখন তাঁর সত্য স্বরূপ অর্জুন দেখতে পাবেন। (হুমায়ুন, ২০১৭ : ১০৬)

চিত্রাঙ্গদার দীপ্ত উচ্চারণে এর প্রতিধ্বনি রয়েছেঃ

> আমি চিত্রাঙ্গদা।
>
> দেবী নাহি, নাহি আমি সামান্যা রমণী।...
>
> ... যদি পার্শ্বে রাখ
>
> মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
>
> যদি অংশ দাও। যদি অনুমতি কর
>
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
>
> যদি সুখে দুঃখে মোহর কর সহচরী,
>
> আমার পাইবে তবে পরিচয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৫৭)

এমন উচ্চারণের মধ্য দিয়েঃ ‘নারী জনমের এই সার্থকতার ধারণা রবীন্দ্রনাথ *চিত্রাঙ্গদা* নাটকে বদলে দেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্যতম ব্যতিক্রম হয়ে ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা, মদন আর বসন্তের গড়া রমণীয়তা আর সৌন্দর্যের খোলস থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করে, আমিই সেই চিত্রাঙ্গদা যে বীর্যে সে পুরুষ, দেবী নয়, সামান্য রমণীও নয়, দুরূহ চিন্তার এবং *মহাভারতে* ব্যাসদেবের সৃষ্টি চিত্রাঙ্গদা রূপসী এবং রমণীয়, পৌরুষ শিক্ষা তেজে সুখে দুঃখে পুরুষের সহচরী হওয়ার অভিলাষী।’ (সাদ, ২০১৮ : ৮৬) চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে অর্জুন চরিত্রটির সংযোগ

জড়িত। কেননা: 'অর্জুন সন্দর্শনে চিত্রাঙ্গদার নারী হৃদয় পেলবতার স্পর্শে পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ১১৬)

'আমরা পৌরাণিক চিত্রাঙ্গদার মধ্যে পাই আত্মজিজ্ঞাসার আধুনিকত্ব। দেহাশ্রয়ী রমণীর পরিবর্তে অন্তরাশ্রয়ী মানবীকে অর্জনের রূপকল্পে এখানে চরিতার্থ হয় পুরুষার্থের আত্মবিশ্লেষণ। অর্জুন যে বিমুগ্ধ চোখে মানব জীবনের অবাধ বিপুল বিস্ময় ও রহস্যময়তাকে ব্যক্ত করে, সে দৃষ্টির সারূপ্য রয়েছে রবীন্দ্রদৃষ্টির সঙ্গে।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬১) চিত্রাঙ্গদা-দর্শনে অর্জুনের অনুভূতি:

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৫–৩৩৬)

এখানে অর্জুন পুরুষের চিরন্তন মূল্যবোধের আধারে সুচিত্রিত হয়েছে। 'তপস্যারত অর্জুন কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে এক কৃত্রিম জগতে বনবাস নির্বাহ করলেও অপরূপা নারী দেহসৌষ্ঠব তাকে ভোগাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ১১৯) তাছাড়া: 'পরিপূর্ণ হৃদয় সৌন্দর্যে নারী দুর্মর বাসনাকে শান্ত করে বাস্তব জীবনের চিন্তা ও কর্মে পুরুষকে নিয়োজিত করতে পারে তাকে আমরা প্রকৃত প্রণয়িনী ও গৃহিণীরূপে চিহ্নিত করতে পারি। *চিত্রাঙ্গদা* নাটকে চিত্রাঙ্গদার এই পরিচয় আবিষ্কৃত হওয়ায় অর্জুন প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ১১৬) এ নাট্য-আখ্যানে মদনদেব ও বসন্ত চরিত্রদ্বয় চিত্রাঙ্গদার মনোলোকের উদ্ভাসনের সহায়ক চরিত্র হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। 'মদনের কাছে তাঁকে ভিক্ষার্থিনী হতে হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের কুরূপ ঢেকে অকস্মাৎ বাঞ্ছিতকে নিজের অধিকারভুক্ত করবার লোভটাই চিত্রাঙ্গদার একমাত্র পরিচয় নয়। তিলে তিলে হৃদয় অধিকার করাই যে সত্যিকার অধিকার, সে সত্য তাঁর অজানা নয়।' (হরপ্রসাদ, ১৩৭০ : ২৩৪) 'বীর্যে যুবরাজ' হিসেবে পরিচিত চিত্রাঙ্গদার অন্তরে সুপ্ত নারীসত্তার জাগরণের মাধ্যম হিসেবে এ চরিত্রদ্বয় নাট্য-আখ্যানের পটে বিশিষ্ট হয়ে আছে। মদনের সংলাপ: 'আমি হব সহায় তোমার।/ অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনের জিনিয়া/ বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৩) বসন্তও জানায়: 'শুধু একদিন নহে,/ বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি/ ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে

বিকশি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৪) বাহ্যিক রূপের ক্ষণস্থায়িত্বের বোধ এ দুটি চরিত্রের সূত্রে নাট্য-আখ্যানে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। নাট্য-আখ্যানে উভয়ের ভূমিকা বিবেচনায় বলা যায়: 'মদন ও বসন্ত চিত্রাঙ্গদার দুটি রূপক চরিত্র।' (সাইফুল, ২০০৩ : ১১৯) এছাড়া বনচর চরিত্র এ নাট্য-আখ্যানে সূত্রধরের ভূমিকা পালন করেছে অনেকাংশে। প্রসঙ্গত বনচর-অর্জুনের পারস্পরিক কথোপকথন উল্লেখ করা হলো :

বনচর। হায় হায়, কে রক্ষা করিবে।

অর্জুন। কী হয়েছে।

বনচর। উত্তর-পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জুন এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪৯-৩৫০)

চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত স্বরূপ বনচরের সংলাপে উপস্থাপিত হলো এখানে। এভাবে নাট্য-আখ্যানের প্রতিটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের অভিমুখী করে তোলেন। নাট্য-আখ্যানের সকল চরিত্রের আয়োজনে চিত্রাঙ্গদার তথা নারীর সামগ্রিক রূপাবয়ব নির্মিতিই রবীন্দ্রনাথের অভিলক্ষ্য। মূলত 'নারীর সার্থকতা এই সম্মিলিত প্রেয়সী ও দেবী, প্রণয়িনী ও গৃহিণী, উর্বশী ও লক্ষ্মীমূর্তিতে। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রিয় ভাব।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ : ৭৮) *মালিনী* কাব্যনাট্যেও রবীন্দ্রনাথ নারীকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় রেখে মৌল তাৎপর্যের অনুসন্ধান করেন।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্য-আখ্যানের মুখ্য চরিত্র হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে রাজা কাশ্যপের কন্যা মালিনী। প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র রাজা কাশ্যপ, রাজমহিষী, সুপ্রিয়, ক্ষেমংকর প্রমুখ। অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র চারুদত্ত, সোমাচার্য, উগ্রসেন, দেবদত্ত, সেনাপতি, ব্রাহ্মণগণ, যুবরাজ, মালিনীর পরিচারিকাবর্গ, প্রতিহারী, প্রজাগণ প্রমুখ। এর নাট্য-আখ্যানের চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানান:

> প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল, এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিল্পী-মনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪২৯)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ সত্যধর্মের প্রতীকী হিসেবে মালিনী চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। '' 'মালিনী' নাটকের নামকরণে চরিত্রকেন্দ্রিক ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মালিনী। নাটকের শুরুতে দেখা যায় নবধর্মে দীক্ষালাভের পর তার মধ্যে দেখা দিয়েছে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। অন্দরমহলের থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জগতের মাঝে দাঁড়ানোর ভাবনা জেগেছে মনে। সেই ভাবনায় সহায়তা দিয়েছে ব্রাহ্মণদের ও প্রজাদের সম্মিলিতভাবে তার নির্বাসন কামনা।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ১২৯) মালিনীর সংলাপে রয়েছে এরই প্রতিধ্বনি:

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা– কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই–গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস– মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান– মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে– কোথা হতে বিশ্বাস আমার
এল মনে? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
বাহির-সংসার–বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,

আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা– যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩৫–৪৩৬)

এভাবেই মালিনী রবীন্দ্র-ধর্মভাবনার কাণ্ডারী হয়ে ওঠে। 'এই চরিত্রটি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দুধর্মের পরিবর্তে করুণা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্মের সমর্থনকারিণীরূপে আবির্ভূতা। ঐ ধর্মের মূল নীতিসমূহের অনুসারিনী সে।' (কনক, ১৯৫০ : ১৪৮–১৪৯) তার নবধর্ম নামক হৃদয়ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত সুপ্রিয় চরিত্রটি। নবধর্মের আলোয় আলোকিত সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেঃ

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী, ক্ষেমংকর– ভ্রামিলাম
বৃথা এ সংসার এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তরমাঝে কই কথা কহে কথা,
কী প্রশ্নের দেয় সে উত্তর– কী ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা! আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী-'পরে রাখিলে চরণ–
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
একি গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্তধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪২)

মূলত "সুপ্রিয় দোলাচলবৃত্তি, হৃদয়াবেগের একান্ত অধীন, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সেই হৃদয়াবেগেরই একটা প্রকাশ। হৃদয়াবেগপ্রবণ বলিয়াই হৃদয়গত ধর্মের প্রতি তাহার আগ্রহ, ধর্মমত অপেক্ষা মানুষের প্রতি বেশি টান।"

(কনক, ১৯৫০ : ১৭১–১৭২) বলা যায়, সুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের প্রতীকী চরিত্র। শাস্ত্র বা প্রচলিত ধর্মমত নয়, মানুষের প্রতি তার আস্থা অবিচল।

> মালিনী নাটিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও সুপ্রিয়র মাধ্যমেই ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে এবং মালিনী চরিত্রের রূপান্তর দেখানো হয়েছে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৯০)

কাশ্যপ ও রাজমহিষী চরিত্র পরিকল্পনায় রাজা ও রাজ্ঞীর বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে পিতা ও মাতা চরিত্রের স্বভাবধর্ম প্রকটিত হয়েছে। নবধর্মে উদ্দীপিত মালিনীকে সন্তান হিসেবে হারাবার আশঙ্কা এ নাট্য-আখ্যানে তাদের ত্রস্ত রেখেছে। লক্ষণীয়যে, 'মালিনী' নাটকের রাজা চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দুই সত্তার রূপ। একদিকে তিনি পিতা, অন্যদিকে রাজা। পিতারূপে তিনি মালিনীর জন্য চিন্তিত। তাকে সর্ববিঘ্ন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য রয়েছে সদাব্যস্ততা তাঁর। আর রাজারূপে তিনি রাজ ধর্মপালনে তৎপর।' (অশোককুমার, ২০১১ : ১৪২) ঘটনাপ্রবাহে তারাও অনুধাবন করতে সমর্থ হয় নবধর্মের আন্তর্শক্তি। কাশ্যপের চেতনায় মালিনী হয়ে ওঠে 'লোকলক্ষ্মী'। আর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসা-উৎকণ্ঠা মিশ্রিত অনুভাবনায় পুরো নাট্য-আখ্যানে বিশিষ্ট হয়ে আছে মহিষী চরিত্রটি। 'কাশীরাজ্যের রানী রাজমহিষীর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রমণীর আদলই ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বামী পুত্র সংসার নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে চাওয়াই তাদের জীবনের পরম প্রার্থনা। মালিনীকেও তিনি সেভাবেই সাথে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে মালিনীকে এবং তার নবধর্মকে ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি তা বোঝা গেছে এ নাটকের শেষের দিকে।' (অশোককুমার, ২০১১ : ১৪৩) তাই তার প্রার্থনা:

> বসুগণ রুদ্রগণ,
> বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
> কন্যারে আমার ... মনোমত বর দেখে
> খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা–
> দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৭–৪৪৮)

আমরা জানি যে, 'ধর্মকে ভিত্তি করিয়া মালিনী নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে। মালিনীর উপজীব্য দুই ধর্মের সংঘাত। একদিকে চিরন্তন শাশ্বত মানবধর্ম, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম– আচার-অনুষ্ঠানে কণ্টকাকীর্ণ ধর্ম। ঐ দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ আঁকাই কবির লক্ষ্য।" (কনক, ১৯৫০ : ১৫৭) চরিত্র পরিকল্পনায় এ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। মালিনী ও তার নবধর্মের বিপরীত বোধের চরিত্রগুলোর হলো ক্ষেমংকর। উল্লেখ্য যে,

নাটকের বিষয় নিয়েছেন তিনি বৌদ্ধকাহিনী থেকে, সেখানে মালিনী প্রধান চরিত্র। কিন্তু এ নাটকের অনুপ্রেরণারূপে তিনি যে স্বপ্নের কথা বলেছেন সেখানে মালিনী কোথাও নেই। রয়েছে দুই বন্ধুর কথা। আর সেই দুই বন্ধুর ছাঁচে গড়ে উঠেছে সুপ্রিয়-ক্ষেমংকরের চরিত্র। তাই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নির্বাচনে ক্ষেমংকর পিছিয়ে নেই। ক্ষেমংকর সৎ, সাহসী, আত্মধর্ম ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। নাটকের প্রথম থেকেই তিনি বারংবার আঘাত করতে চেয়েছেন নবধর্মকে, বৌদ্ধ আখ্যানের মতো। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে অমোঘ শক্তির কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছে। এ পরাজয় ব্যক্তি মালিনীর কাছে ব্যক্তি ক্ষেমংকরের নয়। এ এক ধর্মমতের কাছে আর এক নবাগত ধর্মমতের। বহু বৎসর ধরে জনমনে রাজত্ব করা ধর্মের আপন আসন ত্যাগে দ্বিধা। বাধা তাই প্রবল হয়েছে। কিন্তু ক্ষেমংকর যাদের নিয়ে বাধার প্রাচীর গড়ে নবধর্মের তীব্র স্রোতধারাকে বাঁধবে ভেবেছিলেন তারা যে বসন্ত শেষে প্রথম বাতাসের ভার সইবে না, নুয়ে পড়বে একবারের স্পর্শের পুলকেই– তা বুঝতে পারেন নি। (অশোককুমার, ২০১১ : ১৩০)

ক্ষেমংকর পত্র-মাধ্যমে সুপ্রিয়কে জানায়–

এল ঝড় অবশেষে

একখানি ছোটো পত্ররূপে। লিখেছে সে–

রত্নবতী নগরীর রাজগৃহ হতে

সৈন্য লয়ে আসিছে সে শোণিতের স্রোতে

ভাসাইতে নবধর্ম, ভিড়াইতে তীরে

পিতৃধর্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে

প্রাণদণ্ড দিতে। প্রচণ্ড আঘাতে সেই

ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমিষেই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৫২)

মালিনীর নবধর্মের মূল-উৎপাটন করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম আঁকড়ে থাকাই তার একমাত্র ব্রত। তথাপি 'ক্ষেমংকর প্রেমহীন আদর্শের বাহক নন। তিনি বন্ধুর কাছে জানিয়েছেন তার প্রেমের কথা, বন্ধুর প্রতি তাঁর অকপট প্রেমের কথা তো প্রমাণিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও তাঁর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে তীব্র কষ্ট দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর শাস্তি বিধান করেছেন একদিকে, অন্যদিকে তাঁকে শাস্তি দিয়ে নিজেও যন্ত্রণা পেয়েছেন। মৃত্যুর মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট রাখার বাসনা ব্যক্ত করেছেন।' (অশোককুমার, ২০১১ : ১৩৩–১৩৪) তারপরেও বন্ধুতা ভুলে আখ্যানপটে হন্তাকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই নাট্য-আখানের 'নিরুপায় নায়ক একান্ত অসহায় যূপবদ্ধ বলির পশুর মত নিয়তি-নির্ধারিত পরিণাম বহন করিতে বাধ্য হয়। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ের মর্মান্তিক পরিণামের মধ্যে এই অনিবার্যতা আছে।' (কনক, ১৯৫০ : ১৫৪) এছাড়া চারুদত্ত, সোমাচার্য, উগ্রসেন, দেবদত্ত, সেনাপতি, ব্রাহ্মণগণ, যুবরাজ,

মালিনীর পরিচারিকাবর্গ, প্রতিহারী, প্রজাগণসহ সকল চরিত্র প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'মালিনী এ নাটকের সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র–যার প্রতিটি আচরণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্যান্য চরিত্রগুলো।' (অশোককুমার, ২০১১ : ১২৯) চারুদত্ত, সোমাচার্য, চারুদত্ত, উগ্রসেন, দেবদত্ত প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের শঙ্কা ও সংকটের হেতু ছিল মালিনী। মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তারা ঘোষণা দেয়: 'নির্বাসন, নির্বাসন, রাজদুহিতার নির্বাসন!' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩৭) যুবরাজ চরিত্রটি; পুরো নাট্য-আখ্যানে যার একটিমাত্র সংলাপ রয়েছে এবং তাও মালিনীকেন্দ্রিক। মালিনীর নির্বাসনদণ্ড প্রসঙ্গে সে বলে:

> না দেখি উপায়।
> ত্বরা যদি নাহি কর রাজ্য তবে যায়
> মহারাজ। সৈন্যদল নগরপ্রহরী
> হয়েছে বিদ্রোহী। স্নেহমোহ পরিহরি
> কর্তব্য সাধন করো– দাও মালিনীরে
> অবিলম্বে নির্বাসন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৫)

বিসর্জন ও *মালিনী* একই ভাবাদর্শ-অবলম্বী নাট্য-আখ্যান হওয়ায় উভয় কাব্যনাট্যের চরিত্রায়ণে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। '' 'বিসর্জন' নাটকের নানা চরিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে 'মালিনী'র নানা চরিত্রের প্রকৃতির আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। 'বিসর্জনে'র রঘুপতির নররূপ যেন ক্ষেমঙ্কর, জয়সিংহের আদলে তৈরী সুপ্রিয়, অপর্ণার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব *মালিনী*তে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রথা ও আচারসর্বস্বতার উপর হৃদয়নির্ভর মানবতার ধর্মকে উভয় নাটকে প্রকাশ করতে গিয়ে পরিণতির একই পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। তাই 'বিসর্জনে'র আরো সংহত ও আকর্ষণীয় রূপ 'মালিনী'।" (অশোককুমার, ২০১১ : ১২৪–১২৫) লক্ষণীয়:

> রবীন্দ্রনাথ যেসব নারীচরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাদের মধ্যে যেমন স্থানিকতার পরিচয় আছে, তেমনি আছে চিরন্তন মানবসত্তা। তাই তাদের বিশেষ পটভূমিটি অপসৃত হলেও যা রয়ে যায়, তা সর্বকালীন মানবসত্য। (আনিসুজ্জামান, ২০১৬ : ৪৬)

এ প্রসঙ্গে *রক্তকরবী*র নন্দিনী অবশ্য স্মরণীয়। 'আমরা জানি নারীর আত্মসত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আজীবন রবীন্দ্রনাথ কতখানি মানবিক ও উদারনৈতিক ছিলেন। আবার এও পরিলক্ষিত হয় যে, নারীর ব্যক্তিসত্তার অবয়ব নির্মাণে তিনি পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্যিক কাঠামোরও পরিপোষক এবং নিজের একটি মতাদর্শ আরোপে সর্বদাই উৎকণ্ঠ।' (বেগম আকতার, ২০০৭ : ৩২)

রক্তকরবী

*রক্তকরবী*র নাট্য-আখ্যানের মৌল দার্শনিক অভিপ্রায়ের অনিবার্যতায় নাট্য-চরিত্রসমূহ পরিকল্পিত হয়েছে। নাট্য-আখ্যানে গুরুত্ব ও ভূমিকা বিবেচনায় চরিত্রসমূহকে **ক)** মুখ্য চরিত্র এবং **খ)** নাট্য-সহায়ক চরিত্র দ্বিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ নাট্য-আখ্যানে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে রাজা এবং নন্দিনী। অন্যান্য চরিত্রসমূহ নাট্য-সহায়ক চরিত্র বলা যায়। নাট্য-সহায়ক চরিত্রগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগে করা হয়েছে: **ক)** প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: বিশুপাগলা, অধ্যাপক, রঞ্জন, ফাগুলাল, চন্দ্রা, কিশোর, সর্দার প্রমুখ; **খ)** অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: গোকুল, গোঁসাই, পুরাণবাগীশ, চিকিৎসক, মোড়ল, মেজো সর্দার, পালোয়ান প্রমুখ।

> রবীন্দ্রনাথের এই সবচেয়ে পরিণত নাটকটিকে ভিন্ন ভিন্ন সকলেই মানবস্বভাবের ভাঙা ভাঙা অনেকগুলি স্তরে জড়ানো আছে, যেন একটা তলহীন গহ্বরে পতনশীল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। ফলে তাদের কখনোই মনে হয় না যান্ত্রিক পরিকল্পনায় ক্লিষ্ট, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই আমাদের তারা ছুঁয়ে যায়। (শঙ্খ, ২০০৯ : ১১৪)

এ কাব্যনাট্যের রাজা চরিত্র পরিকল্পনা-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে: '*রক্তকরবী*র রাজা রহস্যময় চরিত্র। শোষক শ্রেণীর কেন্দ্রবিন্দুতে তার অবস্থান। চরিত্রটি সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের রাবণ চরিত্রকে স্মরণ করেছেন। তাঁর স্মৃতিতে ছিল একাধিক মুণ্ড ও হস্তধারী রাবণ। রাবণ পরধন লুণ্ঠনকারী; ধনবাদী সমাজের শোষণবৃত্তির প্রতিনিধি, রামায়ণের রাবণের পররাজ্য গ্রাসের, পরসম্পদ লুণ্ঠনের যে অভিপ্রায় ছিল রক্তকরবীর রাজার মধ্যে রূপকের আবরণে সংকেতের দ্যোতনায়, প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সেই রাবণের অন্তর্বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ রক্তকরবীর রাজার অবয়ব গড়ে উঠেছে পুরাণের রাবণের কঙ্কালের উপর।' (সাইফুল, ২০০৩ : ২৫১) যক্ষপুরী নামক মৃত্যুপুরীর অধিপতি মকররাজের চরিত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে– মকররাজ। ... রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৬৯) রবীন্দ্রনাথ তার শোষক-মুখের আড়ালে লুকানো বদ্ধ আত্মার মুক্তির বাণী, প্রাণের স্পন্দন পৌঁছে দিতে চান। 'এই জাল হইতেছে রাজার নিত্যমুক্ত, সর্বপ্রসারী, আনন্দময় স্বরূপের বাধা।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ৩১৪) পুরো আখ্যানে তার বন্ধনজর্জর আত্মার পরিক্রমা শেষে রবীন্দ্রনাথ তাকে মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত করেন। রাজা বলে:

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি– বেঁচেছি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ১০৫)

সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার মানসিকতা এবং স্খলিত মনুষ্যত্ব থেকে রাজার এ উত্তরণের সূত্র হিসেবে নন্দিনী চরিত্রের পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী নারী-সৃষ্টি নন্দিনী। কেননা:

> ভিন্ন তাৎপর্য দেখি *রক্তকরবীর* নন্দিনীর মধ্যে। সে সংঘশক্তি জাগিয়ে তোলার সক্রিয়তা ও ক্ষমতার অধিকারিণী। হৃদয়প্রেম দিয়ে নন্দিনী উদ্বুদ্ধ করেছে শাপগ্রস্ত পুরুষদের লোভকে, শ্রমকেও। তার তীব্র ভাষা কাব্যব্যঞ্জনার শক্তিতে প্রত্যাখ্যান করে শক্তিমদমত্ত মুনাফালোভী সভ্যতার কাঠামোকে। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৭৭)

এ চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল এমন: 'জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৬৯) অর্থাৎ, এ কাব্যনাট্যে রবীন্দ্র-চিত্তের ভাবপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নন্দিনী চরিত্র সংযোজিত হয়েছে। নন্দিনীই তাই উচ্চারণ করতে পারে:

> আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৫)

নন্দিনীর মধ্যে একটি অ-মানবিক সমাজ কাঠামোকে ভেঙে কাঙ্ক্ষিত আদলে নির্মাণের প্রয়াস লক্ষণীয়। নন্দিনী সুন্দর, সহজ ও আলোর বার্তা নিয়ে উপস্থিত এখানে। নন্দিনী চরিত্র পরিকল্পনায় এ ভাবনা সক্রিয় থাকা আরোপিত মনে হয় না যে:

> রবীন্দ্রনাথের নারী-'পুরাতনী' মানসভ্রমণ শেষে নতুন সভ্যতা সৃষ্টির কারিগর মাত্র নয়, নেতৃত্বে, অধিষ্ঠিত হয়। এতে সংসারের সীমা আছে, আছে পুরুষের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সান্নিধ্য, তবে সবচেয়ে বেশি আছে নারীর আত্মিক জাগরণ। রবীন্দ্রনাথ নারীর জন্য চেয়েছেন কর্মপথ ও সামাজিক পরিসর। এই গতি তবু নারীর প্রেম বা আশ্রয়ীসত্তাকে লঙ্ঘন করে নয়। নারী-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই শেষপর্যন্ত সমন্বয়বাদী। নারী কল্যাণী-নারী যেন কল্যাণ করতে পারে সেই অধিকার দাবি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। (সিরাজ, ২০১৭ : প্রসঙ্গত)

নাট্য-আখ্যানে অন্যান্য চরিত্রের মনোলোক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জিত হয়েছে নন্দিনীর সূত্রে। বিশুপাগলা, অধ্যাপক, ফাগুলাল, চন্দ্রা, কিশোর, সর্দারসহ সকল চরিত্রে নন্দিনীর বয়ে আনা আলোর বিস্তরণ ঘটেছে। নন্দিনীর আলোর উৎস রঞ্জন। পুরো নাট্য-আখ্যানে তার শরীরী উপস্থিতি নেই বটে, তবে তার চেতনার প্রসারণ ঘটেছে চরিত্রের অর্ন্তলোকে। এখানে স্বল্পালোকিত পালোয়ান চরিত্রও তাই শ্রেণিসচেতন, প্রতিবাদমুখর হয়ে বলে:

নন্দিনী। তোমার কি রকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান?

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।–যদি কোনো উপায়ে একবার– হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার– তোর দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯৫)

এ নাট্য-আখ্যানে 'রক্তমাংসের নির্দিষ্ট চরিত্র বা মানুষ নাটকে যতটুকু স্থান পেল, তার চেয়ে বেশি ঠাঁই পেল মানুষের বা চরিত্রের এক একটা আর্কিটাইপ এবং তার নিরন্তর দার্শনিক অভিপ্রায় ও জিজ্ঞাসা। ... সব চরিত্র, সব সংলাপ ক্রিয়া যেন সেই বিশেষ ভাব বা আইডিয়াকে সম্পন্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে।' (শুভাশিস, ১৪১৯ : ২১৫)

৪.১.৫ মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা

এ কথা সবার জানা যে, 'মঞ্চ-সাফল্যের কথা কাব্যনাটকের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে মঞ্চ-সাফল্য এসেছে। ''রবীন্দ্রনাট্যভাবনা বাংলা নাট্য-চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৌলিক চিন্তা ও বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটককেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'হাতে দান করে গেছেন। আর তিনি নিজে ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক অভিজাতদের রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১৮৮১), *কালমৃগয়া* (১৮৮২), *রাজা ও রাণী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *রাজা* (১৯১০)। তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'ফাল্গুনী' এবং 'ডাকঘর' যথাক্রমে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ সালে 'রক্তকরবী' নাটক রচনা করে তার অভিনয়-অধিকার নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িকে প্রদান করেন।'' (অগ্রবীজ, ২০১৮ : সম্পাদকীয়) এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্যযোগ্য যে:

> রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য বাংলাদেশের চেয়ে বিদেশে অধিক সফলভাবে ভাষান্তরে অভিনীত ও মঞ্চে সাফল্য লাভ করেছে। (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৪)

লক্ষণীয় বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্যের আখ্যান বিন্যাসে অতি প্রয়োজনীয় মঞ্চনির্দেশনাই সংযুক্ত করেন। কাব্যনাট্যের মঞ্চ-উপযোগী-উপকরণসমূহ তিনি প্রথাবদ্ধ ভাবনারীতিতে প্রয়োগ করেন না। এ কথ বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে তাঁর প্রাতিস্বিক নাট্যমানস নাট্যমঞ্চ বিষয়ে এমন ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েছিলো: 'নাট্যমঞ্চের ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা। প্রথম কথা, এখানে যা হয় তা হল বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে সমন্বয় আর সংমিশ্রণ। সাহিত্য, অঙ্গভঙ্গি,

সংলাপ, সংগীত, মঞ্চকলা, নৃত্য–সবকিছু একজোট হয়ে দর্শকচৈতন্যে একই প্রতিক্রিয়া জাগাতে চেষ্টা করে। এই সংমিশ্রণের আবার কোনো বাঁধাধরা মান-মাত্রা নেই। এ হচ্ছে একই প্রভাব সৃষ্টিকারী বিভিন্ন শক্তির মুক্তলীলা, যা ফের সহজে বা প্রয়োজনমতো এদিক-ওদিক করে নেওয়া চলে।' (মার্টিন, ২০১৮ : ৯৮)

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এ কাব্যনাট্যের ষোলটি দৃশ্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসকল নির্দেশনা দেন প্রয়োজন বিবেচনায় তার ক্রমধারা উল্লিখিত হলো: গুহা– রাজপথ– অপরাহ্ন– পথ– পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটির– গুহাদ্বারে সন্ন্যাসী–পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী– গুহাদ্বারে–গুহায় সন্ন্যাসী– গুহার বাহিরে–পথে সন্ন্যাসী– গুহার দ্বারে– অরণ্য, ঝড়বৃষ্টি, রাত্রি– প্রভাত– অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া– লোকারণ্য– গুহামুখ, ধুলায় পতিত বালিকা। প্রথম থেকে ষোড়শতম দৃশ্যের এ জাতীয় নির্দেশনায় নাট্য-আখ্যানের ঘটনার ক্রম-বিন্যাস সুস্পষ্টতা চিহ্নায়িত হয়। আবার, এসব নির্দেশনায় ক্রম-মূর্ত হয়ে ওঠে বালিকাটির সংস্পর্শে বদ্ধতার প্রতীকী জীবন থেকে সন্ন্যাসী চরিত্রের ক্রম-উত্থান ও ক্রম-রূপান্তর।

তাছাড়া জনতা-সংশ্লিষ্ট নাট্য-অংশগুলোতে রবীন্দ্রনাথ সংহত অথচ যথাযথ নির্দেশনাসূচক পরামর্শ জ্ঞাপন করেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে পথিকদলের তর্ক, বিদ্রুপ ও পরিহাসমূলত সংলাপ বিনিময়ের পর '[ক্রোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অনুগমন]' বালকপুত্র সমেত স্ত্রী যখন মন্দিরে যেতে না পেরে আক্ষেপে মঞ্চ ত্যাগ করে তখন রবীন্দ্রনাথ সে প্রস্থান-দৃশ্য আঁকেন এভাবে- '[প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান]' একই দৃশ্যে মন্ত্রীর পুত্র আসার ও প্রস্থানের দৃশ্য '[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৯৩) আবার, বালিকার যখন সন্ন্যাসীকে বলে: দেখো পিতা' লতাটিতে কুড়ি ধরিয়াছে,/ প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ১১৪) তখন '[সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল] (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ১১৪) কিংবা '[সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন ও মূর্ছিত হইয়া বালিকার পতন]' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ১১৪)– এসকল মঞ্চনির্দেশনায় সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বময় সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। আবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নাট্য-আখ্যান *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্য-নির্দেশনায় একই রীতির অনুসরণ করেন।

রাজা ও রানী

প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যনাট্যের মতো এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের আগমন, প্রস্থান, অন্তরালে গমন, আলাপচারিতার স্থাননির্দেশক সামান্য মঞ্চনির্দেশনা সংযুক্ত করেন। সুমিত্রা যখন পুরুষবেশে জালন্ধর রাজ্য ত্যাগ

করে তখন রবীন্দ্রনাথ নাট্যনির্দেশনার কাজটি সম্পাদন করেন ত্রিবেদী চরিত্রের ধূর্তমানসিকতা উন্মোচনের সূত্রে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা হলো:

> হে হরি, কী দেখলুম! পুরুষমূর্তি ধরে রানী ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুশি। মধুসূদন! ভাবলে ব্রাহ্মণ বড়ো সরল-হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নেই। ... এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৮২)

সুমিত্রার রাজ্যত্যাগ এ নাট্য-আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনার প্রভাবে তিনি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব পাঠকের গোচরে আনেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই বাংলা কাব্যনাট্যের, ব্যাপক অর্থে বাংলা নাটকের ধারায় স্বতন্ত্র রীতি সৃষ্টি করে চলেন। পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে শিকারীর বিদায়কালে কুমারসেন:

> [বাহু বাড়াইয়া]
>
> এসো তুমি, এসো আলিঙ্গনে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩৬)

এখানে রবীন্দ্রনাথের সর্বমানবীয় প্রেম ও কল্যাণবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার নাট্য-আখ্যানের শেষ দৃশ্যের কিয়দংশ তুলে ধরা হলো:

> [যষ্টিহস্তে কষ্টে শংকরের প্রবেশ
>
> চন্দ্রসেনের প্রতি]
>
> **শংকর** । মহারাজ!
>
> এ কি সত্য! যুবরাজ আসিছেন নিজে
>
> শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
>
> বলো, এ কি সত্য কথা?
>
> **চন্দ্রসেন**। সত্য বটে। ...
>
> **বিক্রমদেব**। ভালো হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
>
> এ তব ক্রন্দন।
>
> **শংকর**। রাজন্, তোমার কাছে
>
> আসি নি কাঁদিতে। ...
>
> **বিক্রমদেব**। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
>
> মিত্র আমি আজি।
>
> **শংকর**। অতিশয় দয়া তব
>
> জালন্ধরপতি! মার্জনা করেছ তুমি!

দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে। ...

[বাহিরে হুলুধ্বনি, কোলাহল

শংকরের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন

প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। আসিয়াছে

দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব। বাদ্য কোথা, বাজাইতে

বলো। চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে

অভ্যর্থনা করি।

[বাদ্যোদ্যম]

বিক্রমদেব। এসো, এসো, বন্ধু এসো।

[স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকাবাহিরে

আগমন। সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব।]

বিক্রমদেব। সুমিত্রা! সুমিত্রা?

চন্দ্রসেন। এ কী, জননী সুমিত্রা!

সুমিত্রা আতিথ্যের উপহার

আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব

মনস্কাম। এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক

এ জগতে, নিবে যাক নারকাগ্নিরাশি–

সুখী হও তুমি।

[ঊর্ধ্বস্বরে]

মা গো জগৎজননী,

দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে।

[পতন ও মৃত্যু]

[ছুটিয়া ইলার প্রবেশ] ...

[মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া]

চন্দ্রসেন। ধিক্ এ মুকুট!

ধিক্ এই সিংহাসন!

[সিংহাসনে পদাঘাত] ...

[নতজানু]

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৪৮–২৫১)

এখানে অভিনেতা বা নাট্যনির্দেশক অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারেন তাদের করণীয় সম্পর্কে। নাট্যনির্দেশনার এ অংশে পাঠক চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হন। এ নাট্য-আখ্যানের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তিনি জানান: 'কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৬৯) অর্থাৎ, মঞ্চায়ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ সচেতন ছিলেন।

> ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুন এ নাটকটি এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রচিত এই রোমান্টিক ট্র্যাজেডি দর্শক মনে যথেষ্ট গভীর দাগ কেটেছিল। (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৬)

লক্ষণীয় যে '' 'রাজা ও রানী' রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পর নাট্যকার স্বয়ং এ নাটকের অভিনয়যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গীতিকাব্যের প্রেরণাজাত এই নাটকের সংস্কার করতে গিয়ে পূর্ববর্তী নাট্যসংস্করণগুলিকেও খুব বেশি গ্রহণযোগ্য ভাবতে পারেননি। তিনি 'তপতী' নাটক লেখেন সেই মানসিকতা থেকেই।'' (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৬) এ নাট্য-আখ্যানে ইউরোপীয় কাঠামোর প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথকে স্বস্তি দেয়নি। তাঁর ভাষ্যে জানা যায়:

> আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা। শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে

বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৬৯)

বিসর্জন

বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মঞ্চসফল কাব্যনাট্য। 'তিনি নিজেও এ নাটকে অভিনয় করেছেন। তাই অভিনয় সার্থক নাটক হিসেবে এটি গড়ে তোলার জন্যই নাট্যকার বারংবার ঘটিয়েছেন এর পরিবর্তন।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৯১) এ নাট্য-আখ্যানে সরাসরি মঞ্চনির্দেশনা প্রদান না করে রবীন্দ্রনাথ এমন সুকৌশলে সংলাপ সজ্জিত করেন যে, পাঠকের কল্পনায় দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। যেমন:

[রঘুপতির প্রবেশ]

[পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া]

জয়সিংহ। গুরুদেব।

রঘুপতি। যাও, যাও!

জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।

রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।

জয়সিংহ। বসন–

রঘুপতি। কে চাহে

বসন?

জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি?

রঘুপতি। আবার?

কে নিয়েছে অপরাধ তব?–

ঘোর কলি

এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম

ব্রহ্মতেজে গ্রাসিবারে চায়– সিংহাসন (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬৮)

গুরু-শিষ্যের পদ-স্খলনের এ দৃশ্যের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ যে রঘুপতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম আঁকড়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে পালিত পুত্র জয়সিংহকে উসকে দিচ্ছে, তার পটভূমি তৈরি করছেন বোদ্ধা পাঠকমাত্রই তা অনুধাবনে সমর্থ হন। এর পরের দৃশ্যেই গুণবতীর সঙ্গে তার আলাপচারিতা লক্ষণীয়:

গুণবতী। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি

রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা

স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন

তুমি তাঁরি রানী! ...

মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর!

[পৈতা ছিঁড়তে উদ্যত] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৭২)

রোষানলে জর্জরিত রঘুপতির স্বরূপ সংলাপের পাশাপাশি নাট্যনির্দেশনা-সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে। নাট্য-আখ্যানে এ কৌশলটি রবীন্দ্রনাথ বারংবার ব্যবহার করেছেন। জয়সিংহের সঙ্গে আলাপচারিতায় রঘুপতির মনস্তত্ত্ব নাট্য-নির্দেশনায় ফুটে ওঠে এভাবে:

[স্বগত]

রঘুপতি। সে কাল গিয়েছে।

অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই– শুধু ভক্তি নয়

[প্রকাশ্যে]

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৭৮)

এ দৃশ্যটির নাট্য-নির্দেশনায় নাট্য-আখ্যানের ঘটনাপ্রবাহ্ এবং চরিত্রের মনোগত অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবে:

কী আদেশ দেব!

ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো–

[ছুরি দেখাইয়া]

তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে

হতেছে শাণিত। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯০)

অন্যত্রও রয়েছে:

সে যে অবিশ্বাস- দৈত্য!

আর নহে। গুরু হোক কিম্বা দেবী হোক,

একই কথা!–

[ছুরিকা উন্মোচন। ... ছুরি ফেলিয়া]

ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯৪)

উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতিতে ছুরি বিষয়ক নির্দেশনা এ নাট্য-আখানের বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ প্রকাশে প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মন্দিরে রঘুপতি জনতাকে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললে কাব্যনাট্যকার নির্দেশনায় লেখেন: '[সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ কথা]' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯৬), '[নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন]' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯৬)। এরপর:

[মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান]

সকলে। ও কী! মার মুখ কোন্ দিকে?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন! ...

[রঘুপতির নিকট আসিয়া]

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কবনা?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই বিশ্বাস করব?

রঘুপতি। হ্যাঁ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৯৬)

এখানে রঘুপতির কপটতা ও জয়সিংহের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। নাট্য-আখ্যানে ধ্রুব হত্যার প্রচেষ্টাকালে রঘুপতি যখন '[খড়্গ উত্তোলন]' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০৯) করলো তখন '[গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের

প্রবেশ। রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল]' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০৯) রঘুপতির রূপান্তরের চিত্র চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে নাট্য-নির্দেশনায়:

[দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২০)

নাট্য-আখ্যানের শেষ দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্য প্রেমের প্রতীক হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন:

[পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২২)

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা নাট্য-আখ্যানের প্রতিটি দৃশ্যের শিরোনামায় প্রয়োজনানুসারে রবীন্দ্রনাথ সংযুক্ত করেন স্থান, কাল ও চরিত্রের নাম। দৃশ্যের সূচনায় এ নির্দেশনা এক নাট্যনির্দেশককে এ ধারণা দেয় যে, কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীগণ কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কী ধরনের আচরণ ও উচ্চারণ করলে আখ্যানপট বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থলের নাম দিলেন অনঙ্গ-আশ্রম।

> 'অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমার সম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এ-সব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ, মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে। (প্রমথ, ২০০১ : ১৯৫)

এ নাট্য-আখ্যানের 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের উৎসভূমি সম্পর্কে ধারণা দেন, যা একজন নাট্যনির্দেশকের মঞ্চায়ন-কৌশলের পক্ষে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া এ নাট্য-আখ্যানের সংলাপসমূহ এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে সচেতন নাট্যনির্দেশক এবং দক্ষ অভিনয়শিল্পী সহজেই এর ভঙ্গিমাটি অনুধাবন করতে পারেন। ফলে নাট্য-আখ্যানের মধ্যে খুব বেশি মঞ্চনির্দেশনা দেননি রবীন্দ্রনাথ। উদাহরণস্বরূপ:

মদন। যদি ফিরে লই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? ...

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪৩)

কিংবা, সূর্যোদয়কালে অবগুণ্ঠন খুলে চিত্রাঙ্গদা যখন বলে:

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৫৬)

এখানে সংলাপের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের বলিষ্ঠতার উপস্থাপিত হয়েছে। দক্ষ নাট্যনির্দেশক এ কাব্যনাট্য মঞ্চস্থকালে এ সকল দিক বিবেচনায় রাখবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমির তাৎপর্যপূর্ণ একটি অংশ হলো ব্রাহ্মণদের নিকট মালিনীর 'বিশ্বদেবী'তে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্য। চারুদত্ত, সোমাচার্য, দেবদত্তসহ উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ সমবেত কণ্ঠে যখন ঘোষণা করে: 'জয় জননীর!/ জয় মা লক্ষ্মীর! জয় মা করুণাময়ীর!' তখন মঞ্চনির্দেশনায় রয়েছে:

[মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪২)

আবার তৃতীয় দৃশ্যে নির্দেশনা রয়েছে: '[মালিনীকে লইয়া সৈন্যগণ ও প্রজাগণের মশাল ও সমারোহ সহকারে প্রবেশ]' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৬) এ নির্দেশনায় মালিনীর সর্বজনে ও সর্বলোকের গ্রহণযোগ্যতার চিত্র ফুটে ওঠে। নাট্য-আখ্যানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ক্ষেমংকরের বন্দীদশীয় সুপ্রিয়কে দেখতে চাওয়ার বাসনা। নাট্য-আখ্যানের এ পর্যায়ে নাট্য-নির্দেশনা রয়েছে:

[ক্ষেমংকরের নিকট সুপ্রিয়ের আগমন, আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৫৬)

এ মঞ্চনির্দেশনা-সূত্রে নাট্য-আখ্যানের দ্বন্দ্বের মাত্রা আরও প্রগাঢ় হয়। পাঠক-চৈতন্যে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের বোধ সৃষ্টি হয় ক্ষেমংকরের আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে। নাট্য-আখ্যানের পরিণতিতে তাই দেখা যায়:

সুপ্রিয়। বন্ধু, তাই হোক।
ক্ষেমংকর। এসো তবে, এসো বুকে।
বহুদূরে গিয়েছিলে এসো কাছে তবে
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহো তবে বন্ধুহস্তে করুণ বিচার–

এই লহো।

[শৃঙ্খল দ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত ও তাহার পতন]

সুপ্রিয়। দেবী, তব জয়। [মৃত্যু]

[মৃতদেহের উপর পড়িয়া]

ক্ষেমংকর। এইবার

ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।

[সিংহাসন ছাড়িয়া]

রাজা। কে আছিস ওরে!

আন্ খড়্গ।

মালিনী। মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে। [মূর্ছিত] (রবীন্দ্রনাথ ১৪০৬ : ৪৫৯)

এ নাট্য-আখ্যানের দ্বন্দ্বাত্মক ক্রম-পরিণতি অনুধাবনে মঞ্চনির্দেশনা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নিঃসন্দেহে। ব্রাহ্মণ দলনেতা ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর ক্ষমা দৃষ্টি তার নবধর্মেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ। নাট্য-আখ্যানে মালিনী তাই মহত্ত্ব লাভ করেছে। তাছাড়া 'এই নাটকে বিরোধের একপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে মালিনী নয়, দেবী মালিনীর ধর্মাদর্শের। ক্ষীণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও মানবী মালিনীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ও তাহার প্রতি প্রেমে অভিভূত সুপ্রিয়। মালিনীকে হারাইবার আশঙ্কায় তাহার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাতেই এই বিরোধের চরম প্রকাশ, একের মৃত্যু ও অপরের অননুমেয় মৃত্যুতে তাহার পরিণতি। সেইজন্য মালিনীর দেবী ও মানবী সত্তার মধ্যে একটা সীমারেখা লক্ষ্য করা যায়, দেবীভাব ও মানবীর ব্যক্তিগত প্রভাবই এই নাটকে পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৪৭)

রক্তকরবী

কাব্যনাট্যের অভিনয়যোগ্যতার শর্তে নাট্য-আখ্যানে মঞ্চনির্দেশনা সংযুক্ত হয়। কাব্যনাট্যের পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন মঞ্চায়ন ও নাট্যিকতার প্রতি। অভিনয়কলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রবীন্দ্রনাথকে প্রাজ্ঞ করেছে। 'কখনো জয়সিংহ, কখনো রঘুপতি, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো বাউল সেজেছেন তিনি। নাটকের নতুন রীতি নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব। আর সে নাটকের মঞ্চায়ন বিভিন্ন অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সংযোগ ঘটানোয় যেমন নাচ, গান, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়কলার সংযোগে তা একটি মিশ্রিত ও রসোত্তীর্ণ শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠেছিল। প্রথাগত নাটক নয়, দেশীয় অভিনয়কলাকে ভেঙেচুরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্র নাট্যশৈলী গড়ে ওঠে।' (দেবাশিস, ২০১৪

: ১৫) *রক্তকরবী* তাঁর স্বতন্ত্র নাট্য-নির্মাণ-রীতির অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে প্রথাগত নাট্যনির্দেশনা অনুপস্থিত। কাব্যনাট্যের 'নাট্যপরিচয়' অংশে এবং নাটকের সূচনায়, নাট্য-আখ্যানে মঞ্চে চরিত্রের আগমন ও প্রস্থান বিষয়ক সামান্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে কাব্যনাট্যের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ জানান:

> [এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।] (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭১)

মূলত জালের আবরণ ও আলো-আঁধারের প্রয়োজনানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পিত হয়েছে নাট্য-আখ্যানের বাস্তবিক মঞ্চ। এ নাট্য-আখ্যানের ভাববস্তু মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের, অনুভববেদ্যতার। এর আবেদন পাঠক ও দর্শকের বোধের কাছে। তাই প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ এতে শিল্পসমন্বিত করেন চিন্তননির্ভর পরিক্রমাকে। নাট্যনির্দেশনার এই মুক্ততা নাট্যনির্দেশকের সৃষ্টিশীলতার সুযোগ তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ও সুচিহ্নিত ভাবনাবিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে নাট্যনির্দেশক স্বাধীনভাব মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাই উন্মুক্ত রেখেছেন নাট্যনির্দেশনার অংশ। রবীন্দ্রনাথ নাট্যনির্দেশকের জন্য এ স্বাধীনতাটুকু রেখেছেন। নাট্য-আখ্যানে দেখা যায় নন্দিনী ধানীরঙের কাপড় পরিহিত। বিশেষ রঙের এ পোশাক বাঙালির সুফলা শস্যক্ষেত্রের ইঙ্গিত বহন করে। কেননা নাট্য-আখ্যানে 'পোশাক হলো মানুষের ব্যবহার্য এমন বিষয় যা ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে তুলে ধরার স্বার্থে ব্যক্তি কিংবা জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরে।' (ফাহমিদা, ২০২৪ : ২৭৭) আবার, জালের বহির্ভাগের সংঘটিত ঘটনার চেয়ে এ নাট্য-আখ্যানে যে মনের অন্তরালের সংগুপ্ত চেতনার সঞ্চরণ—তা *রক্তকরবীর* পাঠকমাত্রই জানা। মুক্তি ও বন্দিত্বের দ্বন্দ্বখেলায় এ আখ্যান অন্তর্জীবনের নিবিড় রূপ তুলে ধরে। ফলে, ঐতিহ্যিক মঞ্চ-ফ্রেমে এর অন্বিষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ একজন নাট্যতাত্ত্বিক ও নির্দেশক হিসেবে:

> মঞ্চের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য চরম বাস্তব রীতিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরঞ্চ সরল ও গীতল ভাষায় অভিনয়ের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। যেখানে নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা শক্তি বিস্তার লাভ করে, সেখানে দর্শকের কল্পনা শক্তি মিশে একাকার হয়ে যায়। (কমলেশ, ২০১৫ : ৪৯)

সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অভিপ্রায় ও তৃষিত শিল্পমানস তাঁকে নতুন মঞ্চ-ফ্রেম অন্বেষণে তাড়িত করে। 'এখানে একজন কবি স্টেজকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন কবির অর্থে ও উদ্দেশ্যে।' (তরুণ, ১৯৮৮ : ১১৭) কেননা এমন একটি

ভাবাদর্শ মুখ্য বিবেচনায় নিয়ে তিনি এ কাব্যনাট্য রচনা করেন; যার আবেদন চিরকালীন, দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। নির্দেশনাকে ছাঁচে ফেলে এর আবেদনকে রবীন্দ্রনাথ সীমায়িত করতে চাননি। এ নাটকের এ নাটকে সময়ের বহুস্তরিভূত সত্য ও বাস্তবতা রূপকায়িত হয়েছে। বিশ্বময় যেন যক্ষপুরী। এর নাগপাশ থেকে মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। *রক্তকরবী* তাই একইসঙ্গে চিরকালীন ও সমকালীন। মঞ্চায়ন প্রক্রিয়ার উন্মুক্ততার চিহ্নতাত্ত্বিক তাৎপর্যও রয়েছে। মঞ্চনির্দেশনা অনেকগুলো দ্যোতকের ইঙ্গিত দেয়; যেমন: মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা আলো, সংগীত, নৃত্য, সংলাপ, চরিত্রের প্রকাশভঙ্গি, পরিচ্ছদ প্রভৃতি। বহুদ্যোতকের সমন্বিত শিল্পদ্যোতিত তৈরি করতে বিষয়টি নাট্যনির্দেশকের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের ভাববিশ্বের সঙ্গে উল্লিখিত দ্যোতকসমূহের শিল্পসমন্বয় ঘটিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে দর্শকের নিকট অধিক স্পষ্ট ও কার্যকরীরূপে উপস্থাপনের দায়িত্ব থাকে নাট্যনির্দেশকের।

রক্তকরবী প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে নাট্যদল বহুরূপীর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্রের (১৯১৫–১৯৭৭) নির্দেশনায় ১৯৫৪ সালের ১০ই মে কলকাতায় রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউটে। মুস্তফা মনোয়ারের (১৯৩৫–২০১৯) নির্দেশনায় ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে *রক্তকরবী*র সম্প্রচার বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে কুমার রায়ের নির্দেশনায় এটি মঞ্চস্থ হয়। জাহ্নবী-এর প্রযোজনায় ২০১০ সালে *রক্তকরবী* নৃত্যনাট্যের রূপ পায়। তবে:

> বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনয় এক ঐতিহাসিক মর্যাদাময় ঘটনা। এই অভিনয়ের মধ্যে একদিকে যেমন উঠে এল এর নাটকীয়তার সামর্থ্য, এর সতেজ মঞ্চযোগ্যতা, তেমনি এঁরা ধরিয়ে দিলেন যে কবিতা আর জীবন পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এর জন্যে অবশ্য প্রয়োজন ছিল মঞ্চ বা অভিনয়েরও পুরোনো ধারণা খসিয়ে দেওয়া। (শঙ্খ, ২০০৯ : ১১৩)

৪.১.৬ কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্র: চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব

যে-সব আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে কোনো সৃষ্টিশীল রচনার ভাবাদর্শ শৈল্পিক সুষমা ও ভাষিক সৌকর্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র স্বর সৃষ্টিতে সহায়ক, চিত্রকল্প সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই প্রধানত কবিতার উপাদান হয়েও সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমকে নান্দনিকায়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে চিত্রকল্পের অভিযোজনা হয়ে থাকে। শিল্পসাহিত্যে শিল্পীর যাপিত অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটে। মূলত 'অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম। ... স্মৃতিধৃত অভিজ্ঞতা মূল্যবোধের প্রেরণায় প্রকাশের জন্য অনিবার্য আবেগে কল্পনার ন্যায়ে সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের

পুষ্পরাশি।' (সরোজ, ১৯৮৪ : ০৯) সুতরাং এটি পাঠককে সাহিত্যিকের দর্শন ও বিশ্বাসের নান্দনিক জগতের সঙ্গে শিল্প-সংযোগ তৈরি করে। 'চিত্রকল্প, সৃষ্টিশীলপ্রজ্ঞার বোধের জগতে সৃজিত, ভাষিক-স্থাপত্যে রূপায়িত শিল্প-সংকেত। ... শব্দসীমায় অসীমতা-সঞ্চারী সমুদ্র গভীর অনন্যতা কোনো সার্থক চিত্রকল্পের চিহ্নায়নের পূর্বশর্ত। এর উৎসমূলে নিহিত থাকবে সাহিত্যস্রষ্টার ইন্দ্রিয়-আস্বাদিত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সংবেদনা অথচ রসগ্রাহী পাঠকের ইন্দ্রিয়-উত্তীর্ণ মনসিজ ভাবনার চিত্রময়ী বিমূর্ততায় অভিদ্যোতিত হবে। (সৈয়দ শাহরিয়ার ২০০৮ : ১৩–১৪) অর্থাৎ 'প্রতিটি ইমেজ [চিত্রকল্প] যেন ইম্যাজিনেশনে পৌঁছবার রাস্তা।' (অমলেন্দু, ১৯৭১ : ০৭) দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের এক বোধের সৃষ্টি করে পাঠকের চৈতন্যে। সাহিত্যে চিত্রকল্পের রয়েছে বহুমাত্রিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে এজরা পাউন্ড বলেন: `Ezra Pound once remarked, 'It is better to present one Image in a lifetime than to produce voluminous works.' (C. Day, 1961 : 25)

কাব্যনাট্যে প্রচলিত নাটকের চেয়ে ভাবকল্পনা, ভাষার বিন্যাস, গঠন-সংহতি তুলনামূলকভাবে নিবিড় ও শিল্পিত হয়ে থাকে। এর গাঁথুনিতে কল্পনার সূক্ষ্ম অথচ তীব্র উপস্থিতিসূত্রে কাব্যনাট্যকার সৃজন করেন এমন সব চিত্রকল্প যা, পাঠকের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে অনন্য আস্বাদের সঙ্গে পরিচিতি করায়। 'ইমেজ, পোয়েটিক ইমেজ বা বাক্ প্রতিমা যে শুধুমাত্র কবিতাতেই প্রযুক্ত হবে তা নয়, সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই ইমেজের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতা, কথাসাহিত্যের মত নাটকেও ইমেজরি বা বাক্প্রতিমার মধ্য দিয়ে বাস্তবতা এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনার সংযোগ এবং সম্পৃক্তি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ৩৩) চিত্রময়তা ও ক্রিয়াশীলতার সুদৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ও যথোপযুক্ত চিত্রকল্প জন্ম লাভ করে কাব্যনাট্যের আখ্যানে। কাব্যনাট্যের ভাবনাবিশ্বের সুস্পষ্টীকরণে এবং এর অন্তর্বয়নের কৌশল অনুধাবনে চিত্রকল্পের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। P. Gurrey তিনি লিখেছেন: 'It is imagery which vitalizes such expression infusing it with copious suggestions of weights, buoyances, textures, sounds, movements, shapes and colours. (P. Gurrey, 1968 : 46)

কাব্যনাট্যে কবিতার পেলবতা এবং নাটকের ক্রিয়াশীলতার শিল্পসন্নিবেশে চিত্রকল্পের জন্ম হয়। এটি কাব্যনাট্যের ভাব ও ভাষাকে জীবন্ত, শক্তিশালী এবং নান্দনিক করে তোলার অন্যতম উৎস। চিত্রকল্পের যথাযথ ও নান্দনিক প্রয়োগবৈচিত্র্যে কাব্যনাট্যের কাহিনি (plot) পাঠকের চৈতন্যে ইন্দ্রিয়গাহ্য হয়ে ওঠে। আবেগের গভীরতার্থ নিরূপণে ও নান্দনিকায়নে, বিমূর্ত ধারণা প্রমূর্তকরণে, ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়ে এমনকি পাঠক বা দর্শক যেন কাব্যনাট্যের সংলাপ, চরিত্র, মঞ্চসজ্জা গভীর ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন ও অনুভব করতে পারেন– সে-সুযোগ সৃষ্টিতে চিত্রকল্পের ভূমিকা অনন্য। বর্তমান গবেষণায় যে-দুজন কাব্যনাট্যকারকে নির্বাচন করা হয়েছে,

তাঁরা প্রধানত কবি। তাই তাঁদের রচিত কাব্যনাট্যে চিত্রকল্প গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক, ভাবের অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ 'রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের মুঞ্জরণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জগতে।' (সরোজ, ১৯৮৪ : কথারম্ভ)

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রনাথের নাট্যমানসের অন্যতম দিক ভাবনাবিশ্বের নান্দনিকতার আবরণে উপস্থাপন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন চিত্রকল্পের। কাব্যনাট্যে রবীন্দ্র-মানসের এ প্রবণতার গভীরতা চিত্রকল্পের আধারে গভীরার্থবহ হয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর কাব্যনাট্যে চিত্রকল্পের উপস্থিতি-সূত্রে বলা যায়: নাট্যঘনত্বের মধ্যে একটা দমকা হাওয়ার মতো একটি সার্থক বাক্‌প্রতিমা নাটকের তাৎপর্যকে যেমন তেমনি কাব্যিক রসবোধও সূচিত করে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ৩৮) *প্রকৃতির প্রতিশোধ* কাব্যনাট্যের সন্ন্যাসীর ধ্যানের একাগ্রতা তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
> একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
> দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
> একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৭)

আলোর রেখা এখানে রাতের অন্ধকারের গুপ্তচরের প্রতিরূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহায় বহুবর্ষ কাটাইয়াছে, সেই অন্ধ গুহাই ছিল তাহার কাছে সত্য।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭২) রবীন্দ্র-দর্শনে অন্ধকার শেষ কথা নয়। সন্ন্যাসীর এ উচ্চারণে তাই গভীরার্থ নিহিত রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের মধ্যে জীবনের যেকোনো সাধনাই অপূর্ণ থেকে যায়। সমস্ত দর্শন ও সাধনার আকরস্থল যে বিশ্বপ্রকৃতি–এ সত্যভাষ্য আভাসিত হয়েছে এখানে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কবির অনুভব সেই শৈশব থেকেই: 'বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, ... সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। ... সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ– মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ : ১০) বালিকার ঘুমন্ত দৃশ্যরূপ সন্ন্যাসীর ভাবনায় পরিস্ফুট হয় প্রকৃতির আশ্রয়ে।

> কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে
> ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।

যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি

হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯৮)

বালিকার ঘুমন্ত দৃশ্যের উন্মোচন পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ ঘুমকে তুলে আনেন মাতৃস্নেহস্পর্শী রূপকল্পে। ঘুমের চিত্ররূপে একদিকে শান্তি ও স্নিগ্ধতার আবহ, অপরদিকে বালিকার বাস্তবিক জীবনসত্যের সঙ্গে বিজড়িত অনাদর, অবহেলা, মৌলিক চাহিদার অনিশ্চয়তার দৃশ্যও পাঠকের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়। সন্ন্যাসীর অনুভাবনায় স্নেহবঞ্চিত, অনাদরে লালিত বালিকার জীবনের বিপ্রতীপ স্বরূপ 'কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে'–এ চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া ঘুম শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে মানসিকভাবে মানুষকে স্বস্থ, শান্ত ও সুখকর অনুভূতি এনে দেয়। বালিকার বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঘুম তাই বালিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য জীবনের প্রতিরূপক হয়ে ওঠে। বালিকাকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বস্তুতপক্ষে, তাঁর মৌল দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন এ নাট্য-আখ্যানে। তাই সন্ন্যাসীর অনুভবঃ

দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল

আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন– (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০০)

ধ্যান এক রকমের গভীর অনুশীলন যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সন্ন্যাসীর নিকট বালিকার স্পর্শ ধ্যানের মতন প্রতিভাত হয়েছে। বালিকার মৃদু ও সুকোমল স্পর্শ এখানে ধ্যানের প্রত্নপ্রতিমায় চিত্রিত হয়েছে। ধ্যান আবেগী স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে শরীর ও মন প্রশান্ত করেঃ বালিকার স্পর্শও অনুরূপ। সন্ন্যাসীর ধ্যান অসীমকে অন্বেষণ। বালিকার স্পর্শে সন্ন্যাসী প্রত্যাশিত অসীমের সন্ধান পায়। '... সামান্য অস্পৃশ্য বালিকা স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে যখন তাহাকে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল, সন্ন্যাসী তখন দেখিল ক্ষুদ্রকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই যুক্তি।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭৪) বালিকার সংস্পর্শে সন্ন্যাসীর মনোগত রূপান্তরের স্বরূপ উঠে এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গজাত চিত্রকল্পেঃ

প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী–

বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,

ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য

তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১৪–১১৫)

প্রকৃতির ভয়াবহ রূপের চিত্র উঠে এসেছে এখানে। 'প্রলয়' প্রতীকে প্রকৃতির বিধ্বংসী রূপের উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ তুলে আনেন ঝড়, সমুদ্র ও আঁধারের চিত্ররূপ। ঝড়ের তীব্রতায় ও ধ্বংসমত্তায়, সমুদ্রের সংক্ষুব্ধতায়, তমস্যাবৃত

অরণ্যের তরঙ্গময় হয়ে ওঠার দৃশ্যকল্পে রবীন্দ্রনাথ মূলত সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বময় সত্তার জীবনবোধের রূপান্তরের ইঙ্গিত প্রতীকায়িত করেন। প্রকৃতির এমন উত্তাল চিত্রকল্পে জীবন ও বোধের গভীরার্থকে প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: 'প্রথম যৌবনে যখন একদিন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখেছিলেন কবি, তখন ছিল এই প্রকৃতি-চৈতন্য-দ্বন্দ্বেরই এক সরল চেহারা, আকাশ আর সমুদ্রের এই ছবি তখন আরো প্রকাশ্য রূপকে-উপমায় ঘুরছিল ওর সংলাপগুলির মধ্যে।' (শঙ্খ, ১৪২১ : ১৫৫) প্রকৃতির আশ্রয়ে অজস্র চিত্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্ক্ষিত দর্শনকে পরিস্ফুট করেন। সন্ন্যাসীর ক্রম-রূপান্তরিত ভাবনা রবীন্দ্র-কল্পনায় চিত্রিত হয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে:

> আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তিসুধা!
> কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
> মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
> চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০৫)

'সুমধুর', 'শান্তিসুধা', 'আরাম' প্রভৃতি শব্দবন্ধে প্রকৃতির মধুর ও শান্ত রূপ বিধৃত হয়েছে। সন্ন্যাসীর নতুন জীবনদৃষ্টিতে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে চাঁদের অপার্থিব সৌন্দর্যসুধায় সিক্ত হবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এ নাট্য-আখ্যানের রবীন্দ্রনাথের ভাবনাবিশ্বকে স্মরণে আনে। বৃক্ষের দাঁড়িয়ে থাকা, সন্ন্যাসীর তরু হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা চাঁদের আলোর সৌন্দর্য মূলত সীমায়িত জীবন-প্রতিবেশের মধ্যে অসীমের অনুসন্ধানের স্মারক হয়ে উঠেছে। মাটির বুকে বৃক্ষের শেকড়ায়িত দৃশ্যপটের চিত্রকল্পে জীবনদৃষ্টির সুদৃঢ়তা বুঝে নিতে পারেন সচেতন পাঠক। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা গেছে নাট্য-আখ্যানের সূচনায়: 'সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহাবাসী। সর্ব ইন্দ্রিয়বিজয়ী মহাজ্ঞানী, সর্ব ভেদাভেদ চূর্ণ করিয়া নিষ্কাম। সমস্ত স্নেহবন্ধন-ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী।' (প্রভাতকুমার, ১৯০৭ : ১৭২) রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে প্রকৃতি কেবল উপস্থাপনার বৈচিত্র্যেই শিল্পান্বিত হয় না, তা আখ্যানপট এমনকি চরিত্রের নতুন জীবনবোধের অনুঘটক হিসেবেও কাজ করে কখনওবা। কেননা:

> প্রকৃতি তাঁহার কাছে প্রাণময়ী, মমতাময়ী মাতৃরূপিণী। ... প্রকৃতির সহিত মানবমনের আনন্দের সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়াছন। (চারুচন্দ্র, ১৩৬৭ : ৩২–৩৩)

এ কাব্যনাট্যের 'চিত্রকল্পগুলো সন্ন্যাসীর মেজাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। জগতকে মিথ্যা নয়, সত্য হিসেবে উপলব্ধি করতে শিখে বিশ্বের যথার্থ রূপকে আঁখি মেলে উপভোগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যে ভাষার বর্ণ ও রঙ এর কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে, তাতে রয়েছে কবির চিত্রকল্প নির্মাণে সতর্কদৃষ্টি।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৫)

রাজা ও রানী

কাব্যনাট্যসমূহে 'প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের সেতুবন্ধ-রচনায় শিল্পিত-আবেগকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।' (ভীষ্মদেব, ২০০৪ : ৭৫) এ কাব্যনাট্য-আখ্যানে প্রেমদর্শনের নতুন মাত্রা উন্মোচনের প্রেক্ষাপট হিসেবে রাজকর্তব্যের প্রতি রাজার অনীহার চিত্রাঙ্কন করেন। তাই প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় মন্ত্রী বলে:

রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার-রবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৪)

কাব্যিক এ অভিব্যক্তি গভীর জীবনাবেগ-মথিত। রাজা একটি রাজ্যের পিতাতুল্য। রাজা বিক্রমদেবের কেবল প্রেম-জীবনের উচ্ছ্বাসপ্রিয়তায় ও অভ্যস্ততায় আড়ালে পড়ে যায় রাজ্যের প্রতি রাজার সমস্ত কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথ রাজার অবহেলায় রাজ্যের রাজকীয় মহিমার ক্রম-হ্রাসমানতার স্বরূপ উন্মোচনে অনাথার হাহাকার-মিশ্রিত কান্নার প্রতীকী চিত্ররূপ প্রয়োগ করলেন। রাজকীয়তার হতশ্রীদশায়, পতনোন্মুখ রাজ্যের সামগ্রিক চিত্রপট সুস্পষ্ট হয় এতে। সন্ধ্যা নেমে আসার চিত্রকল্পময় বর্ণনা বিক্রমদেবের সংলাপে:

মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে

কুঞ্জবনমাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম–সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনককান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৮)

সন্ধ্যার রোমান্টিক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপটের উপস্থাপনা-সূত্রে এখানে সৃজিত হলো সন্ধ্যালোকের অসামান্য চিত্রকল্প। মনোরম বাগানে প্রেয়সীর মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবেশের প্রতিকল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছে প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার নেমে আসার দৃশ্যকল্প। আবার তা কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে অন্তহীন অন্ধকারের পটভূমিকায় লজ্জাবনতা নববধূর সোনালি আভামিশ্রিত সৌন্দর্যের গভীরতায়। নববধূর কান্তিটুকু যেন অন্ধকার গ্রাস করতে চায়, ঠিক যেমন সন্ধ্যা গ্রাস করে সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু। আলো-অন্ধকারের যুগল উপস্থাপনায়, প্রেম-প্রকৃতির সূক্ষ্ম মেলবন্ধনে প্রেয়সী কিংবা নববধূর সাযুজ্যে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেন সন্ধ্যার এক অপূর্ব ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। 'নববধূসম সন্ধ্যা মৌনমুগ্ধ রূপে আসছে কুঞ্জবনে। এই রূপটি রানী সুমিত্রার। অন্যদিকে সন্ধ্যাকে গ্রাস করবার জন্য গম্ভীর নিশা বিস্তার করে অন্তহীন অন্ধকার প্রস্তুত হয়ে আছে। রূপ, জ্যোতি, হাসি পান করবার জন্য রাজা বিক্রমদেবের অপেক্ষা। একদিকে

‘কনকচরণ’, ‘কনককান্তি’, লজ্জানম্র নববধূ সুমিত্রা অন্যদিকে অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগর বিক্রমদেব।’ (দেবাশিস, ২০১৪ : ৮১) উভয়ের প্রণয়ের স্বরূপ ফুটে উঠেছে এভাবে:

রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত, অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২১৩)

রক্তের প্রতীকী প্রবাহে রবীন্দ্রনাথ বস্তুত বিক্রমদেবের রূপান্তরিত প্রেমদর্শনের স্বরূপ তুলে ধরলেন এখানে। নর-নারীর প্রণয়ের গভীরতর সংযোগ, আত্মিক মিলনের শিল্পিত ভাষ্য এ চিত্রকল্পে নিহিত। এখানে যুদ্ধের পট মূলত রাজা-রানীর হৃদয় প্রাঙ্গণ। হৃদয়ের রক্তক্ষরণে মিলনের আয়োজন, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সুরের আবহ মূলত রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রেমের পরিচিতিই তুলে ধরে। অস্ত্র ও যুদ্ধ, প্রেম ও বিরহ, সংঘর্ষ ও সংগীত এখানে রবীন্দ্রভাবনায় একাকার হয়ে গেছে। ‘স্রোতের অনুভূতির সঙ্গে রক্ত যুক্ত হওয়ায় তা নদীস্রোতের থেকে ভিন্ন রুদ্ররোষের অবতারণা করেছে। তাকে সার্থকতা দিয়েছে অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধের অনুষঙ্গ। ‘মিলনের স্রোত’, যুদ্ধ, রক্তপাত এবং শেষে মিলনের প্রসঙ্গটিও এসেছে। বিক্রমদেব-সুমিত্রার অচরিতার্থ মিলন এবং অন্তর্বিরোধের দ্বন্দ্ব এ বাক্‌প্রতিমায় চিত্রিত।’ (দেবাশিস, ২০১৪ : ৮৫) শেষপর্যন্ত প্রেম, সংঘাত ও ঐক্যের এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। অন্যত্র রয়েছে:

এইবার
বুঝি পাব তারে– ধাবমান, ঘনশ্বাস,
ত্রস্ত আঁখি মৃগ-সম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩১)

‘ধাবমান ঘনশ্বাস’ এবং ‘মৃগের ত্রস্ত আঁখি’ বৈপরীত্যময় অনুভূতি সৃষ্টি করে পাঠকের চৈতন্যে: একদিকে কোনো কিছু অন্বেষণজনিত অস্থিরতায় নিঃশ্বাসের উর্ধ্ব ও তীব্র গতি; অপরদিকে শিকারির হাত থেকে বাঁচতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় হরিণের ত্রস্ত ও সিক্ত আঁখি– দুই বিপরীত দৃশ্যপটের সংযোজন করে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেব কর্তৃক সুমিত্রাকে অন্বেষণের অস্থিরতার ও ব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কন করেন। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠামিশ্রিত এ চিত্রকল্পে পাঠক একই সঙ্গে প্রেমের বিচ্ছিন্নতা ও মিলিত হবার তীব্র বাসনার অনুভূতি লাভ করে। আবেগের গভীরতায় ও প্রকাশের সূক্ষ্মতায়, আত্ম-পর্যবেক্ষণ ও সংবেদনশীলতার গ্রন্থনায় এটি অনন্য মাত্র পেয়েছে। ‘গতিশীল ঘন শ্বাস প্রবাহের সঙ্গে আঁখির ত্রস্ততা মৃগয়ার সূত্রে রমণীর মিলনকল্পনা সংরচিত হয়েছে। মৃগের গতিশীলভাবে এগিয়ে যাওয়া এবং শিকারির

পশ্চাদ্ধাবন নাটকীয়তায় ব্যঞ্জিত হয়েছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১১৮) এছাড়াও পুরাণ-আশ্রয়ী অনুষঙ্গে এ কাব্যনাট্যের ভাবানুষঙ্গী চিত্রকল্প সৃজনে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অবশ্যস্বীকার্য। যেমন:

রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৪)

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মন্ত্রী সংলাপে জালন্ধর রাজ্যের দুরবস্থার চিত্রকল্পময় উপস্থাপনা লক্ষণীয়। পৌরাণিক অনুষঙ্গে রাজ্যের প্রতাপ বিভক্তির চিত্র ফুটে উঠেছে এতে। শিল্পসাহিত্যে রাজার সঙ্গে প্রতাপ সম্পর্ক দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হিসেবে মূল্যায়িত হয়। আর বিষ্ণুচক্র শুভ ও ন্যায়ের প্রতীক। বিষ্ণুচক্র তথা ধনু চক্রাকারে ঘূর্ণনের মাধ্যমে সমস্ত অন্যায় ও অশুভ দূর করে। বিষ্ণুচক্রের সঙ্গে জালন্ধর রাজ্যে শাসন কাঠামোর বিভক্তিকে তুলনা করা হয়েছে। ''মহাদেব সতীদেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন থাকাকালে বিষ্ণুচক্রে বিখণ্ডিত সতীর দেহখণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। 'সতী' শব্দটির মধ্যে হিন্দুপুরাণের এই অনুষঙ্গ যেমন আছে তেমনি 'সতী'-র আর একে অর্থ নারীত্ব বা স্ত্রীত্বের নির্ধারিত গুণ ধারণ করার মধ্যেও আছে। এবং স্বামীর শবদাহের সময় যে হিন্দু নারী আত্মবিসর্জন দেয় তাকেও সতী বলা হয়। রাজার প্রতাপ 'সতীদেহ'- সদৃশ। তা খণ্ড হয়ে পড়ায় পূর্ণতার সক্ষমতা আর নেই।'' (দেবাশিস, ২০১৪ : ৯১) রাজ্যের মহিমা ও সক্ষমতার ক্রম-ভঙ্গুরতার চিত্র আভাসিত হয়েছে এতে। রাজা বিক্রমদেবের অখণ্ড ক্ষমতা রানীর আত্মীয়েরা খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিচ্ছে: বিদেশি, কাশ্মিরীদের রাজত্ব জুড়ে বসার চিত্র তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ এ চিত্রকল্পের আয়োজন করেন।

বিসর্জন

''প্রথম দৃশ্যের 'এত রক্ত কেন?' এই জিজ্ঞাসা থেকে শেষ দৃশ্যে 'জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে' এই দীর্ঘ ঘটনা সূত্রে রক্তের ইমেজ নাটকটিকে সাংগীতিকতার সঙ্গে সমন্বিত করেছে। রক্তের রঙ ছাড়া বিসর্জন এ পুষ্পের রঙ, জ্যোৎস্নালোকের রঙ, বিদ্যুতের বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ভাষা ও সংলাপে কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে এবং ভাববস্তু বিন্যাসে ও রস পরিণতিতে বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনার গতিশীলতায় চরিত্রের অন্তর-বাইরের সম্মিলিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এবং সর্বোপরি মঞ্চ উপযোগিতায় বিসর্জন রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।'' (সাইফুল, ২০০৩ : ৮২) নির্মম বলিপূজা-আশ্রয়ী এ কাব্যনাট্যের আখ্যানে দেব-দেবী বিষয়ক অনুষঙ্গের সুদৃঢ় উপস্থিতি লক্ষণীয়। জয়সিংহের সংলাপে:

যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে

দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে।

যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ

নেমে আসে মরুভূমে– দেবী নেমে আসে

মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার

মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব

সমান হইয়া যায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬৭)

আকাশ, মেঘ ও বৃষ্টির প্রতীকী প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে দেবীর মানবীতে রূপান্তরিত হওয়ার চিত্ররূপ নির্মিত হয়েছে। মরুভূমির বুকে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসার উপমায় যথার্থ দানের এবং দেবীর মানবী হয়ে ওঠার কল্পনায় প্রকৃত দাতার রূপায়ব উন্মোচিত হয়েছে এখানে। দেবী তার প্রকৃত দানশীলতায় দরিদ্রের ভূমিতল স্পর্শ করে সর্বত্রগামী ও প্রেমময় হয়ে ওঠে। দাতা ও দানের, দেবতা ও মানবের আবেগী সংযোগ স্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। এখানে মরুভূমির বিশুষ্ক প্রান্তরে বৃষ্টির অস্তিত্ব এ তৃষিত বুকে প্রাণ পুনরুজ্জীবনের প্রতিরূপক। দেবীর বা আরাধ্যের মানবীয় প্রেমবোধে প্রকৃত প্রাণের জাগরণ ঘটে। 'জয়সিংহ উপরিউক্ত সংলাপটি অপর্ণার প্রতি বলেছে। জয়সিংহ কি একা নয়, সে কি মরুভূমির উপমানে প্রতিষ্ঠিত নয়। অপর্ণা যেন বৃষ্টি, দেবী। দেবীরূপে অপর্ণাকে আগেই অভিষিক্ত করেছে জয়সিংহ। এবার সে দেবী এ বাক্‌প্রতিমায় মানবী হয়ে উঠল। বৃষ্টির মতোই স্বাভাবিকভাবে রচিত হয় দেবী ও মানবের এবং মানবীর সম্পর্ক। *বিসর্জনে* যে কৃত্রিম ধর্মবোধের এক স্বতন্ত্র চক্র রচিত হয়েছে, সে মিথ্যা জীবহত্যার পাশে দেব-মানবের এই স্বাভাবিক সম্পর্কসূত্রটিই একমাত্র সত্য এবং পূর্ণসত্য। জীবহত্যার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হিংসার চরমতায় যে দেবীপূজার আয়োজন সে কৃত্রিমতার বিপরীতে জয়সিংহের এই হৃদয়ধর্মের উন্মোচিত পূজনশৈলী। তা এ নাটকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে। যেখানে দেবী সহজেই মানবী, মানবী আরো সহজেই দেবী হয়ে যায়।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৪৯) আবার, প্রচলিত ধর্মের আচারনিষ্ঠতার নির্মমতাও উৎপ্রেক্ষাত্মক চিত্রকল্পে বিধৃত হয়েছে অপর্ণার সংলাপে:

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট

পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬৭)

প্রথাবদ্ধ ধর্মের যূপকাষ্ঠ পাষাণসোপানের রূপকল্পে চিত্রিত করেন রবীন্দ্রনাথ। রঘুপতির আরাধ্য ও আচরিত ধর্মজীবনের ন্যায় সেও প্রাণহীন প্রস্তরপ্রতিম সত্তা। রঘুপতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে অপর্ণার এ উচ্চারণের অন্তরালে রয়েছে শাস্ত্র-আশ্রিত যুক্তিহীন ধর্মাচারের সারবত্তা। তার দৃষ্টিপাতের, ললাটের কাঠিন্য দেবীমন্দিরের পাষাণসোপানের সঙ্গে প্রতিতুলিত হয়েও জীবরক্তবলি প্রথার নির্মমতাকে অভিব্যঞ্জিত করে। নাট্য-আখ্যানের পরিসমাপ্তিতে পাষাণ ভেঙে প্রাণময় সত্তার আবির্ভাব দৃশ্য সংকেতিত হয়েছে। রঘুপতির সংলাপে:

পাষাণ ভাঙিয়া গেল– জননী আমার

এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!

জননী অমৃতময়ী! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২২)

প্রস্তরনির্মিত দেবীমূর্তির আরাধনার অন্তঃসারশূন্য ও প্রাণহীন পটে এখানে মানবের অধিষ্ঠান চিত্রকল্পাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। এটি যেন পুরো নাট্য-আখ্যানের মৌল প্রতিপাদ্যের চিত্রকল্পময় উপস্থাপনা। নাট্য-আখ্যানে জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পূর্বপর্যন্ত রঘুপতির নিকট 'জননী' ছিল প্রস্তরমূর্তির দেবীমাত্র। জয়সিংহকে হারিয়ে এবং অপর্ণার পিতা সম্বোধনে রঘুপতির হৃদয়মন্দিরে ভাঙন ও রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটে। তার নিকট সত্যের প্রতিমূর্তি আর প্রাণহীন দেবী নয়; অপর্ণারূপী জীবন্ত মানবী। তার এ রূপান্তরচিহ্ন ওপরের চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে চিত্রিত করেলেন– যা পুরো নাট্য-আখ্যানেরই চিত্র-প্রতিমা হয়ে উঠলো যেন। কেননা: 'যে পাষাণমূর্তির মধ্যে রঘুপতি প্রকৃত দেবী ও ঈশ্বরীর সন্ধানে ব্যস্ত ছিল, সে পাষাণ মূর্তির ধারণা ভেঙে গেছে। প্রত্যক্ষ সত্য মাতৃরূপে দেখা দিয়েছে অমৃতময়ী বিশ্বজননী। সে রূপ একান্তই মানবী, সে অপর্ণা। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অপর্ণার মধ্যেই রঘুপতির দৃষ্টি জননীর সাক্ষাৎ পেয়েছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৩৭) অন্তর যখন সত্যধর্মে আলোকিত হয়ে ওঠে, প্রকৃতিতে যেন তার সাড়া পড়ে যায়। মানব মনের আন্তর্রহস্যের উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানস প্রতীকী পরিচর্যার আশ্রয় নেন। জয়সিংহের মনোজগৎ চিত্রিত হয়েছে এভাবে:

দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা

জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত–কলধ্বনি তার

এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।

আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি

শ্রান্তিক্ষীণ– বহু রাত্রিজাগরণে যেন

পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব

ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০৬)

আকাশে আধেক চাঁদের পাণ্ডুর চিত্র কিংবা বহু রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি রঘুপতির তৈরি-করা ধর্মভাবনায় ক্লান্ত জয়সিংহের প্রতিচ্ছবি। অপর্ণার বারংবার আহ্বানে জয়সিংহ সত্যের আলোর সন্ধান পেয়েছে; মন্দিরে পাষাণ সোপান সে ঢিঙিয়ে যাবার শক্তি খুঁজে পেয়েছে অপর্ণার চেতনায়। গোমতীর শীর্ণ জলরেখা মূলত জয়সিংহ, জ্যোৎস্নালোক অপর্ণার অন্তর্বাহিত মানবীয় প্রেমের আলো। গোমতীর জলরাশিতে চাঁদের আলোর বিচ্ছুরণে শান্ত, সুশীতল ও রোমান্টিক ভাবাবেগের ইঙ্গিতবহ। জ্যোৎস্নার নির্মল ও অপার্থিব সৌন্দর্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের রূপকী প্রকাশ। প্রকৃতি এখানে কেবল পটভূমি নয়, মানবিক ভাবাবেগের সংযোগ সেতু হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। নাট্য-আখ্যানের শেষপর্যায়ে গুণবতীর জীবনভাবনায়ও আসে পরিবর্তন। গোবিন্দমাণিক্যকে উপলক্ষ করে তার বিশ্বস্ত উচ্চারণ:

আজ দেবী নাই–

তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩২২)

ঐশ্বরিক সত্তায় স্থিত জীবনবোধ রূপান্তরিত হয়েছে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও মানবিক সত্তায়। দেবীর মধ্যে আধ্যাত্মিক বোধের অচলায়তন ভেঙে রবীন্দ্রনাথ জাগতিক বন্ধনে বিশ্বাস রেখেছেন। ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের মধ্যে দেবত্বের ধারণাকে সংপ্রোথিত করলেন তিনি। 'মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৭১); 'দে আমারে একটি সন্তান– দে জননী' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০৩); 'কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার। / মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩১৯) প্রভৃতিসহ গুণবতীর সকল কার্যকলাপ ও অনুভাবনায় থাকা দেবীর ধারণা পাল্টে যাওয়ার পরিক্রমা উল্লিখিত চিত্রকল্পে নিহিত। গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যেই সে সন্ধান পায় প্রকৃত দেবত্বের।

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চিত্রকল্প প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'চিত্রকল্পরাশি একটি বৃক্ষের ফুলের বা ফলের সঙ্গে তুলনীয়। বৃক্ষ পরিচিতি অবশ্যই সেই ফুলের বা ফলের উপর নির্ভরশীল। তথাপি বৃক্ষ-লগ্ন ফল বা বৃন্ত লগ্ন ফুলের মহিমা যেমন সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়েই অনুভববেদ্য, সার্থক চিত্রকল্পকেও পূর্ণভাবে লাভ করা যায় কাব্য বিষয়ের সমগ্রের প্রেক্ষাপটে তাকে রেখে।' (সরোজ, ১৯৮৪ : ৪২) এ নাট্য-আখ্যানে অর্জুনের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার রূপ পরিস্ফুট হয়েছে এভাবে:

যেমনি দেখিনু চেয়ে

সেই সুরসরসীর সলিলের পানে,

অমনি পড়িল চোখে অনন্ত-অতল।

স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে
অসাধ অসীমে, কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৮-৩৩৯)

কৈলাসশিখরে মৃগয়াশ্রান্ত, তৃষিত, তাপিত অর্জুন দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্রে মানসের তীরের অভিজ্ঞতা এ চিত্রকল্পে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সুরসরসীর জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের আলোয় অনন্ত সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে সে। সূর্য অপার সৌন্দর্য ও শক্তির আধাররূপে সাহিত্যে বিধৃত হয়। সূর্যের প্রতিফলিত রেখায় জলে থাকা মৃণাল জলের বুকে এমন আঁকি বুঁকির সৃষ্টি করে যা রবীন্দ্র-কল্পনায় অগ্নিসদৃশ সর্পের প্রতিকল্পনায় উঠে এসেছে। সর্পের উপস্থাপনায় ইন্দ্রিয় সংরক্ত অর্জুনের ইঙ্গিত বহন করে। সূর্যের আলোকরশ্মি, সুনীল আকাশ, কম্পমান জলরাশিতে মৃণাল এসব মিলে এক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তর্দৃষ্টিজাত অনুভূতির সৃষ্টি করে। প্রকৃতির আধারে অর্জুনের ভাবনায় চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে এরই আড়ালে। কর্মক্লান্ত অর্জুন যেন অনন্ত শীতল অনুভূতি লাভ করে চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যে। তাই: 'অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মাঝে 'স্বচ্ছ অতলতার' সাক্ষাৎ পেয়েছে। এই চিত্রাঙ্গদা বিশেষ কোনো মানবী নয়, সৌন্দর্যময়ীমূর্তি সে। যার সঙ্গে বিশ্বসৌন্দর্যরূপের গভীর সংযোগ। উর্বশীর সৌন্দর্য এবং লক্ষ্মীর সৌন্দর্য ও চিত্রাঙ্গদার স্বরূপের মধ্য দিয়ে অর্জুনের অনুভূতিতে প্রতিভাসিত এক।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৬৯–১৭০) চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিতে অর্জুন:

যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৪)

অর্জুনকে প্রথম দেখার অনভূতির ব্যঞ্জনা চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে এখানে। প্রথম দেখার মুহূর্তকে হৃদয়লোকে অনন্ত বসন্তের প্রবেশের কল্পনায় রোমান্টিক অনুভবের সৃষ্টি হয়েছে। বসন্ত ঋতু নবজীবনের, প্রেম ও আনন্দের প্রতীক। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে দর্শনের মধ্য দিয়ে যেন প্রেমের অনুভবে নতুন জীবনে উদ্দীপিত হলো। তাই চিত্রাঙ্গদা যৌবনের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, বসন্ত ঋতু প্রকৃতির মতোই নতুনের আবির্ভাবে আলোড়িত। তার অন্তর্দেশবাহিত পরিবর্তনের ধারা বসন্ত ঋতু অনুষঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা লক্ষ্মীর চরণতলের পদ্মের ন্যায় অর্জুনের প্রতি সমর্পিত হয়ে উৎসাহী হয়। উভয়ের সমর্পণ দৃশ্য পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় চিত্রকল্প। মদনদেবকে মিলনদৃশ্যের বর্ণনা শেষে চিত্রাঙ্গদা অনুভূতিঃ

আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো
বিজনবিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪২)

সূর্যালোকিত প্রকৃতিপটের সূক্ষ্ম অথচ জীবন্ত চিত্রের 'ছায়াত্রস্তা হরিণীর' সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রতিতুলনায় চিত্রটিতে ক্রিয়াশীলতা ও প্রাণপণে পালিয়ে বাঁচবার গতিশীলতা সংযুক্ত হয়ে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। বনভূমির পটে হরিণীর গতি-সৌন্দর্য সমপতিত হয় চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে। 'চিত্রাঙ্গদার ছায়া তার বাহ্যিক রূপ। এইজন্য চিত্রাঙ্গদা ছায়াত্রস্তা। শরতের নবপ্রভাতের শেফালি ছড়ানো বনস্থলীর মধ্য দিয়ে ছায়াত্রস্তা হরিণীর যাওয়ার চিত্র এ বাক্‌প্রতিমাটিকে জীবন্ত, সচল ও সজীব করে তুলেছে। (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৩৫) এ নাট্য-আখ্যানে এমন স্বচ্ছ অথচ ক্রিয়াশীল চিত্রকল্প পাঠকের মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অর্জুনের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব প্রসঙ্গেঃ

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৮)

ব্রত হলো ধর্মীয় কিংবা নৈতিক প্রতিজ্ঞা সম্পাদনের সুদৃঢ়তা। চাঁদ ও চাঁদের আলো হলো প্রেমের রোমান্টিক আবহ সৃষ্টির অনুঘটক। ব্রত ও যোগনিদ্রা এবং চাঁদের আলো ও রাত্রির অন্ধকার পরস্পর বিপ্রতীপ ভাবনার উদ্রেক ঘটায়।

অর্জুন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনকালে চিত্রাঙ্গদার রূপ-মাধুর্যে বিমোহিত হয়। চাঁদের চকিত আলো ঝলকানিতে যেমন রাতের অন্ধকার কেটে যায়, তেমনি চিত্রাঙ্গদার দর্শনে অর্জুনের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। অরণ্যে ধনুর্বিদ্যা অনুশীলনে আসা চিত্রাঙ্গদারও ব্রত ভেঙেছে অর্জুনকে দেখে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত: 'যোগনিদ্রা হল প্রলয়কালে পরমেশ্বর অর্থাৎ শিব-এর সর্বজীসংহারের বাসনায় যোগরূপ। 'যোগনিদ্রা' শব্দটির অন্য অর্থ দুর্গা। এখানে অর্জুন শিব এবং চিত্রাঙ্গদা দুর্গা। আবার যোগ শব্দের অনেকগুলি অর্থের মধ্যে সংযোগ একটি। সহযোগ অর্থাৎ মিলন। অর্জুনের ব্রত ভঙ্গের ফলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার মিলন ঘটল। অথবা চিত্রাঙ্গদার ব্রতভঙ্গের ফলে অর্জুনের সঙ্গে তার মিলন ঘটল। যোগের আর এক অর্থ ধ্যান বা উপায়। মহাদেবের ধ্যান ভেঙে উমা তাকে লাভ করেছিল। ... চন্দ্র অন্ধকার ভেঙে আলো নিয়ে এসেছে। ... চিত্রাঙ্গদার ব্রতভঙ্গ করে অর্জুন, অর্জুনের ব্রতভঙ্গ করে চিত্রাঙ্গদা। শেষে উভয়ক্ষেত্রেই মিলন ঘটে। চন্দ্রোদয় যোগনিদ্রাভঙ্গ করেছে। অর্জুনের সৌরসত্তা, চিত্রাঙ্গদার চান্দ্রসত্তা দুই-ই আলোর দিশারি।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৬৮) প্রেমের এক চিরন্তন রূপ উন্মোচিত হয়েছে এখানে। উভয়ের প্রণয়-অনুভূতি প্রকৃতির আশ্রয়ে নন্দনমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এসো এসো, দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। ... (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৫৩)

দীর্ঘদিন কর্মহীন অর্জুন অবসাদজর্জর আত্মার প্রেমের সুত্রে পুনর্জাগরণের চিত্রকল্প এটি। শীত সুপ্তোত্থিত সাপের জাগরণের মতোই প্রেমের ভুবন থেকে কর্মের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পায় অর্জুন। অর্জুনের প্রেমিক সত্তার অন্তরালে ক্ষাত্রশক্তি ও চিত্রাঙ্গদার দৈহিক সৌন্দর্যের অন্তরালে থাকা বীরোচিত ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সুপ্ত শক্তি বলে তারা প্রবলবেগে ধেয়ে পৃথিবীর বাইরের জ্যোতিষ্ক হবার বাসনা ব্যক্ত করে: যেনবা মহাজাগতিক বিশালতায় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিতে চান। এ অভিলক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই এ নাট্য-আখ্যানের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষিত হতে পারে।

মালিনী

কাব্যনাট্যের ভাববিন্যাসে, চরিত্রের আয়োজনে, নাট্যঘটনার বিন্যাস প্রক্রিয়ায়, নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূতকরণে, নাট্যপরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে চিত্রকল্পসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। 'জীবন ও জগতকে তিনি যে ভালোবেসেছেন এবং অনুভব করেছেন, তার সাক্ষ্য তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশিতে।' (সরোজ, ১৯৮৪ : ০৯) যেমন: মালিনীর নবধর্মের আলোয় আলোকিত হতে চায় সুপ্রিয়। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিয়ের সংলাপ:

> পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই
> ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী– তাই আমি চাই
> একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
> তোমার অন্তর হতে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৯)

শত লক্ষ পথের মধ্যে সুপ্রিয় সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিল মালিনীর আলোকময় পথেই। সংশয়ী সুপ্রিয় অসংখ্য জটিল পথের মধ্য দিয়ে একটি পথ বেছে নেয়: নতুন মানবিক ধর্মবোধের পথ। সে আত্মিক মুক্তির পরিসর খুঁজে পেয়েছে মালিনীর নবধর্মে। প্রচলিত বিবিধ ধর্মীয় শাস্ত্র, নানা মত ও পথ সব জেনেও সুপ্রিয় জীনের প্রকৃত দিশার সন্ধান পায়নি। সুপ্রিয় শতলক্ষ অন্ধকারময় পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মালিনীর নতুন ধর্মভাবনায় জ্যোতির্ময়ের সন্ধান পেল। তার চেতনায় মালিনী জ্যোতির্ময়ী। আলোকে অফুরান উৎস থেকে থেকে একটিমাত্র উজ্জ্বল ও সুন্দর রশ্মির প্রত্যাশী সুপ্রিয়। সুপ্রিয়ের এমন ভাবনায়: 'মালিনীর অন্তরে যে নবধর্মবোধের জাগরণ ঘটেছে তা আলোর সঙ্গে একীভূত।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৪১) মানবের অন্তর্গত কালিমা, সংশয় সমস্ত কিছুর অবসান ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ মালিনীর সত্যধর্মের চিত্রকল্প নির্মাণ করেন আলোর অনুষঙ্গে। আবার মহিষীর দৃষ্টিতে মালিনীর মলিন পরিচ্ছেদ ধরা পড়েছে এভাবে:

> এ-সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা
> নবীন বয়সে? কোথা গেল বেশভূষা
> কোথা আভরণ? আমার সোনার উষা
> স্বর্ণপ্রভাহীনা, এও কি, চোখের পরে
> সহ্য হয় মার? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩২)

বাহ্যিক সৌন্দর্যের ঝলক নয়, বরং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য। এটি পাঠককে এ কাব্যনাট্যের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করে। আত্মার জাগরণ ও সমৃদ্ধি, প্রেম ও সত্য, ন্যায্যতার প্রকৃত মূল্যমানেই জীবনের সারসত্য লুকায়িত। মালিনীর নবধর্ম প্রকৃতিতে জ্যোৎস্নার আবির্ভাবের চিত্রকল্পে আঁকেন রবীন্দ্রনাথ।

কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ–
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে–। ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির–
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি– দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা– আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪১)

প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় আয়োজনের মধ্যে জ্যোৎস্না অপার্থিব আলোর সঞ্চার করে। 'বৃহৎ লোকালয়', 'শান্ত আকাশ', 'রাজপথ', 'গৃহশ্রেণী', 'উদার মন্দির', 'স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি', 'নদীতীর', 'পূজার ঘণ্টা', প্রভৃতি পার্থিব অনুষঙ্গের আয়োজনের উদ্দেশ্য মূলত মালিনীর আন্তর্চৈতন্যের নবধর্মভাবকে 'গ্লোরিফাই' করা। বস্তুজাগতিক পৃথিবীর পটে নেমে আসা জ্যোৎস্না যেন মালিনীর হৃদয় উৎসারিত ভাবসত্য। এক হৃদয় থেকে উৎসারিত জ্যোৎস্নালোক সমস্ত জগৎ প্লাবিত করেছে। 'সমগ্র হৃদয়ের বার্তা এক হৃদয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। এক হৃদয়ের ভেতর সমস্ত হৃদয়ের কথা আশ্রয় পেয়েছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৫২) মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃত পরিসরে চাঁদের সুকোমল আলো সমস্ত অন্ধকার বিতাড়িত করে রাত্রি-চাঁদ-আকাশের সঙ্গে অ-পূর্ব মিলনদৃশ্য চলা করে চলেছে যেন। জাগতিক কোলাহল, মহাবিশ্বের বিশালতায়, প্রকৃতির বিস্তীর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্ক্ষিত ধর্মবোধকে এভাবেই ছড়িয়ে দেন। চারুদত্তের ভাষায় মালিনী তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বদেবী। কেননা:

কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪১)

মালিনীর ধর্মভাবনা এখানে জ্যোৎস্নালোকের অধিকল্পনায় চিত্রিত হয়েছে। একক আলোর উৎসমুখ সামষ্টিক জীবনের সংকট, সংশয় দূর করবার বাসনা রবীন্দ্রনাথের। আচারসর্বস্ব ধর্মাচারের বিপরীতে মানবীয় জীবনভাবনাকে এভাবেই তিনি বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দেন। এরই আলোয় আলোকিত হয়ে সুপ্রিয় উচ্চারণ করে:

আমি নহি একজন
তোমাদের ছায়া। প্রতিধ্বনি নহি আমি
শাস্ত্রবচনের। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩৮)

নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্রের রীতিনীতি সুপ্রিয় আবদ্ধ থাকতে চায়নি বলে সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তার আত্মিক ব্যবধান বিদ্যমান। সুপ্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রাণহীন ছায়া হয়ে থাকতে চায়নি। কিংবা সে হতে চায়নি প্রতিধ্বনি যা প্রকৃত ধ্বনিউৎস

নয়। শাস্ত্র-অনুগামী ভাবনা প্রকৃত জীবনবোধের উৎস নয়। নবধর্মের প্রকাশে সে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে এ ঘোষণায় যে: 'প্রতিধ্বনি নহি আমি শাস্ত্রবচনের। শাস্ত্রাশ্রিত বোধ শেষ আশ্রয় হতে পারে না–একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন।

প্রাণময় ধর্মভাবনা তাকে আকৃষ্ট করেছে। নাট্য-আখ্যানে তাই দেখা যায় রাজাও এ ধর্মভাবের প্রতি আগ্রহী হয়ে মালিনীকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করে:

কী সৌন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,
সেইমত উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৭)

পৌরাণিক লক্ষ্মীর প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে: 'ঋকবেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। ... রামায়ণ অনুসারে লক্ষ্মী পদ্মহস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন, যখন দেবতা ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করেছিল। ... দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্র মন্থনের সময়ে ঘৃত থেকে উত্থিত হয়ে দেবগণের কাছে যান।' (সুধীরচন্দ্র, ১৪১৬ : ৪৮৪) রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানে মালিনী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে লক্ষ্মীর ইমেজ ব্যবহার করলেন। সমাজ ও জীবনের সমস্ত গরল দূর করে দেয় মালিনী ও তার অন্তরস্থিত ভাবধারা। সুর ও অসুরের সমুদ্রমন্থনে প্রথমে গরল এবং পরে অমৃতধারা নিয়ে লক্ষ্মীর আবির্ভাব যেমন সমুদ্র-তরঙ্গে ও জনজীবনে আনন্দের অনাবিল ধারা বইয়ে দিয়েছিল, এ নাট্য-আখ্যানের পটে মালিনীর উপস্থিতি সেরূপ। নবধর্মই মালিনীর অমৃতসুধা। এ নবধর্মের স্পর্শে আলোকিত হয়েছে মানবের জীবন এবং সে-সূত্রে জনজীবন। কাশ্যপের দৃষ্টিতে মালিনী তাই লক্ষ্মীর লোকায়ত রূপের প্রতীক হিসেবে লোকলক্ষ্মী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। মানুষের মাঝে বাস করে মানবের অন্তরকে আলোকিত করবার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নারীর কাঁধেই অর্পণ করেন।

রক্তকরবী

রক্তকরবীর রাজা নেপথ্যে থেকে নন্দিনীকে বলে: '... পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৯) একদিকে নিরীহ ও শান্ত প্রাণের নন্দিনী, অপরদিকে ছোবল মেরে সমস্ত কিছু কেড়ে নেয়ার ভয়াল মূর্তি রাজা রূপকল্পে প্রাণহানির অশুভ শঙ্কা চিত্রায়িত হয়েছে এখানে। পায়রা শুভ চেতনার, আর বাজপাখি অশুভ, অশনিচেতনার সংকেতবহ। 'বাজপাখি পরোক্ষভাবে সমগ্র শোষণ প্রক্রিয়ার প্রতীক। এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে যক্ষপুরীর খোদাইকরদের নিঃশেষিত করার জন্য। ধনবাদী সভ্যতার শোষণবৃত্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে বাজপাখির মাধ্যমে।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৬০) রাজার রাক্ষুসে-বৃত্তি ক্রম-স্খলিত রূপের উন্মোচন কাব্যনাট্যকার আখ্যানপটে তুলে আনেন এভাবে:

> নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৬)

অবরুদ্ধ ও বিপন্ন মানব সত্তায় সংগুপ্ত বন্ধন ভেঙে, আগল খুলে মুক্ত জীবনানন্দে বেরিয়ে আসার প্রবল ও তীব্র আকুতি ব্যক্ত হয়েছে রাজার কণ্ঠে। ক্ষমতা, লোভ আর সংগ্রহের পাহাড় গড়ার কুশ্রী নেশায় মত্ততায় ক্লান্ত ও বেদনাহত মানবাত্মায় মুক্তির সুবাতাস লেগেছে যেন। প্রকাণ্ড দৈত্যের ঘুমন্ত সত্তায় প্রাণের জোয়ার নিয়ে আসে নন্দিনী। গোটা যক্ষপুরীর প্রেক্ষাপটে নন্দিনী হয়ে ওঠে আলোর উৎসমুখ। অধ্যাপকের দৃষ্টিতে নন্দিনী:

> সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭২)

প্রভাতসূর্যের আলোয় ফুলের বন তথা বিশ্বপ্রকৃতি আলোকিত হওয়া নিত্যকার সত্য ও বাস্তবতা, সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বোধ জাগায়। কিন্তু ভীষণ বদ্ধ পরিসরে, যেখানে আলো প্রবেশের অবকাশকে বিন্দুপরিমাণ প্রশ্রয় দেয় হয় না, সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আলোর আলোড়ন বিস্ময় জাগায় স্বভাবতই। খনিশ্রমিকদের রুদ্ধশ্বাস জীবন-প্রতিবেশের পটভূমিতে নন্দিনী সেই আলো: সম্ভাবনার, আশার, শুশ্রূষার, সর্বোপরি আনন্দের। যক্ষপুরীর খনিগহ্বরসম অন্ধকারে সামূহিক প্রতিকূলতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের, প্রাণের বীজমন্ত্র বুনে দেন। নন্দিনীর আবির্ভাবে এ নাট্য-আখ্যানের সকল চরিত্র টের পায় এ পাতালপুরীর দেয়ালে ফাটল ধরেছে। উপনিবেশিত সমাজ কাঠামোর বিপরীতে সমাজ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র এভাবেই এগিয়ে থাকে। *রক্তকরবীরতে* সমাজ ও জীবনের নতুন বিন্যাসসূত্রের এমনকি সম্ভাব্য বিপ্লবের কাণ্ডারীও নন্দিনীই :

তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘে মতো দেখাচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় রক্তকরবীর রঙ ও সন্ধ্যাকাশের লালচে আভার সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্য একই রেখায় সমীকৃত হয়ে গেছে। কবির অনন্য-উপলব্ধিজাত শিল্পিত ভাবনায় নন্দিনীর সহজ-সুন্দর ফুলেল সজ্জা রক্তকরবীর গুচ্ছও বিদ্রোহব্যঞ্জনার্থ লাভ করে। রক্তকরবীর লাল প্রেমের, আবেগের রঙের সঙ্গে 'প্রলয়গোধূলির মেঘের' তুলনায় এক গতিশীল, নাটকীয় ও রূপময় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এ পরিবর্তনের পটভূমিকায় রয়েছে দিন ও রাতের সংযোগকাল: সায়াহ্ন। গোধূলির মেঘমালার চলিষ্ণুতা আর নন্দিনীর সহজ প্রেমময়তায় জীবনের এক অ-পূর্ব সৌন্দর্যের ও মুক্ততার আবহ রেখে যায়। যক্ষপুরীর বর্মকঠিন দেয়ালে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নতুন প্রাণের উচ্ছলতায় মুখরিত হবে এরই মাধ্যমে। জীবনের মুখরতার সঞ্জীবনীসত্তা রঞ্জনও।

আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৩)

কাব্যিকতার সঙ্গে নাট্য-গতিশীলতার সংযোজনে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক সময়ের বাঁধন খুলতে চান। রঞ্জনের আগমনের উদ্দীপনা 'মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠা'র কাব্যিক উচ্চারণে জারিত হয় বলেই তা চেতনাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়; যা এ নাট্য-আখ্যানের মৌল অভিপ্রায় সম্পাদনে সহায়ক হয়ে ওঠে। একইভাবে:

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলরকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৯)

রাজার অভ্যন্তরীণ ভীত, সংকট, ও অন্তর্ঘাতের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে বিশুপাগলার উচ্চারণে। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্ক্ষিত দর্শনভাবনায় রাজাকে পরিস্রুত করতে চান সুরের দোলায়। 'বুড়ো ব্যাঙ'রূপী রাজার জড়ত্ব ভাঙতে গানের সুরের গতি ও দোলার প্রয়োগবৈচিত্র্যে অনন্যতা লাভ করে। *রক্তকরবী*র নাট্য-আখ্যান পরিবর্তনের সূত্রধারাকে এভাবে নাট্য ও কাব্যগুণমণ্ডিত করে তোলে। প্রকৃতই: 'কেবল রাজনৈতিক প্রপ্যাগান্ডায় নয়, অথবা শিল্পভণিতির মোড়কে তুলে দেওয়া কোনো সংগ্রামী প্রোগ্রামে নয়, শিল্পের নিজস্ব অধিকারেই যে পৌঁছতে পারে জীবনের বেগ আর উল্লাস, 'রক্তকরবী' এবারে তা প্রমাণ করল।' (শঙ্খ, ২০০৯ : ১২০–১২১)

৪.১.৭ কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন

বর্তমান গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্যসমূহের ভাবনাবিশ্ব বিশ্লেষণে চিহ্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হবার অবকাশ রয়েছে। কেননা কাব্যনাট্যে বিধৃত চেতনা, চরিত্র, ভাষাসহ সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের স্বোপর্জিত শিল্পবিশ্বাসের স্বতন্ত্র ও অভিনতুন চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা: 'রূপ ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণে বলা যায় যে, উপমা-চিত্রকল্প প্রায়শই খণ্ড বাক্য, পূর্ণ বাক্য কখনো-বা একাধিক বাক্যে বিন্যস্ত হয়ে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। অপরদিকে, প্রতীক মূলত একটি শব্দ নির্ভর, কখনো-বা সমাসবদ্ধ পদ-শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রতীক, আলঙ্কারিক ভাষার উপরিতলে সীমিত পরিসরে ব্যক্ত হলেও গভীরতলে এক বা একাধিক পূর্ণ বাক্যের বিমূর্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। বস্তুত, আভাসিত পূর্ণ বাক্যের অনুভববেদ্য দ্যোতনা প্রতীকের চিহ্নায়নের নান্দনিকতাকে বহুমাত্রায় সমৃদ্ধ করে। (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০০৮ : ২১)

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কাব্যনাট্যটির নাটকের শুরুতে রয়েছে সন্ন্যাসীর গুহাকেন্দ্রিক জীবনযাপনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যনাট্যের দৃশ্যসজ্জায় গুহা ও গুহাকেন্দ্রিক শব্দবন্ধ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি প্রথম দৃশ্যের নাম দিয়েছেন 'গুহা'। 'গুহা' জগৎ-সংসার বিচ্ছিন্ন বদ্ধজীবনের প্রতীকী চিহ্ন। বাস্তব জগতের রূপ-রস-গন্ধ উপেক্ষা করে সন্ন্যাসীর অন্ধকারময় জীবন গুহার প্রতিরূপকে প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক বলেন: 'প্রথমেই গুহা। গুহা অন্ধকারময়, সংকীর্ণ, বাসস্থানের প্রতীক। জ্ঞানসাধক, মায়া-বাদী সন্ন্যাসীর ইহাই বাসস্থল নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে সংসারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ যাহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য হইয়াছে, জগতের সমস্তই যাহার ধারণায় অসার, তাহার বাহ্য সম্বন্ধশূন্য, আত্মকেন্দ্রিক, নিভৃত জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত স্থান গুহা। এই গুহা সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতীক। সন্ন্যাসীর জীবনও বাস্তব-সংসারচ্যুত হইয়া একান্ত আত্মভাব-সাধনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল। উহাও একপ্রকার গুহা'। (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৭৩) সন্ন্যাসীর বদ্ধজীবনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অন্ধকারের চিহ্ন। অন্ধকারের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে গুহাকেন্দ্রিক জীবনবাস্তবতার উন্মোচনে।

> অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
> অন্ধকার মানসের, বিচরণভূমি,
> অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৯)

অন্ধকারের চিহ্নে সন্ন্যাসীর বিশ্বাসের জগৎ ফুটে উঠেছে। মূলত 'রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য প্রান্ত ভাবকে রূপকে-রহস্যে, সাংকেতিকতায় প্রকাশ করা। ভাবের দ্বন্দ্বই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এরকম নাটক *প্রকৃতির প্রতিশোধ*। (সাইফুল, ২০০৩ : ২৬৬) আবার অন্ধকারের চিহ্নে নতুন জীবনের স্বরূপ উঠে এসেছে কখনওবা।

পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০৩)

বিশ্বপ্রকৃতিতে সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহ এখানে সন্ন্যাসীর পূর্ববর্তী চেতনার প্রতীকী চিহ্ন। আর সমুদ্রের নীলে কনকসন্ধ্যার মিলিয়ে যাওয়ায় উদ্ভাসিত হয়েছে তার রূপান্তরিত বিশ্বাসের প্রতীকী চিহ্ন। এখানে সন্ধ্যা ও সমুদ্রের রূপকল্পে বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য চিহ্নায়িত হয়েছে। সূর্যাস্তের সোনালি আভা ধীরে সুনীল সমুদ্রের জলে মিলিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্যপট পাঠকের কল্পনাবিশ্বে প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের বোধের সঞ্চার করে। প্রকৃতির নানা রঙ ও রূপের আয়োজনে এ নাট্য-আখ্যানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য সুচিহ্নায়িত হয়েছে। আবার:

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৯)

স্বেচ্ছায় প্রকৃতি, মানবজীবনপ্রবাহ দূরে ঠেলে সাধনায় নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে সন্ন্যাসী। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনায় মানব ও প্রকৃতি এক অপরের পরিপূরক, অচ্ছেদ্য অংশ। তাই রবীন্দ্র-কল্পনায় প্রকৃতি সন্ন্যাসীর নির্জন সাধনায় হানা দেয়। সন্ন্যাসীর সাধনায় থাকা প্রকৃতির শূন্যস্থান প্রকৃতি নিজেই পূরণ করে নিয়ে চায় যেন। এভাবেই শব্দের মধ্যে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে যায়। মূলত: 'শব্দ কখনও-কখনও চিন্তার বিষয়ের চিহ্ন, কখনও-কখনও চিন্তনক্রিয়ার চিহ্ন। (অভী, ২০১১ : ২৬) অন্যত্রও রয়েছে:

এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরিতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০৫)

আলোর অন্বেষণ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক। কবি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এসেছেন। আলোকের অন্বেষণের সূত্রে বারংবার গুহামুখ কিংবা পথের চিহ্ন বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে রবীন্দ্র–ভাবনায়। 'এ নাটকে গুহা একটি প্রতীক বিশেষ, যা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অসীমের প্রতি আকৃষ্ট সন্ন্যাসীর অবস্থাকে তুলে ধরেছে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতেও আছে এই গুহা। সন্ন্যাসীর অন্তরের জাগরণের মত সেখানেও আছে গুহায়িত চেতনার উদ্ভাস।' (অশোককুমার, ২০১১ : ২৫৯) গুহাবাসী সন্ন্যাসী জীবনের পথেও ছুটেছেন।

বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৮)

বলা যায়: 'পথ সংসারের উদ্বেলিত কর্মস্রোত, খর জীবনযাত্রার প্রতীক– ইহার আনন্দ, কৌতুক, সংগীত, স্নেহ, প্রেম, কলহ, সবকিছুর সম্মিলিত রূপের প্রতীক। এইখানে সীমার স্বরূপ ও তাহার মায়াময় আকর্ষণীশক্তির প্রকাশক্ষেত্র। তাই সন্ন্যাসীর জীবনের দ্বন্দ্বের একদিকে গুহা, অপরদিকে গুহামুখে ও পথে; মানবিক স্নেহ বালিকার মূর্তিতে গুহার মধ্য হইতে তাহাকে বাহির করিয়াছে, শেষে পথের নানা আকর্ষণে সংসারকে সে ভালোবাসিতে শিখিয়াছে, এই প্রেমেই সে আত্মকেন্দ্রিক গুহাজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই গুহা, গুহামুখে ও পথ সন্ন্যাসীর ভাবজীবনের তিনটি প্রতীক–এই তিনটি স্থানের মধ্যে তাহার চিত্তধারা তরঙ্গায়িত হইয়া পরিণামে পৌঁছিয়াছে।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১৭৩) এরই সূত্রে বলা যায় পুরনো চেতনাকে ঝেড়ে ফেলে নবচেতনায় উজ্জীবিত হবার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ঝড় অনুষঙ্গ। ত্রয়োদশ দৃশ্যে দেখা যায় যে, ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতেও বজ্রের তীব্র হুঙ্কার উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী শুনতে পায় 'ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১৫) কেননা, বালিকা এখানে মুক্তপ্রকৃতির প্রতিরূপক। সে গুহার বদ্ধদশার বিপরীতে জীবনের কল্লোলময় আনন্দের ধারা বয়ে আনে। বালিকা ব্যক্তি, সে সীমার অংশ। সন্ন্যাসী সেই সীমার মধ্যেই পেয়েছেন অসীমতার সন্ধান। এভাবে বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের অনুসন্ধানই সীমা অসীমের চেতনাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। আবার, লোকশ্রুত প্রবাদপ্রতিম বাক্যবিন্যাসের চিহ্ন উঠে এসেছে পথিকদের কথোপকথনে:

পঞ্চম। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা। ...

প্রথম। ... তার এক গালে চুন এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯১)

সন্ন্যাসীর গুহা জীবনের সীমের ধ্যানের জগতের বিপরীত চিহ্নসমুহ সংযোজিত হয়েছে এখানে। 'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে', 'অতি দর্পে হত লঙ্কা', 'এক গালে চুন এ গালে কালি' কিংবা 'ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি' প্রভৃতি জনমুখর মানব সমাজের চিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় নাট্য-আখ্যানে। জনতার কল-কোলাহলে সন্ন্যাসী খুঁজে পায় অসীমের রূপ :

সন্ন্যাসী। অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০৮)

অসীম কিংবা পরম সত্তার অন্বেষণে প্রাত্যহিক জীবন সীমায়, ঊর্ধ্বলোকে বা অন্যত্র এর অনুসন্ধান বৃথা: রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতের অন্যতম প্রান্ত এটি। 'ঈশ্বর অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত এই নাটক থেকে। অথচ এই নাটকের ধার্মিক তাৎপর্য আমাদের চোখে স্পষ্টই ধরা পড়ে। সন্তেরা, মরমিয়া সাধকেরা কখনও সংসারের ভিতর দিয়েই আবার কখনও এর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন, দুর্গম অরণ্যে, নির্জন গুহায়। মরমিয়া সাধকদের কেউ-বা পৃথিবীকে ভালোবেসেছেন, কেউ পৃথিবীকে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই ঈশ্বরপ্রেমী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী প্রচলিত অর্থে মরমিয়া সাধক নন, কারণ ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটি তাঁর জীবনে না-এসে পড়া পর্যন্ত তিনি কোনো-কিছুই ভালোবাসতেন না। যেহেতু মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়কেই তিনি ঘৃণা করতেন তাই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন অন্ধকার গুহায়।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৬) মানুষ ও মানব সমাজের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভীষ্ট জীবনদর্শন অন্বেষণ করেছেন এ নাট্য-আখ্যানে। সীমা-অসীমের দ্বন্দ্বের পরিক্রমণ শেষে সন্ন্যাসীর তাই উপলব্ধি:

যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র ওই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজি খুঁজি! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১৫)

সন্ন্যাসীর অসীমের ব্যর্থ অন্বেষণ এখানে 'খদ্যোত-আলোক' ও 'অন্ধকারে মরি পথ খুঁজি' প্রভৃতি দ্যোতকের আশ্রয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সূর্য ও চাঁদ অপরিসীম আলোকের উৎস হিসেবে সুচিহ্নিত সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে। সুর্য ও চাঁদের বৈপরীত্যে আলোক-পতঙ্গ খ্যাত জোনাকির ক্ষুদ্র আলোকের বৈপরীত্যময় চিহ্নায়ন এ নাট্য-আখ্যানকে বিশেষ করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। সীমা-অসীমের দ্বন্দ্বের মীমাংসায় পৌঁছে সন্ন্যাসীর তাই আত্মোপলব্ধি:

জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১১৭)

অর্থাৎ, বিশ্বময় আনন্দের ধারা বইয়ে দিতে চান রবীন্দ্রনাথ। বস্তুবিশ্বের বিচিত্র স্বরূপে অসীম আনন্দের চিহ্ন পরিব্যাপ্ত করে দেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় সামঞ্জস্যের আনন্দধারা, যা রবীন্দ্র-দর্শনের অন্যতম দিক। আবার, এ

নাট্য-আখ্যানে সংগীতের যোজনা অসীমত্বের ধারণাকে পূর্ণায়ত রূপ প্রদান করেছে। 'গানগুলোর মধ্য দিয়ে নাট্যরসকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন নাট্যকার। (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৫)

রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু,
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯০)

প্রকৃতি এখানে অসীম আনন্দের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির মনোরম ও ইঙ্গিতময় উপস্থাপনার পরেও প্রশ্ন ওঠে: 'কে নিলো এই প্রতিশোধ তাঁর উপর? নাটকের শিরোনাম ঘোষণা করছে এ *প্রকৃতির প্রতিশোধ*। কিন্তু কোন্ প্রকৃতি? এ কি সেই তুচ্ছ অবজ্ঞেয় প্রকৃতি যার সীমিত রূপ আগেই দেখেছিলেন সন্ন্যাসী? না কি এ সেই আশ্চর্য মহিমাময় প্রকৃতি যার সীমাহীন আয়তন তিনি হৃদয়ে উপলব্ধি করেছিলেন কন্যাটির মৃতদেহ আবিষ্কার করার পূর্বমুহূর্তে? আধিভৌতিক জড়প্রকৃতি তো প্রতিশোধ নিতে পারে না।' (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৭) এ মূলত রবীন্দ্রচিত্তের রূপান্তর প্রক্রিয়ারই চিহ্নায়ন। 'যে প্রকৃতিকে এককালে উপহাস করেছেন তিনি– সেই প্রকৃতিই যেন তার প্রতিশোধ নিয়েছে বলে মনে হয়েছে তাঁর।' (অশোককুমার, ২০১১ : ২৬২) কাব্যনাট্যকার রবীন্দ্রনাথের চেতনবিশ্বের এ রূপান্তর সন্ন্যাসী ও বালিকার এ আখ্যানে নান্দনিকতা লাভ করেছে। মূলত: 'বালিকাটির মৃত্যুতে সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই পরিণতি শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীকে মানবিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে; তার গুরুত্বই এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিতৃষ্ণ সন্ন্যাসী বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হন। সীমার মাঝে অসীমকে তিনি খুঁজে পান। রাবীন্দ্রিক ভাবনায় সন্ন্যাসী এভাবে রূপান্তরিত চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৩) তাই পুরো নাট্য–আখ্যানটি রবীন্দ্রনাথের ক্রম-রূপান্তরিত শিল্পীসত্তার চিহ্ন হিসেবে পাঠ করা যায়। কেননা:

> সন্ন্যাসী তাঁর মনের এই নির্লিপ্ত অবস্থা অতিক্রম ক'রে যান, বুঝি তাঁর জীবনের করুণতম অভিজ্ঞতার অবস্থা মনে করা যেতে পারে যেখান থেকে বিশ্বকে শান্ত বৈরাগ্য ও নান্দনিক দূরত্বের সঙ্গে ধ্যান করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাযুজ্য রয়েছে। তাঁর জীবনের করুণতম মুহূর্ত এসেছিলো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার মাত্র দু-বছর পর। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ও উৎসাহদাত্রী বৌঠাকরুন কাদম্বরী দেবী, যাঁর সাহচর্যে তিনি জীবনের সতেরোটি অবিস্মরণীয় বৎসর কাটিয়েছিলেন, এইসময়ে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। চব্বিশ বছরের

যুবক রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হয়েছিলো যেন সমস্ত বিশ্ব আত্মহত্যা করেছে, আর পিছনে প'ড়ে রয়েছে তাঁকে ঘিরে দিগন্ত থেকে দিগন্তব্যাপী এক নিঃসীম অন্ধকার। (আবু সয়ীদ, ২০২১ : ৮৫)

রাজা ও রানী

এ নাট্য-আখ্যানে রাজা বিক্রমদেবের রূপান্তরশীল সত্তার নানা চিহ্ন রয়েছে। যেমন: নাট্য-আখ্যানের শেষ পর্যায়ে তার জীবনানুভব :

অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৪২)

অস্ত্র রাজ্য পরিচালনার, আত্মরক্ষার উপকরণ, যা এ কাব্যনাট্যের আখ্যানপটে শত্রুকে বন্দি করবার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিক্রমদেব সুমিত্রাকে অস্ত্রের শক্তিতে নয়, প্রেমের শক্তিতে বন্দি করতে চান। দ্বৈধ বন্দিত্বের মধ্যে দ্বিতীয়টি মূলত মুক্তির অনন্ত পরিসরকে চিহ্নিত করে। রাজার মুক্তির পরিসর দ্বিতীয়টিই। প্রেমের বন্দিত্বে মূলত মুক্তির চিহ্নায়ন সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রাজা আর রানীর রোমান্টিক প্রণয়ানুভূতির স্বরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে পরিস্ফুট করেন এভাবে:

নয়নপল্লবে লজ্জা ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতরকম্পিত
দীপশিখাসম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৯)

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার প্রেমজীবনের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ প্রয়োগ করে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন এখানে। 'নয়নপল্লব', 'ফুলদল', 'শিশিররবিন্দু', 'অধরের হাসি', 'দীপশিখা' এ সকল দ্যোতকের মধ্য দিয়ে বিক্রমদেবের রোমান্টিক প্রণয়ানুভব দ্যোতিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বিচিত্র প্যারাডাইমে মানবীয় আবেগকে শিল্পরূপময় করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতি ও প্রেম একই চিহ্নে বিধৃত হলো এখানে। কুমারসেনের প্রেমভাবনাও অনুরূপ ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে:

মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে

পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার

প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের

বিরহরজনী-'পরে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২১১)

রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী ভাবনার মূলেও রয়েছে প্রেমের চিহ্নায়ন। বিক্রমদেবের সংলাপে:

... আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,

বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে– অতি তীব্র

প্রেম-আলিঙ্গন-সম। ভালো নাহি লাগে

অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি– ক্ষুদ্র যুদ্ধে

ক্ষুদ্র জয়লাভ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২১২-২১৩)

যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপরীতে প্রেমময় জীবনের চিহ্নায়ন ঘটেছে 'বুকে বুকে', 'বাহুতে বাহুতে', 'অতি তীব্র প্রেম-আলিঙ্গন' প্রভৃতি শব্দবন্ধে। নাট্য-আখ্যানের সূচনায় 'রাজার প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে, প্রেমের পরিণাম এক নিষ্ঠুর বীভৎসতায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাই রাজার জীবনে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি টানিয়া আনিয়াছে। ইহা আমরা নাটকের মধ্যে দেখিয়াছি।' (উপেন্দ্রনাথ, ১৪১৫ : ১২৮) কিন্তু তার মধ্য দিয়েও প্রেমের শক্তি ফল্গুধারার মতো রাজার হৃদয়ে স্থিত হয়। এখানে তারই চিহ্নায়ন ঘটেছে। এ নাট্য-আখ্যানে সংযোজিত গানেও এ ভাবনা ছড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। 'এ নাটকে গানের সংখ্যা আটটি। সে গান গেয়েছে নাটকের নানান শ্রেণীর অপ্রধান চরিত্র। প্রধান চরিত্রের কণ্ঠে এ নাটকে কোন গান নেই। 'রাজা ও রানী' নাটকে গান গেয়েছে সৈনিক, সখীরা, ইলা, প্রথম সখীর দুটি গান, জনতা (২য় ব্যক্তি) এবং কাঠুরিয়া।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৭২) ত্রিচূড় প্রাসাদের অন্তঃপুরে ইলার কণ্ঠে:

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,

তুমি অবসরমত বাসিয়ো।

আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,

তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৩০)

এখানে 'রাত্রি জেগে আছে সে কুমারের অপেক্ষায় কুমারের দেখা নেই তাই প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গভীর অভিমান।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৭৩) রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনায় বিজড়িত মান-অভিমান চিহ্নায়িত হয়েছে। দেবদত্তের সংলাপে রানীর আত্মীয়েরা চিহ্নায়িত হয়েছে দুটি পৌরাণিক চরিত্রের অনুষঙ্গে।

> রানীর আত্মীয় তারা প্রজার মাতুল,
> যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৮২)

রানী সুমিত্রার আত্মীয়েরা এখানে জালন্ধর রাজ্যের কংস ও কালনেমি চরিত্রের দ্যোতকে চিহ্নায়িত হয়েছে। পৌরাণিক এ চরিত্র দুটির দ্যোতকে এ নাট্য-আখ্যানে চিহ্নায়িত হয়েছে সুমিত্রার আত্মীয়দের প্রতাপের প্রতি লোভ, প্রবঞ্চনা ও কূটতন্ত্রের স্বরূপ অভিদ্যোতিত হয়েছে। রানী রাজ্যের মাতা হিসেবে পরিগণিত হয়, সেদিক থেকে রানীর আত্মীয়-পরিজন রাজ্যের মাতুলরূপে বিবেচিত হয়। পুরাণে আছে দেবকী ও বসুদেবের 'বিবাহে উপস্থিত থাকাকালে তিনি দৈববাণী শুনতে পান যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে বধ করবে। কংস এই দৈববাণী শুনে বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে এঁদের পর পর সাতটি সন্তান হয়, তাদের সকলকেই কংস হত্যা করেন।' (সুধীরচন্দ্র, ১৪১৬ : ৯৫) আর পৌরাণিক কালনেমি সম্পর্কে জানা যায়: 'কালনেমি রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দান করার জন্য হনুমান গন্ধমাদনপর্বত হতে ঔষধি আনতে গেলে রাবণ কালনেমিকে পথিমধ্যে হনুমানকে নিহত করার জন্য পাঠান এবং তার পুরস্কারস্বরূপ মাতুলকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।' (সুধীরচন্দ্র, ১৪১৬ : ১০৩) সুতরাং দেবদত্তের সংলাপে এ দুই চরিত্রের উপস্থিতি নাট্য-আখ্যানপটে আত্মীয়-বন্ধনের অভিশপ্ত দিক নির্দেশ করে। সুমিত্রার মাতুলদের অত্যাচারের চিত্র মন্‌সুখ, নন্দলাল, কুঞ্জর, কিনু, হরিদীন প্রমুখ প্রজার আলাপচারিতায় সুস্পষ্ট হয়েছে।

> **মন্‌সুখ**। আমার একগাছা লাঙল আছে, এবার তাজ-পরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব।
> **কিনু**। মুখের কোনো কাজটাই হয় না– অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৭৬)

সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায় যে, শোষণ-নিপীড়নে নুইয়ে-পড়া শ্রম-জনতা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসে তাদের নিত্যদিনের ব্যবহৃত সরঞ্জাম হাতে নিয়েই। এখানে কৃষিজীবনের অন্যতম হাতিয়ার 'লাঙল'-এর প্রয়োগ সে-কথাই পাঠকের চৈতন্যে জাগ্রত করে। অপরদিকে, 'তাজ-পরা মাথাগুলো'– এ দ্যোতকে প্রতীকায়িত হয়েছে শাসনযন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। আর 'মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব'– এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় নতুন শস্য উৎপাদনের প্রস্তুতির ইঙ্গিত। মন্‌সুখ চরিত্রের এ উচ্চারণের মধ্যে শাসনব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থা, ক্ষোভ ও বিপ্লবের চিহ্ন নিহিত রয়েছে। তার এ উচ্চারণকে আরও বস্তুনিষ্ঠতা প্রদান করেছে

কিনু নাপিতের 'অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না'– এ উচ্চারণে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের প্রকৃত রূপ চিহ্নায়িত হয়েছে। শোষণ-বঞ্চনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন থাকলেও জীবিকার তাগিদে তা আর সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে না। উভয়ের সংলাপে মূলত শোষণ কাঠামোর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার সূত্রে নব সমাজ বিনির্মাণের যে আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন রবীন্দ্রনাথ– তা চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অরাজকতা লেগেই আছে। দেবদত্ত ও সুমিত্রার পারস্পরিক সংলাপে ফুটে ওঠে শোষণের কার্যকারণ।

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কী শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১৮২)

'ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা' প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের চিহ্ন। আর 'দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা' শোষণের প্রতীকী চিহ্ন। শোষণ-নিপীড়ন কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়, রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য সমাজের জন্য প্রয়োজন মিত্রতা। রেবতীর সংলাপে রয়েছে:

যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা? শত্রু কোথা?
মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২২১)

'যুদ্ধসজ্জা', 'কেন যুদ্ধসজ্জা', 'শত্রু কোথা' প্রভৃতি শব্দবন্ধ রবীন্দ্র-সত্তায় সংগুপ্ত যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের চিহ্ন হিসেবে পাঠ করা যায়। মিত্রতার শক্তিতে তিনি সমগ্র সমাজ ও জীবনকে পরিস্রুত করে তুলতে আগ্রহী হন। মিত্রতার অন্যতম অনুষঙ্গ প্রেম। কুমারসেনের সংলাপে প্রেমের চিহ্নায়ন ঘটেছে এভাবে।

পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৬ : ২০৬)

ইলাকে উপজীব্য করে এ সংলাপ উচ্চারিত হলেও ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র চরাচরে প্রণয়ের শক্তির রূপ ছড়িয়ে দিতে চান। বিপরীতার্থক বোধের সংশ্লেষে রবীন্দ্রনাথ এ নাট্য-আখ্যানে শত্রুতার বিপরীতে মিত্রতা, যুদ্ধের বিপরীতে

প্রেমের চিহ্নায়ন ঘটান। কাব্যনাট্যটির নামকরণেও রবীন্দ্রনাথ এ বৈপরীত্যময় চিহ্নায়ন ঘটিয়েছেন। প্রেমভাবনার বৈপরীত্য ও নাট্য-আখ্যানের পরিসমাপ্তিতে এর মীমাংসায় পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ। 'রাজা ও রানী' নাটকের নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকের মূল বিষয়কে অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এ বিষয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে কোথাও কোথাও এর আভ্যন্তরীণ বিষয় তথা ব্যঞ্জনা। তবে এ নামকরণে মূলত আভাসিত হয়েছে রাজা বিক্রমদেব আর রানী সুমিত্রার প্রেমভাবনার বৈপরীত্য–সংঘাত–এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে সে সংঘাতের অবসান। (অশোককুমার, ২০১১ : ৬৭)

বিসর্জন

বিসর্জন কাব্যনাট্য–আখ্যানের সূচনা ঘটেছে প্রাণের জন্য আকুতির মধ্য দিয়ে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রথম সংলাপেই মাতৃস্বর্গ-বঞ্চিত গুণবতীর হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

> তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
> লালাসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
> আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
> অনুভব– এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
> এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
> নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
> প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
> একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
> ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
> অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬১)

'তপ্ত বক্ষ', 'এক শিশুর পরশ', 'প্রাণের ভিতরে', 'বাহু দুটি', 'এই কোল', 'এই দৃষ্টি', 'নিবিড় জীবন্ত নীড়', 'প্রাণকণিকা' প্রভৃতি দ্যোতকের মধ্য দিয়ে গুণবতীর সন্তানবতী হয়ে ওঠার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্যোতিত হয়েছে। আর 'একটি নূতন আঁখি', 'কথাহীন মুখ', 'প্রথম হাসিটি' প্রভৃতি গুণবতীর প্রত্যাশিত শিশুর দ্যোতক। এ উদ্ধৃতিটি গুণবতীর মাতৃস্বর্গস্বাদ লাভের প্রতীক চিহ্ন। 'একটি পূর্ণ প্রাণের মধ্যে আর একটি প্রাণকণিকার সৃজন

বিশ্বপ্রাণসত্তাসৃষ্টির আদিমতম আর্কিটাইপ।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১২৪) আবার, বসুন্ধরা মাতৃরূপে চিহ্নায়িত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। জয়সিংহের সংলাপে লক্ষণীয়:

পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ২৯৪)

জবা ফুল ও বলিপূজার রক্তধারা এখানে রঙের সাদৃশ্যে চিহ্নায়িত। তবে, এর অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বেদনার চিহ্নায়ন লুকায়িত। বলিপূজার ফলে প্রাণনাশের নিষ্ঠুরতা কাব্যনাট্যকারকে বেদনার্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই কল্পনা করেন: পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া রক্তপাতের রঙ নিয়ে জবা ফুল তাই রঙিন হয়ে উঠেছে। এখানে: '' 'দুটি জবাফুল' যেন দেহস্থিত হৃৎপিণ্ডের নিলয়-অলিন্দ, যেন দুটি ছিন্ন শ্বাসযন্ত্র। ছিন্ন পুষ্পবৃন্তের মতোই যা সত্য। ধরিত্রীর মাতৃবক্ষের প্রতীকেও দুটি জবার ভাব মূর্ত। 'রক্ত' তরল, স্নেহও তরল। রক্ত দেহে থাকে, স্নেহ থাকে মনে। উভয়েই প্রাণের চিহ্নে চিহ্নিত।'' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৪০) আবার, রঘুপতির ভাবনায় পৃথিবীর রক্তপাতের চিহ্নায়ন ঘটেছে এভাবে:

এ জগৎ মহা হত্যাশালা। ...
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট–
তাহার কী জীব নহে? ...
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে–
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে

উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে

মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৮৪)

প্রতিনিয়ত বিশ্বময় সংঘটিত হত্যালীলার দ্যোতক হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছেঃ ' চরণে দলিত শত কীট', 'অরণ্যের মাঝে', 'লোকালয়ে', 'বিহঙ্গের নীড়ে', 'কীটের গহ্বরে', 'অগাধ সাগর-জলে', 'নির্মল আকাশে', 'জীবিকার তরে', 'খেলাচ্ছলে, 'অকারণে', 'অনিচ্ছার বশে'। অর্থাৎ, পৃথিবীর হত্যালীলার তালিকায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের সংহারও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকেনি। এখানে হন্তাকারক বাঘের দ্যোতকে এবং হত্যাযজ্ঞে আক্রান্ত শ্রেণি হরিণের দ্যোতকে চিহ্নায়িত হয়েছে। বাঘের নিরীহ হরিণ শিকারের প্রাকৃতিক ও দ্রুত গতিশীল দৃশ্যকল্পে বৈশ্বিক হত্যালীলার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি চিহ্নায়িত হয়েছে আলোচ্য উদ্ধৃতিতে। গোবিন্দমাণিক্য ও গুণবতীর সম্পর্কের বিচ্ছেদ চিহ্নায়িত হয়েছে এভাবেঃ

প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের

সূর্য। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৭৩)

মেঘ ও সূর্যের সহাবস্থান রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিদৃশ্যমান। মহাকাশের বিশালতার পটে মেঘ ক্ষণস্থায়িত্বের, আর সূর্য স্থায়িত্বের চিহ্ন। মেঘে রয়েছে অন্ধকারের প্রতিভাস, আর সূর্য আলোর উৎসারণ। মেঘ ও সূর্যের দ্বৈত বৈপরীত্যময় চিহ্নে গুণবতীর অভিমানের সাময়িক অনুভূতি এবং গোবিন্দমাণিক্যের চিরন্তন প্রণয় অভিদ্যোতিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ক্ষণিকের এ জীবন হাসি-আনন্দে কাটিয়ে দেয়াতেই পরম প্রাপ্তি যেন। রবীন্দ্রনাথ সে-আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন প্রেমে, ত্যাগে, স্নেহে তথা শুভ ও কল্যাণ চেতনায়। এ চেতনার বাহক অপর্ণা তাই নিজেকে চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ছাগশিশুর মাতারূপেঃ

কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর

শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক

জানে না সে আপন মায়েরে। ...

আমি তার মাতা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৬২)

'কে তোমার বিশ্বমাতা'– প্রথাসর্বস্ব ধর্মের দ্যোতক, 'আমি তার মাতা'– মানবপ্রেম ও ধর্মের দ্যোতক। পুরো সংলাপটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশিত ধর্মের স্বরূপ আভাসিত হয়েছে। একদিকে বিশ্বমাতা, অপরদিকে অপর্ণার মাতৃসত্তা– এ দ্বিবিধ মাতৃরূপের বৈপরীত্যময় চিহ্নায়নে নাট্য-আখ্যানটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ

মানবতাবোধের সুকোমল স্পর্শে এ নাট্য-আখ্যানের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রকে তাড়িত করেছেন। তাই এ নাট্য-আখ্যানে দেখা গেছেঃ 'গোবিন্দমাণিক্য নিত্য মানব ধর্ম, উদার মনুষ্যত্ব, সহজাত প্রেমের ও অহিংসার প্রতীক। রঘুপতি অর্থহীন ধর্ম যুক্তিহীন প্রথা, মনুষ্যরচিত আচারবিধি ও হিংসার প্রতীক।" (কনক, ১৯৫০ : ৮৭) প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বের বলি-চিহ্ন জয়সিংহ যেন। তাই অপর্ণার বারংবার জয়সিংহকে আহ্বান জানায় প্রতি মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসার। কেননা– 'এ নাটকের নাট্যঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মহামায়ার মন্দির। এখানেই রাজধর্ম, পুরোহিত-ধর্ম এবং মানবিকতার ধর্মের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছে। ... গৃহ রূপে নাটকের এ মন্দির জয়সিংহ ও রঘুপতির আশ্রয়স্থল। ... শাস্ত্রীয় ধর্ম এবং প্রেমধর্মের বিরোধিতার সম্পূর্ণ রূপটি মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এখানে ঘটেছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৪২) মন্দির তাই প্রথাবদ্ধ ধর্মের প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। অপর্ণার আহ্বানে সাড়া দেয় জয়সিংহ। সে বলেঃ

মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩০৬–৩০৭)

রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বে পীড়িত জয়সিংহকে মীমাংসার পথে নিয়ে এসেছেন প্রকৃতি ও প্রেমের চিরায়ত সংশ্লেষণ-বৈশিষ্ট্যের সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রেম, ভালোবাসা, পূর্ণিমার সুপ্ত রাত্রি, রজনীগন্ধার সুভাস সবমিলিয়ে এ অপূর্ব কল্পলোকের আবহ নির্মাণ করেন– যা শেষপর্যন্ত মানব প্রেমের শান্ত-সুশীতল প্রবাহকে অভিদ্যোতিত করেছে। অপর্ণার গানে এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। যেমনঃ

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি–
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ২৮৭)

বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতার প্রলোভনের উর্ধ্বে আনন্দময় জীবনের এমন প্রতিচ্ছবির অভিদ্যোতনা পাঠক চৈতন্যে সুখকর অনুভূতির জন্ম দেয়। 'নব নব উৎসব', 'আনন্দে রবে', কিংবা 'গৃহভরা হাসি' প্রভৃতি প্যারাডাইমে রবীন্দ্রনাথের আনন্দময় ও উৎসবমুখর জীবনের প্রতি আগ্রহ চিহ্নায়িত হয়েছে। মূলত 'উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ গান।

বিলীয়মান স্মৃতি ও ইতিহাসকে ধারণ করার আবশ্যিক আধারও গান।' (হোসনে আরা, ২০১৮ : ১০৭) নাট্য-আখ্যানের শেষপর্যায়ে এসে গোবিন্দমাণিক্যের উচ্চারণ:

মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩১৮)

ব্যক্তি যখন নিজেকে চিনতে পায়, তখন সে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। ত্রিপুরার রাজ্যের রাজত্ব হারিয়ে গোবিন্দমাণিক্য আপন রাজ্যের রাজা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে। 'সমাজের উপরিকাঠামোতে ধর্মের যে অবস্থান তাকে তাৎপর্যহীন মনে করেছেন রাজা গোবিন্দমাণিক্য। (চঞ্চল, ২০১১ : ৩২৮) এভাবেই ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণীতে, প্রেমে, মানবতার সুনির্মল ধারায় এভাবেই রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলোকে পরিস্নাত করে তোলেন।

চিত্রাঙ্গদা

প্রাচীন সাহিত্য থেকে চয়ন করে আনা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের ক্ষুদ্র ঘটনাংশকে রবীন্দ্রনাথ অভিনতুন ও আধুনিক মোড়কে উন্মোচন করেন। ফলে এ নাট্য-আখ্যানের চিহ্নায়নে আধুনিক মানুষের জীবন বোধ ও জিজ্ঞাসার প্রতিফলন দেখা যায়। চিত্রাঙ্গদার রূপদর্শনে অর্জুনের ভাবনা চিহ্নায়িত হয়েছে এভাবে:

কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩৫)

সরোবর থেকে সদ্য স্নান সেরে চিত্রাঙ্গদা ফিরে যাওয়ার দৃশ্যকল্প অর্জুনের মানসলোকে অভিনব রূপবোধের জন্ম দেয়। এ উদ্ধৃতিতে তারই চিহ্নায়ন রয়েছে। সরোবরের সোপানের শ্বেত শিলাপটে সিক্ত চিত্রাঙ্গদার রূপ সায়াহ্নকালের

সোনারঙা আলোর দ্যোতকে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। 'হাসি মিলাইল মুখে', 'ম্লান হল দুটি আঁখি', 'ম্লান মুখ করি' 'নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে', 'মৃদুপদে' প্রভৃতি দ্যোতকের মধ্য দিয়ে নাট্য-আখ্যানে বিধৃত চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব অভিদ্যোতিত হয়েছে। অর্জুন সরোবরে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখেও বিস্মিত হয়েছে। মূলতঃ 'সরোবর তাঁর দর্পণ। সেই দর্পণে নিজের অঙ্গশ্রী দেখে দেখে নিজেই মুগ্ধ হন তিনি।' (হরপ্রসাদ, ১৩৭০ : ২৩৪) অর্জুনকে দেখে চিত্রাঙ্গদার অনুভবঃ

ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই প্রথম জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর। ...
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ! আজন্মের বিস্ময় আমার। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৩১)

চিত্রাঙ্গদার এ পুরো অনুভবে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনার চিহ্নায়ন ঘটেছে। অর্জুন প্রেমের স্থিরতা প্রদান করতে চায় গৃহে, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বলেঃ

গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে

প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪৫)

অরণ্যলোক এবং গার্হস্থ্য জীবনের দ্বান্দ্বিক পটভূমিকার চিহ্নায়নের অন্তরালে চিত্রাঙ্গদার মননভূমির রূপরেখা অঙ্কিত রয়েছে। অর্জুনের দৃষ্টিতে প্রেমের পূর্ণতার চিহ্ন গৃহ। কিন্তু মদনদেবের বরে সৌন্দর্যধারায় পুষ্পিত চিত্রাঙ্গদার কাঙ্ক্ষিত জীবনের চিহ্ন অরণ্যভূমি। চিত্রাঙ্গদার ভাবনা ফুল-আশ্রিত; ফুলের রূপকল্পে চিত্রাঙ্গদার ভাবনায় যেসকল প্যারাডাইম ব্যবহৃত হয়েছে তা সময়ান্তরের ক্ষণস্থায়িত্বের ইঙ্গিত-চিহ্ন হিসেবে পাঠ করা যায়। যেমন: 'শুকাইবে', 'ফেলে দিবে', 'মরিছে', 'পড়িছে', 'ঝরিছে', 'খসিছে', 'খেলা সাঙ্গ হবে', 'শত শত সমাপ্ত সুখ' প্রভৃতি শব্দবন্ধ চিত্রাঙ্গদার এ বৎসরের ক্ষণস্থায়ী রূপ-ছদ্মবেশের দ্যোতক। 'কুসুমদল', 'পল্লবরাশি', 'অঙ্কুর', 'ফুটিছে', 'কেশর' প্রভৃতি জীবনের দ্যোতক। এভাবে বিপরীত ভাব-দ্যোতকের সংশ্লেষ ঘটান রবীন্দ্রনাথ। 'শত শত সমাপ্ত সুখ' মূলত শত শত ফুলের মৃত্যুর দ্যোতক যাতে চিত্রাঙ্গদার দৈহিক সৌন্দর্যের ক্ষণিকতা দ্যোতিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে এ বোধের মুখোমুখি করেন যে: 'অরণ্যের অন্তঃপুরে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত জীবনগুলি ফুটে উঠছে আবার অরণ্যেই ঝরে পড়ে যাচ্ছে– এই জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য সে খুঁজে পেয়েছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ১৮৯) হেমন্ত ঋতুর রিক্ততার চিত্রে মানব জীবনের আরেক গভীর সত্য সংপ্রোথিত রয়েছে; তা হলো: বাহ্যিক সৌন্দর্যের অসারত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব। নাট্য-আখ্যান পটে চিত্রাঙ্গদার মানস-রূপান্তরের সূত্রে এ সত্যভাষণে পাঠককে উপনীত করেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদার উপলব্ধিজাত উচ্চারণ তাই:

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে, আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৫৬)

চিত্রাঙ্গদার এ উচ্চারণ তাকে জীবন্ত মানবীকে রূপান্তরিত করেছে। আবার, দীর্ঘকায় বনস্পতিপ্রতিম অর্জুনের সঙ্গে প্রথম মিলনে তার উপলব্ধি:

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। ...
চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪১)

এখানে চিত্রাঙ্গদার প্রণয়ে সমর্পিত রূপের চিহ্নায়ন ঘটেছে। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মিলন দৃশ্যের কল্পনায় 'শ্লথ বসন', 'চন্দ্র' ও 'অন্ধকার' প্রভৃতি অনুষঙ্গ ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ধকার পটভূমিতে সৃজন-সাধনার দৃশ্যকল্পে প্রেমের সৌন্দর্য, রহস্য, অনিশ্চয়তা ও সংলগ্নতা চিহ্নায়িত হয়েছে এখানে। নাট্য-আখ্যানের অন্তিমে এ চিহ্ন আরও সুস্পষ্টতা পায় চিত্রাঙ্গদার উচ্চারণে : 'গর্ভে আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৫৭) 'বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।' (প্রমথ, ২০০১ : ২০৬) আবার বর্ষার অনুষঙ্গে উভয়ের সংলগ্নতার চিহ্নায়ন ঘটেছে এভাবে:

আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৩৪৮)

মন্মথের এ সংলাপে নব বর্ষার চিহ্নে চিত্রাঙ্গদার তৃষিত হৃদয়ের নব জাগ্রত প্রেমবোধ সুচিহ্নায়িত হয়েছে। 'মৃগয়া'-র প্রচ্ছন্নে হরিণ-হরিণীর এবং নবীন বর্ষার প্রচ্ছন্নে প্রণয়ের অনুকূল প্রতিবেশ দ্যোতিত হয়েছে। মানবীয় আবেগ ও সংরাগ প্রকৃতির অনুকূল পরিস্থিতিতে চিহ্নায়িত হয়েছে এতে।

মালিনী

প্রথম দৃশ্যে মালিনীর নবজাগ্রত ধর্মবোধের চিহ্নায়নের দৃষ্টান্তস্বরূপ:

মহাক্ষণ আসিয়াছে। অন্তর চঞ্চল

যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে
কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্যমুরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো; বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার– কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩১)

'মহাক্ষণ', 'অন্তর চঞ্চল', 'বারিবিন্দুসম', 'টলমল', 'পদ্মদল', 'নেত্র মুদি', 'আকাশের কোলাহল', 'আয়োজন আমারে ঘিরিয়া', 'অদৃশ্যমুরতি', 'বিদ্যুতের মতো', 'চমকিছে আলো', 'বায়ুর তরঙ্গ', 'করিছে আঘাত', 'ব্যথাসম', 'অন্তরেতে মম', 'ডাকিছে আমারে' এ নবধর্মবোধের উদ্বোধনের দ্যোতক। লক্ষণীয় যে, দ্যোতকগুলোর মধ্যে সৃষ্টি ও সম্ভাবনা ভাব-চিহ্ন সন্নিবেশিত রয়েছে। পদ্মদলে জলবিন্দুর টলমল চঞ্চলতার ইঙ্গিত দেয়। চল-চঞ্চলতা প্রাণশক্তির প্রতীক চিহ্ন। কিংবা আকাশের কোলাহল বিশ্বপ্রকৃতি আলোড়িত হওয়ার, বিদ্যুতের ন্যায় আলোর ঝলকানি আধারের বুকে আলোর সঞ্চারের প্রতীক চিহ্ন। স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মিশেলে নবলব্ধ ধর্মরূপের উন্মোচন ঘটেছে এখানে। এ নাট্য-আখ্যানের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো: 'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিনে তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩১) উদ্ধৃতিতে মালিনীর ভাবকল্পে রবীন্দ্রনাথের এ ভাবনাই চিহ্নায়ন বলা যায়। নাট্য-আখ্যানের শুরুতে নবলব্ধ ধর্মবোধ পূর্ণরূপে মালিনীর নিকট স্পষ্ট হয়নি বলে চিহ্নসমূহে চঞ্চলতা, সংশয়, হয়ে ওঠার ব্যথা ও আনন্দ সংমিশ্রিত হয়েছে। 'মালিনীর অন্তরে এই নবজাগ্রত ধর্মবোধ এখনো স্পষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। আলো-অন্ধকার, ক্ষণিক আবেগোচ্ছ্বাস, আবার পথ হারানোর ভয়– এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব মালিনীর মধ্যে আবর্তিত হয়েছে নাটকের সূচনায়।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৪১) নবধর্মের পূর্ণরূপের প্রকাশে মালিনী হয়ে ওঠে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। মহিষীর সংলাপে:

এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা।

ওগো তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা। ...

এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা,

এসেছে তোমার ঘরে। করিয়ো না হেলা (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩৪)

এখানে মালিনী দেবপ্রতিম, অন্তর্যামীতুল্য চিহ্নায়নের মর্যাদা লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সীমাবদ্ধ ধারণার বিপরীতে মালিনী প্রদীপ্ত শিখারূপে চিহ্নায়িত হয়েছে। অগ্নি একইসঙ্গে দহন ও আলোকায়নের শক্তিতে প্রোজ্জ্বল। এখানে এ দ্বিবিধ অর্থেই অগ্নিশিখা চিহ্নকে পাঠ করা যায়। তাই মালিনীর মনে হয়:

আজি মোর মনে হয়

অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়–

যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,

যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা,

যত দুঃখ যেথা সকলের 'পরে

অনন্তপ্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে

মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪১)

মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষী মনোভাব, বসুন্ধরার দুঃখ-জরা, কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সে ভাবনাকেই নির্মেঘ নীলাকাশের পটে চাঁদের আলোক বিকিরণের সঙ্গে একই রেখায় সমীকৃত করেন। মালিনীর নবধর্ম প্রকাশের সমস্ত বাধা দূরীভূত হওয়ার চিত্র আভাসিত হয়েছে এখানে। 'মালিনীর মনে হয়েছে তার হৃদয় অমৃতের পাত্র। জগতের সমস্ত দুঃখ দূর করতে পারে সে। নবধর্ম প্রকাশের সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে গেছে। এই জন্যই আকাশে সমস্ত মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রের প্রকাশ ঘটেছে।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৫১) আবার সুপ্রিয়ের সংলাপে:

তার পরে জান তুমি কী ঘটিল মোর।

লভিলাম যেন আমি নবজন্মভূমি

যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি

সুধাবৃষ্টি। ... হৃদয়-অমৃতে

স্তন্যদান করিয়াছ সে দেবশিশুরে,

লয়েছে সে নবজন্ম মানবের পুরে

তোমারে মা ব'লে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৫১)

এখানে নবধর্মের কল্যাণীরূপের চিহ্নায়ন সাধিত হয়েছে। 'নবজন্ম', 'নবজন্মভূমি', 'সুধাবৃষ্টি', 'হৃদয়-অমৃত' প্রভৃতি এ নাট্য-আখ্যানের উপজীব্য ধর্মভাবনার সংকেতিত চিহ্ন। মালিনীও তাই বলে:

> আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ! (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৪৭)

এ নাট্য-আখ্যানে বিভিন্ন স্থানে প্রাণের চিহ্নে মালিনীর নবধর্ম চিহ্নায়িত হয়েছে। শাস্ত্রীয় দেববিশ্বাসে অন্তরের যোগ তথা প্রাণের অন্বেষণ করা বৃথা; তাতে প্রাণের মুক্তি ঘটে না। উদ্দীপ্ত প্রাণের জ্যোর্তিময় সংপ্রোথিত রয়েছে নবধর্মে। এ ধর্মের ধারক হয়ে ব্যক্তি মালিনী বিশ্বের প্রাণস্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাসাদের প্রাচীরে, অন্তঃপুরে কিংবা দৈহিক ও পার্থিব বন্ধনে এ মালিনীকে আবদ্ধ করে রাখবার নয়। 'এখানে প্রাণ জ্যোতির্ময়। মালিনীর কাছে প্রাণ হল বিশ্ব-মহাপ্রাণস্রোতের অনুসারী। তার এই প্রাণচেতনার মধ্যে উদ্দীপ্ত চিরন্তন প্রাণপ্রতিমার গতিধারাও সম্পৃক্ত। ... ধর্ম ও প্রাণ দুই-ই মানবিক চেতনার মুক্তিতে সম্পৃক্ত।' (দেবাশিস, ২০১৪ : ২৫৫) মুক্তির বারতায় মুখরিত মালিনীকে তাই বলতে শোনা যায়:

> বোঝাতে পারিনে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
> আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,
> শাখা হতে চ্যুত পত্রসম। সর্বলোকে
> যাব আমি– রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
> বাহির-সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
> আসিয়াছে মহাক্ষণ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৩৫)

মালিনীর নবধর্মের বিশ্বপ্রসারী ভাবপ্রকল্প এখানে শাখাচ্যুত পত্র, বাহির পৃথিবী, মহাক্ষণ প্রভৃতি দ্যোতকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

রক্তকরবী

রক্তকরবী কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবচেতনা-লালিত ভাবনাবিশ্বের ভেতরপ্রদেশের অনুসন্ধানের কৌশল হিসেবে চিহ্নবিজ্ঞান গৃহীত হয়েছে এ প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতি ও বিশ্বাসের জগতের এ কাব্যনাট্যের ভাবসম্পদ ও ভাষিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে– চিহ্নবিজ্ঞানের আলোকে তারই অনুসন্ধান করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

> আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি– তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৬)

এ নাট্য-আখ্যানে রাজার বহির্জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের পাহাড় গড়া আর রুদ্ধ দ্বারে অন্ধকারের জীব হয়ে থাকা। জোরের মূর্তি ধরে সব দখল করে নেয় সে। কিন্তু নন্দিনীর তো নয়ই; সামান্যতম ঘাসের, ফুলের স্পন্দন সে কেড়ে নিজের করতে পারে না। স্বরচিত শাসনজালে রাজা নিজেই আটকে যায়; জীবনের তৃষ্ণায় কাতর হয় সে। বদ্ধতার নির্মোক ছেড়ে প্রাণের সাড়ায় তার ব্যাকুলতা জাগে। 'প্রকাণ্ড মরুভূমি' প্যারাডাইমে রবীন্দ্রনাথ রাজার জীবনের প্রতি আকুতি চিহ্নায়িত হয়েছে। 'একটি ছোট্ট ঘাসের' মধ্যে মরুর বিপরীত প্যারাডাইম প্রাণাবেগের অভিদ্যোতনা সঞ্চার করেন। কাব্যনাট্যের আধারে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আশ্রয়ে ভাবনাবিশ্বকে পরিস্ফুট করে চলেন অবলীলায়। কেননা: 'প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার– তাই তিনি প্রকৃতি রূপমুগ্ধপ্রেমিক। ... প্রকৃতির দুই রূপ– রুদ্র আর শান্ত। বিশ্বপ্রকৃতির ঐ দুই রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে।' (চারুচন্দ্র, ১৩৬৭ : ৩৩–৩৪) রঞ্জনের চেতনার পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেন নদী উপমা-চিহ্ন:

> আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৩)

বিনাশ ও সৃষ্টির শক্তির দ্যোতক নদী মধ্য দিয়ে রঞ্জনের অন্তর্নিহিত শক্তির চিহ্নায়ন সাধিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির নিগড় থেকে মুক্ত হতে নদীর গতিধর্ম ও ক্রিয়াশীলতার অনিবার্যতা তৈরি হয়। এর সঙ্গে হৃদয়াবেগের যোগ ঘটলেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য অর্জিত হয় যেন। তিনি উপনিবেশিত সমাজে বাস করেও উপনিবেশের সমাজকাঠামো নতুন করে নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। কারণ 'বিশ শতকে অত্যাসন্ন মহা-অন্ধকারের পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করলেও তাঁর শিল্পবিশ্বাস কখনো বিমানবিক হয়ে ওঠেনি।' (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০০৮ : ৫৯) তাই তিনি মানবিক বোধের জাগরণের স্বপ্ন দেখেন। এ আখ্যানে সে-স্বপ্নের অন্যতম সারথি এ নাট্য-আখ্যানের সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক কিশোর। নন্দিনীর সঙ্গে তার কথোপকথন লক্ষণীয়:

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই। ...ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো।...এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭১)

যক্ষপুরী খনিশহরের শ্রমিকেরা উৎপাদন ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ভীষণ অন্ধকারে, অ-মানবিক শ্রম দিয়ে খনি খুঁড়ে খুঁড়ে তারা নাম পর্যন্ত হারিয়ে সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। যক্ষপুরীর প্রতিষ্ঠিত নিয়মে বিপরীতে খনিশ্রমিকদের সৃজনশীল জীবনের চিহ্নায়নে রবীন্দ্রনাথের কিশোর চরিত্রের আবির্ভাব। শ্রমঘণ্টা থেকে সময় চুরি করে নন্দিনীর জন্য ফুল নিয়ে আসা তার সৃজনশীলতা; 'ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো' এর মধ্য দিয়ে নন্দিনীর প্রতি তার অনুরাগ; এবং 'না, আমি সামলে চলব না, চলব না'-এ উচ্চারণে প্রতিষ্ঠিত ও সকল খনিশ্রমিকের মেনে নেয়া কঠোর কঠিন নিয়ম ভাঙার আয়োজন চিহ্নায়িত হয়েছে। 'না, আমি সামলে চলব না, চলব না'– পুরো আখ্যানজুড়ে এ নাট্যমুহূর্ত যেন অনুরণন তোলে। এতে জীবনের প্রতি ভাবালুলতা নেই; যা আছে তা হলো কৈশোরক পর্যায়ে প্রতিকূলতাকে পরোয়া না করার উদ্যম ও সাহস। কারণ সে কিশোর। নামেই তার স্বভাবধর্ম চিহ্নায়িত হয়ে যায়। এ নাট্য-আখ্যানের চরিত্রের ভাষা চিহ্নায়ন-সূত্রে বলা যায় চরিত্রের তথা: 'মানুষের অনুভূতি এতটাই ব্যক্তিক যে তার জন্য আলাদা ব্যক্তিক ভাষা দরকার।' (অভী, ২০১১ : ০৭) চরিত্রের স্থান-কাল ও দর্শনভাবনায় আলোয় এর আখ্যানের চরিত্রের ভাষা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ভাষার বৈচিত্র্যময় সজ্জায় রবীন্দ্রনাথের চেতনা ক্রম-বিকশিত হয়ে পরিণতি দিকে যাত্রা করেছে।

বিশু। আমি ৬৯৬। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক্। বুকের উপর দিয়ে জুয়াখেলা হচ্ছে।...

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল বলে গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি–

বিশু। স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ–

বিশু। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮০–৮১)

খনিশ্রমিকেরা বারো ঘণ্টা শ্রম দেয়ার পর আরও চার ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করানো হয়। খোদাইকর ও কারিকরেরা অ-মানবে রূপান্তরিত হয় এমন অমানুষিক পরিশ্রমে। রাজা ও তার সর্দারদের শোষণের অপকৌশল, মানুষকে সংখ্যার ছকে অবমূল্যায়ন, মকরের শিকারের বীভৎস ও ভয়াল স্বরূপের চিহ্নায়নের দীর্ঘশ্বাস রবীন্দ্রনাথ আড়াল করেন বাংলার প্রাণের উৎসব নবান্নের দ্যোতকে। এ নাট্য-আখ্যানের গানের আড়ালেও রবীন্দ্রনাথের এ বোধ সক্রিয় ছিল। নন্দিনীর গান:

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে–
মরি, হায় হায় হায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৫)

বিশুর গান:

আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৯০)

গানের সুর, ছন্দ ও দোলায় যেন সব অশুভ, অসত্য, আড়াল দূর হয়ে উৎসবের, প্রাণের সঞ্চারিত হবে প্রাণহীন এ যক্ষপুরে। এ নাট্য-আখ্যানের অশুভ-অসত্যের বিপরীতে *রক্তকরবী* নামের ব্যঞ্জনাও এ চেতনারই স্মারক। যক্ষপুরীর বিপরীতে ফসলের ক্ষেতের, চাঁদের আলোর কিংবা রক্তকরবী ফুলের উপস্থাপনা বস্তুত রুদ্ধ পরিবেশে প্রাণের প্রবহমানতার চিহ্ন। তবে: 'দ্রুতবর্ধমান জটিল নগরমন্যতার পাশাপাশি এই শ্যামল উপস্থাপনার একটা মানে আছে হয়তো। এমন নয় যে এর মধ্যে আছে 'গ্রামে ফিরে যাও' ধরণের কোনো সরল পরামর্শ। আধুনিক সমস্যাবলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যে, যদিও তাকে নাম দিয়েছিলেন তিনি চিরন্তন সমস্যা–এবং তার কোনো কোনো জীবনঘনিষ্ঠ উত্তরও ছিল তাঁর ভাবনায়। কিন্তু সে-উত্তরকে তিনি জড়িয়ে নিয়েছিলেন গ্রামীণ মণ্ডনে। এর মধ্য দিয়ে তিনি চাইছিলেন বাংলাদেশের চিরায়ত যোগসূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে, পটভূমিকায় সজীব করে তুলতে চাইছিলেন

আমাদের বিলীয়মান অস্তিত্বের টান।' (শঙ্খ, ২০০৯ : ১৭) ফলে এ সকল চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্ত শিল্পীসত্তা স্বস্তি পায়। কেননা একথা সবারই জানা 'যে শাসন-ব্যবস্থায় রাজা-প্রজার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, তাকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও সুস্থ ব্যবস্থা বলে স্বীকার করতে পারেননি। যে ব্যবস্থায় প্রজার মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন করে রাখা হয়, সে ব্যবস্থাকে ভালো ব্যবস্থা মুক্ত অবস্থা বলে গ্রহণ করা চলে না। (সাধনকুমার, ২০০৬ : ১৯১) এমন শাসনকাঠামোয় শাসক-শোষিত উভয়েই শেষপর্যন্ত মুক্তির স্বাদ পায় না। এ সত্যই এ নাট্য-আখ্যানে ধারণ করেন কাব্যনাট্যকার। 'এই নাটকটি সত্যমূলক। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৬৯)

এ কাব্যনাট্য-আখ্যানের নামকরণে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন অন্তর্নিহিত রয়েছে। 'রক্তকরবী'র অর্থ শব্দের নির্দিষ্ট রূপে আভিধানিক অর্থবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নেই-তাকে অতিক্রম করে অরূপের দিকে চলেছে এর যাত্রা। 'রক্তকরবী'র অর্থ ভাবার্থে নিয়ে যাওয়ার ফলে দেখা যায় নন্দিনী আর রক্তকরবী সেখানে একার্থ বয়ে নিয়ে গেছে।' (অশোককুমার, ২০১১ : ৩৬১–৩৬২) রক্তকরবী-চিহ্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে: 'রক্তকরবী ফুলের প্রসঙ্গ এ নাটকে সকলের মুখেই ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়েছে। রক্তকরবী বিপ্লবাত্মক ভাবাদর্শের অনুগামী। নতুন সমাজ গঠনের আহ্বানের প্রতীক। অর্থাৎ এ ফুলের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপুরীর মানুষের অন্তরচেতনার কথা অভিব্যক্ত করেছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় যক্ষপুরীর মানুষদের উজ্জীবিত করে তোলে রক্তকরবী প্রতীকটি।' (সাইফুল, ২০০৩ : ৩৬০) ভাবের গভীর ব্যঞ্জনায় শব্দার্থের সীমায়িত গণ্ডি পেরিয়ে রক্তকরবী রবীন্দ্র-চিত্তের অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতীকী চিহ্ন হয়ে ওঠে। রক্তকরবী প্রতীক-চিহ্ন ছাড়াও এ নাট্য-আখ্যানে বাজপাখি, ব্যাঙ, পায়রা প্রতীক-চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সহায়কপঞ্জি

অনুপম হাসান — ২০১০, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অনীক মাহমুদ — ২০১২, 'মানবতাবাদ: রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইন ও রোমাঁ রোলাঁ এবং একাল' *সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ* শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অভী চৌধুরী — ২০১১, *নিহিতার্থের খোঁজে*, মনফকিরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

অমলেন্দু বসু — ১৯৭১, *সাহিত্যলোক*, জেনারেল প্রিন্টার্স প্রা. লি. কলকাতা

অশোককুমার মিশ্র — ২০১১, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপ: অরূপ* প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আনিসুজ্জামান — ২০১৬, *তাঁর সৃষ্টির পথ*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা

আবু সয়ীদ আইয়ুব — ২০২১, *পথের শেষ কোথায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উত্তম দাশ — ২০০৮, 'বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক' / অনুপম হাসান, *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব* (সম্পাদিত), মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ১৪১৫, *রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ১৩৬৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা

কনক বন্দ্যোপধ্যায় — ১৯৫০, *রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা*, এ. মুখর্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা

কণিকা সাহা — ১৯৯৪, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

কমলেশ রায় ২০১৫, *রবীন্দ্রনাট্যে যাত্রার প্রভাব*, ভাষাচিত্র, ঢাকা

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী ২০১১, ''কাব্যনাটক ও বুদ্ধদেব বসু'/, *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ* বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

কৃষ্ণা ঘোষ 2019, 'রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ও প্রতিবাদ', THE IMPRESSION A Journal on multidisciplinary studies, Annual Issue (ISSN-2278-2699)

খোন্দকার আশরাফ হোসেন ২০১৩, *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

চঞ্চল কুমার বোস ২০১১, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে রাজা : আর্থ-সামাজিক অবলোকন', *প্রভাতসূর্য*, ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পাদিত), নবযুগ, ঢাকা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭, *রবি-রশ্মি পূর্বভাগে*, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও পুনর্বিবৃত), এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা

চিরঞ্জীব শূর ২০১৬, 'উত্তরঔপনিবেশিক সাহিত্য সমালোচনাঃ গোড়ার কিছু কথা', *প্রতীচ্যের সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব*, (সংকলিত), আলোচনা চক্র, কলকাতা

চিন্মোহন সেহানবীশ ২০১৭, *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা*, প্যাপিরাস, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় ২০০৩, *বাংলা কাব্যনাট্যঃ রূপ ও রীতি*, প্রতিভাস, কলকাতা

২০০৭, *কাব্যনাট্য-বিভাবনা*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা

দেবাশিস ভট্টাচার্য ২০১৪, *রবীন্দ্রকাব্যনাট্যে বাক্‌প্রতিমা*, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫, *কাব্যের মুক্তি ও তার পর*, প্রতিভাস, কলকাতা

প্রমথ চৌধুরী ২০০১, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, সুচয়নী পাবলিশার্স, সুচয়নী প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

প্রমথনাথ বিশী ১৩৬১, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপ্যাধায় ২০১৭, 'প্রসঙ্গঃ উত্তরঔপনিবেশিকতা', *উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য*, চিরঞ্জীব শুর (সংকলক), আলোচনা চক্র, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪২০, *রবীন্দ্রজীবনকথা*, আনন্দ, দ্বাদশ মুদ্রণ, কলকাতা

১৯০৭, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা

ফাহমিদা সুলতানা তানজী ২০২৪ 'থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে গুরুত্ব', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বসুধা চক্রবর্তী ১৩৬৭, *মানবতাবাদ*, প্রথম প্রকাশ, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা

বেগম আকতার কামাল ২০১৪, *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, অবসর, ঢাকা

২০০৭, *কবির উপন্যাস*, ঐতিহ্য, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী ২০০৪, *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

১৪১২, *দু-চারিটি অশ্রুজল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান ২০১২ 'উপনিবেশবাদ উত্তর-উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' *সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ*, শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মার্টিন কেম্পশন ২০১৮, *অনুভবে অনুধ্যানে রবীন্দ্রনাথ* মার্টিন কেম্পশেন, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), কারিগর, কলকাতা

মুনিরা সুলতানা ২০২৩, *দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

মোমেনুর রসুল ২০২২, *সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ব্যক্তি-সমাজ- রাজনীতি ও শিল্প-ভাবনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৮, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

১৪২৫, *কালান্তর*, বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা

১৪০৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

১৪০৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ* দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

১৩৫৪, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, নতুন সংস্করণ, কলকাতা

১৯০৮, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ ২০০৯, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, দে'জ পাবলিশিং,ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা

১৪২১, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, প্যাপিরাস, কলকাতা

শান্তনু কায়সার ১৯৮৫, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শাশ্বত ভট্টাচার্য ২০১০, *রবীন্দ্রনাট্যধারার প্রথম পর্যায়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শুভাশিস সিনহা ১৪১৯,'নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ', খেয়া পত্রিকা পুলক হাসান সম্পাদিত, ৫৩তম সংখ্যা, রবীন্দ্র সংকলন, শ্রাবণ

সরোজ বন্দ্যোপধ্যায় ১৯৮৪, *আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র-চিত্রকল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সাইফুল ইসলাম ২০০৩, *রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সাদ কামালী ২০১৮, 'রবীন্দ্রনাথের গীত-কাব্যনাটক পুরাণ উপলব্ধি ও পৌরাণিক আখ্যানের নবরূপায়ণ' অগ্রবীজ সাহিত্য ও চিন্তার কাগজ, সম্পাদক চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ, এগারো বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ২০০৬, *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা*, দেজ পাবলিশিং কলকাতা

সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪১৬, *পৌরাণিক অভিধান* (সংকলিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০১১, 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনের সত্য', *প্রভাতসূর্য* ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পাদিত) নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন ২০১৭, *রবীন্দ্রচেতনায় নারী*, কথাপ্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন ২০১৪, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ, প্রথম ধ্রুবপদ প্রকাশ, ধ্রুবপদ ঢাকা

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ২০০৮, *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকচিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হরপ্রসাদ মিত্র ১৩৭০, *রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ* প্রথম খণ্ড, ডি, এম. লাইব্রেরি, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা

হোসনে আরা ২০১৮, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির ২০১৭, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* হায়াৎ মামুদ (অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা) প্রথম বিপিএল প্রকাশ, ঢাকা

C. Day Lewis 1961, *The poetic Image*, Jonathan Cape Thirty Bedford square, Tenth impression, London

P. Gurrey 1968, *The Appreciation of Poetry*, Oxford university press, seventh print, London

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব বসু: ভাবাদর্শে মিথ ও মিথায়ন

৪.২

আধুনিক সৃজনশীল প্রতিভা অন্তর্দেশে বিবিধ অভিজ্ঞতা ও স্বকালের অভিজ্ঞানের সঙ্গে মিথলোকের সংশ্লেষণ ঘটিয়ে সাহিত্যে এক অভিনব ভুবনের সৃষ্টি করেন। মূলত 'ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও পুরাণ-অভিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ায় সাহিত্য পায় শাশ্বত কালমাত্রা।' (মাহবুব, ২০১২ : ৭১) বুদ্ধদেব বসুর শিল্পযাত্রার অন্যতম অভিলক্ষ্য মিথের ভুবনে অবগাহন। স্বকালের জীবনচেতনা ও বাস্তবতায় বোধের অন্তর্গূঢ়তাকে রূপান্বিত করবার উপযুক্ত আধার অনুসন্ধানে অতৃপ্ত হয়ে বুদ্ধদেব মিথের জগতে অনুপ্রবেশ করেন। 'বুদ্ধদেব সেই চিরন্তন এবং সর্বত্রগামী বিশ্বপুরাণের পথেই হেঁটেছেন এবং সেই পথচলার অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতা, নাটক এবং গবেষণার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪৯) নতুনভাবে ও রূপে আধুনিক জীবন ও জগৎকে অবলোকন, অনুধ্যান ও ব্যাখ্যানের জন্য নতুন প্রকরণ অনুসন্ধানী হলেন তিনি। কেননা '... আধুনিক বিষয়বস্তু ও আধুনিক প্রকরণ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতোই সম্পৃক্ত।' (দীপ্তি, ২০০৭ : ১০৮) বুদ্ধদেবের নান্দনিক অভীপ্সায় মিথ তাই গভীরার্থবাহী। 'শুধু মিথের উৎস সন্ধান বা আলংকারিক প্রয়োগই তাঁর লক্ষ্য হয় না। তিনি চেতন-অবচেতনে মিথগ্রস্ত থাকেন নানা স্তরে–নিজ মানস গঠনের পর্যায়ে, কবিতা লেখার রহস্যময়তায় এবং ভাবাদর্শ তৈরির সূত্রেও।' (বেগম আকতার, ২০১৩ : ১০৩) বুদ্ধদেব কাবনাট্যের ভাবাদর্শ ও এর অন্তর্বয়নে মিথের ভূমিকা অসামান্য। 'ত্রিশোত্তর কাব্যধারায় অন্যতম প্রধান কবিব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু পুরাণনির্ভর কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন।' (মাহবুব, ২০১২ : ১১১)

৪.২.১ কাব্যনাট্য পরিচিতি: বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব

বাংলা কাব্যনাট্যসাহিত্যের অন্যতম কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার যথাক্রমে বিক্রমপুরের মালখানগর ও বহর গ্রামে। বুদ্ধদেবের জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাতা বিনয়কুমারী মৃত্যুবরণ করেন। মাতা সম্পর্কে তিনি জানান: '' 'বিনয়কুমারী' নামটি আমি কারো মুখে উচ্চারিত হতে শুনিনি, *মুকুল* পত্রিকার একটি পুরনো খণ্ডে কাঁচা হস্তাক্ষরে লেখা দেখেছিলাম– কেমন করে সেটিকে আমার মায়ের নাম বলে শনাক্ত করেছিলাম তা আমার

মনে নেই।... তাঁর মৃত্যুই আমার নামকরণের কারণ।'' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৩) তাঁর পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন স্ত্রী বিয়োগের বছর শেষ না হতেই। পিতা-মাতার স্নেহ-সান্নিধ্য বঞ্চিত বুদ্ধদেব অপত্যস্নেহে বেড়ে ওঠেন দাদামশায় চিন্তাহরণ সিংহ এবং মাতামহী স্বর্ণলতা ঘোষের নিকট। স্মৃতিকথায় তিনি লেখেন: 'আমি আমার দাদামশাইকে ডাকতাম 'দা', দিদিমাকে 'মা' বলতাম। শুধু যে মুখে বলতাম তা নয়, তাঁকে মা ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবিনি কখনো, ভাবতে পারিনি। অথচ আমি খুব অল্প বয়সেই জেনেছিলাম আমার 'আসল' মা মরে গিয়েছেন, আমার বাবার সঙ্গেও আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে। (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৭) দাদামশায়ের শিক্ষানুরাগী মন ও পঠন-পাঠনের অভ্যাস বুদ্ধদেবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। চিন্তাহরণ সিংহ প্রথমে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ বিভাগের দারোগা পদে চাকুরি করেন তিনি। চাকুরির কর্মঘণ্টার বাদে তাঁর সময় কাটতো শিশু বুদ্ধদেবকে নিয়ে। স্মৃতিকথায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন:

> চিন্তাহরণ ও স্বর্ণলতা– এঁরাই আমার বাল্যজীবনকে পরিবৃত ক'রে রেখেছিলেন। বিশেষত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে আমি এমন এক ধরনের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, যার বুনোনটা খুব ঘন, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই– পিতাপুত্রের সম্বন্ধের চেয়ে অনেকটাই বড়ো তার আয়তন। কেননা তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু, ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী। চাকরির সময়টুকু বাদ দিয়ে তিনি আমাকেই তাঁর জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ১২)

ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের প্রতি বুদ্ধদেবের আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাঁর সূত্রেই। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতিতে নয়, তিনি বুদ্ধদেবকে শেখাতেন দৈনন্দিন কাজের মাঝে, কখনোবা খেলাচ্ছলে আনন্দ সহযোগে। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণ-সূত্রে জানা যায়: 'রবিবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে আমার খেলা জমে শব্দরচনা ও শব্দহরণের চৌকো এবিসিডি-গুলো নিয়ে– সেটাও ইংরেজি চর্চারই একটি উপায়; তিনি ইচ্ছে ক'রে আমার কাছে হেরে গেলেন বুঝেও আমি খুশি না হ'য়ে পারি না।...আমার ইংরেজির জন্য দাদামশাই যে এত বেশ যত্ন নিয়েছিলেন, তার কারণ কি তাঁর কলোনিয়াল মনোভাব? হয়তো তা-ই– বাড়িতে দিল্লি-দরবারের মস্ত রঙিন ছবিও দেখেছি, রৌপ্যমুদ্রার উপরে অঙ্কিত মহারানীর মূর্তিটিকে মহিলারা বলতেন 'সাক্ষাৎ ভগবতী'। ... ইংরেজি ছিলো আমাদের কাছে বইয়ের ও স্কুল-কলেজের ভাষা–জীবনের ভাষা বাংলা। আমার বাংলার জন্য চিন্তাহরণকে কোনো শ্রম করতে হয়নি, আমার শিক্ষক ছিলেন শুধু লেখকরা–যোগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাদুকরগণ। দাদামশায় আমাকে সংস্কৃতটাও ধরিয়ে দিয়েছিলেন।' (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ১৩–১৪) স্বর্ণলতা বুদ্ধদেবকে শোনাতেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮–১৯৯৪) উপন্যাসের কাহিনি, বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত গল্প-কাহিনি। চিন্তাহরণের বৃদ্ধা

ও বিধবা আত্মীয় বামাসুন্দরীর কাছ থেকে বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথার রস। শৈশবের এসব অভিজ্ঞতার সূত্রে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃতি ভাষার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মূলত:

> একজন সম্পন্ন-শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠা মফস্বলি প্রতিকূলতায় বিঘ্নিত হয়নি। কারণ, প্রধানত ঘরে, গৌণত ঘরের বাইরে, বহু অনুকূল উপাদান ছিল। তাঁর মাতামহী ভালো বাংলা শিখেছিলেন ঘরে। ... আর দাদামশাই পরম যত্নে শিখিয়েছিলেন ইংরেজি। সেই শেখানোরও সৌন্দর্য ছিল। ব্যাকরণের ক্লান্তিকর পথ ঘুরে নয়, প্রাত্যহিক চর্চার মধ্য দিয়ে। (মোহাম্মদ আজম, ২০১১ : ৩৩৬)

১৯২৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন ভূগোল ক্লাসের স্মৃতিচারণ করে বুদ্ধদেব জানান: 'ভূগোলের বইয়ের তিনবার-দাগানো দুটি প্রশ্ন হ'লো: '' 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না' আর 'বৃটিশ মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি ভারতবর্ষ';–এই সূত্র দুটোকে, বছরের পর বছর, যারা ভারতবর্ষেরই নিরীহ বালকবালিকাদের গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলো, তাদের গভীরবুদ্ধির তারিফ না– ক'রে উপায় নেই।" (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ৮৮) এ থেকে অনুমেয় যে, অল্প বয়স থেকেই ব্রিটিশ শাসনের অপকৌশল সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ১৯২৫ সালে ঢাকা বোর্ডে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। *আমার যৌবন*-এ তিনি জানিয়েছেন:

> ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা আমি দিয়েছিলাম খুব আঁটঘাট বেঁধে, প্রয়োজনের চেয়েও অধিকমাত্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ৭৭)

ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে ১৯২৭ সালের ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ; ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ; ১৯৩১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর ভাবনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভিতরে-বাইরে জমকালো এক ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ৭৯) এখান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় অতিক্রমের পর তিনি কলকাতায় পাড়ি জমান।

> বাংলা সাহিত্যে যে ধরনের প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় বুদ্ধদেব বসু যৌবনে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি জমান, প্রত্যাশিত সে প্রতিষ্ঠা ও পর্যাপ্ত খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন। ... সাহিত্য চর্চাই ছিল তাঁর জীবনের মূল– বস্তুত একমাত্র ব্রত। (সৈয়দ আবুল, ২০১১ : ১৯১)

সাহিত্যিক অভীপ্সা থেকেই বুদ্ধদেব বসু নিবিড়িভাবে পাঠ করেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাহিত্য: *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়ড*, *ওডেসি*, *ইনিড*, মার্ক অ্যান্টনি (খ্রিস্টপূর্ব ৮৩–খ্রিস্টপূর্ব ৩০), উইলিয়াম শেকসপিয়র (১৫৬৪–১৬১৬), টমাস গ্রে (১৭১৬–১৭৭১), উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থ (১৭৭০–১৮৫০), লর্ড বায়রন (১৭৮৮–১৮২৪), পি বি শেলী (১৭৯২–১৮২২), জন কীটস্ (১৭৯৫–১৮২১), ভিক্টর হুগো (১৮০২–১৮৮৫) চালর্স ডিকেন্স (১৮১২–১৮৭০), শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১–১৮৬৭), জুল ভার্ন (১৮২৮–১৯০৫), হেনরিক ইবসেন (১৮২৮–১৯০৬), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০–১৮৭০), গি দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০–১৮৯৩), বার্নার্ড শ' (১৮৫৬–১৯৫০), অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৪–১৯০০), স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯–১৯৩০), ন্যুড হামসুন (১৮৫৯–১৯৫২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), ডি. এস. লরেন্স (১৮৮৫–১৯৩০), আন্তন চেখভ (১৯৬০–১৯০৪)। অর্থাৎ, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সাহিত্যের রসাস্বাদন করেন সম-তাৎপর্যে, যা তাঁর সাহিত্যমানস গঠনে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তী জীবনে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন এই প্রবল পাণ্ডিত্যের জোরে। মূলত 'অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রতিভার আন্তর-টানে এবং প্রাতিস্বিক জীবনচেতনার অন্তর-প্রাণনায় দেশি-বিদেশি সাহিত্যভাণ্ডার থেকে পরিগ্রহণ–স্বীকরণের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু ক্রমে উপনীত হন তাঁর নিজস্ব শিল্পভুবনে।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৯৪) বুদ্ধদেবের জীবনীকার যথার্থই বলেন:

> জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তা এই সময় থেকেই তৈরি হচ্ছে: সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। শেষ দিন পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অপরিবর্তিত ছিল–বলা যায় এটাই তাঁর 'বুদ্ধদেব-বসুত্ব' ... (সমীর, ১৯৯৮ : ২৯)

তিনি ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন ঢাকাবাসের শুরু থেকে। 'ছোট পরিসরে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ তখন ঢাকাতে তৈরি হয়েছিল। কলকাতারই যেন একটি ছোট সংস্করণ।' (সৈয়দ আবুল, ২০১১ : ৫৫) বুদ্ধদেব বসু যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি 'পতাকা পত্রিকা'র লিপিকর ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'তোষণী' পত্রিকায়। সাহিত্যচর্চার সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা ও কলকাতা জীবনে 'ক্ষণিকা', 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'ত্রৈমাসিক কবিতা', 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর বেড়ে ওঠার কালানুক্রমিক চিত্রের পটভূমিকায় রয়েছে: কুমিল্লা, নোয়াখালি, ঢাকা ও কলকাতা। মফস্বলি-জীবনেও তিনি ছিলেন সাহিত্যপিপাসু। কেননা:

থেকেও কীভাবে না থাকো যায়, কিংবা এক জায়গায় থেকে আসলে অন্য জায়গায় থাকা যায়, তার আমোদজনক সব নজির আছে বুদ্ধদেবের মফস্বল জীবনে। জনজীবন নয়, পাড়া-গাঁ নয়, চাষবাষ নয়, বসুকে সমগ্র সত্তাসমেত আটকে রেখেছিল পোস্টাফিস। একদিকে পত্রপত্রিকা আর বই আসছে, অন্যদিকে লেখা যাচ্ছে। দুটোই কলকাতায়। তাই নোয়াখালীতে থাকলেও বসু আসলে ছিলেন না সেখানে; যেখানে ছিলেন সেখানে তখনো যাওয়া হয়ে উঠেনি। (মোহাম্মদ আজম, ২০১১ : ৩৩৮)

নোয়াখালি বাসকালে দৈশিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সংঘঠিত নানা আন্দোলন, রাজনৈতিক পালাবদল সম্পর্কে ধারণা রাখতেন তিনি:

নন্ কো-অপারেশন। অসহযোগ। সত্যাগ্রহ। এই নোয়াখালি শহর–দৈবাৎ যেখানে ছিটকে পড়েছি আমি, আর সে-সময়ে আমার যেটাকে মনে হচ্ছিলো দরিদ্র এবং মলিন এবং দম-আটকানো-সেখানেও তরঙ্গ এসে পৌঁছলো। মেঘনার শরের চেয়েও উত্তাল, বারো-শো ছিয়াত্তরের বন্যার চেয়েও কূল-ভাসানো। প্রায় অজ্ঞান বয়স থেকেই আমি চা-খোর, ... সেই চা, যার নতুন নাম হয়েছে 'কুলির রক্ত', আমি এক দমকে ছেড়ে দিয়েছি। ঘামছি সারা দুপুর চটের মতো মোটা খদ্দরে... (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ৭৩)

একইভাবে কলকাতাবাসকালেও যুগসংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব: 'যুদ্ধের সময়ে কলকাতায় আমাদের জীবন খুব তীব্র হয়ে উঠেছিলো। রাজনীতিজনিত সংঘাত ও বিভেদের বাইরে, মানবিক স্তরে, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলাম।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৮৯)

আশৈশব-আমৃত্যু তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ সারথী। 'নোয়াখালিতে থাকতে বালক বুদ্ধদেব ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ–সঙ্গী বলতে দাদামশাই শুধু, আর ছিল বই।' (সমীর, ১৯৯৮ : ৩৩) তাছাড়া তাঁর বেড়ে-ওঠা জীবন-প্রতিবেশজাত অস্থিরতা তাঁর চৈতন্যে নৈঃসঙ্গ্যের বীজ বুনে দিয়েছে। 'যে-সময়টা ধরে একটি শিশু ক্রমে বেড়ে ওঠে, পূর্ণমনস্ক একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়, বুদ্ধদেব বসুর জীবনের সেই সময়টা ভরে সমস্ত দেশ ছিল রাজনৈতিক অশান্তিতে উগ্র, এবং সমস্ত পৃথিবী ভাবদ্রোহে ও জাতিবৈরতায় সংকুল। (সমীর, ১৯৯৮ : পঁচিশ) ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫–১৯১১), প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৭), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫), দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) দেশবিভক্তিসহ (১৯৪৭) নানা সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। সময়োত্থিত সংকটে বেদনার্ত হয়ে কবিতাচর্চা করলে তাঁকে নিন্দিত হতে হয়েছে কখনওবা। কবি বুদ্ধদেবের ভাষ্যে সে-বেদনার উৎসারণ ঘটেছে এভাবে:

> অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ ও পুনর্গঠনের প্রয়াস– ইতিহাসের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের শুনতে হয়েছে কটূক্তি। 'কবিতা লিখে কী হয়– দেশের কাজ করো!' 'গান বন্ধ হোক, এখন যুদ্ধ!' 'কবিরা যদি সমাজশোধনের যন্ত্রী না হন তাহ'লে আমরা চাই না তাঁদের।' এমনকি: 'দিগন্ত-জোড়া ধানখেতের দৃশ্য পৃথিবীর সব কবিতার চাইতে মূল্যবান'– এ-রকম একটি আশ্চর্য কথাও শোনা গিয়েছিলো একবার। 'যেন কবিতা বিনষ্ট হ'লেই অধিক শস্য উৎপন্ন হবে! যেন কবিরা কোনো জাদুবিদ্যার বলে কৃষিকর্মে ব্যাঘাত ঘটান! (বুদ্ধদেব, ২০২৩ : ০৭)

এমন বৈরি পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণেই হয়তো: 'আমিত্ব আর আত্মতার নির্মোকে বুদ্ধদেব নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন সৃজনবেলার সূচনা থেকে অন্তিম পর্ব পর্যন্ত।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৬৯) তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্বের জায়গা হলো তিনি একাকিত্বকে সৃজনীশক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে এর প্রচ্ছাপ রয়েছে:

> বুদ্ধদেব বসুর সমগ্র সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে এই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আত্মসচেতন এবং চৈতন্যপীড়িত উপলব্ধির দুর্মর প্রকাশ। তাঁর কাছে নিঃসঙ্গতার অর্থ পলায়ন নয়, তা সত্য–অবলোকন ও সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা। (হিমেল, ২০১৩ : ১৭)

শৈশবে শারীরিক অসুস্থতা, খর্বাকৃতি, তোৎলামি প্রভৃতিকে সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে বালক বুদ্ধদেবের মধ্যে আড়ালে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এ সীমাবদ্ধতা অচিরেই তিনি কাটিয়ে ওঠেন স্বকীয় সৃজনক্ষম প্রজ্ঞা দিয়ে। 'শিশু বয়স থেকেই এমন সাহিত্য-পাগল ছিলেন যে বালক, স্বভাবত অন্তর্মুখী এবং লাজুক হওয়া সত্ত্বেও এমন নাটক-পাগল যে ''নিজস্ব নাটুকে দল'' তৈরি করে দলের নেতৃত্ব দেন, নির্ভয়ে অভিনয় করেন জিবের জড়তা অনায়াসে অতিক্রম করে, তিনি যে ভবিষ্যতে সাহিত্যের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করবেন সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। ... কালে কালে বুদ্ধদেব বসু যে নাটকের ফর্ম নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং বাংলায় কাব্যনাট্যের এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা আমরা জানি। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ০৭) স্মৃতিচারণায় বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন:

> আমি হঠাৎ একজন অভিনেতা হ'য়ে উঠেছি, এমনকি গ'ড়ে তুলেছি আমার সমবয়সী বা আমার চাইতে অল্প–বড়ো কয়েকটি ছেলেকে জুটিয়ে একটি নিজস্ব নাটুকে দল; ... আশ্চর্যের বিষয়, মঞ্চে নামলে আমার তোৎলামির চিহ্নমাত্র থাকে না–আমাকে সাহায্য করে আমার উৎসাহ, শ্রোতাদের প্রীতি, আর সবচেয়ে বেশি কবিতার ছন্দ। (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ৫২)

বোঝা যায় যে, নাটক রচনার ভ্রূণটি বাল্যকাল থেকেই জাগরূক ছিল তাঁর মননে। 'তাছাড়া এক বিরল ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে তাঁর ভিতর থাকে– তিনি পদ্য মেলাতে পারেন, এবং লিখতে ভালোবাসেন। শিশুর জীবনের যত ব্যর্থতাবোধ সব এইভাবে এক অভাবিত দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ পেতে আরম্ভ করে।' (সমীর, ২০১১ : ১৬)

বুদ্ধদেব বসুর নাটক দেখার বিবিধ অভিজ্ঞতা ছিল। নোয়াখালির টাউন হলের নাট্যাভিনয়, ম্যাজিক খেলা দেখা, কাচারি ময়দানের সার্কাস, বায়োস্কোপ দেখা; ঢাকা-জীবনে আর্মানিটেলা পিকচার হাউজে চলচ্চিত্র উপভোগের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তাঁর নাট্যকার সত্তার ভিত্তি তৈরিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন জগন্নাথ হলে তাঁর রচিত দুটি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হয়। এগুলোর একটি হলো *একটি মেয়ের জন্য* (১৯২৯)। এটি 'নবশক্তি পত্রিকা'র বর্ষ-১, সংখ্যা-৪১, ২ ফাল্গুন ১৩৩৬ এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টির নাম পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে দময়ন্তী বসু সিং জানান: 'আমার ধারণা সেটিই *হিতাকাঙ্ক্ষী* নাটক যেটি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম নাকতলার বাড়িতে, অবহেলিত কাগজের স্তূপে। ... দুটি নাটকই প্রহসন, বিদ্রূপের পাত্র নীতিবাগীশ প্রবীণের।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ০৮)

কলকাতা বাসের শুরুর দিকে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন বুদ্ধদেব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'আমি অল্পবয়স থেকেই নানারকম লেখা লিখে আসছি, কলকাতাবাসের আরম্ভকালে নিজেকে নাট্যকাররূপে কল্পনা করেছিলাম।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১২১) নাট্যকার হওয়ার আন্তর্তাগিদ থেকেই কলকাতায় তিনি প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা, হারান ঠাকুরতা, প্রবোধচন্দ্র গুহমহাশয়া প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যজনের সংস্পর্শে আসেন। এ সময়কার রচনা *অনুরাধা* (১৯৩৬) নাটক যা মঞ্চের আলো দেখেনি। এছাড়া নাটকের প্রতি প্রবল অনুরাগ থেকে তিনি, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অনিল ভট্টাচার্য প্রমুখ মিলে গড়ে তোলেন 'লিটল থিয়েটার' নামে নাট্যাদল। বুদ্ধদেব ১৯৩০ সালে রচিত *রাবণ* নাটকে নির্মাণ করেন *রামায়ণ*-এর নতুন ব্যাখ্যা; এ নতুন ব্যাখ্যা সে-কালে সমর্থন করেননি অনেকে, ফলে তা মঞ্চস্থ হয়নি। স্মৃতিকথায় তিনি সে-অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন:

> ... মাসের পর মাস যদিও কেটে যায়, অন্য নতুন নাটকের উপর পর্দা ওঠে আর পর্দা পড়ে– 'রাবণে'র উদ্বোধনী রজনী আর আসে না। ঠাকুরতা-মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 'হবে-হচ্ছে' করেন ... গুজব শুনি আমার সংলাপে আপত্তি করছেন প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা, ... অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি বিভীষণের ভূমিকা নেবেন কথা ছিলো আর আমার প্রতি স্পষ্টত তিনি সহৃদয়, তিনিও একদিন বললেন, আমার ভাষা আর একটু 'রীমোট' হলে ভালো হতো–আমি বুঝে নিলাম রাবণ-সীতার মুখে সমকালীন চলতি ভাষা বসানো আমার ভুল হয়েছিলো। অগত্যা আমি পাণ্ডুলিপিটির পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলাম–তাতেও ব্যর্থ হতে হলো। ... আমার নাট্যকার-স্বপ্ন চৌচির ... (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১২৩)

নাটক রচনার সূচনাপর্বে এমন নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। বিশেষ করে উল্লিখিত 'এই ঘটনায় তরুণ নাট্যকারটি যে কতটা মর্মাহত হয়েছিলেন সেটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। হতাশ হৃদয়ে এরপর বহুকাল আর তিনি

নাটক রচনায় হাত দেননি।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ০৮) তবে, তিনি দমে যাননি। এরপর তিনি গল্প-নাট্য, নাট্যোপন্যাস লিখেছেন। *অনেক রকম* (১৯৩৩) নাট্যোপন্যাস; তিন অঙ্কের হ্রস্ব নাটক *কাঠঠোকরা* (১৯৪২); *কালো হাওয়া* উপন্যাসের নাট্যরূপ *মায়া মালঞ্চ* (১৯৪৪); *লোকটা* (১৯৩৫), *পাতা ঝ'রে যায়, বাবু ও বিবি* (১৯৬৬) প্রভৃতি গল্প-নাট্য; *রুনু ও লোটুর প্রেম* (১৯৩৩) নীতিমূলক প্রহসন; *নেপথ্য নাটক* (১৯৭০) প্রভৃতি তাঁর নাট্যমানসকে প্রাজ্ঞ করেছে। (দময়ন্তী, ২০১৩ : ভূমিকা) এসব নাট্যপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর অপরিতৃপ্ত শিল্প-অভিপ্রায় আবিষ্কার করা যায়, যা পরবর্তী সময়ে কাব্যনাট্যের প্রকরণে প্রদীপ্ত ও পরিশীলিত হয়ে পরিস্ফুট হয়। তাঁর মতে,

> সুধীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন সেই কথাটা তখন নতুন উঠেছে–বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই প্রথম। আমরা পেয়েছি পরিশেষ ও পুনশ্চ-একটাতে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কথ্যরীতি, অন্যটায় গদ্যের কাব্যিক ব্যবহার। হাতে-হাতে ঘুরছে এজরা পাউণ্ড আর টি.এস. এলিয়ট, মুখে-মুখে বাংলা পদ্যের রূপান্তর-প্রস্তাব। এইসব কথাবার্তার ধাক্কায় আমি আস্ত একটা কাব্য-নাট্য লিখে ফেললাম,'– তার পটভূমি হাল-আমলের কলকাতা, ছন্দ প্রবহমান পয়ার, মাঝে-মাঝে ছিলো অদৃশ্য যুক্তবর্ণ একমাত্রায় বসানো-সে কাজটি পরে আরো সুষ্ঠুভাবে করেছিলো সুভাষ তার পদাতিকের কবিতায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৩৫)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা, দেশভাগের ফলে সৃষ্ট উন্মুল চেতনা ও অর্থনৈতিক বিপন্নতা প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সৃজনকর্মকে ভীষণভাবে ব্যাহত করে। তিনি স্মৃতিচারণ করেন: 'মনে পড়ে ঋতু ছিলো শীত। যুদ্ধ চলছে; কলকাতায় বিশৃঙ্খলা, আলোড়ন, উদ্‌ভ্রান্তি।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৭৯) এ সময়ে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তিনি জীবন-জীবিকার তাগিদে পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেন; ইউনেস্কোর কাজে দিল্লি, মহীশূর এবং এক বছরের শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে আমেরিকা যান। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসুর পাঠদানের (১৯৬৩) একটি অংশে ছিল ইলিয়াড, ওডিসি, ইনিড, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যসমূহ। ইহুদি, জার্মান, গ্রিক, মার্কিনসহ নানা দেশীয় ছাত্রদের ভিন্ন ও বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও জিজ্ঞাসা বুদ্ধদেবকে এ বিষয়ে আরও উৎসুক করে তোলে। তখন মহাভারত নিয়ে বই লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময়ে রেক্টর ত্রিগুণা সেন বিশ্ববিদ্যালয়টির কলাবিভাগ গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন বুদ্ধদেবকে। এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগ। এ সময়ে তিনি মনোযোগী ছিলেন এ বিভাগটির সার্বিক নানাবিধ ব্যস্ততায় তিনি সৃজনশীল রচনা থেকে খানিকটা দূরে সরে যান। কিছুকাল পরে এখানে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হবার আশঙ্কা অনুভব করেন। এ বিষয়ে প্রতিভা বসু স্মৃতিচারণা:

> চাকরির মোহ বুদ্ধদেবের ছিল না বটে কিন্তু তিনি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর নতুন বিভাগটির ব্যাপারে, ... আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই রকম ক্ষেত্রে তাঁর কী করা উচিত? আমি বললাম, আমরা তো কায়ক্লেশে দিনযাপনে

> চিরদিনই অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে একটা আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে।...পরে ভেবে দেখেছি এই চাকরি ছাড়াটা তাৎক্ষণিক ভাবে নানা কারণেই অত্যন্ত বেদনার হলেও চাকরি না ছাড়লে তাঁর নিজের সৃষ্টি ব্যাহত হতো। (প্রতিভা, ২০২০ : ২৩৫)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষাকাতরতা কিংবা ষড়যন্ত্রের সূত্রে চাকরিজীবনের ইস্তফা দিয়ে নতুন উদ্যমে সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হলেন। এ সময়ে বুদ্ধদেব গভীর অভিনিবেশ সহকারে মহাকাব্য *মহাভারত* চর্চা করেন। *আত্মজৈবনিক* (২০১৮) গ্রন্থের সংযোজন অংশে দময়ন্তী বসু সিং লেখেন:

> মহাভারতে বুঁদ হয়ে থাকা বুদ্ধদেব বসুর হাত থেকে আশ্চর্য সব লেখা বেরোচ্ছে তখন। সাগরময় দু-হাত ভরে সেই সম্ভার তুলে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ পত্রিকার ভাণ্ডারে। একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে শরীর-মন পুলকিত করা তাঁর কাব্যনাট্য, স্মৃতিকথা, শেষ পর্যন্ত সেই মহাগ্রন্থ *মহাভারতের কথা*। তখন বারবার ধন্যবাদ দিয়েছি যাদবপুরের সেই কু-ঘটনাকে যা তাঁকে যাদবপুর ছাড়তে বাধ্য করে। বিভাগের গুরুভার অ্যালবাট্রসের মতো তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকলে তা অবশ্যই তাঁর সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী হতো, মহাভারত নিয়ে এতো চর্চা কি করতে পারতেন তিনি? এসব লেখা কি আমরা পেতাম? চাকরি কেড়ে নিয়ে শিল্পীকে ভাতে মারা যায়, হাতে মারা যায় না। এই সামান্য: সত্য ক্ষমতাশীল নির্গুণীর কাছে অনেক সময়েই অধরা থেকে যায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ২১৫)

মহাভারতের কথা গ্রন্থের মুখবন্ধে বুদ্ধদেব জানান: '... আমি টের পাই আমার মনের দু-একটা পূবার্জিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে-ধীরে পরিণত হ'য়ে উঠছে।' (বুদ্ধদেব, ১৩৮৫ : ০৫) এ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরবর্তী সময়ে তাঁর সৃষ্ট কবিতা ও কাব্যনাট্যসমূহে। 'প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তাঁর মহৎ গ্রন্থ *মহাভারতের কথা* লেখার, আর তার মধ্যেই সত্তার মিলনে সৃষ্টি হলো অসাধারণ সব কাব্যনাট্য– মহাভারতের বিবিধ কাহিনীর নতুন ভাষ্যে। গদ্যের সজীব শানিত ভাষা, নাটকীয় উপাদান ও অসামান্য কাব্যময়তার মিশ্রণে এক নতুন ধারায় রচিত এই মৌলিক নাটকগুলির একের পর এক আবির্ভার অকস্মাৎ আমাদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল।' (দময়ন্তী, ২০১৩ : ১০) এ সময়ে জীবন ও জগতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার অবকাশ পান তিনি। তাছাড়া 'আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পকলার সর্বশেষ আন্দোলন ও গতিপ্রকৃতি তাঁর সাগ্রহ অনুসন্ধিৎসাকে অতিক্রম করে যায়নি।' (মাহবুব, ১৯৯১ : ১৬) বুদ্ধদেবের এ নতুন এ দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিশেষ কারণ রয়েছে।

> এই ১৯৬৬ সাল থেকে বুদ্ধদেবের জীবনে-বহিরঙ্গে ও অন্তর্জীবনে– একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। বহিরঙ্গের দিক দিয়ে বাড়িবদল করলেন–নাগরিক রাসবিহারী অ্যাভেনিয়ু থেকে মফস্বলী নাকতলায়– করে, আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন ... পরিবর্তন ঘটল তাঁর অন্তর্জীবনেও। এই সময় থেকে নাটক লেখার কাল আরম্ভ হল। এর আগে যেসব নাটক লিখেছেন তার সঙ্গে এখনকার নাটকগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে। আগেকার নাটক– যেমন

'অনুরাধা', 'মায়া-মালঞ্চ' সেগুলি লিখেছেন নাটক হিসেবেই, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল নাটকীয়তা এবং অভিনয়যোগ্যতা। ... কিন্তু এই সময় থেকে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে তাঁর নাট্যরচনার যে-পর্যায় শুরু হল, সেখানে দেখতে পাচ্ছি মঞ্চযোগ্যতাই তাদের একমাত্র গুণ নয়। নাটকের ফর্মটি ব্যবহার করে কাব্যরচনা– এবং পুরাণের পুনর্জন্মদান– এই দুটি এই পর্যায়ের নাটকের আসল লক্ষ্য। (সমীর, ১৯৯৮ : ৩৪৭–৩৪৮)

- ***তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬)**

বুদ্ধদেব বসুর নাট্যপ্রতিভার শিখরস্পর্শী ফসল তাঁর রচিত কাব্যনাট্যসমূহ। বুদ্ধদেব জীবনের অন্তিম পর্বে এসে কাব্যনাট্য রচনার মাধ্যমে পরিপুষ্টি দান করেন বাংলা কাব্যনাট্যধারাকে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৮), *প্রথম পার্থ* (১৯৬৯), *সংক্রান্তি* (১৯৭০), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) প্রভৃতি কাব্যনাট্যসমূহে তিনি পুরাণ-কাহিনির সঙ্গে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা ও হৃদয়ানুভূতির সংশ্লেষে নতুন শিল্পরস সৃষ্টি করেন। এসব কাব্যনাট্যের ভাববস্তু *মহাভারত*-এর নানা অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ। কাব্যনাট্যসমূহে ধূসর অতীতের পুরাণ-কথায় সমকাললগ্ন ভাবনা জুড়ে দিয়ে বুদ্ধদেব পুরাণকে নব-ব্যঞ্জনায় সাজিয়ে তুললেন। পুরাণের পাটাতনে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা, সময় ও মনন অন্বেষণ করেন তিনি।

প্রায় ভাবতে বসেছিলাম রবীন্দ্রনাথের পরে আর নাটক লেখা হলো না বাংলা ভাষায়। ... 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' থেকে 'কালসন্ধ্যা' পর্যন্ত প'ড়ে আর আমরা বলতে পারি না যে বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথেই থেমে আছে; রবীন্দ্রনাথের এক যথার্থ উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটেছে আকস্মিক। (অমিয়, ১৯৬০ : ১২৯)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের প্রথম শিল্পস্মারক। '১৯৩৯-এ যেমন পাশ্চাত্যে কাব্য নাট্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আমাদের দেশেও তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র প্রকাশ সেই বিজয় অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ।' (তরুণ, ২০০৩ : ৯৮) *রামায়ণ*, *মহাভারত*-এর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি অবলম্বনে বুদ্ধদেব বসু এ কাব্যনাট্য রচনা করেন। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডের নবম ও দশম সর্গে, বেদব্যাসের মহাভারতের 'বনপর্বে', মহাভারতের আরণ্যক পর্বের ১১০–১১৩ সর্গে, পদ্মপুরাণের পাতাল–১৩, মহাবস্তুভদ্রকল্পবদান–৩৩, অবদান-কল্পলতা–৬৫, ১০১ প্রভৃতি স্থানে, বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের অলম্বুষা জাতক–৫২৩ এবং নলিনিকা জাতক–৫২৬ প্রভৃতিতে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসঙ্গ রয়েছে। (পুষ্পেন্দুশেখর গিরি : ২০১৩) ঋষ্যশৃঙ্গ *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর গুরুত্বপূর্ণ মিথ। এ মিথকথা অপার সম্ভাবনায় ঋদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এ মিথকথার বহু-বর্ণিল উপস্থাপনা লক্ষযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের "পতিতা" (১৩০৪) কবিতায়, এবং শুকুন্তলা' (১৩০৯) প্রবন্ধে, 'শেষ কথা' ছোটগল্পে; শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬–১৯৩৮) আঁধারে আলো' (১৩২১) ছোটগল্পে; সমরেশ মজুমদারের (১৯৪৪–২০২৩) 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯৮৮) উপন্যাসে; রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯–১৮৯৪) গীতনাট্য বা অপেরা 'ঋষ্যশৃঙ্গ' (১৮৯২) প্রভৃতিতে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথার সংগতিময় শিল্পিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেব সৃজনশীল জীবনের প্রারম্ভ স্তরেই এ মিথকথার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা তাঁর শিল্প-মানসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরই শিল্প-ফসল তাঁর *মরচে-পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা এবং *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬) ও 'ইক্ষাকু সেন্নিন' (১৯৭১) কাব্যনাট্যদ্বয়। বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় এ মিথ গভীর কাব্যবোধ ও অপূর্ব নাট্যশৃঙ্খলার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাকাহিনির প্রেরণা ও উপাত্ত নাট্য-আখ্যানে বুদ্ধদেব বসু যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা নিয়ে বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ নাট্যবিশ্লেষকের দৃষ্টিতে এটি কাব্যনাট্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। '১৯৩৯-এ যেমন পাশ্চাত্যে কাব্য নাট্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আমাদের দেশেও 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র প্রকাশ সেই বিজয় অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ।' (তরুণ, ২০০৩ : ৯৮) মাহবুব সাদিকের মতে: 'ভাষা প্রয়োগে, নাট্যগুণে এবং আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ববেদনার উন্মোচনে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* একটি সার্থক আধুনিক কাব্যনাটক।' (মাহবুব, ২০০৯ : ১৪) ড. অজিতকুমার ঘোষ মনে করেন: 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে পুরোপুরি কাব্যনাট্য বলা চলে না, আংশিক কাব্যনাট্য বলা চলে। কারণ এর সংলাপ সর্বত্র কাব্যসংলাপ নয়। কাব্যময় কিন্তু কাব্যসংলাপ নয়।' (অজিতকুমার, ১৯৯৯ : ৪৯৩) ''বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক'' প্রবন্ধে অনুপম হাসান বলেন: 'গদ্যে সংলাপ রচিত হলেও যেমন কোনো নাটক কাব্যনাটক হতে পারে, তেমনি কাব্যে সংলাপ রচিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাব্যনাটক হতে পারে, যদি সেখানে কাব্যনাটকের মূল বৈশিষ্ট্য-চরিত্রের অন্তর্গত বিষয়াদির উপস্থাপন যথাযথভাবে করা হয়। বুদ্ধদেব বসু তপস্বী তরঙ্গিণীর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এর মানসচিত্রটিকে নাট্যরূপ দিতে পারেন নি। এজন্যই আমরা তাঁর এই রচনাটিকে কাব্যনাট্যধর্মী বা কাব্যনাটক রচনার নিরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করেছি।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৩৫) বিশ্বজিৎ ঘোষ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের যে তালিকা উল্লেখ করেন তা হলো: *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, *কালসন্ধ্যা*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *প্রথম পার্থ*, *সংক্রান্তি* , *প্রায়শ্চিত্ত*, *ইক্ষাকু সেন্নিন*, *অনুরাধা*। (বিশ্বজিৎ, ২০২৪) শান্তনু কায়সার কৃত বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের তালিকা হলো: 'তাঁর কাব্যনাট্যগুলোর মধ্যে আছে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'প্রথম পার্থ', 'সত্যসন্ধ', 'পাতা ঝরে যায়', 'কালসন্ধ্যা', 'সংক্রান্তি', ও অনাম্নী অঙ্গনা'। (শান্তনু, ২০১৩ : ৩০) কণিকা সাহা আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: ''বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৬) মূলত গদ্যভাষায় রচিত হলেও এই নাটক এত বেশি কবিত্বমণ্ডিত যে সেই অধিকারেই বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৩৮) বুদ্ধদেব বসুর জীবনী লেখক সমীর সেনগুপ্ত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*-কে কাব্যনাট্য

হিসেবে চিহ্নিত করেন। বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহের সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কে 'চার অঙ্কের নাটক' বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধদেব বসুর নাটক সমগ্র-এর সম্পাদক দময়ন্তী বসু সিং *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*কে কাব্যনাট্যে তালিকাভুক্ত করে বলেন: '...*তপস্বী ও তরঙ্গিণী* বাংলা নাট্যধারার ইতিহাসে এক মাইলফলক। গদ্যের ছদ্মবেশে এই নাটক যতটা কাব্য, ততটাই এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী যা অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয় বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০) ''তপস্বী ও তরঙ্গিণী : একটি জনান্তিক পর্যবেক্ষণ'' প্রবন্ধে এ প্রতর্কের মীমাংসা অনুসন্ধান করা হয়েছে এভাবে:

> বুদ্ধদেব বসু বাংলা চিরায়ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কাব্যনাটকের সৃজয়িতা হলেও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে স্বভাবসচেতনভাবেই 'কাব্যনাটক' পরিভাষা বর্জন করেছেন সর্বদা। গঠনশৈলীর নবনিরীক্ষা আর বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠায় নিরলস হয়েও তিনি নাটকের আঙ্গিক-ভিত্তিক শ্রেণিকরণে আস্থা রাখেননি। এ কারণে অবিমিশ্র গদ্যভাষায় সৃজিত নাটকের মতো, কাব্যনাটকও তাঁর ভাষায় অভিহিত হয়েছে 'নাটক' নামে; বিশেষণমুক্ত 'নাটক' অভিধাতেই তাঁর আসক্তি। গদ্যপদ্য সমন্বিত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*কে যেমন তিনি নাটক বলেন, তেমনি অবিমিশ্র কাব্যনাটক *কালসন্ধ্যা*, *সংক্রান্তি*, *অনাম্নী অঙ্গনা* কিংবা *প্রথম পার্থ*ও বুদ্ধদেব-ভাষ্যে 'নাটক'। আবার নিকষিত গদ্যভাষায় রচিত *কলকাতার ইলেকট্রা* কিংবা *সত্যসন্ধ*কেও তিনি নাটক-পরিচয়েই উপস্থাপন করেন। সম্ভবত এ কারণেই শ্রেণি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে পাঠক-নির্দেশক-সমালোচক কখনো-কখনো বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ২৮৭)

বর্তমান গবেষণায় *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শাণিত গদ্য ভাষা, কবিতার পেলবতা, নাটকীয়তা, আধুনিক সময়ের সংকট ও জীবন-জিজ্ঞাসার শিল্পসম্মত উপস্থাপনার বিবেচনায় কাব্যনাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে *তপস্বী তরঙ্গিণী*। কেননা: 'তাঁর সব থেকে বিখ্যাত নাট্যপ্রচেষ্টা: *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*। গদ্যভাষার জন্য একেও, শুধুমাত্র 'নাটক' আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু রচনা পরিকল্পনার চারিত্র্যে ও ভাষার ভিতরে লুকিয়ে থাকা কবিতার দোলায় এটিকেও আলাদাভাবে বিচার করতেই হয়।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩৫) তাঁর রচিত পরবর্তী কাব্যনাট্য *কালসন্ধ্যা*য়ও কবিত্ব ও নাট্যিক বিন্যাসের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়: অলংকারমণ্ডিত সংলাপে, কাব্য-স্বাদ সৃষ্টিতে, সংঘাত ও সংক্ষুব্ধতাপূর্ণ নাটকীয়তা-নির্ভর কাহিনি নির্মাণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

■ *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৮)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী রচনার পর থেকে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের ভুবন প্রসারিত হতে শুরু করে। এটির পর 'লেখা হলো *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৮), *প্রথম পার্থ* (১৯৬৯), *সংক্রান্তি* (১৯৭০), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০)– যেন কোনো দৈব

প্রেরণায় সৃষ্টি হচ্ছে এমনই আশ্চর্য তার আবেদন, কাব্যগুণের সঙ্গে নাট্যগুণের এমনই অনবদ্য মিলন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০) মহাভারত-পাঠের অভিজ্ঞতা, বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিতে বুদ্ধদেব তিনটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। এ কাব্যনাট্যগুলো ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে *প্রথম পার্থ*, যুদ্ধের শেষের দিন উপজীব্য করে *সংক্রান্তি*; এবং এ যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর দ্বারকাবাসী আত্মবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড নিয়ে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্য রচনা করেন বুদ্ধদেব।

> সমকাল ও শাশ্বত কালের সঙ্গে মহাভারতীয় কাহিনীর সংযোগসূত্র রচনার জন্যে বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা*র কাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছেন। (মাহবুব, ২০০৯ : ৪৬)

মহাভারত-এর 'মৌষলপর্বে' বর্ণিত আছে: 'বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসরে বৃষ্ণিবংশীয়গণ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরূপ ঘটেছিল আপনি সবিস্তারে বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন।– একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ মুনি দ্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ প্রভৃতি বীরগণের কুবুদ্ধি হ'ল। তাঁরা শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত ক'রে মুনিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি কি প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত নৃশংস ও গর্বিত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলের সকলেই বিনষ্ট হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করবে। ... পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষণ্ন হয়ে সেই মুষলের সূক্ষ্ম চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। ... এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতমস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পারতেন না। দ্বারকায় নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল; মূষিকের দল নিদ্রিত যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের রব করতে লাগল। গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নির্লজ্জভাবে পাপকার্য করতে লাগলেন।' (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ১৪১৮ : ৬৭১–৬৭২) মহাভারতের এ কাহিনি-অংশ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এ কাব্যনাট্য রচনা করেন।

> আলোচ্য কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের ভাব-ভাবনা, মানসিক অনুভূত সত্যের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কাব্যনাট্যের আশ্রয়ে গাঢ়তর রস সৃষ্টি করেছে। ...আলোচ্য নাটক যদিও মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেও বুদ্ধদেব এই কাব্যনাট্যে তাঁর কবি মনোজীবনের মহাকাব্যিক বিশালতা এনেছেন। নাটকীয়তারও কাব্যিক রসে

নাটকখানির মানব-মানবী অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পরিণামে বিবর্তিত হয়ে কাব্যিক জীবনদর্শনকে নাট্যিক করে তুলেছে। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৪)

এ কাব্যনাট্যের ন্যায় *প্রথম পার্থ* কাব্যনাট্যেও বুদ্ধদেব বসু পুরাণের আশ্রয়ে মানব-মানবীর অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিণামদর্শী আখ্যান নির্মাণে বুদ্ধদেব বসু স্বকীয় শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দেন।

- ***প্রথম পার্থ* (১৯৬৯)**

মহাভারত–এর 'উদ্যোগ পর্বের' আখ্যায়িকভাগ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি। কুরু-পাণ্ডবের এ যুদ্ধে কর্ণ পাণ্ডবদের বিপক্ষ দলে অবস্থান করে। সমাসন্ন বিপদে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিরসনে কুন্তী তাই বিদুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে যায় গঙ্গাপাড়ে কর্ণের নিকট এবং কর্ণকে জানান পাণ্ডবরা তার ভ্রাতা।

> সূর্যতাপে পীড়িত হয়ে শুষ্ক পদ্ম-মালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরীয়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্ণ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন। ... বৎস, রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আমার কন্যা অবস্থায় তুমি আমার প্রথম পুত্ররূপে জন্মেছিলেন। তুমি পার্থ, জগৎপ্রকাশক তপনদেব তোমার জনক। ... পুত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে মোহবশে দুর্যোধনাদির সেবা করেছ, তা উচিত নয়। ... তিনি কুন্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জননী, আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। ... আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ১৪১৮ : ৩৫২)

মহাভারত-এর কর্ণ বুদ্ধদেবের রচনায় বহুকৌণিক নৈঃসঙ্গ্যতার ভারে উপস্থাপিত হয়েও সে নুইয়ে পড়ে না; বরং তার অন্তরস্থিত মনুষ্যত্বের বোধ ও মহত্ত্বে সে ক্রম-প্রোজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে *প্রথম পার্থ* নাট্য-আখ্যানে। ''রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এর ন্যায় 'প্রথম পার্থ' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বদিনের একটি বিশেষ মুহূর্তের ঘটনাকে নিয়ে একজন বিশেষ ব্যক্তি কর্ণকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত। (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ১৩৪)

আত্মপরিচয়সংকটে মহাবীর কর্ণের বেদনা ও নিঃসঙ্গতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের মানবের দ্বন্দ্ব ও বেদনা। প্রকৃত অর্থে এ নাট্য-আখ্যানের মৌল সংকট কর্ণের নিজেকে চেনার সংকট; একইসঙ্গে নিজেকে চিনিয়ে দেবারও; তার এ নিরন্তন প্রচেষ্টা এ কাব্যনাট্যের অন্যতম বিশিষ্টতা। আর 'গদ্যছন্দে রচিত হয়ে 'প্রথম পার্থ' কখনো কাব্যিক নয়। নয় বলেই বাচনিক ছন্দের স্বাভাবিকত্ব আমাদের পীড়িত করে না। আবেগ প্লাবিত করে না, আলোড়িত করে।'

(তরুণ, ২০০৩ : ১০৪) সব দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়: 'আধুনিক বিজ্ঞান কাব্যচিন্তার একটি সক্ষম প্রকাশ হিসেবে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যের মধ্যে সংশয়হীনভাবে চিরকালীন সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৪) *মহাভারত*-এর কুরুক্ষেত্রের শেষতম দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃজিত *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্যেও বুদ্ধদেব বসু মানব জীবন ও সভ্যতার এক অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতার স্বরূপ নান্দনিক করে তোলেন।

- ***সংক্রান্তি* (১৯৭০)**

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের কাহিনি-অংশ এ কাব্যনাট্যে গৃহীত বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। 'ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ ক'রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন।' (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ১৪১৮ : ৫১৫) *মহাভারত*-এর 'সৌপ্তিকপর্ব-এর দুর্যোধনের মৃত্যু-দৃশ্য কেন্দ্র করে *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্য রচিত।

> কালে কালে পৃথিবীতে যুদ্ধের মাধ্যমেই যে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি ঘটে তা অনুভূত হবে সংক্রান্তির বিষয়-বিন্যাসে।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৮৭)

দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাকালের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ ও নূতন কালের ইঙ্গিত প্রদান করেন কাব্যনাট্যকার। পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কালের অগ্রযাত্রা এ কাব্যনাট্যে সুচিহ্নায়িত হয়েছে। বুদ্ধদেব এ কাব্যনাট্যে বহির্মুখী বাস্তবতাকে কবিতার অন্তর্মুখিতায় প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। ফলে পুরাণের চরিত্ররা মিথের আবরণ খুলে আধুনিক জীবনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়েছে। মূলত:

> বুদ্ধদেব বসুর 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে মূলত মহাকালের এক রক্তাক্ত ইতিকথা চিত্রিত হয়েছে। ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নের চিত্র 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে উপস্থাপন করেছেন। 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাকালের এক ক্রান্তি মোচন হয়েছে এবং উত্তরণের পথ নির্মাণ হয়েছে। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জাগতিকার্থে কখনো কখনো কোনো কোনো বিনাশ ভয়ংকর, কিন্তু সেই বিনাশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে মহান সত্য। 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং সংকট, অবশেষে দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে উত্তরণ তা শুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। (অনুপম, ২০০৮ : ১৫০)

এছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বপটে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ-বিরোধী আখ্যান নির্মাণও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। কেননা কবি ও নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর জীবনাভিজ্ঞতায় রয়েছে যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব। তাঁর স্মৃতিকথায় রয়েছে:

যুদ্ধের সময়ে কলকাতায় আমাদের জীবন খুব তীব্র হয়ে উঠেছিলো; রাজনীতিজনিত সংঘাত ও বিভেদের বাইরে, মানবিক স্তরে, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলাম। প্রথম ঝাপটে ত্রাস–এই বুঝি এসে পড়লো জাপানিরা তাদের আগুন-বোমা নিয়ে: লোকেরা ছুটছে সম্ভবমতো দূরে-কাছে মফস্বলে বা বাংলার বাইরে, শহর শূন্যায়মান, বাড়ি ভাড়া অর্ধেক হয়ে গেলো। দিবালোক-বাঁচানো একঘণ্টা-এগোনো ঘড়ির কাঁটায় যানবাহন আপিস ইত্যাদি টায়ে-টুয়ে চলেছে, কিন্তু স্কুল-কলেজগুলো বন্ধ হবার জোগাড়; রিপন কলেজে এক মাস পয়লা এলো বেতনহীন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১৮৯)

এ কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব পৌরাণিক গান্ধারী চরিত্রকে পুনর্মূল্যায়ন করে আধুনিক মানবী এবং জীবিতের যন্ত্রণায় সংরক্ত করে তোলেন। ধর্মকথার আড়ালে থাকা গান্ধারীর হৃদয় এখানে নাট্যসম্ভব মুহূর্তসমূহকে অনিবার্য গতি প্রদান করেছে। একই শিল্প-অভিপ্রায় নিয়ে বুদ্ধদেব নির্মাণ করেন পরবর্তী কাব্যনাট্য *অনাম্নী অঙ্গনা*-র আখ্যানপট।

- ***অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০)**

অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৭০) মহাভারতের বিদুরের জন্মরহস্যকে বুদ্ধদেব আধুনিক মোড়ক উন্মোচন করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের পরে এটি যখন গ্রন্থরূপ পেয়েছে তখন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা ব্যাসদেবের সাহচার্যে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে জন্ম দেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণের ছিলেন। *মহাভারত*-এ বর্ণিত 'অম্বিকা পুনর্বার ঋতুমতী হ'লে সত্যবতী তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে করে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুমি আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান হবে। এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।' (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ১৪১৮ : ৪৬) এ ক্ষুদ্র কাহিনি-অংশকে অবলম্বন করে আধুনিক নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মপরিচয়ের সংকট, ব্যক্তিত্ব ও প্রেমানুভূতির সারৎসার আবিষ্কার করেন বুদ্ধদেব বসু।

> মহাভারতের চরিত্র বিদুরের নামপরিচয়হীন শূদ্র মাতা বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিপ্রতিভার স্পর্শে শাশ্বত প্রেমে ও মাতৃগৌরবে অভিষিক্ত হয়েছে। বুদ্ধদেব এক অসমাপ্ত পুরাণ- প্রসঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ পুরাণে রূপান্তরিত করেছেন। এ এক অবিস্মরণীয় নাট্যকীর্তি। (মাহবুব, ২০০৯ : ৫৭)

রামায়ণ ও *মহাভারত*-এর নানা গল্পকথা ভারতীয় জীবনে ও মননে বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য নিয়ে বিরাজ করছে যুগ যুগ ধরে। 'সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বে পুরাণের আখ্যান উপাখ্যানের গল্প নতুন করে, নতুন

রূপে, নতুন ভাবে শোনার শোনবার আকাঙ্ক্ষাই গল্পগুলির অমরত্বের প্রধান কারণ।' (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ৪৪৯) বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাট্যসমূহে পুরাণের ধূসর অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করেন সংরক্ত জীবন ও সমকালে যাতে উন্মোচিত হয় এক অনাস্বাদিত জগৎ। 'প্রধানত মহাভারত-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুকাহিনি অবলম্বনে তিনি যে-সব কাব্যনাটক লিখেছেন, তাতে তাঁর প্রাতিস্বিক কল্পনা-শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : পঁচিশ) বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহে আধুনিক মানব জীবন, সংকট ও তা থেকে উত্তরণের সূত্রসমূহ মিথের আবরণে বুদ্ধদেবের নিজস্ব দার্শনিক অনুধ্যানের জগতের সংশ্লেষে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই বলা যায়:

> এই কাব্যনাটকগুলোতে মহাভারতের স্বর যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাদীর্ণ বোধ। (রাজীব, ২০১৯ : ৫২)

৪.২.২ উত্তর-উপনিবেশবাদ ও প্রতীকী শিল্পচেতনার ভাবাদর্শিক সংশ্লেষ

ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো বাঙালির স্বকীয় প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং মননের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করেছে। '... উপনিবেশ-আমলে জাত ক্ষমতা-সম্পর্ক আর মতাদর্শের প্রতাপের কারণেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী ছক থেকে মুক্ত হতে পারেনি।' (মোহাম্মাদ আজম, ২০২৪ : ৪৯৪) উত্তর-ঔপনিবেশিককালে শিল্পসাহিত্যে এর বিরুদ্ধে নতুন ভাবনাকল্প ও প্রতিরোধ চেতনা গড়ে ওঠে। '... ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের মনোভঙ্গি।' (চিরঞ্জীব, ২০১৭ : ৬৪) বুদ্ধদেব বসু উপনিবেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। যাপিত জীবনে আভিজাত্য ও বিত্তের প্রতি তথা উপনিবেশের সৃষ্ট সুযোগের প্রতি নির্লোভ-নির্মোহ বুদ্ধদেব বসুকে আবিষ্কার করা যায়। *জীবনের জলছবি* স্মৃতিগ্রন্থে পুত্রের মোটা অঙ্কের বেতনের চাকুরি পাওয়া নিয়ে প্রতিভা বসুর বর্ণনা বুদ্ধদেব বসুর মননবিশ্ব অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে বিবেচনায় নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো:

> তোর ট্রেনিং পিরিয়ডেই এতো টাকা দেবে? সে কিরে, ট্রেনিং শেষে মাইনে তো আরো অনেক হবে। কী করবি তুই এতো টাকা দিয়ে?... বুদ্ধদেবের একেবারে মত নেই, 'ওসব চাকরি ওকে করতে হবে না। গাদা গাদা টাকা পাবে আর মদ খেতে শিখবে। লেখাপড়ার সঙ্গে কোনো সংস্রবই থাকবে না। (প্রতিভা, ২০২০ : ২৬৯)

জীবনে-মননে-বোধে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে যত রকমের ঔপনিবেশিক অভ্যাস ও আধিপত্যপ্রবণতা গড়ে উঠেছে, তারই বিপ্রতীপে বাঙালির মননশীল আত্মনির্ভরতার, সংরক্ত ও প্রতিরোধকামী বাঙালির অস্তিত্বকে মুখরিত করে

তুলতে বুদ্ধদেব পুরাণের পুনরুজ্জীবন ঘটান। তাঁর প্রথম কাব্যনাট্য *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল। কন্যাকে লেখা চিঠির ব্যাখ্যা-সূত্রে জানা যায়:

> 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তির সূত্রে সাহিত্য আকাদেমির নিমন্ত্রণ। কিন্তু তিনি আকাদেমি পুরস্কার নিতে যাননি, পরে সরকারি খেতাব 'পদ্মভূষণ' নিতেও যাননি। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫১)

তথাকথিত খ্যাতি বা খেতাবের জন্য নয়, তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন শিল্পীর দায় বোধ থেকে। তাছাড়া 'ভদ্রগোছের জীবন ধারণের জন্য আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর 'হাঁড়ি-চড়ানো ফাউন্টেনপেন' দিনরাত সচল থেকেছে।' (উত্তম, ২০০৮ : ০৯) তাঁর বিত্তবৈভবহীন জীবনের প্রতিচ্ছবিতে লোভ, ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকবার চেষ্টা, কিংবা উপনিবেশের বিশেষ সুবিধা পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই।

কালধর্মকে শিল্পকর্মে রূপায়ণের সূত্রেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও তা থেকে উত্তরণের বৈশিষ্ট্য প্রতীকায়িত হয়েছে। উপনিবেশের সৃষ্ট ছক আত্মমুক্ত হবার জন্য প্রেরণায় ও আত্মপ্রকাশের তাড়নায় বুদ্ধদেব বসু সৃজনশীল জগতের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হন। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীকে পত্রযোগে 'কিসের জন্য আর্ট'– বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন:

> আমার জন্যে আর্ট– তা ছাড়া আর কী? কেননা আমার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে আমিই হয়ে উঠছি, ফুটে উঠছি, খোসার পর খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে আমার আত্মা দীপ্ত হয়ে উঠছে বিশুদ্ধ নগ্নতায়। ... আমি যতক্ষণ লিখি একমাত্র নিজেরই জন্য লিখি, আত্মপ্রকাশের অপ্রতিরোধ্য প্রেরণায়, আত্মপ্রকাশের দুঃসহ যন্ত্রণায়, অনির্বচনীয় আনন্দের জন্য। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৩৩২)

ঔপনিবেশিকতার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে উপনিবেশিতের মনোজগতে; বুদ্ধদেবের আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা মূলত ঔপনিবেশিক শক্তির বিপরীতে স্বকীয় অস্তিত্বকে মেলে ধরা। 'অতএব আত্মবিস্মরণের পরিবর্তে বিপরীত প্রক্রিয়ায় শুরু হয় আত্মানুসন্ধান, চলে 'আপনার শ্রেষ্ঠ সত্য'র সন্ধান ও তাকে অনুভব করা মাত্র সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করার প্রয়াস।' (চিরঞ্জীব, ২০১৭ : ৬১) বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের পরিক্রমণ মূলত আত্ম-অনুসন্ধানের, আত্ম-উদ্‌ঘাটনেরই; ব্যাপক অর্থে তা বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধানের। '... ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী দুজনেরই আত্মানুসন্ধানের নাটক। দুজনেই খুঁজছে সেই হারিয়ে ফেলা মুখ, যে মুখ তাদের স্বরূপ। এই ব্যাখ্যা যদি নির্ভুল হয় তা হলে এই নাটকও বহির্ঘটনার নাটক নয়, সত্তানুসন্ধানের নাটক...' (অশ্রুকুমার, ২০১৬ : ৩৫৬); *কালসন্ধ্যা* আত্মদর্শন লাভের;

প্রথম পার্থ কর্ণের আত্মপরিচয় অন্বেষণের; *সংক্রান্তি* যুগের সংক্রান্তিকালে একটি জাতির আত্মদর্শনের এবং *অনাম্নী অঙ্গনা* নারীর ব্যক্তিত্ব, প্রেম ও মাতৃত্ব অনুসন্ধানের শিল্পস্মারক।

> উল্লিখিত সব কটি নাটকে পুরাণ অথবা পুরাণচ্ছায়া ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক কবির নিজস্ব কারণে। পুরাণ আধুনিক কবিভাবনার জীবনভাষ্যের সংস্পর্শে এসে নিজেও আর একটা ডাইমেনশন পায়। সুতরাং বুদ্ধদেবকেও পুরাণ সন্ধান করতে হল নিজ কালাশ্রিত চেতনার তাগিদে, কালোত্তরের রহস্য মোচনের টানে। (সরোজ, ২০০৮ : ২০৯)

প্রকৃতপক্ষে, 'উত্তরঔপনিবেশিক সাহিত্য সবার ওপরে স্থান দেয় আত্ম-প্রতিনিধিত্বকে, যা শৈল্পিক ও রাজনৈতিক উভয়তই জড়িত।' (চিরঞ্জীব, ২০১৬ : ১৭৮) সমাজ ও জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ বুদ্ধদেবের সাহিত্যচর্চার অন্তরালে ছিল উপনিবেশের রূঢ় প্রতিবেশে প্রেমের, মানবতার আখ্যান সৃজন। উপনিবেশিত জনমানসে মুক্তির বারতা পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায় বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যভাবনার অন্যতম অন্তর্নিহিত শক্তি।

> ...'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কে-ই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা– স্পষ্টত মানুষের জন্যই শিল্পকলা। স্পষ্টত মানুষের পক্ষে তা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধর্ম ও সমাজনীতি ও বিজ্ঞান তেমনি– কিন্তু ভিন্নভাবে, ভিন্ন কারণে। নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, মানুষের আত্মার পক্ষে, দেহ প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক সত্তার পক্ষে– রহস্যময় অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন। (বুদ্ধদেব, ২০২৩ : ৪৩)

বুদ্ধদেব উপনিবেশের বদ্ধ পরিসরে ক্রম-ক্ষয়িত মূল্যবোধ ও মৃতপ্রায় মানবাত্মায় প্রশান্তির স্রোতস্বিনী সঞ্চরণ করেন মিথের অনন্ত সম্ভাবনাকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে। কেননা 'সামাজিক মুক্তির প্রচেষ্টায় মানুষের সংগ্রামের কথা নয়, কল্যাণ ও শুভবোধের প্রচার নয়, 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' সৃষ্টিতেই তাঁর অপার আনন্দ।' (সৈয়দ আবুল, ২০১১ : ২০৪) জীবনের শেষপর্বে সে-আনন্দ তিনি খুঁজে পেয়েছেন কাব্যনাট্যের ফর্মে। মিথের প্রয়োগ, রদবদল ঘটানো, ভিন্ন ও অভিনব অর্থান্তরে মিথের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ কুশলতায় নতুন জীবনবোধ ও প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করেন বুদ্ধদেব। 'রামায়ণ বা মহাভারতের যে সব চরিত্র তিনি বেছে নিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট হয়ে আছে সঙ্কটের মুখোমুখি হতে পারার যন্ত্রণায়। এ তো এখনকারও যন্ত্রণা বটে।' (সরোজ, ২০০৮ : ২০৯) তরঙ্গিণী, ঋষ্যশৃঙ্গ, অর্জুন, কর্ণ, গান্ধারী কিংবা অঙ্গনার চরিত্রের সংকট ও অন্তর্দেশবাহিত যন্ত্রণা একালীন জীবনযন্ত্রণারই প্রতিচ্ছবি। তাই যুগের চারিত্র্য নিয়ে:

> তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্র একা ও নিঃসঙ্গ। রাষ্ট্র, সমাজ এমনকি পারিবারিক জীবনযাপনে তারা স্বাভাবিক থাকলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে চরিত্রগুলো ক্রমশ কোলহাল থেকে বিচ্ছিন্ন। (গৌতম, ২০২৫ : ৪১)

কাব্যনাট্যসমূহে তিনি ঐতিহ্যগত মিথের রদবদল ঘটান, চরিত্রের অন্তর্দেশ দ্বন্দ্ব-সংকুল করে তোলেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের শিল্পান্বিত আড়াল গ্রহণ করে উপনিবেশের সংকটকে প্রকাশ করার বাসনা থেকেই। তরঙ্গিণী, ঋষ্যশৃঙ্গ, কর্ণ, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র কিংবা অর্জুনের একাকিত্বের বোধ মূলত সময়জাত। তাছাড়া, *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে 'ধৃতরাষ্ট্রের কামনার সঙ্গে বুদ্ধদেব একালের রাষ্ট্রযন্ত্র, শাসকবর্গের কর্মকাণ্ড ও আকাঙ্ক্ষার সমীকরণ রচনা করেছেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে মানবিক পৃথিবী ক্রমশ ধ্বংসের পুরাণ রচনা করছে। এ জন্যেই লেখকের যুদ্ধবিরোধী মনোভঙ্গি আমাদের এতো বেশি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেবের প্রথম পার্থ কাব্যনাটকেও তাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে।... বস্তুত এই কাব্যনাটকের মধ্য দিয়ে লেখক আধুনিক যুদ্ধবাজ মানবগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রশক্তির মানবিকতা-বিধ্বংসী মনোভঙ্গিকে মূর্ত করেছেন এবং মানববিধ্বংসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এক মানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা করেছেন। (মাহবুব, ২০০৯ : ১০১)

বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের অন্যতম বিশিষ্টতা প্রান্তিক, উপেক্ষিত, অবমূল্যায়িত মানবপ্রবাহের ক্ষীণ স্বরকে ক্রমশ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত করে কাব্যনাট্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত করা। কখনও-বা তাদের তুলে আনেন কাব্যনাট্যের কেন্দ্রীয় ভাবনায়। কেননা: 'আবহমান বাংলায় চরিত্রের বিকাশ প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে ধাবমান।' (মো. মুসফিকুর, ২০২৫ : ৮০) এ বোধ বুদ্ধদেবের মানসচৈতন্যে সক্রিয় থাকা বিস্ময়ের নয়, বরং স্বাভাবিক ও সহজাত। আর তাই *অনাম্নী অঙ্গনার* অঙ্গনা বলে 'আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন, /আমরা শুধু দেখে যাবো–মেনে নেবো–কথা বলবো না।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৫০)– এ উচ্চারণে শূদ্র নারী, সামান্য পরিচারিকা শ্রেণিসচেতন আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হলো। কিংবা প্রথম পার্থ-খ্যাত কর্ণের নিঃসীম বেদনায় পাঠক লীন হয়ে যায় এবং বারংবার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়: 'তবু দ্বন্দ্ব কেন?' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪২)। তাঁর কাব্যনাট্যের আখ্যানে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, যথা: যাদব বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রমুখেরা নাট্য-আখ্যানের সূত্রধরের ভূমিকায় উঠে আসে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা-জাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক নতুন আখ্যান নির্মাণের তাগিদ থেকেই। 'তাই উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বহুস্বর, অনেকান্ত ও মুক্ত উপসংহার– কিন্তু মূল্যবোধ অভিন্ন যেখানে প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধের চেতনা সমন্বিত হয়। দেশজ সংস্কৃতির আখ্যান-বয়ানে তাই আমরা পাই অনেকার্থদ্যোতক সমবায়ী বহুত্ববাদী আদল যা প্রচলিত চিহ্নায়নকে ভেঙ্গে নতুন আত্মপরিচয় অর্জন করতে প্রয়াসী হয়।' (চিরঞ্জীব, ২০১৬ : ১৯৭) আত্মপিরচয় অর্জনে বুদ্ধদেবের অন্যতম আশ্রয় প্রেমের শক্তির জাগরণ।

> প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যাপী মন্দা ও ক্ষয়ঙ্কর মন্দ মন্থর কালস্রোতে কবি বুদ্ধদেব প্রেমকেই কালের প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরেছেন। (সরোজ, ২০০৮ : ২০২)

তাঁর কাব্যনাট্যসমূহের আখ্যান পটভূমিতায় তিনি যে দর্শনের, বিশ্বাসের জগৎ প্রতিফলিত করেন, তা প্রেমের বহুবিচিত্র রূপে রঙিনঃ নর-নারীর প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম সর্বোপরি মানবপ্রেম। '... বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য গুলিতে নাট্যকারের নিজস্ব প্রেম দর্শন ভাবনা আধুনিক ভাবনার মোড়কে পরিবেশিত।' (তারক, 2016 :18)

উপনিবেশের গ্রাসে আক্রান্ত মনের শুশ্রূষায় প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রয়োগ করেন বুদ্ধদেব। ঔপনিবেশিক ভাষা-সাম্রাজ্যকে পাশ কাটিয়ে নান্দনিক এক ভাষাকাঠামোয় তিনি তাঁর বিশ্বাসের জগৎ বিন্যস্ত করায় ছিলেন অকপট ও সাহসী। যুদ্ধ, ক্ষমতা ও উপেক্ষিতের পুরাণে আধুনিক সংকট, প্রেম ও বিবিধ মানবিক সম্পর্কের পরিচর্যায় স্বকীয় শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দেন বুদ্ধদেব। বস্তুতপক্ষে, শিল্পসাহিত্যের ভুবনেঃ 'প্রেমের আধারেই তিনি সন্ধান করেছেন জীবনকে, প্রেমচেতনার মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর প্রাতিস্বিক জীবনচেতনা।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৩২৮) প্রথাবদ্ধতা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব চিহ্নায়নে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও মুক্তিকামিতার উদ্ভাসনে, ত্যাগের মহিমায় অনন্যতর উচ্চতার সন্ধানে, মিথকথার নবভাষ্য নির্মাণে, আধুনিক জীবনবোধ ও মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যানে বুদ্ধদেব বসুর অভিলক্ষ্য হলো উপনিবেশের সর্বগ্রাসী ঢেউয়ে বাঙালির হারিয়ে যাওয়া স্বরূপের আধুনিক উপস্থাপন। কেননাঃ

> ...সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনো বড় সমস্যা আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই আমরা ঔপনিবেশিকতার ভূমিকাকে বাদ দিয়ে করতে পারি না। (বিপান, ১৯৬০ : ০৬)

পৌরাণিক অনুষঙ্গকেন্দ্রিক নাট্য-আখ্যানে বুদ্ধদেব বস্তুত উপনিবেশের প্রভাবের ধারাবাহিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প চেতনার আখ্যানের দিকে যাত্রা করেছেনঃ বিষয় ও বুননে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন, এ মৌল প্রবণতায় তাঁর কাব্যনাট্যসমূহ একসূত্রে গাথা। সাহিত্যিক জীবনে পূর্বাপর বুদ্ধদেব বসু এভাবে অনন্য হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেনঃ 'দেবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি সম্মান লাভ করবেন।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬০ : ০১)

৪.২.৩ কাব্যনাট্যিক আখ্যান বিবেচনা

বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্য রচনার রসদ পেয়েছেন মিথের জগৎ থেকে। মিথকে ঘটনার পরম্পরা ও অলৌকিকত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে কাব্যনাট্যের আখ্যানে প্রতিষ্ঠা প্রদানে আধুনিক জীবনমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

মিথকথাকে স্বকীয় শিল্প-অভীপ্সা থেকে ভেঙেছেন, কখনওবা নতুন ভাবনার সঞ্চরণ ঘটিয়ে গড়ে তুলেছেন অভিনবরূপে।

> আধুনিক ব্যক্তিমনের জন্য সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কোথাও পরমাশ্রয় রচিত হয়ে নেই, যা কিছু মহানতা ও প্রশান্তি সবই অতীতকালীন। এখনকার আত্মা বিশুষ্ক বন্ধ্যা, প্রাত্যহিকতায় ঠাসা। অভ্যাসবদ্ধ এই জীবনযাপন বদ্ধ পরিসরে ঘোরাফেরা করেই শেষ হয়। তাই পৌরণিক সময়ের চেয়েও এখন বেশি প্রয়োজন মিথপদ্ধতির অনন্ত সেই জন্ম-যৌবন-শক্তির 'পুনরুজ্জীবন' ও সঞ্চরণ– এক জন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে। (বেগম আকতার, ২০১৩ : ১০৭)

ফলে তাঁর নাট্য-আখ্যানে মিথ আধার ও আধেয়-এর শক্তিশালী আয়ুধ হিসেবে সুচিহ্নিত। তাছাড়া মিথ-পুরাণের সীমায়িত পরিসর তাঁর মননস্পর্শে সমকালীন জীবন ও সমাজকে প্রতিফলিত করে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি। বর্তমান গবেষণার এ অংশে তাঁর কাব্যনাট্যের কাহিনি বিন্যাসে, নাট্য-আখ্যান পটভূমিতে, দর্শনে, নাট্যসূত্র নির্মিতিতে, নির্মাণকলায়, চরিত্রায়ণ কৌশলে মিথের প্রয়োগবৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হয়েছে। কাব্যনাট্যসমূহে 'বলা বাহুল্য, পুরাণই শাশ্বতের একমাত্র দর্পণ নয়; যেমন পুরাণে তেমনি বর্তমানে ও বুদ্ধদেব জীবনের শাশ্বত রহস্যের প্রতিবিম্ব খুঁজেছেন।' (অমিয়, ১৯৬০ : ১৩১) বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের আখ্যান বিশ্লেষণের এ অংশটি তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা:

ক) আখ্যান পটভূমি: নাট্যসূত্র ও দর্শন;

খ) নির্মাণ পরিকল্পনা ও সৃজনের মূলনীতি;

গ) কাহিনি বিন্যাস।

ক. আখ্যান পটভূমি: নাট্যসূত্র ও দর্শন

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

রামায়ণ ও *মহাভারত*–এর ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা অপার সম্ভাবনায় ঋদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এ মিথকথার বহু-বর্ণিল উপস্থাপনা লক্ষযোগ্য। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় এ মিথ সন্নিবেশিত হয়েছে সুগভীর কাব্যবোধ ও অ-পূর্ব নাট্যশৃঙ্খলার শিল্পসংহত প্রক্রিয়ায়। 'পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে এরকম অসাধারণ সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।' (লায়েক, ২০১২ : ভূমিকা) বুদ্ধদেব ''লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল'' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫৩০–৫৩১)–এ দার্শনিক বোধের উদ্বোধনে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকে নির্বাচন করেন। এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এ কাব্যনাট্যের ভাবনাবিশ্ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব। বুদ্ধদেবের

শিল্পিত জীবনভাবনায় 'কাম' প্রচলিত অর্থে সংজ্ঞাপিত হয়নি। তাঁর ভাবনায় 'প্রেম' ও 'কাম' বিরোধার্থক নয়; বরং পরিপূরক ও প্রভাবক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত, যা এ আখ্যানের অন্যতম বিশেষত্ব। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হলো:

> শুধু ভোগে, কামে নয় প্রেমে ও চেতন্যেই তথা আত্মোপলব্ধিতেই মানুষের মুক্তি ও আনন্দ, তিনি বুঝলেন 'ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার'কে তাই 'নির্ধারিত' অক্ষরে, মুক্তি দিতে বেছে নিলেন কাব্যনাটক– যা বাইরের ঘটনার চাপে নয়, ভাবের সংঘাতে, অন্তর্নাটকীয়তায় দীপ্যমান। অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষত সেই জীবনের ভাষারূপ তাঁর কাব্যনাটক, যা সংলাপে, কবিত্বে, নাট্যরসে এবং অভিনয়গুণে বাংলাসাহিত্যে এক অনন্য স্বাদ নিয়ে এলো। (তরুণ, ২০০৩ : ৯৮)

তাই সাধনা ভঙ্গের ফলে তপস্বীর আধুনিক মানবে কিংবা বারাঙ্গনার তপস্বিনী সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার ভাবনায় বুদ্ধদেব বসু অনায়াসেই উন্নীত হতে পারেন। আর এ ভাবনাসূত্রে মিথকথায় তিনি অবলীলায় সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন একালীন ভাবনা, সংকট ও তা থেকে উত্তরণের সূত্র।

> কেমন করে, কোন-কোন স্তর পেরিয়ে, কত বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকার এই উদ্বর্তন ঘটল, তা উদ্ঘাটিত হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিপুণ নাটকীয় কৌশলে গম্ভীর সজীব শাণিত কাব্যধর্মী মনোমুগ্ধকর ভাষায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হল। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫৩১)

এ কালিক পটভূমিকা কিংবা ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি বিনির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়; মিথকে তিনি আধুনিক মানবের আত্ম-বিশ্লেষণে, আত্ম-অনুভূতির আয়ুধ হিসেবে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। 'মিথের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তিনি আসলে নিজের চিত্তবাসনারই আস্বাদ গ্রহণ করেন।' (বেগম আকতার, ২০১১ : ২৮২) এ মিথকথার অন্তর্বুননের সৌকর্যে তা পাঠক ও দর্শকচিত্তে শিল্প-সংক্রমিত হয়। অমিয় দেব ''দর্পণে দুই মুখ'' প্রবন্ধে সে-কথাই ব্যক্ত করলেন:

> এই নিয়ে পাঁচবার পড়লাম 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। পাঁচবারই সেই পরম তৃপ্তি পেয়েছি যা কেবল মহৎ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এক অতি প্রাচীন পুরাণের এমন আধুনিক রূপায়ণ খুব বেশি দেখিনি।... পুরাণ দেখেছিলো কেবল দেহকেই, বুদ্ধদেব তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন মন, রোম্যান্টিকতা মনকেই সর্বস্ব জেনেছিলো, বুদ্ধদেব তাকে দিলেন দেহের আশ্রয়। ছত্রিশ বছর আগে বন্দীর বন্দনায় যে দ্বন্দ্বের আভাস শুরু হয়েছিলো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে যেন তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটলো, অবশেষে খুলে গেলো সেই আযৌবন নন্দিত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দরজা। (অমিয়, ১৯৬০ : ১৩২)

এ আখ্যান পটভূমিতে এক বারবণিতা থেকে কামহীন রোমান্টিক প্রেমবোধে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে সময় গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। সে-সচেতনতা থেকেই এ কাব্যনাট্যের সূচনায় নাট্য-আখ্যানের সময়

সম্পর্কে জানান: 'প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে একদিন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক বৎসর ব্যবধান। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাকাল একই দিন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৬)

তপোবন থেকে ছলনা করে অঙ্গদেশে নিয়ে আসার পরবর্তী একবছর তরঙ্গিণীর সঙ্গে তপস্বীর সাক্ষাত হয়নি। এ একবছর তরঙ্গিণী চরিত্র মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার মধ্য অতিবাহিত করেছে: বারাঙ্গনাবৃত্তিতে অস্বস্তি ও অনীহা, আত্মপরিচয় সংকট, পাণিপ্রার্থীর দৃষ্টিতে ঋষ্যশৃঙ্গের দৃষ্টিপাতের মুগ্ধতার প্রত্যাশা ও তা না-পাওয়াজনিত হতাশা ও বেদনা, তপস্বী-দর্শনের এসব বহুভোগ্যা নারী তরঙ্গিণীকে ক্রমশ অন্য তরঙ্গিণীতে রূপান্তরিত করেছে। একইভাবে বৈবাহিক জীবনে তপস্বীর ভাবনাজুড়ে ছিল তরঙ্গিণীর সান্নিধ্য-স্মৃতি ও বেদনার দহন। সময়ের এ পরিক্রমায় তপস্বীর প্রেমভাব নতুনতর চেতনায় উন্নীত হয়। উভয়ের সঙ্গে দেখা বা মিলিত হওয়া মাত্রই এ রূপান্তর সাধিত হলে বাস্তবতাবর্জিত মনে হতো। সুতরাং আখ্যানের ঘটনাবিন্যাস প্রক্রিয়ায় এক বছরের ব্যবধান নাট্যকার সচেতনভাবেই রেখেছেন। এ ব্যবধানসূত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন:

> হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা জেগে উঠলে বারাঙ্গনাও যে তার গ্লানিময় জীবনের ঊর্ধ্বে নিজের অন্তরের গভীরে আপন সত্তাকে পবিত্রতার প্রতিমারূপে অনুভব করে। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৭)

আবার, পৌরাণিক অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের পটে দুই পৌরাণিক নারীকে প্রতিস্থাপন করে বুদ্ধদেব আরেক দার্শনিক অভিপ্রায় প্রকাশ করেন *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু সময়জাত সংকট মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। ষাটের দশকের ভারত-চিন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫), পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬), নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭) প্রভৃতি সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে বুদ্ধদেব বসুর মানসলোকে। তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গনা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নকশালবাড়ি আন্দোলন গড়ে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি অঞ্চলে এ আন্দোলনের সূচনা এবং কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ ও ছাত্র-যুবক-জনতার অংশগ্রহণে দ্রুত তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন যত বেগবান হয়; রাষ্ট্রযন্ত্রের দমননীতি ততই কঠোর হতে থাকে। ফলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বস্তুত:

> তাঁর জীবন কেটেছে দুটি মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের মধ্য দিয়ে। রুশবিপ্লব, ভারতে অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক সামাজিক অভিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আণবিক বোমা, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা–এসব বহুমুখী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কেটেছে তাঁর জীবন। (মুনিরা, ২০২১ : ৪৮)

সমাজ-রাজনীতির এ অস্থির ও বক্র গতিপ্রকৃতির অন্তর্চাপ বুদ্ধদেব কাটিয়ে ওঠেন স্বকীয় দর্শনভাবনার শিল্পিত প্রকাশে। যুগের সংকট বুদ্ধদেবের সংবেদনশীল মানসপটে যত বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, তত যেন তিনি নতুন উদ্যমে সৃষ্টিশীলতার জগতে নিমগ্ন থেকে রচনা করেছেন ইতিবাচকতার আখ্যান। *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৮) কাব্যনাট্য তারই নিদর্শন। 'বুদ্ধদের বসুর সমগ্র কাব্যনাটগুলিতে বিশেষত তাঁর 'কালসন্ধ্যা' নামক কাব্যনাট্যে ইয়েটস্ ও এলিয়ট উভয়ের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি নিজের কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে, রসপ্রমাতা সত্তাকে ও জীবনধর্মী কাব্যিক উপলব্ধিকে আবেগাশ্রিত ও মননধর্মী কাব্যিক ও নাট্যিক সংলাপে প্রয়োগ করেছেন।' (ধ্রুবকুমার ২০১৯ : ২৬৩) *মহাভারত*-এর গান্ধারীর অভিশাপের অমোঘ ও অনিবার্য পরিণতি *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যের ফ্রেম হিসেবে গৃহীত হলেও:

> বুদ্ধদেব বসু, এই বৃত্তান্তটির সামগ্রিক এবং মিথিক-প্রকরণধর্মী-বিন্যাস ঘটিয়ে সমকালীন সন্ধি-যুগের ক্ষয় ও পতনের মর্মটিকে রচনায় প্রোথিত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৪৮)

যাদবকুলের নির্মম ও করুণ পরিণতি, কৃষ্ণের জীবন সমাপন কিংবা মহাবীর অর্জুনের পরাভব– পুরাণের এ বৈনাশিক পটভূমিকার উন্মোচন করে বুদ্ধদেব এ কাব্যনাট্যের আখ্যানে মহাকালচক্রের প্রেক্ষাপটে মানবের অলঙ্ঘনীয় নিয়তির সারৎসার ইঙ্গিতময় করেন। মানুষ অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়, কালের চক্রে সে আবদ্ধ। তাই কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন যদুবংশকে এ বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না; এমনকি নিজেদেরকেও নয়। কালচক্রের ঘটনাধারা নিয়ে অনুশোচনার কোনো মানে নেই। কেন না 'জীবতে ও মৃতে' কোনো পার্থক্য নেই। ধ্রুব সত্য কেবল সত্তায় বিরাজমান; এর বিলয়-বৃদ্ধি, শুরু-শেষ নেই। এটি রহস্যেঘেরা ও ব্যাখ্যাতীত। ফলে সময়ের পটে কালসন্ধ্যার পটভূমিকা অবধারিত, অনিবার্য ও অলঙ্ঘনীয়। তাই বলা যায় 'বিশ শতকের অস্থির কালবেলাই যেন এ-কাব্যনাটকের পটভূমি।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৪৬) যুদ্ধের পটভূমিকায় দার্শনিক বোধের উন্মেষ ঘটান বুদ্ধদেব। প্রকৃতপক্ষে,

> যুগসন্ধিক্ষণে যখন কালসন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে তখন অবক্ষয়িত সমাজে চিরন্তন মূলবোধের অবলুপ্তি ঘটে। *কালসন্ধ্যা* অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী, সৃষ্টি ধ্বংসের নিয়মে বাধা, যিনি প্রজ্ঞাবান, তিনি জানেন প্রকৃত প্রস্তাবে কাল অখণ্ড ও স্থির, সব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে ধ্রুব অপরিবর্তনীয় সত্য যা জন্ম-মৃত্যু রহিত। (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ১৩৪)

পুরাতনের আবরণে চিরন্তন মূল্যবোধের সংযোগ সাধিত হয়েছে বুদ্ধদেবের দর্শনচিন্তার সূত্রেই। 'মিথ ভেঙে এখানে ইতিহাসকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব এক দার্শনিক প্রজ্ঞায়।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪৪) পুরাণের *কালসন্ধ্যা* আধুনিক জীবনের প্রেক্ষণবিন্দুতে সন্নিবেশিত হয়ে এ নাট্য-আখ্যানে যে জীবনসত্যের সন্ধান দেয় তা হলো: কালের অমোঘ পরিবর্তনশীলতা জীবন ও সময়ের পটে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এ সত্য মেনে পরিবর্তন ধারণ করে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা। তাই বলা যায়:

> ভারত-পুরাণের মোষলপর্বের বাঁধাধরা কাহিনীর পথ ধরে এগোয়নি *কালসন্ধ্যা*; মহাধ্বংসের এক প্রেক্ষাপুরাণ নির্মাণ করেছেন বুদ্ধদেব। (মাহবুব, ২০০৯ : ৪৭)

মানব সভ্যতার ইতিহাস উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ক্রমে-অগ্রসরমান। মানব ইতিহাসের এ আদি সত্য এ নাট্য-আখ্যানে আধুনিক রূপাবয়ব লাভ করেছে। পৌরাণিক ফ্রেম ভেদ করে জীবনের প্রবহমানতার সূত্র নির্দেশিত হয়েছে এখানে। ফলে 'আলোচ্য নাটক যদিও মহাভারতের এক বিশেষ সময় ও পর্বকে অবলম্বন করে রচিত, তথাপি মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেও বুদ্ধদেব এই কাব্যনাট্যে তাঁর কবি মনোজীবনের মহাকাব্যিক বিশালতা এনেছেন।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৪) আবার, *মহাভারত*-এর উপেক্ষিত চরিত্র কর্ণের জীবনবোধের বিশালত্ব নির্মাণ করেন *প্রথম পার্থ* কাব্যনাট্যে।

প্রথম পার্থ

কুরু ও পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিনের ঘটনা *প্রথম পার্থ* (১৯৬৯) কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। *মহাভারত*-এর 'উদ্যোগ পর্ব'-এর ঘটনাবলিকে বুদ্ধদেব তাঁর দার্শনিক অনুধ্যানের জগতের অনুগামী করে সাজিয়েছেন। এ কাব্যনাট্য রচনার আরেকটি অনুপ্রেরণাস্থল হলো রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মর্তব্য: 'প্রথম পার্থ'র কাব্যবস্তু মহাভারতীয় হলেও এর উৎস মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাট্যকবিতাই নবরূপে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ভাগ্যবিড়ম্বিত, পুরুষকারে বিশ্বাসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের কাছে সমর্পিত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর কর্ণকে দিয়েছেন আরেক মহত্ত্ব। যিনি জয়-পরাজয়, সুখদুঃখ সব কিছুকে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেখেছেন।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৩) এ কাব্যনাট্য রচনায় বুদ্ধদেব বসু *মহাভারত* ও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও স্বকীয় ও আধুনিক শিল্পমনস্কতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ:

> রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখেননি, 'কর্ণকুন্তীসংবাদে' কবিতাই লিখেছেন... আর বুদ্ধদেব যেহেতু নাটকই লিখেছেন (যতই তার ভাষা হোক কবিতার), তাই নাট্যশুরুর আগেই 'স্থান: গঙ্গাতীরে এক বনভূমি' লিখতে পারলেন। আবার

রবীন্দ্রনাথ কবিতার মধ্যেই উক্তি প্রত্যুক্তিসূত্রে চরিত্রের নাম-উল্লেখ করেছেন। যেমন "কর্ণ প্রণমি তোমারে আর্যে"। সেখানে বুদ্ধদেব নাট্য প্রচেষ্টার প্রারম্ভেই 'পাত্রপাত্রী/কর্ণ, কুন্তী' প্রমুখ চরিত্রের উল্লেখ করতে পারলেন। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩০)

বুদ্ধদেব বসুর অভিলক্ষ্য কর্ণ চরিত্রে আধুনিক নিঃসঙ্গ ও বহুকৌণিক জটিলতায় আক্রান্ত মানবের অংশীদার হিসেবে প্রতিপন্ন করা। এ আখ্যানপটে মৌল দ্বন্দ্ব কর্ণকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, বুদ্ধদেব এখানে পৌরাণিক কর্ণের নবজন্ম দান করলেন। এ নাট্য-আখ্যানে:

> সমশক্তিধর দুইপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বে অর্জুনেরও নিহত হবার আশঙ্কা ছিল, ছিল কর্ণেরও। কর্ণ সম্পর্কে কুন্তীর একটা অপরাধবোধও কাজ করেছিল–এই সব মিলিয়ে তাঁর মনে যে-জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই নিরসন করতে তিনি কর্ণকে একবার রাজত্বের, আর একবার দ্রৌপদীর প্রলোভন দেখাতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্পূর্ণই মহাভারতের পরিকাঠামোকে অতিক্রম করে গিয়ে নতুন সংযোজন। মিথকে এখানে বুদ্ধদেব ভাঙেননি বটে, কিন্তু তার ওপরে নতুন একটি ভাবনা সংযোজিত করেছেন, যার ফলে সমস্ত কাহিনির অন্তর্লীন টানাপোড়েনের জটিলতাটা বেড়ে গিয়ে শিল্পঋদ্ধিই ঘটেছে। দ্রৌপদী কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন– এই ঘটনাটিও মিথের ওপরে নূতনতর এক প্লটের বিন্যাস করেছেন। (চন্দ্রমল্লী ২০১৫ : ২৩৬)

এ নাট্য-আখ্যানে বুদ্ধদেব বসুর মৌল উপজীব্য পুরাণের কর্ণকে আধুনিক জীবন, সংকট ও দর্শনের আলোয় নতুন করে আবিষ্কার করা। ফলে '*মহাভারতের* আত্মপরিচয়হীন মহাবীর কর্ণ মানবিক বেদনা ও নিঃসঙ্গতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ* (১৯৭০) কাব্যনাটকে।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৭০) মিথের ফ্রেম প্রায় অনুরূপ রেখে বুদ্ধদেব কর্ণের মনোজগতের অস্তিত্ব-আত্মপরিচয় সঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা এবং ক্রম-রূপান্তরের মধ্য নতুন জীবনদর্শন প্রতিভাত করেন। তার বিচ্ছিন্নতার এ নাট্য-আখ্যানের মৌল উপজীব্য। এ নাট্য-আখ্যানে:

> কর্ণ মৃত্যুর মূল্যে বেছে নিলেন মহত্ত্ব। আর এইখানেই কর্ণ স্বপ্রভ, উজ্জ্বল, মহনীয়। কালের যাত্রায় ব্যথিত, কালস্রোতে ভাসমান মহান বীর চরিত্র মানুষের হৃদয়সিংহাসনে চিরকালের জন্য সমাসীন হলেন। কৌরবরা পরাজিত, কৌরব পক্ষ হতোদ্যম, কিন্তু পাণ্ডবরা বেদনার্ত, বিচলিত; কুন্তী সন্তান হারানোর বেদনায় আর্ত, কাতরা, দীর্ণা। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৮২)

পরবর্তী কাব্যনাট্য *সংক্রান্তি* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শতপুত্র হারানোর দুর্বহ বেদনায় আচ্ছন্ন মাতৃহৃদয়ের স্বরূপ উন্মোচনেও বুদ্ধদেব আন্তরিক এবং বলা চলে সমব্যথীভাবাপন্ন।

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি (১৯৭০) কাব্যনাট্যের আখ্যান-বিভাবনায় বুদ্ধদেব বসু নির্বাচন করেন *মহাভারত*-এর কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিন তথা শেষতম দিনে কৌরবদের অনিবার্য ও করুণ পরাভবের আখ্যান। 'এই পতন-দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের যুদ্ধবাজ শক্তির পতনের সমান্তরাল রূপক রচিত হয়েছে। ... কালে কালে পৃথিবীতে যুদ্ধের মাধ্যমেই যে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি ঘটে তা অনুভূত হবে *সংক্রান্তি*র বিষয়-বিন্যাসে।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৮৭) বিগত সতেরো দিনের ভয়ানক, বীভৎস যুদ্ধবিক্ষুব্ধতার স্মৃতি রোমন্থন ও অন্তিম পরিণতি নিয়ে রচিত এ কাব্যনাট্যে মূল আকর্ষণ দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্যের মধ্য দিয়ে পাণ্ডবদের বিজয় রচনা করা।

> সকাল থেকে সন্ধ্যা–এই সময়পর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই নাটকে পুরাণের সীমানা অতিক্রম করে বুদ্ধদেব তাঁর বক্তব্যকে প্রসারিত করে দিয়েছেন সমকালে–সমকালীন মানববুদ্ধির বিনষ্টি ও বৈনাশিক প্রবণতাকে তিনি এখানে প্রতিচিত্রিত করেছেন। বিশ শতকের সত্তরের দশকে অস্থির হানাহানিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকেই যেন ধারণ করে আছে সংক্রান্তি। (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : একুশ)

মৃত্যুর বীভৎস মিছিলের অন্তরালে, ধ্বংসলীলার বিপরীতে নবজীবনের ইঙ্গিতময় উদ্ভাসন ঘটান বুদ্ধদেব। এ কাব্যনাট্যে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, জীবন-মরণ, পাপ-পুণ্যের বৈপরীত্যময় আয়োজনে রূপান্বিত হয়েছে নিবিড় ও গভীর দার্শনিক অনুধ্যান। 'সেদিক থেকে দেখলে 'সংক্রান্তি'-র ভাবগত সত্তা মূল মহাভারতের তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ অন্য তিনটির চেয়ে। এর আধ্যাত্মিকতা মূলত দুর্যোধনের মৃত্যুতে এসে একটি প্রমায় পরিণতি পেয়েছে, যা অবশ্য মহাভারত মিথের অনুষঙ্গে ছিল নেহাৎই গৌণ একটি উপলক্ষ্য। এদিক দিয়ে দেখলে গভীর এক দার্শনিকতা সত্ত্বেও 'সংক্রান্তি' আবার মহাভারতের মৌলিক প্রবণতা থেকে খানিকটা সরেও গেছে।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ৩৯) এ কাব্যনাট্যের আখ্যানের মতো বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনা*তে আখ্যান বিন্যাসে স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং স্বকীয় চেতনাকে শিল্পরূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

অনাম্নী অঙ্গনা

বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারত*-পরিভ্রমণের আরেক অনুপম শিল্প-স্মারক *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) কাব্যনাট্য। প্রধানত বিদুরের জন্ম-ইতিহাসের পূর্ব বৃত্তান্ত উপজীব্য এ কাব্যনাট্যের আখ্যান পটভূমি গড়ে উঠেছে পুরাণের এ খণ্ড-কাহিনি অবলম্বন করে রচিত এ কাব্যনাট্যে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মকথাও। 'মহাভারতের অন্যতম

এক অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত বুদ্ধদেবের অনবদ্য সৃষ্টি 'অনাম্নী অঙ্গনা'। (রাজীব, ২০১৯ : ৪৭) পুরাণের উল্লেখমাত্র দাসীর সত্তায় মাতৃত্বের মহান ও পবিত্র ব্রত জাগিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব।

> সে অনাম্নী কিন্তু নারীসত্তার জাগরণে সে এক বিশিষ্ট নারী, মাতৃত্ব তাকে মহিমান্বিত করেছে। (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ১৩৪)

এ আখ্যানের দার্শনিক ভিত্তিভূমি কামবোধ থেকে জাত গভীর ও চিরন্তন প্রেমানুভব। ''কাম যে অন্ধকারেই টেনে আনে তা নয়, তা আলোর পথেও নিয়ে যায়– এই ভাবনা বা তত্ত্ব 'বন্দীর বন্দনা' থেকে বারে বারে বুদ্ধদেব বলেছেন। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-তেও এই রূপান্তর দেখেছি; 'অনাম্নী অঙ্গনা-'ও তার দৃষ্টান্ত।'' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৬) অঙ্গনার এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নাট্য-পটভূমিতে সংযুক্ত হয়েছে সমাজের অন্ত্যজ, ব্রাত্য শ্রেণির সচেতনতা, সচেতনতার সূত্রে ক্রম-বলিষ্ঠ এবং শেষপর্যন্ত প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তিতে জারিত হয়ে সাহসিক উচ্চারণ। অঙ্গনার তন্তুবায়পুত্রের প্রতি প্রণয়, বিবাহ-পূর্ব সঙ্গমে ঘৃণা প্রভৃতি ঘটনাক্রমে বিপ্রতীপতা লাভ করেঃ এক রাত্রির মিলনে অঙ্গনার অতীত-আকাঙ্ক্ষার বিলোপ, ব্যাসদেবের প্রতি অনাগ্রহ এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু অসামান্য দক্ষতায়। সুতরাং

> ভরত বংশের কাহিনীর এই বিশেষ অংশকে গ্রহণ করলেও নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু এখানে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছেন। (মনীষা, 2025 : 592)

এভাবেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহ জগৎ ও জীবনের এমন এক বোধের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে যা একইসঙ্গে আধুনিক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। উল্লিখিত কাব্যনাট্যসমূহে পৌরাণিক পটভূমিকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক মননসঞ্জাত দর্শন ও জীবনসংকটের অভিমুখী করেন। 'তিনি কাহিনী *মহাভারত* থেকে সংগ্রহ করলেও সেই কাহিনীর অন্তর্গত বিষয়ের এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, যার মাধ্যমে নাট্য-ঘটনায় দার্শনিক ও মানসিক জীবন-সংকট প্রবলরূপে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৫১) এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, আর্ত ও পীড়িত বেদনা, ব্যক্তিচিত্তের নিঃসীম শূন্যতাবোধ, কামবোধ ও প্রেমচেতনার উপস্থাপনায় এ সকল আখ্যানপট বিশিষ্ট। বলা বাহুল্যঃ

> এদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মিথকে কীভাবে বুদ্ধদেব রদবদল ঘটিয়ে নতুন মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন, সেটি বিচার করতে গিয়ে রচনাকালগত নয়, সমগ্র কাহিনির পর্যায়গতভাবে বিশ্লেষণ করাই বাঞ্ছনীয়। আর তাতে বস্তুতই 'মহাভারত' কিছু অশুদ্ধ হবে না। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৫)

খ. নির্মাণ পরিকল্পনা ও সৃজনের মূলনীতি

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

বুদ্ধদেব বসু অনুসন্ধিৎসু শিল্পমানসের অধিকারী। পূর্বাপর নাট্যচর্চায় তিনি নাটকের ফর্ম নিয়ে বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অপরদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা নিয়ে তাঁর শিল্প-কৌতূহলের সূচনা যৌবনকালে। সৃজনশীল জীবনের প্রারম্ভ স্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ-উপজীব্য 'পতিতা' কবিতা বুদ্ধদেবের শিল্প-মানসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরই শিল্প-ফসল তাঁর *মরচে-পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা এবং *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬) কাব্যনাট্য ও *ইক্ষাকু সেন্নিন* (১৯৭১) অনূদিত নাটক।

> 'পতিতা'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন তাঁর অনুভূত সেই সত্য–প্রেমের স্পর্শ, ক্লিন্ন জীবন থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার করেছে পতিতাকে। ... সুন্দরের সংস্পর্শে ঘটে তার জন্মান্তর। ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মান্তর ঘটিয়েছেন এই পতিতার। রবীন্দ্রনাথও বদলে নিয়েছিলেন পুরাণ-কথাকে নিজের বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য। পতিতা নারীমণ্ডলী থেকে একজন ঋষ্যশৃঙ্গের সেবায় উৎসর্গিতআত্মা হয়ে নিজেই উদ্ধার পেয়েছিল–একথা রামায়ণ কাহিনীতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পতিতানারীর এই রূপান্তর-সূত্রটি প্রথমাবধি বুদ্ধদেবকে প্রাণিত করেছিলো। তবু কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন নি বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গের এই মিথকে সামগ্রিকভাবে তার আদিম সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করে এ নাটকে যেভাবে উপস্থিত করলেন, রবীন্দ্রনাথের পতিতায় সেভাবে তা নেই। (লায়েক, ২০১২ : ১৮)

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে এ মিথকথা নবনির্মাণের অভীপ্সা সম্পর্কে জানান:

> ... সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর *মহাভারতে*র আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খসমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান প'ড়ে চমকে উঠেছি– এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বাইরে কিছুই জানতাম না। ... প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না, বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত ক'রে তোলার মতো তহবিল আমার ছিলো না। সেগুলি সংগৃহীত হ'লো নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার ও ক্লাশ পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে, আর বিশ্বপুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত। (বুদ্ধদেব, ২০২৩ : ৭৮)

প্রখর যৌবনের ভাবনা কাঙ্ক্ষিত ও সুপরিকল্পিত ফর্মে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের নতুন ব্যঞ্জনা সৃজনে তাঁকে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অর্থাৎ *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যে সৃজনের মূলনীতি হিসেবে কাজ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের নতুন পাঠ নির্মাণ। ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের ঐক্য-সূত্র তিনি অনুসন্ধান করেন বিশ্বসাহিত্যের আনাচে-কানাচে। জাপানি

নাট্যকার কোম্পারু মোতায়াসু (১৪৫৩–১৫৩২)–এর *ইক্কাকু সেন্নিন* নামক নো নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইক্কাকুর সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বুদ্ধদেব ভাষ্যে: 'এই নাটকে যাঁর নাম ইক্কাকু, তিনি যে আমাদের চিরপরিচিত ঋষ্যশৃঙ্গেরই জাপানি অবতার তা কাউকে ব'লে দেবার অপেক্ষা রাখে না... কিন্তু শুধু রূপান্তর নয় এটাকে জন্মান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৪৫১) *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের অভিযোজনা প্রগাঢ় নান্দনিক মাত্রা লাভ করেছে। বিশেষ করে: 'রামায়ণ এবং মহাভারতে যে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনী আছে, সেখানে লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি এবং তার প্রতিকারস্বরূপ অপাপবিদ্ধ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে রূপসী বারাঙ্গনার ছলনায় বিভ্রান্ত করে রাজ্যে আনয়ন, মুনির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনাকে সংহিতায়িত করে ঘটনা পরম্পরায় বর্ণনা করা হয়েছে।' (কমলেশ, ১৯৮০ : ২৬) ঘটনা-বিন্যাস, পৌরাণিক ও আধুনিক জীবন ও সময়ের অন্বয় সাধনে এ কাব্যনাট্য অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

> নারী ও পুরষের মিলনের ফলে বৃষ্টি নামবে, বসুন্ধরা তৃণে শস্যে পরিপূর্ণ হবে এই ধারণা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিবলয়ের মানুষের মনেই সঞ্চিত আছে স্মরণাতীত কাল থেকে। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে অজস্র ধর্মাচার সর্বত্রই প্রচলিত আছে। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৮)

পুরাণের পাটাতনে নতুন বোধের সঞ্চারে তিনি স্বাধীনতাও নিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যে: 'আমার বক্তব্য এই– আর হয়তো বা বহু পাঠকের পক্ষে তা সহজেই অনুমেয় যে আমি এই কালভঙ্গ ঘটিয়েছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে, তার আন্তরিক প্রয়োজন ছিল ব'লে।... সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত– অর্থাৎ, একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। ... আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫২৯–৫৩০) পুরাকাহিনির আরেক কাব্যনাট্যিক রূপায়ণ *কালসন্ধ্যা*য়ও বুদ্ধদেবের একই মানসপ্রবণতা লক্ষণীয়।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু *মহাভারত*-এর মৌষল পর্বের কাহিনি-অংশ স্বতন্ত্র পরিবেশনরীতি ও আধুনিক জীবনরসে জারিত হয়ে কাব্যনাট্যিক রূপ পেয়েছে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে। উল্লেখ্য যে:

> নানা দেশের ও নানা যুগের কল্পনাচিত্র, যারা পরস্পরের দর্পণের কাজ করে আর কখনো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাও– এদের সংসর্গে স্থাপন ক'রে আমি দেখাতে চেয়েছি যে মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপ্যাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান। এই কথাটা অবশ্য ভারতবাসীদের অজানা নয়, তবু নতুন ক'রে বলারও প্রয়োজন আছে। (বুদ্ধদেব, ১৩৮৫ : ০৮)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী পরবর্তী কাব্যনাট্যসমূহ নির্মাণের মূলনীতি হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর শিল্পমানসে এ ভাবনাই কার্যকর থেকেছে। *মহাভারত*-এর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে গান্ধারী পুত্র ও স্বজনদের বীভৎস ও করুণ মৃত্যুর দৃশ্য দেখে মহারথী কৃষ্ণকে যাদব বংশের ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দেন। এ অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর বাস্তব রূপ পায়। গান্ধারীর অভিশাপানুসারে যদুবংশের অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচারে দ্বারকা নগরী চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভীষিকার সম্মুখীন হয়।

> এক-একটা যুগক্রান্তির সময় রাষ্ট্র সমাজনীতি মূল্যবোধ ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ– সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ্ হয়ে যায় এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার যাঁদের হাতে থাকে, তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েন। এই সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত হতে আমরা বারবার দেখেছি পৃথিবীর ইতিহাসে। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪২)

এ প্রতীতীকে হৃদয়ে ধারণ করে পৌরাণিক কাহিনি-অংশ আধুনিক জীবনের ও সময়ের অনুষঙ্গী ভাবসম্পদের আলোকে উপস্থাপনে বুদ্ধদেব প্রয়াসী হন। এর নির্মাণকলায় তাই পৌরাণিক যুগ ও বর্তমান যুগের ব্যবধান ঘুচে গেছে অনেকাংশে। 'পুরাণকাহিনি ও সমকাল একাত্ম হয়ে এ নাটকে সৃষ্টি করেছে কাল–উপলব্ধির এক ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : চৌদ্দ) বুদ্ধদেবের ভাষ্যে:

> বলা বাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব-ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৮১)

সুতরাং 'কাব্যনাটকটি *মহাভারত*-এর 'মৌষল পর্ব'-এর অন্তর্গত যদু বংশ ধ্বংসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও এর আবেদন চিরকালীন মানব-ইতিহাসের। কালের চরিত্র-চিন্তা-ভাবনা নিয়েই পুরাণ কাহিনী রচিত হয়, সে কাহিনীতে সুদৃঢ় অতীতের অন্তরচর্চা যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি তার স্খলন-পতন-তত্ত্বটির দীর্ঘশ্বাসও গোপন থাকে না। বুদ্ধদেব তাঁর নাট্যকাহিনীতে সেভাবেই তার কালকে ধরতে চেয়েছেন এবং ধরেছেন। এজন্যই তাঁর নাটকে গল্পের অন্তরালটি সতর্ক পাঠক ও চিন্তামনস্ক দর্শকের কাছে অধিকতর অন্বিষ্ট।' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৪৭)

এ নাট্য-আখ্যান বিন্যাসে বুদ্ধদেব বসু সচেতনভাবে চারটি উপবিভাগ সন্নিবেশিত করেন: **ক)** পূর্বরঙ্গ, **খ)** প্রথম অঙ্ক, **গ)** দ্বিতীয় অঙ্ক, **ঘ)** উত্তরকথন। প্রথম অংশের আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিতাভাস; দ্বিতীয় অংশে অনিবার্য বিপর্যয়ের অপ্রতিরোধ্য গতি; তৃতীয় অংশে চূড়ান্ত সর্বনাশের পটে মানুষের সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা এবং শেষাংশে চরম সর্বনাশের, ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে দৈন্য স্বীকার করে বিনয়ের পথে মানুষের অবস্থানকে সুচিহ্নিত করেন বুদ্ধদেব বসু। অর্থাৎ, এ কাব্যনাট্যের 'পূর্বরঙ্গ' অংশে দুই বৃদ্ধের কথোপকথনে দ্বারকাপুরীর দুর্লক্ষণ উচ্চারিত; প্রথম অঙ্কে দুর্লক্ষণের স্বরূপ উপস্থাপন; দ্বিতীয় অঙ্কে এসে কৃষ্ণের নির্বিকারত্ব ও অর্জুনের অক্ষমতার ফলে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা নাট্য-আখ্যানের ঘটনা ও নাট্যক্রিয়ায় দ্বন্দ্বমুখরতা সৃষ্টি; এবং 'উত্তরকথন' অংশে দ্বন্দ্বসংঘাতের দার্শনিক মীমাংসায় পৌঁছানো: এমন টান টান উত্তেজনায় নাট্য-আখ্যান পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ কেড়েছে।

> পুরোনো গ্রিক নাটকের Prologue এবং Epilogue আকারেই বুদ্ধদেব এ-দুটি লিখেছেন। 'পূর্বরঙ্গ' অংশটিতে রয়েছে যাদব বৃদ্ধের অন্তর্গত মনোলগ। ... এরা আসলে গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো আসন্ন ধ্বংসের রূপটি আভাসে পরিব্যক্ত করেছে। (মাহবুব, ২০০৯ : ৪৬)

তাছাড়া ইউরোপীয় প্রথাগত নাট্যবিভাজন অনুযায়ী দুটি অঙ্ক সংযুক্ত করেন তিনি। নাট্য-আখ্যান বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় তিনি যে নিরীক্ষাধর্মী ছিলেন, তা স্পষ্টত বোঝা যায়। উপযুক্ত প্রতিবেশ সৃষ্টি করে দ্রুতলয়ের ঘটনাবলির গ্রন্থনায় তীব্র নাট্যিক আবহ সৃষ্টি এ নাট্য-আখ্যানের অন্যতম বিশিষ্টতা হিসেবে চিহ্নিত। করুণ ও বীভৎস রসের আধারেও ভাবীকাল ইতিবাচকবোধে বিধৃত করেন বুদ্ধদেব। পুরাণ-যুগের নতুন ভাষ্য এভাবে নির্মাণ করেন বুদ্ধদেব বসু।

> একজাতীয় সংশয়োত্তীর্ণ মানসিক জিজ্ঞাসার দার্শনিক চেতনা আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যরস সৃষ্টির যেমন সহায়ক, তেমনি কাব্যরসের মাধ্যমে আগত তীক্ষ্ণ দার্শনিক জীবন জিজ্ঞাসা বা সত্যসমীক্ষা নাটকের শেষতম পরিণতিতে নাট্যিক রস মাধ্যমে পূর্ণতার পথগামী হয়েছে। এখানেই কাব্য নাট্য হিসেবে যেমন 'কালসন্ধ্যা' নাটকের গঠনকুশলতার সার্থকতার প্রশ্ন নিহিত, তেমনি ভূমিকাংশে বিবৃত গান্ধারীর অভিশাপের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সত্য তাৎপর্যকে কবি নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন, তাও সার্থকতা লাভ করেছে। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৫)

একইভাবে *প্রথম পার্থ* কাব্যনাট্যে চিরন্তন অভিজ্ঞতালব্ধ শাশ্বত সত্যের পুনর্মূল্যায়ন আধুনিককালের মিথস্ক্রিয়ায়। পুরাণের সত্য, ঐতিহাসিক সত্য আধুনিক ব্যক্তিমননের প্রচ্ছায়ায় নানা প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে নবরসের সঞ্চার করেছে কাব্যনাট্যটি।

প্রথম পার্থ

প্রথম পার্থ কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসুর মৌল আকর্ষণ পুরাণের কর্ণ চরিত্রের অন্তর্লোকে আধুনিক বোধসঞ্জাত নতুন পাঠ নির্মাণ করা। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কুমারী মায়ের সন্তানকে কানীন সন্তান বলা হতো। কর্ণ তাই কুন্তীর কানীনপুত্র। সমাজপ্রচলিত প্রথানুসারে কর্ণ তাই কুন্তীর স্বামী পাণ্ডুরাজের গোত্র লাভ করে। বুদ্ধদেব এ বিবেচনায় কর্ণকে 'প্রথম পার্থ' বলেছেন। এ কাব্যনাট্যে লক্ষণীয় যে, 'এ নাটকে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে কোনো নাট্যসংকটের, সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি কিংবা নাট্যঘটনা কোনো অনিবার্য পরিণামের দিকেও দ্রুত অগ্রসর হয়নি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মতো কোনো নাটকীয় উপাদান নেই।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৪৭) বরং এতে গ্রন্থিত হয়েছে কয়েকটি ঘটনার অভিঘাতে কর্ণ চরিত্রের অন্তর্দেশের স্বরূপ। এ কাব্যনাট্য তাই কর্ণের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব, সংকট ও তা থেকে মহত্তম বোধে উত্তরিত হওয়ার আখ্যান।

ব্যক্তিচরিত্র যখন জীবনসত্যের মুখোমুখি হয়ে দিকভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় মজ্জমান হয়, তখনও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে মহত্ত্বের পথে আশ্রয় নিতে পারে: কর্ণ বুদ্ধদেব বসুর তেমনই এক ব্যতিক্রমী নির্মাণ। মূলত: 'বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণের প্রতি আমাদের মনে এনেছন এক অন্যধরনের সম্মান ও মুগ্ধতা।' (সুমিতা, ২০২৫ : ২৫) কর্ণ অন্তর্দহনে পুড়ে পুড়ে কীভাবে আধুনিক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবে পরিণত হয়, তারই প্রক্রিয়া এ কাব্যনাটের নির্মাণ সৌকর্য নিয়ন্ত্রণ করেছে যেন। তার বিচ্ছিন্নতার বোধের ওপরই এ নাট্য-আখ্যান গড়ে উঠেছে।

> আমরা জানি নাট্যগুণ প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করে। এখানে চারিত্রিক সেই দ্বন্দ্ব আশ্রয় করেছে মাতা ও পুত্রকে। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩২)

তাই দেখা যায় চারটি প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় এ কাব্যনাট্য গতিশীল ও দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছে: **ক)** কুন্তী কর্তৃক কর্ণকে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দেয়া; **খ)** কর্ণ কর্তৃক মাতা কুন্তীর আবেদন প্রত্যাখ্যান; **গ)** স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদী কর্তৃক কর্ণকে প্রত্যাখ্যান **ঘ)** কর্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে ফিরিয়ে দেয়া। এসব ঘটনা কর্ণের মনস্তত্ত্বে গভীর ও গভীরতর বিষণ্নতার জন্ম দেয়। এখানে প্রথমোক্ত প্রত্যাখ্যানটি পরবর্তী-প্রত্যাখ্যানের ঘটনাকে অনিবার্য করে তোলে। ফলে কর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে আরও বেশি দ্বন্দ্বসংকুল। এ কারণেই:

> এই কর্ণ বস্তুত একটি নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া চরিত্র, যা প্রতিষ্ঠিত মিথকে বহিরঙ্গে লঙ্ঘন না করেও অন্তরঙ্গে অনেক বেশি ভাবঋদ্ধ করেছে, যা একান্তই আধুনিক মননের ফসল। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৮)

পুরাণে উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও নিঃসঙ্গ কর্ণের অভিমানী অথচ সংগ্রামী ও সত্যনিষ্ট কর্ণের উচ্চারণ, আচরণ, ভাব ও ভাবনা পুরো নাট্য-আখ্যানকে প্রভাবিত করেছে। বিচ্ছিন্নতার অখণ্ড ভাব প্রকাশে প্রচল নাট্যরীতির অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজন রাখেননি কাব্যনাট্যকার। কাব্যনাট্যের শুরুতেই বুদ্ধদেব জানিয়ে দেন এ আখ্যানের নায়ক সে।

> একজনের নাম এখনো করিনি।
> ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে। অপেক্ষমাণ, যেন চিন্তান্বিত।
> আমাদের মনে যে-চিন্তা, তাঁরও হয়তো তা-ই,
> কেননা আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক–
> পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪২)

এ কাব্যনাট্যের যাবতীয় আয়োজনের কেন্দ্রে যেমন কর্ণ, তেমনি *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্যের নায়ক বা চরিত্র না হয়েও নাট্য-আখ্যানের মৌল আকর্ষণবিন্দুরূপে বিন্যস্ত হয়েছে দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্য: ''দুর্যোধনের মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এনেছে নাট্য মুহূর্তকে।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৮)

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি কাব্যনাট্যের ঘটনাক্রম, বিষয়-বিন্যাস ও নির্মাণকলায় বুদ্ধদেব বসু নিয়ে এসেছেন বিষয়ানুগ পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং আধুনিক মন ও মননের প্রচ্ছাপ। 'ফলে, মহাভারতের উপাখ্যান আর ধূসর থাকে না, হয়ে ওঠে আবহমান মানব জীবনের বহমান ধারার সঙ্গী।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৯) আধুনিক যুদ্ধক্ষত সময়ের আলেখ্য নির্মাণে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন:

> মহাকালই মানবিক বুদ্ধি হরণ করে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে রোপণ করে উন্মাদনা। এই উন্মাদনাই যুদ্ধের জন্মদাতা এবং কালে-কালে যুদ্ধই উন্নত সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে। প্রতিটি সভ্যতার ক্রান্তিকালে ঘটে মানববুদ্ধির বিপর্যয়–ডেকে আনে সমূহ ধ্বংস। *সংক্রান্তি* সেই সামগ্রিক ধ্বংসের পুরাণচিত্র। (মাহবুব, ২০০৯ : ৮৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গান্ধারীর আবেদন* (১৯০০) নাট্যকাব্যের পটভূমিতে বুদ্ধদেব এ কাব্যনাট্য রচনার পরিকল্পনা করেন। তবে কুরুক্ষেত্রের পরিণতির উপস্থাপনায় 'রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতার দুর্মর স্মৃতি সত্ত্বেও 'সংক্রান্তি'র মৌলিকত্ব নিয়ে দ্বিমত নেই।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৭) পুরাণ কথাবস্তুর আধুনিক রূপায়ণে, পৌরাণিক চরিত্রের অন্তস্থলে আধুনিক চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিস্থাপনে, ভাষাকাঠামো ও সংলাপে কাব্যনাট্যরসাশ্রিত জীবনবোধ

সঞ্চারের শৈল্পিক দক্ষতায় বুদ্ধদেব বসু বিশিষ্টতার দাবিদার। এ মিথকথার পুনর্জন্মদানকল্পে দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্য বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরে বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চান যুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, মাতা-পিতাসহ স্বজনের রক্তাক্ত হৃদয়।

> মাত্র তিনটি চরিত্র–ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, সঞ্জয়ের সংলাপে এ নাটক পৌরাণিক সীমানা অতিক্রম করে সমকালের সমূহ সংকটকে ধারণ করেছে। তিনজনেরই বক্তব্যের মূল সূত্র দুর্যোধন। যুদ্ধের শেষ দিবসে পুত্র দুর্যোধনের মৃত্যু আশংকায় কম্পিত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী। (রাজীব, ২০১৯ : ৫১)

দুর্বিষহ যুদ্ধ বিপর্যস্ততা চিত্র উপস্থাপনে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন বুদ্ধদেব এ নাট্য-আখ্যানে। এ নাট্য-আখ্যানে পূর্বাপর গৃহীত হয়েছে করুণ, বীভৎস এবং সর্বোপরি শান্ত রসের ধারা। *কালসন্ধ্যা*, *প্রথম পার্থ* কাব্যনাট্যের ন্যায় এ কাব্যনাট্যের বহুল প্রচলিত নাট্যরীতির অঙ্ক, দৃশ্য বিভাজন নেই। একটি পূর্ণ দিবসের হত্যাযজ্ঞে বিধ্বংস মানবাত্মার ক্রোধ, ক্ষোভ, অক্ষমতা শিল্পরূপায়ণে বুদ্ধদেব বসু স্বকীয় রীতিকে গ্রহণ করেন এ কাব্যনাট্যে। অপরদিকে, একটি রাত্রের মিলনদৃশ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের সামান্য দাসীকে প্রেমের শক্তিতে আধুনিক নারীতে রূপাঙ্কিত করেন অনায়াসেই। এর সাক্ষ্য বহন করে *অনাম্নী অঙ্গনা* কাব্যনাট্য ।

অনাম্নী অঙ্গনা

অনাম্নী অঙ্গনা কাব্যনাট্যে মিথিক কথাবস্তু অভিন্ন রেখে বুদ্ধদেব নির্মাণ পরিকল্পনা করেন। '...অঙ্গনাকে অবলম্বন করে বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠিত মিথের মধ্যেই অভিজাত এবং সাধারণ, এই দুই বর্গের মানুষের জীবনচর্যার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জাত মূল্যবোধের তারতম্যের ব্যাপারটি যেভাবে চিহ্নিত করে প্লটের বিন্যাস ঘটিয়েছেন, সেই অবশ্যই মূল মিথীয় কাহিনির ওপরে একটি বিশেষ এবং নতুন মাত্রাকে অন্বিত করেছে। দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কিছু ভাবনা ও অনুভূতিকে শিল্পসৌষম্যের মাধ্যমে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতেও আধুনিককালের ভাবনারই অভিক্ষেপ দেখি।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩১)

বিদুরের জন্মের পূর্বের সূত্রের কাহিনি অংশে গুরুত্ব পেয়েছে 'রাজপরিবারের গৃহবধূরূপে সত্যবতী, অম্বিকা বনাম দাসী অঙ্গনা ও অন্য তিন দাসী; রাজপরিবারের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বনাম সাধারণ গৃহস্থের ছোটো সুখ, ছোটো আশার নীড়; রাজকন্যা ও রাজপুরুষের ইন্দ্রিয়গত শৈথিল্য ও ক্ষমতাহীনতার অকৃতকার্যতা বনাম দরিদ্রের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রেমবোধ, স্বপ্নরচনা; শেষ পর্যন্ত রাজপরিবারের আসন্ন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও আত্ম-কলহমুখর সর্বনাশের পাশে দাসীপুত্রের শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকতা ও মানবিকতার মন্ত্রণা।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৮) প্রভৃতি নাট্যদ্বন্দ্ব; যা এ কাব্যনাট্যের আখ্যানের আকর্ষণীয় দিক নিঃসন্দেহে। সমাজের নিচুতলার মানুষের শ্রেণিসচেতনতার বোধ, নিষ্করুণ

জীবন প্যার্টান এখানে কাব্যরস ও নাট্যরসে সমৃদ্ধ ও নান্দনিক হয়ে উঠেছে। এমন নান্দনিককতার উৎসমূলে রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর সমৃদ্ধ শিল্পাভিজ্ঞতা।

এ কাব্যনাট্যে প্রচলিত অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজনকে বাদ দিয়ে সংলাপ, মঞ্চনির্দেশনা, নাট্যদ্বন্দ্ব প্রভৃতির মাধ্যমে নাট্য-কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যান স্বচ্ছন্দে। বিশেষত মনোগত দ্বন্দ্বসূত্রে এ নাট্য-আখ্যান গতি পেয়েছে। তবে অ্যাখ্যান-বিন্যাসের দিকে দৃকপাত করলে এর চারটি স্তর পরিদৃশ্যমান হয় : **ক)** অঙ্গনা ও তার ত্রয়ী সখীর দৃশ্য; **খ)** অম্বিকা-সত্যবতীর দৃশ্য; **গ)** অম্বিকা-অঙ্গনার কথোপকথনের দৃশ্য; **ঘ)** বেদব্যাসের অঙ্কশায়িনী হওয়ার অভিজ্ঞতা-অনুভূতি প্রসঙ্গে অঙ্গনা-অম্বিকার কথোপকথন। এছাড়া এ নাট্য—কাহিনির সময়কাল ফাল্গুনের এক অপরাহ্ন থেকে আরম্ভ করে পরের দিন ভোরবেলা পর্যন্ত। অঙ্গনা ও তার তিন সখীর প্রণয় কথার উদ্ভাসনে বুদ্ধদেব বসু বসন্ত ঋতুকে নির্বাচন করেন। নাট্য-আখ্যানের ভাববিশ্ব প্রতিপাদনের জন্য যতটুকু সম্ভব প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। বহিঃপ্রকৃতি ফ্রেমে মানব মনের প্রকৃতির অনুসন্ধান করেন বুদ্ধদেব। এভাবেই: বুদ্ধদেব এক অসমাপ্ত পুরাণ-প্রসঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ পুরাণে রূপান্তরিত করেছেন। এ এক অবিস্মরণীয় নাট্যকীর্তি। (মাহবুব, ২০০৯ : ৫৭) এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে:

> *অনাম্নী অঙ্গনা* নাটকটি মহাভারতের মূল কাহিনির প্রারম্ভিক পর্যায়ের একটি উপলক্ষ্য তথা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মকাহিনির অনুষঙ্গে লেখা। 'প্রথম পার্থ' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অচির-প্রাক্কালে কুন্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎকারের সুপরিচিত প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। 'সংক্রান্তি' কুরুক্ষেত্র- সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে দুর্যোধনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে লেখা। আর 'কালসন্ধ্যা'র উপলক্ষ্য হল মহাভারতের মৌষলপর্ব, যেখানে যদুকুল বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে ও ত্রিভুবনজয়ী অর্জুনের পরাক্রম নিঃশেষিত। স্পষ্টতই মহাভারতীয় কাহিনির সুদীর্ঘপথের চারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাঁক, তাঁর এই নাটক চতুষ্টকের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছে। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩০)

গ. কাহিনি-বিন্যাস

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

এক অপাপবিদ্ধ মানবসত্তার বোধ ও চেতনায় প্রেমানুভবের জাগরণ এবং বহুবল্লভা নারীর দার্শনিক উত্তরণের কাহিনি চার অঙ্কে বিন্যস্ত হয়েছে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যে। এর প্রথম অঙ্কের ঘটনার ক্রমপ্রবাহের মধ্যে রয়েছে: অঙ্গদেশে আসন্ন খরা, দুর্ভিক্ষ ও দুর্দিনের আশঙ্কা; অঙ্গরাজ্যের সংকট পরিত্রাণের উপায় অপাপবিদ্ধ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গ করে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরে নিয়ে আসা; তরুণী বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীকে তপস্বীর তপোবনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত; ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে শান্তার অসম্মতি ও প্রতিবাদ: অংশুমান-শান্তার প্রণয়ের প্রসঙ্গ; রতিকলায় পারদর্শিনী তরঙ্গিণীর তপস্বীর আশ্রমে যেতে প্রথমে ভীত এবং পরক্ষণে লোলাপাঙ্গীর অনুপ্রেরণায় চলচঞ্চল ও পুলকিত হওয়া প্রভৃতি। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমের ছদ্মবেশী তরঙ্গিণীর আশ্রমে প্রবেশ; তরঙ্গিণীর ছলাকলায় ঋষ্যশৃঙ্গের অনঙ্গব্রত পালন ও তরঙ্গিণীর প্রস্থান; আশ্রম নারী সংস্পর্শে আসায় বিভাণ্ডক ক্ষুব্ধ; মাতা ও নারী সম্পর্কে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবিধ ভাবনা; তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তরঙ্গ দৃশ্য এবং চম্পানগরের বৃষ্টির শব্দ ও জনতার উল্লাস প্রভৃতি দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাবলি। নাট্য-কাহিনির তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাপ্রবাহে রয়েছে: তরঙ্গিণীর অন্তর্গত বেদনা; অঙ্গরাজ্যের সামূহিক সমৃদ্ধির চিত্র; তরঙ্গিণীর জন্য চন্দ্রকেতু অস্থিরতা এবং অংশুমানের শান্তার জন্য বিরহ; তরঙ্গিণীর ভাবান্তরের জন্য ঋষিকুমারের শাপে প্রসঙ্গ; সমস্ত জাগতিকতা বিমুখ তরঙ্গিণী পিতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া; শাপমুক্তির আবেদন নিয়ে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাওয়া; দ্বিতীয় অঙ্কের ন্যায় সজ্জিত তরঙ্গিণী স্বর্ণখোচিত দর্পণ তরঙ্গিণীর স্বগতোক্তিতে তপস্বীর প্রতি তার প্রগাঢ় প্রণয়বোধ প্রকাশিত প্রভৃতি। চতুর্থ অঙ্কের রাজকীয় জীবনের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অনাগ্রহ, আনন্দহীনতার প্রকাশ; বিভাণ্ডকের আগমন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ ফিরে না যাওয়া; শান্তা-অংশুমানের প্রণয়, তরঙ্গিণীর অপ্রকৃতিস্থতা ও তার সম্পর্কে ঋষ্যশৃঙ্গ অবগত হয়; শান্তাকে কৌমার্য, অংশুমানকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ এবং তরঙ্গিণীকে জন্মান্তরের দেখা হওয়ার সম্ভাব্যতা জানিয়ে কোনো এক অজানা পথের সন্ধানে বাইরে দিকে নিষ্ক্রান্ত হয়; অলংকারাদি পরিত্যাগ করে তরঙ্গিণী বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়; রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের আশীর্বাদধন্য শান্তা ও অশুমান; লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিমায় মঞ্চ ত্যাগ করা প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনির পরিসমাপ্তি।

কালসন্ধ্যা

কাহিনির সূচনায় 'পূর্বরঙ্গ' ভাগে দেখা যায় দুই যাদব বৃদ্ধ সম্প্রতি দ্বারকার দুর্লক্ষণ নিয়ে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন; তাদের বিজ্ঞ অনুমান কুরুক্ষেত্রের বীভৎস ও রক্তাক্ত তথা শোণিতক্ষরণের ধারা বেয়ে আরেক ধ্বংসলীলার সূত্রপাত

ঘটবে। কাব্যনাট্যটির প্রথম অঙ্কে যদুবংশের সামূহিক ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছে কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ও অর্জুনপত্নী সুভদ্রা দ্বারকাপুরীর প্রাসাদকক্ষের বাতায়নে দাঁড়িয়ে। সুভদ্রা ও সত্যভামা দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা, মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ-উচ্চারণ, জনতার উগ্রতা, মোহাচ্ছনতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন নগরীর বিধ্বংসী চিত্র উঠে এসেছে। বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা কৃষ্ণকে স্মরণ করলেও যদুবংশের আত্মধ্বংসযজ্ঞলীলা থেকে কৃষ্ণ নিজেকে স্বেচ্ছায় আড়ালে রেখেছে। দ্বন্দ্ব ও বধের খেলায় কৃষ্ণের নির্লিপ্ততার কারণে সকলে তাকে তিরষ্কার করে। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রৌঢ় অর্জুনকে দেখা যায় যদুবংশের ধ্বংসযজ্ঞে শোকে বিহ্বল। এ সংকটকালে কৃষ্ণের নির্বিকারত্ব অর্জুনকে ব্যথিত করে। কৃষ্ণকে ধিক্কার জানায় অর্জুন। প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে নারীদের আর্তস্বর: 'পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো।' কিন্তু বারবংবার কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়। অতর্কিতে দস্যুদলের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও শর শিথিল হয়ে খসে পড়ে ক্লান্ত, রিক্ত প্রৌঢ় অর্জুনের। কৃষ্ণহীন অর্জুন এক অন্তহীন শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়। 'উত্তরকথন' অংশে অর্জুন ও ব্যাসদেব—এর কথোপকথনে: ব্যাসদেবের নিকট অর্জুন তার অক্ষমতার প্রসঙ্গ ব্যক্ত করে। ব্যাসদেব জানায় দেবতার দানে অর্জুন শক্তিশালী ছিল; সে শক্তি এখন অপ্রয়োজনীয়; কৃষ্ণ তাই অন্তর্হিত এবং অর্জুনের তাই প্রস্থান করাও আবশ্যক। কেননা পাণ্ডবরা জীবন বৃত্ত-পরিক্রমা পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর এ রঙ্গমঞ্চে অর্জুনও একজন সাধারণ কুশীলব মাত্র। অর্জুনের শ্লথ চরণে বেরিয়ে যাওয়া এবং ব্যাসদেবের পুঁথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রথম পার্থ

এ নাট্য-কাহিনির যবনিকা উঠলে দেখা যায় আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুদ্ধের দ্বন্দ্ব-সূত্র, যুদ্ধের ফলাফল; কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কর্ণের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তারা কথোপকথনরত। মন্ত্রণাসভা থেকে কুন্তীর কর্ণের নিকট আসে, কর্ণকে তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন এবং মাতার অধিকার নিয়ে ভ্রাতার হাতে ভ্রাতৃহত্যা থেকে কর্ণকে বিরত থাকার আর্জি জানায়। এতে কর্ণ আবেগায়িত হলেও দ্রুতই নিজেকে সামলে নেয় এই ভেবে যে, মাতার নিকট সে ছিল পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত। রক্তের টান ও হৃদয়ের আবেগে কুন্তী কর্ণের নিকট এলেও দুই পুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনিবার্যতা রোধ করতে পারেনি। কর্ণ তাকে জানিয়ে দেয় মনুষ্যত্ব তার ধর্ম: তাই পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই তার ভ্রাতা সমতুল্য। কুন্তী ফিরে গেলে রাজপথ ছেড়ে বনপথের মধ্য দিয়ে এসে দ্রৌপদী কর্ণকে সমাসন্ন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় সূত্রপুত্র পরিচয়ের কারণে কর্ণ বরণ-অযোগ্য হিসেবে অসম্মানিত ও ব্যথিত হওয়ার ঘটনা, পারস্পরিক হৃদয়াবেগ প্রভৃতি তাদের কথোপকথনে উঠে

আসে। দ্রৌপদী কর্ণকে অর্জুনের শক্তিমত্ত সংহারব্রত সম্পর্কে অবহিত করলে কর্ণ জানিয়ে দেয় সে প্রেম ও আয়ু কোনটিরই ভিক্ষুক নয়। দ্রৌপদীও তাই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এবার কর্ণের নিকট এলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে কর্ণ জানিয়ে দেয় তার উদ্দেশ্য 'মানুষের কল্যাণ'। অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে জয়ী হতে চায়। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে জানায় এ যুদ্ধে কর্ণের পরাভব ঘটবে। কর্ণ তবু সংকল্পে অনড়। কৃষ্ণের প্রস্থান এবং দুই বৃদ্ধের কর্ণের মহত্ত্ব নিয়ে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংক্রান্তি

এ কাব্যনাট্যের সূচনায় রাজপুরীর প্রাঙ্গণে সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র কথোপকথনকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের আরম্ভ ধ্বনি বেজে ওঠে। হস্তিনাপুরের রাজপুরীর নিভৃত বেদীমণ্ডিত প্রাঙ্গণ থেকে ব্যাসের বরে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছে কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিনের ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ। সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথনে বিগত সতেরো দিনের রোমহর্ষক যুদ্ধচিত্রও উঠে এসেছে। সঞ্জয় যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনের ভীমসেন ও দুর্যোধনের মর্মান্তিক ও বীভৎস যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রকে। নাট্য-কাহিনির এ পর্যায়ে দেখা যায়, ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র পুত্র দুর্যোধন জীবিত, কৌরবদের সৈন্যবাহিনি রণক্লান্ত; অপরদিকে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ও কৃষ্ণ রয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। নাট্য-কাহিনির এ পর্যায়ের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে রয়েছেঃ ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ জয়ের আশা; যুধিষ্ঠিরের রণস্থলে জেনে ধৃতরাষ্ট্রের বিস্ময়; যুধিষ্ঠিরের অর্ধসত্য বাক্যে মানবহত্যায় ব্যথিত ধৃতরাষ্ট্র; শল্যের মৃত্যু; হতোদ্যম কৌরবসেনাদের নতুন উদ্যমে জাগিয়ে দুর্যোধনের পুনরায় যুদ্ধ শুরু; কুরু-পাণ্ডবের ধ্বংসমত্ত যুদ্ধ; আশাহত ও পরাজিত দুর্যোধনের কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ছেড়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয়; গান্ধারীর আগমন ও পুত্রশোকে বিলাপ; দ্বৈপায়ন হ্রদের জল থেকে উঠে পরিত্যক্ত রণসজ্জা পরে হ্রদের তীরবর্তী ভূমিতে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় দুর্যোধন; দুর্যোধনের পরাভব ও মুত্যু; গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক এবং দুর্যোধনের মৃত্যু মানব-ইতিহাসের ক্রান্তিকাল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে।

অনাম্নী অঙ্গনা

নাট্য-কাহিনির শুরুতে দেখা যায় হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের অলিন্দের সিঁড়িতে অঙ্গনা ও তার সখীরা দাসী জীবনের বঞ্চনার এবং জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করছে। আলাপচারিতা শেষে তাদের প্রস্থান ঘটে এবং অম্বিকা- সত্যবতী প্রবেশ করে। সত্যবতী অম্বিকাকে পুনর্বার পুত্রবতী হওয়ার জন্য ব্যাসদেবের নিকট যাওয়ার নির্দেশ

দিলে ব্যাসদেবের ভীষণ মূর্তি, কৃষ্ণবর্ণ, অপরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গ স্মরণে এনে অম্বিকা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। সত্যবতীর সঙ্গে কথোপকথনকালে অম্বিকা জানতে পারে ব্যাসদেব তার দেবর এবং সত্যবতী ধীবরকন্যা। এতে অম্বিকা চমকিত, বিস্মিত হয়। প্রবল অনাগ্রহ সত্ত্বেও রাত্রির দ্বিতীয় যামে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্বীকৃত হয়। রাজবধূ অম্বিকা তার হয়ে অঙ্গনাকে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে অনুরোধ জানায়। এ মিলনের শর্তে অম্বিকা অঙ্গনাকে দাসী জীবন থেকে মুক্তি দেবে– যা ছিল অঙ্গনার একান্ত কাম্য। অঙ্গনা এ প্রস্তাবে বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, দ্বিধান্বিত হলেও শেষপর্যন্ত সে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হয়। পরের দিন ভোরবেলা অম্বিকার সঙ্গে অঙ্গনার মিলন রাত্রি প্রসঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে অম্বিকার ঈর্ষাকাতরতা প্রকাশ পায়। নাট্য-কাহিনির অন্তিম পর্যায়ে অম্বিকা অঙ্গনার রূপান্তরিত সত্তা অনুভব করে; রূপান্তরিত অঙ্গনা আর দাসীজীবন মুক্তি চায় না : মাতৃত্বের অদৃশ্য অথচ তীব্র বন্ধনে জড়িয়ে যায় সে। এ বন্ধনেই তার মুক্তি। অঙ্গনার গানের মধ্য দিয়ে নাট্য-কাহিনি সমাপ্ত হয়।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহের কাহিনি বিন্যাসের প্রতি দৃকপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মহাভারত-এর নানা অংশ নিয়ে কাব্যনাট্য রচনায় মনোসংযোগ করেন। 'কেননা ১৯৬৫–৬৬ থেকে ১৯৭৩–৭৪ পর্যন্ত সমস্ত সময়কালটাই তিনি মূলত মহাভারতীয় মিথের ঘন অরণ্যেই অতন্দ্র অভিযাত্রীর মত ঘুরে বেড়িয়েছেন।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৫)

৪.২.৪ চরিত্রায়ণ কৌশল

রামায়ণ ও *মহাভারত*-এর আখ্যানপটে বুদ্ধদেব তাঁর শিল্পবিশ্বাসকে অনুপ্রবেশ করান চরিত্রের মাধ্যমে। পৌরাণিক চরিত্রসমূহকে নতুন বোধ ও চেতনায় পুনরুজ্জীবিত করার প্রক্রিয়াটি এমন যে, চরিত্রগুলো পুরাকালের বলে প্রতিভাত হয় না। 'মহাভারতে যে চরিত্রগুলো ছিল উপেক্ষিত, অনালোকিত সবলে সেই চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে তিনি পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। এই চরিত্রগুলো তর্ক করে, যুক্তি বিস্তার করে, পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে।' (রাজীব, ২০১৯ : ৫২) অর্থাৎ আধুনিকের আয়নায় তাদের স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে কাব্যনাট্যসমূহে। কেননা: 'জন্মসূত্রে মস্তিষ্ককোষে যে প্রবণতা, যে ভারতীয় ঐতিহ্যবোধ ও মানসিক প্যাটার্নের তিনি পরিপোষক, আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনবোধের সঙ্গে তার ব্যবধান ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রত্নস্বভাব ও অন্তর্গত প্রজ্ঞায় তিনি বহন করেন ভারতীয় বোধ-বিশ্বাস, জীবনদৃষ্টি ও জীবনসত্য এবং মেধা-মননের আনুকূল্যে অর্জন করেন পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্যদর্শন ও জীবনদৃষ্টি। প্রত্নপ্রজ্ঞায় ভারতীয় বোধের ধারক হলেও চৈতন্যের দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু আন্তর্জাতিক বোধের পরিপোষক।' (মাহবুব, ১৯৯১ : ৩১০)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

মিথের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন–এ দুয়ের মিথস্ক্রিয়ায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের ভুবন। এর প্রথশ শিল্প-ফসল *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্য। পুরাণ কাহিনির নতুন আখ্যান নির্মাণে, আখ্যানে প্রয়োজনীয় ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বময়তা সৃষ্টির অনিবার্যতায় এবং প্রতিপাদ্য দার্শনিক বোধের সহায়ক হিসেবে চরিত্রসমূহ সংযোজিত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। আখ্যানপটে গুরুত্ব ও ভূমিকা বিবেচনায় চরিত্রসমূহকে **ক)** মুখ্য চরিত্র এবং **খ)** নাট্য-সহায়ক চরিত্র দ্বিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ নাট্য-আখ্যানে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিণী। অন্যান্য চরিত্রসমূহকে নাট্য-সহায়ক চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। চরিত্রের ভূমিকা বিবেচনায় নাট্য-সহায়ক চরিত্রগুলোকে দুভাগে ভাগে করা হয়েছে: **ক)** প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: বিভাণ্ডক, লোলাপাঙ্গী, শান্তা, রাজমন্ত্রী, অংশুমান, চন্দ্রকেতু প্রমুখ; **খ)** অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: দুই রাজদূত, গাঁয়ের মেয়েরা, নেপথ্যে মেয়ে, পুরুষ ও বালক-বালিকার কণ্ঠস্বর এক ঘোষক, তরঙ্গিণীর সখীরা প্রমুখ। এ কাব্যনাট্যের চরিত্রায়ণ কৌশল প্রসঙ্গে স্মর্তব্য:

> পুরাণকে নতুন করে দেখা শুধু নয়, পুরাণকে একালীন করে তোলা তাঁর কাজ। অর্থাৎ পুরাণের সেইসব নর-নারীকেই তিনি বেছে নেন, যাঁরা তাঁরই মতো অস্তিত্বের সংকটে ও যন্ত্রণায় কাতর। (তরুণ, ২০০৭ : ৫৮)

এ কারণেই পুরাণের এক সামান্য বহুবল্লভা নারীকে এ কাব্যনাট্যের মূল ভূমিকায় স্থান পেয়েছে। আমরা জানি যে: 'পুরুষতান্ত্রিক ভারতবর্ষীয় সমাজে বহুকাল ধরেই নারীর অবস্থান প্রান্তিক।' (তাশরিক, ২০১৮ : ২৪৭) বুদ্ধদেব তাঁর নাট্য-আখ্যানের বিভাবনায় প্রান্তিক নারীকে উজ্জ্বল করে তুললেন। এ কাব্যনাট্যে কাব্যনাট্যকারের তরঙ্গিণী চরিত্র পরিকল্পনার মূল আকর্ষণ নতুনতর মানব দর্শনে উন্নীত হওয়া। তরঙ্গিণীর তারুণ্য এবং যৌবন কাটছিল মূলত মানব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সে নগর-বধূ; পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য দেহ উন্মোচন তার বৃত্তি। প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার এ প্রক্রিয়ায় সে মূলত দেখছে পাণিপ্রার্থীদের। অর্থাৎ, দেহপসারিণী তরঙ্গিণী সেই মানুষকে পাঠ করে। তরঙ্গিণীর নিকট পাণিপ্রার্থীর প্রাত্যহিকতার অংশমাত্র; তারা বৈচিত্র্যহীন, প্রেমহীন, আনন্দহীন। এটি তার মানব পাঠের একটি অধ্যায়। তরঙ্গিণীর মানবপাঠের আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা ঘটে অপাপবিদ্ধ ঋষিকুমারকে দর্শনের মধ্য দিয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শন তরঙ্গিণীর পক্ষে নতুনতর মানব অভিজ্ঞতা বটে। ছলচাতুরী ও কৌশলে তপস্বীর কৌমার্যনাশের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য ভ্রষ্ট করতে এসে তরঙ্গিণী যেন জীবনের শুদ্ধতম সত্তার সন্ধান পেল। এ মানব-অভিজ্ঞতা তরঙ্গিণীর চরিত্রে রূপান্তর ঘটায়। তপস্বীর দৃষ্টিপাতের প্রেমময় মুগ্ধতা তরঙ্গিণীর অন্তর্দেশ প্লাবিত করে।

তরঙ্গিণীর নিকট তপস্বীর অবয়ব ও দৃষ্টিপাত সবই অভিনব ও হৃদস্পর্শী। তপস্বীর পবিত্র ও সরল ও মুগ্ধতামিশ্রিত দৃষ্টিতে তরঙ্গিণী নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করে। মূলত:

> কাম যখন অন্ধ, তখন তা থেকে মানবাত্মাকে উদ্ধার করে প্রেম, কিন্তু কাম যখন উদ্দীপক, জীবনরসের সঙ্গী তখনই প্রেমের সঙ্গে তার ঘটে সত্যিকারের পরিণয়। এই বিশিষ্ট প্রেম-দর্শনকে বুদ্ধদেব তাঁর কবিসত্তার ক্রমবিবর্তনে একটা স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছে দিয়ে আধুনিক অস্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে নিজ চিন্তার সাজুয্য রচনা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে কবিচিত্তের সেই সহজাত উন্মেষ রোমান্টিকতা। প্রকৃতই বুদ্ধদেবের কবিজীবনে তা হয়ে উঠেছে 'বিশ্বজগতের লুকানো সম্বন্ধসূত্রের আবিষ্কারক'। (উত্তম, ২০০৮ : ২৪)

প্রাত্যহিক দেহবৃত্তি থেকে নতুন বোধে উত্তরিত হবার যাত্রাপথে বুদ্ধদেব বসু তরঙ্গিণী চরিত্রে বঞ্চনা, অভিমান ও আত্মপরিচয় অন্বেষণ ও তৎজাত সংকট সন্নিবেশিত করেন। তৃতীয় অঙ্কে মাতা লোলাপাঙ্গীর সঙ্গে আলাপকালে তরঙ্গিণী পিতা সম্পর্কে যখন জানতে চায় তখন তার মনের রূপান্তর টের পাওয়া যায়।

> কিন্তু-প্রথম যখন দেখা হ'লো–তিনি কি মুগ্ধ ছিলেন?... তুমি কি কেঁপে উঠেছিলে, তাঁর চোখে তোমার চোখ পড়লো যখন? তোমার কি তখন মনে হয়েছিলো তুমি অন্য কেউ? ...আমার যেন মনে হয় তোমার মুখের তলায় অন্য মুখ লুকিয়ে আছে। আমার পিতা তা-ই দেখেছিলেন। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৪৯)

তরঙ্গিণীর দীর্ঘদিনের জীবনাভিজ্ঞতার বিপরীতে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। বারাঙ্গনাবৃত্তি থেকে তরঙ্গিণীর কামহীন প্রেমময় চেতনায় উত্তরণ ঘটে। কিন্তু নাট্য-আখ্যানে ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্যতায় ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার বিবাহ তরঙ্গিণীর স্বপ্নভঙ্গের কারণ। এ স্বপ্নভঙ্গ তাকে অভিমানী করে। অভিমান থেকে তরঙ্গিণীর পূর্বের জীবনে প্রত্যাবর্তন ঘটেনি; বরং নতুনতর উচ্চতায় সে আসীন হয়। কাব্যনাট্যকারের অভীপ্সা অনুসারে সে বারবধূ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের সর্বপ্লাবী প্রভাবে তরঙ্গিণী হয়ে উঠলো তপস্বিনী। এভাবেই তার আত্ম-আবিষ্কার ঘটে। তরঙ্গিণীর আত্ম-আবিষ্কার ঘটে 'বস্তুতপক্ষে তাঁর নিজের মিথচর্যার আত্মোদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষায়।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৬) সমালোচক যথার্থই বলেন:

> প্রেম ও যৌনতা মানবজীবনের স্বাভাবিক দুই সম্বন্ধসূত্র। বুদ্ধদেব তাঁর কবিজীবনের বিবর্তনে তাকে বুঝে নিতে চেয়েছেন দার্শনিক প্রতীতিতে। প্রথম জীবনে কামের নিগঢ়ে বন্দী আত্মার তীব্র ছটফটানি আমরা লক্ষ্য করেছি, মনে হয় প্রায় অচিকিৎস্য সে কামচেতনা। জীবনে প্রেমের উদ্দীপনা তাকে শিখিয়ে ছিলো কামের কারাগার থেকে মুক্তির নিশানা। প্রেম সেখানে উদ্ধারকর্তা। কিন্তু শরীরবৃত্তের সঙ্গে মানসবৃত্তকে মিশিয়ে পূর্ণ যৌবনেই তিনি বুঝে নিয়েছেন যে কামের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে প্রেমের কোন বিরোধ নেই। (উত্তম, ২০০৮ : ২৪)

অপরদিকে নির্জন ও নির্মল তপোবনে নির্গুণ অবস্থার মধ্যে তপস্বীর বাস। তার মানব-অভিজ্ঞতা নেই; মানবের প্রতি আগ্রহও তাই নেই। পিতা বিভাণ্ডকই কেবল তার মানব দর্শনের অভিজ্ঞতার অংশ। পিতার দেহাবয়ব তাকে আকৃষ্ট করেনি কখনও। তরঙ্গিণী তার নতুন মানব-অভিজ্ঞতা লাভ করে। তরঙ্গিণীর দর্শন ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌতূহলী, মুগ্ধ ও প্রেমমগ্ন করে। তরঙ্গিণীর দর্শন তার পক্ষে 'দুর্লভ চিত্তপ্রসাদের' কারণ। নারী-সান্নিধ্য তপস্বীর চৈতন্যে ভাবান্তর ঘটায়, এবং অচিরেই তা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ তপস্বীর নির্গুণ থেকে স্বগুণের দিকে যাত্রা করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন:

> আসলে বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল ধরে মিথের একটি অতি প্রাচীন উপজীব্য নিয়ে মগ্ন ছিলেন যা তাঁর কবিতার মধ্যে বারংবার নানামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। খ্রিস্টীয় 'হোলি গ্রেইল' উপাখ্যানের কথা বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছেন 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কবিতার মুখবন্ধে। কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়, এই কাহিনির মধ্যে যে-মিথ লুকিয়ে রয়েছে, তার উৎসে রয়েছে ঊর্বরতাকেন্দ্রিক আদিম ধর্মধারার অনুষঙ্গ। নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে বৃষ্টি নামবে, বসুন্ধরা তৃণে শস্যে পরিপূর্ণ হবে এই ধারণা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিবলয়ের মানুষের মনেই সঞ্চিত আছে স্মরণাতীত কাল থেকে। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে অজস্র ধর্মাচার সর্বত্রই প্রচলিত আছে। 'হোলি গ্রেইল' মিথই হোক আর ঋষ্যশৃঙ্গ মিথই হোক, সেটি তারই রূপান্তর।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২২৮)

'হোলি গ্রেইল' মিথের চার জন গুরুত্বপূর্ণ সাধু হলেন সেন্ট জোসেফ অব আরমাথিয়া, সেন্ট লরেন্স, সেন্ট গালাহাদ এবং সেন্ট পারসিভাল। ব্রিটেনের মধ্যযুগীয় রাজা আর্থারের অন্যতম নাইট বা সাধু ছিল সেন্ট পারসিভাল; যার বেড়ে ওঠা ঋষ্যশৃঙ্গের মতোই নির্জন অরণ্য-মাঝে। তার পবিত্র গ্রেইল অন্বেষণ মূলত সত্য ও আত্মিক শুদ্ধির সন্ধান। প্রায় মানবসমাজস্পর্শহীন প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সন্তানের মতোই বেড়ে ওঠা ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের সূত্রে তাই পারসিভারের উল্লেখ বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। আত্মিক পূর্ণতা ও আত্মোপলব্ধির প্রতীক হিসেবে উভয় মিথের সাযুজ্য রয়েছে। তাছাড়া: ''এ বই-র 'মরচে পড়া পেরেকের গান' নামকবিতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত, যে কাহিনী আরো পূর্ণায়ত হয়েছে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে। প্রেম আর কামের দ্বন্দ্ব এখানে। ... ঋষ্যশৃঙ্গ তার শেষ অনুভূতিকে নিবেদনে রাখলেন প্রভাবে- 'আমি সেই ব্রহ্মলোকে স্থান পেলাম তার আলিঙ্গনে।' বুদ্ধদেবের প্রেমদর্শনটি পুরাণের গল্পেও স্থির-দীপ্ত।" (উত্তম, ২০০৮ : ৪৩) অপর এক নারী অর্থাৎ শান্তার সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে সে-প্রেম হারিয়ে ফেলছে। তরঙ্গিণীর সূত্রে যে অপার প্রেমের সঞ্চার ঘটে তপস্বীর হৃদয়ে, সেই প্রেমানুভবকে তপস্বী পরবর্তী সময়ে শান্তার সঙ্গে যাপিত জীবনে অন্বেষণ করেছে এক অন্তহীন ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গের ভাবনায়:

> গভীর–আরো গভীর, শূন্য থেকে গাঢ়তর শূন্য–
> সেখানে আমি হংস, আমি বংশীধ্বনি, আমি সর্বগ ও স্থাণু,

নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে আমি ব্যাপ্ত,

তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল–

তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হ'য়ে, তার বৈভবের অন্তরালে।

সে কোথায়? সে কে? তার নাম পর্যন্ত জানি না। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫৬)

এই ট্র্যাজেডিকে সে অতিক্রম করে গেছে তরঙ্গিণীকে ও জাগতিক সকল মোহ পরিত্যাগ করে; সে ডুব দিয়েছে আত্মমন্ত্র সাধনায়। শান্তার সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে তপস্বী অনুধাবন করেছে নারী-অবয়ব নারীকে ভালোবাসার কারণ হতে পারে; কিন্তু ভালোবাসার প্রকৃত রূপ নারী-অবয়বে বাস করে না। ভালোবাসা মনসিজ; বোধের কাছে তার আবেদন। ভালোবাসার প্রকৃত সত্য অন্বেষণে তপস্বীকে তাই নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করতে হয়েছে। '... শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তরঙ্গিণীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৬) কাঙ্ক্ষিত তরঙ্গিণীকে পেয়েও এবং এমনকি তরঙ্গিণীর তার সহযাত্রী হওয়ার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও সে তাকে সঙ্গে নেয়নি। ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা ভঙ্গের কারণ যে 'কাম'; নাট্য-আখ্যানের অন্তিমে সেই 'কাম' তাকে নতুনতর জীবনোপলব্ধিতে উৎসাহী করে। তার অন্বিষ্ট এখন সে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান। এ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তপস্বীর নতুন 'জার্নি'-র সূচনা ঘটে। প্রেমের প্রকৃত আনন্দ মূলত আত্মমন্থনে; আত্মবশে, আত্মনিমগ্নতার নিঃসঙ্গ অভিযাত্রায়। কেননা:

> যুগধর্মের বৈনাশিকতায় বুদ্ধদেব বসুর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ-জীবনসন্দিগ্ধ-শিকড়উন্মূলিত-বিশ্বাসবিচ্যুত, কখনও-বা সত্তাবিচ্ছিন্ন। (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৮৭)

পুরাণে উল্লেখমাত্র বারাঙ্গনাকে বুদ্ধদেব বসু নাম দিলেন লোলাপাঙ্গী। তার চরিত্রায়ণে: চতুরতা, লোভ-লালসা, বৈষয়িকতা, বুদ্ধদেবের ভাষায় 'জীবনের প্রতি অপ্রতিরোধ্য গ্রাস' এবং মাতৃত্বের বোধ। নাট্য-আখ্যানের প্রেক্ষাপটে লোলাপাঙ্গীর চরিত্রায়ণে নাট্যকারের অভিপ্রায়: '... লোলাপাঙ্গী চরিত্রটি যেন কখনোই 'কমিক' হ'য়ে না ওঠে... মনে রাখতে হবে তার পক্ষে অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৫) তপস্বীর কঠোর-কঠিন পৌরাণিক রূপ ও পিতৃস্নেহের প্রতিমূর্তি হিসেবে বিভাণ্ডক চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। বুদ্ধদেবের পরিকল্পনায়: 'বিভাণ্ডক হবেন 'কর্কদর্শন', তাঁকে রুক্ষ জটা ও দাড়িগোঁফ দেয়া যেতে পারে, গাত্র রোমশ হ'লে অসংগত হবে না।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৪–৭৫) পৌরাণিক নারীর মনস্তত্ত্বে আধুনিক অধিকার সচেতন মন ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠতা শান্তা চরিত্র পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। নাট্য-আখ্যানে অশুমান চরিত্রের

প্রয়োজনীয়তা মূলত শান্তা চরিত্রের সুদৃঢ় ও স্বকীয় ভিত্তি প্রদানে। একইভাবে, চন্দ্রকেতু চরিত্রায়ণে বুদ্ধদেবের মৌল অভিপ্রায় ছিল যৌবন উদ্দীপিত তরঙ্গিণীকে আরও প্রোজ্জ্বল ও প্রগাঢ়রূপে রূপায়ণ করা তথা বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীকে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তুলে ধরা; ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর প্রেমানুভবের গৌরবান্বিত করা; এবং সর্বোপরি তরঙ্গিণীর রূপান্তর-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সহায়ক চরিত্র হিসেবে। তাছাড়া নাট্য-আখ্যানের সবশেষ দৃশ্যে চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী তরঙ্গিণীকে হারিয়ে বেদনার্ত হয়েও জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলে। এখানে বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়:

> কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতনভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তারা, কেননা তরঙ্গিণীকে হারাবার পরেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণার; যেহেতু তারা সাধারণ, এবং পরাজিত, আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৫–৭৬)

বস্তুত, সংকট থেকে ব্যক্তির ক্রম-উত্তরণ এবং জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ের স্বরূপ নির্ণয় বুদ্ধদেব বসুর অন্বিষ্ট। কেননা : 'জীনবসংকটের নামান্তরই অস্তিত্বসংকট।' (সোহানা, ২০২০ : ১৬)

রাজমন্ত্রী রাজ্যের দায়িত্বশীল ও সামগ্রিক কল্যাণচিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। নাট্য-আখ্যানের সূচনায় অঙ্গরাজের বীর্যহীনতা, অক্ষমতার ফলে সৃষ্ট সংকট এবং শেষ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পটভূমিকায় সূত্রধরের ভূমিকায় রাজপুরোহিত চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। স্বল্প পরিসরে দুই রাজদূতের উপস্থিতি হলেও অঙ্গদেশের সংকট পরিত্রাণে বারাঙ্গনা নিয়োজিত হবে– গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্য পাঠকের নিকট তারাই পৌঁছে দেয়। অন্যান্য নাট্য-সহায়ক চরিত্র আখ্যানে গতিশীলতা, দ্বন্দ্ব-সংকট এবং মৌল প্রতিপাদ্যের প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়:

> ...ব্যক্তির মুক্তিই বুদ্ধদেবের অন্বিষ্ট। অথচ আত্মপ্রকাশের ভাষা তাঁদের অজানা। বুদ্ধদেব তাঁদের বাঙ্ময় করার দায়িত্ব নেন স্বেচ্ছায়। তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটান। তাঁর কাব্যনাট্যগুলি পড়তে পড়তে আমরা ফিরতে পারি না অতীতে, পৌরাণিক জগতে। পৌরাণিক চরিত্ররা সহজেই আমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠেন। তাঁদের ও আমাদের যন্ত্রণা একাকার হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসুর সিদ্ধিও সেখানেই। (তরুণ, ২০০৭ : ৫৮)

কালসন্ধ্যা কাব্যনাট্যেও পৌরাণিক কালের যন্ত্রণা ও দুর্বহ বেদনা আধুনিক কালের হয়ে ওঠে চরিত্রসমূহে পরিকল্পিত আন্তর্বৈশিষ্ট্যের সূত্রে।

কালসন্ধ্যা

মহাভারত-এর মৌষল-পর্বে পুত্রশোকগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ গান্ধারীর অভিশাপ মুখ্য বিবেচনায় রেখে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে বিশ শতকের জটিল ও অস্থির সময়কে রূপাঙ্কিত করেন। অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পরিণামবাহী জীবনবোধের সঞ্চারে এ কাব্যনাট্যের চরিত্রসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ কাব্যনাট্যের মুখ্য চরিত্রসমূহ হলো: সত্যভামা, সুভদ্রা, অর্জুন, কৃষ্ণ; প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: প্রথম বৃদ্ধ, দ্বিতীয় বৃদ্ধ, ব্যাসদেব প্রমুখ; এবং অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: কয়েকটি সুরাবিহ্বল অভিজাতবংশীয় পুরুষ ও রমণী, দ্বারকার বিবিধ জনতা (স্ত্রী ও পুরুষ), দুই প্রহরী, দস্যুদল, কয়েকটি নারী এবং অর্জুনের অনুচরবৃন্দ। যুদ্ধ যে জীবনে, জাতিতে, সভ্যতায় শুভত্ব কেড়ে নেয়; বধের উন্মত্ততায় মানবের দানবে রূপান্তরিত হয়– তারই আখ্যান সুভদ্রা-সত্যভামার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্ফুট হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। সুভদ্রা ও সত্যভামা চরিত্রকে এ নাট্য-আখ্যানের সূত্রধার হিসেবে পরিকল্পনা করেন বুদ্ধদেব। তাছড়া শাশ্বত নারীর রূপকল্প আভাসিত হয়েছে চরিত্রদ্বয়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত উল্লেখ্য:

> একটা বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন তার নিজের ভারেই ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে, তখন সেই রাষ্ট্রের ধাতা পুরুষেরাও ব্যর্থ হন সব কিছু অটুটভাবে টিকিয়ে রাখতে। অর্জুন এবং কৃষ্ণকে এ-নাটকে সেইরকম অসহায় মূর্তিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁদের সহধর্মিণীরা–সুভদ্রা ও সত্যভামা দ্বারকাপুরীর চিরন্তনী ঐতিহ্যবোধের অসহায় প্রতীকে এখানে চিত্রিত। কৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা ও সত্যভামা–এই চারজন নাটকের এক কোটিতে ; আর সমস্ত যাদবকুল তার বিপরীতে। ন্যায়, নীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ–এই সবগুলিকে ধরে রাখার নিষ্ফল আকুলতা দেখি প্রথম চারজনের মধ্যে। আর অন্যেরা সেগুলিকে বিধ্বস্ত করে এক উন্মত্ত আত্মঘাতনের লীলায় মত্ত হয়েছে। এই দুটি পরস্পর বিপ্রতীপ রাষ্ট্রিক-সামাজিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বই এই নাটকের মুখ্য চালনাশক্তি। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪৩–২৪৪)

সংকটাপন্নময় সময় ও সভ্যতায়, জীবনের বিপ্রতীপ গতি ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে যুদ্ধ যে কতটা নির্মম ও বীভৎসতার সৃষ্টি করে– তা নারীর দৃষ্টিতে এ নাট্য-আখ্যানে দেখালেন বুদ্ধদেব। যাদবগণের অস্ত্র আর হিংসার সংঘাতে দ্রষ্টা হয়েও নারীরা জীবনের প্রতি নঞর্থক হয়ে ওঠে না। বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের ধারক হয়ে তারা জীবনে আনন্দের অন্বেষী হয়। সুভদ্রা ও সত্যভামার কথোপকথনের অংশবিশেষ:

> এসো, অন্য কথা বলি, সত্যভামা,
> পুরানো দিনের কথা, অতীতের–
> আমাদের যখন যৌবন ছিলো– সেই সব দিন।
> বলো প্রেম, বলো সুখ–যুদ্ধ নয়, জয় নয়, রাজনীতি নয়–
> পুরুষ ও নারীর প্রণয়,

আলিঙ্গনে প্রাণবিনিময়, ...

অন্তরালে অন্য এক প্রাণ–

আনন্দে ও যন্ত্রণার জন্ম নেয় মাতার সন্তান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০৩)

যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রেমের; মৃত্যুর মিছিলে পৃথিবীতে শিশুর জন্মের অন্তরালবর্তী ইতিবৃত্ত সচেতনভাবেই সংযোজিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের দার্শনিক মননভূমিতে যুদ্ধের বিরোধিতা স্পষ্টীকরণে, ধ্বংসের আবহ ম্রিয়মান করে তোলার অভিপ্রায়ে নারীর কোমল হৃদয়ে প্রণয় ও মাতৃত্ববোধের উৎসারণ ঘটাতে এ দুই নারী চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের মহাবীর ও বলশালী অর্জুন এবং বিজ্ঞ পার্থের সারথি কৃষ্ণ বুদ্ধদেবের দার্শনিক ভাবনায় ভিন্ন রূপাবয়ব পেয়েছে। তাদের অলৌকিকত্ব, বলবীর্য ও অসীম ক্ষমতার বিপরীতে বুদ্ধদেব তাদের চরিত্র পরিকল্পনায় আনলেন সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ চরিত্রায়ণে জীবনের পটে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর ট্র্যাজিক বেদনাকে প্রগাঢ়তা এবং অর্জুন চরিত্রায়ণে সংগ্রামশীলতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অদম্য প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ এখানে ঘটনার অধীন নয়; বরং নিস্পৃহ, নিরুদ্যম। আর অর্জুন চরিত্রের অভিব্যঞ্জিত 'জীবিতের যন্ত্রণা'। 'এই পৃথিবী যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ, প্রতিটি নরনারী যেন কুশীলব। অর্জুন সেই কুশীলবের একজন।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৭১) তাই দ্বারকা নগরীর সাধারণ মানুষের মতো তারাও সময় ও ঘটনার পুতুলমাত্র, শিকার হয় করুণ পরিণতির। অর্জুনকে কৃষ্ণ বলে:

প্রথমত, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;

যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন–
সব দ্বন্দ্ব:
পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে।
এবং ফলত–
ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১১১)

একদিকে চরম বিপর্যয়, অপরদিকে কৃষ্ণের নির্লিপ্ততা নাটকে ঘটনা সংস্থাপনের বিপরীত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য করে তোলে। নাট্য-আখ্যানে একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত কালের এ বোধ অন্য কোনো চরিত্রে পাওয়া যায় না। সময় ও সভ্যতার অমোঘ পরিবর্তনের ধারায় আধুনিক মানুষ নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়; পরিবর্তন মেনে নিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা ব্যতীত তার আর উপায় থাকে না। মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তি ও বংশের বিনাশের আখ্যানে বুদ্ধদেব বসু পাঠককে যে জীবনসত্যের মুখোমুখি করেন তা হলো: 'কৃষ্ণ, অর্জুন এবং যদুবংশের এই পরিণতি সাধারণ মানুষকে একটি মহাসত্যে উপনীত হতে সহায়তা করে– পার্থিব ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, যৌবন, গৌরব

ইত্যাদি চিরস্থায়ী নয় বরং একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ, একদিন এসবের পতন অনিবার্য।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৩৮) ব্যাসদেব চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের প্রতিচ্ছায়া আবিষ্কার করা যায়।

> ...ব্যাসদেবের আড়ালে বুদ্ধদেব স্বয়ংই এখানে পুরাণের অনুসন্ধান করতে গিয়েও, কালচেতনার মধ্যে চিরন্তন সত্যসন্ধানী হয়ে উঠেছেন। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৭৩)

দুই যাদব বৃদ্ধ নাট্য-সূচনায় পৌরাণিক কালের সংযোগ সূত্র নির্মাণ করে। প্রথম বৃদ্ধের 'তবু বীজ থেকে বৃক্ষের উত্থান বীজ থেকে বৃক্ষের' এবং দ্বিতীয় বৃদ্ধের 'কেবল এটুকু: যাতে মানুষের সন্তানেরা বাঁচে';– তাদের এ দার্শনিক উচ্চারণ পুরো নাট্য-আখ্যানজুড়ে মর্মরিত যেন। পাঠক যখনই ধ্বংসলীলার মুখোমুখি হন, তখনই অকপটে স্মরণে আসে তাদের ভাবনা ও অনুমান। 'এরা জটিল, গূঢ়, গোপনীয়, আভাসী সংবাদকে দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের কাছে সরল করে ব্যাখ্যা করে।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩২) তাছাড়া ধ্বংসকামী, উন্মাতাল কামোন্মত্ত নারী-পুরুষ, দস্যুদল প্রভৃতি চরিত্রসমূহ নাট্য-আখ্যানের গতি ও দ্বন্দ্ব বিস্তারে ও রসব্যঞ্জনার প্রগাঢ়ত্ব সৃষ্টিতে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছে। পরিস্থিতি-নির্ভর ও নাট্যদ্বন্দ্বে আক্লিষ্ট চরিত্রগুলো কল্যাণকামী মানবীয় ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয় না। বরং বিনাশী সময়ের পটে দাঁড়িয়ে অতীতের সুখস্মৃতি, মানবীয় সুকুমার ভাবনা চরিত্রে বৈচিত্র্য ও গতিশীলতা আনে।

> ... কবির প্রাজ্ঞ জীবন নিষ্ঠা এবং বস্তুধর্মী দৃষ্টিকোণ বিপদ অতিক্রম করে চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ নাটকীয় তাৎপর্যেও পৌঁছেছে। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৪)

আমাদের পরিচিত পুরাণ-কাহিনিতে এভাবে আধুনিক দ্বান্দ্বিক চরিত্র-বিন্যাস বজায় রেখে বুদ্ধদেব বসু মুষলপর্বের নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহকে নতুন কালের মাত্রা সন্নিবিষ্ট করেন। একই পারঙ্গমতা বুদ্ধদেব বসু প্রদর্শন করেন *প্রথম পার্থ*-এ।

প্রথম পার্থ

বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রায়ণ কৌশলের অন্যতম দিক অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র মানস নির্মাণ। অন্তর্দ্বন্দ্বময় সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রবৈশিষ্ট্যে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের যন্ত্রণায় জীবনভর বেদনার্ত ছিলেন বুদ্ধদেব।' (বিশ্বজিৎ, ২০১১ : ২৭২) তাঁর ব্যক্তিজীবনের এ বোধে উদ্ভাসিত *প্রথম পার্থ*-এর কর্ণ চরিত্র। এ নাট্য-আখ্যান মূলত প্রথম পার্থ হিসেবে চিহ্নিত কর্ণের। তাই এ নাট্য-আখ্যানের মুখ্য চরিত্র কর্ণ। কর্ণ চরিত্রে বৈচিত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশের জন্য অন্যান্য চরিত্রের পরিকল্পনা করেন বুদ্ধদেব। কুন্তী, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ ও দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রমুখ চরিত্র-পরিকল্পনায় কর্ণের স্বরূপ সমুজ্জ্বল করার অভিপ্রায় ছিল বুদ্ধদেবের। এখানে প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র: কুন্তী,

দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণ; অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্রঃ দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অস্ত্রবীর, সত্যনিষ্ঠ, মহাপ্রাণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের তুলনায় বুদ্ধদেব বসু কর্ণ চরিত্রে আধুনিক মানবের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বকে বড় করে তোলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ সঙ্গে কর্ণের অন্তরাত্মা সাযুজ্য তৈরি করতে অক্ষম, বিচ্ছিন্নতায় ঘেরা তার পরিপার্শ্ব। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর চেতনাস্থিত নৈঃসঙ্গ্যবোধ স্মর্তব্য। আসলেঃ

> মিথ যাঁরা গড়ে তোলেন, শুধু তাঁরাই নন, যাঁদেরকে নিয়ে তা গড়া হয় সেই পৌরাণিক চরিত্রগুলিও কোনো-না-কোনোভাবে যূথবদ্ধ মানসিকতার অনুশাসনে বন্দী থাকেন। ব্যক্তিক অনুভূতি একান্তভাবেই আধুনিকতার জাতক, শিল্পবাণিজ্যনির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। আর তারই চূড়ান্ত অভিঘাত হচ্ছে মানসিকভাবে পারিপার্শ্বিক থেকে বিলগ্নতার অনুভব। মিথের কর্ণের চরিত্রে সেই আধুনিক অভিভাবনাই সংলগ্ন করে দিয়েছেন বুদ্ধদেব। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৪–২৩৫)

আধুনিক মানসিকতাসঞ্জাত কর্ণ তাই উচ্চারণ করতে পারেঃ

> আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।
> আমার সার্থকতা চেষ্টায়-সংগ্রামে।...
> কিন্তু আমি জানি, আমার পথ ভিন্ন,
> আমি অপ্রিয় দুঃসাধ্যের সাধক। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৮৫)

কর্ণের দুঃসাধ্য সাধনার স্বরূপ উন্মোচনে অন্যান্য চরিত্র এ নাট্য-আখ্যানে সংযোজিত হয়েছে। মাতৃহৃদয়ের অধিকার নিয়ে কুন্তীর আগমন, দ্রৌপদীর প্রেমের ভুবনে হাতছানি, কৃষ্ণের আবেদন– সমস্তকিছু প্রত্যাখ্যান করে কর্ণ নিজের পথ করে নিয়েছে। বস্তুতঃ

> আধুনিক মানসের যে দ্বন্দ্ববেদনা বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাটকে সোচ্চার। ভাগ্য ও দৈবের বিরুদ্ধে কর্ণের সংগ্রাম ও পরাজয়, আমাদেরই কৃতকর্মের স্মারক। অস্তিত্বকে বাঁচাবার জন্য আমরাও অবিশ্রাম সংগ্রামমুখর। (তরুণ, ২০০৭ : ৬৫)

কুন্তী আকস্মিক সংকল্পে উত্তেজিত হয়ে কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের জন্য গঙ্গা তীরে আসে। একদিকে তার ক্ষত্রিয় নারী সত্তা, অপরদিকে মাতৃসত্তারঃ এ দ্বিবিধ সত্তার দ্বন্দ্বসংকুলতা এ নাট্য-আখ্যানে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। গঙ্গার জলে যা কুন্তীর ভাষ্যে কালস্রোতে কর্ণকে ভাসিয়ে দেয়ার অতীত ইতিহাসের গ্লানিবাহী কুন্তীর মাতৃহৃদয় অন্যতম দিক।

আমি কিছু গোপন করবো না, আমার গোপনীয় কোনো কথা নেই।...
কিন্তু তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, কর্ণ,
এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আজ্ঞায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫৪)

দ্রৌপদী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিষয়ে কর্তব্যবোধে জাগ্রত করতে এলে আরেক ক্ষতবিক্ষত, প্রেমপিপাসু অথচ বঞ্চিত এক কর্ণ আবিষ্কৃত হয়। কৃষ্ণ পারেনি কর্ণকে তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে; এমনকি সমাসন্ন যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষাবলম্বী হবে জেনেও।

তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে–চিরকাল–
এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৪)

এ সত্য জেনেও কর্ণ সংকল্পে ও প্রতিজ্ঞায় অবিচল: প্রকৃত যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য এটাই। বস্তুত এ তিনটি চরিত্র পরিকল্পনার মূলে রয়েছে কর্ণ চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ সত্তার উন্মোচন। '... কাব্যনাটকে একটি চরিত্রের ভাবাবেগ অন্য আর-এক চরিত্রের ভাবাবেগের সঙ্গে নির্মমভাবে সংলগ্ন, প্রত্যাঘাত-প্রত্যাশী।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৫) বুদ্ধদেব বসু সে-টেকনিকই প্রয়োগ করে প্রায় সমগ্রতলস্পর্শী এক কর্ণের নবজন্ম দিলেন। আর তাই কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের ভাবাবেগে ভেসে না গিয়ে স্বকীয় চেতনায় স্থির থেকেছে।

আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েও আবেগে এই কর্ণ ভেসে যায়নি; অতি নাটকীয়তায় দৈবের কাছে হার মানে নি। এক ঔদাসীন্য ও বিষাদে আত্মমগ্ন থেকেছেন। যদিও তাঁর বুকে পরাজয়ের ক্ষত জ্বলন্ত। সেই জ্বালা নিয়েই কর্ণ বহির্ঘটনা থেকে সরে গিয়ে অন্তর্মুখী হয়েছেন। মৃত্যুর মূল্যে বেছে নিয়েছেন মহত্ত্ব। (তরুণ ২০০৩ : ১০৪)

এ নাট্য-আখ্যানে ঘটনা ও চরিত্রের সংযোজক হিসেবে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। নাট্য-আখ্যানের গূঢ়ার্থ প্রকাশে, প্রয়োজন বিবেচনায় নাট্য-আখ্যানে তথ্যের সংযুক্তিতে তারা অনন্য। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গ্রিক নাটকের কোরাস চরিত্রের মতো। প্রথম বৃদ্ধের সংলাপ: 'কর্ণের বংশপরিচয় যা-ই হোক, ব্যবহারে তিনি বীর।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৬৫); দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপ: 'কর্ণ, আপনি অঙ্গদেশের রাজা, কিন্তু আপনাকে কেউ রাজা কর্ণ বলে না,/ লোকের মুখে আপনার নাম দাতা কর্ণ।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫৭) দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপ: ' কে জানে কর্ণের উক্তির উৎস কী ছিলো,/ আক্রোশ, না বেদনা–ঈর্ষা, না মনস্তাপ।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৬৬) প্রথম বৃদ্ধের সংলাপ: 'কর্ণ বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও।/ তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ, কাল সূর্যোদয়ে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৫) প্রভৃতি সংলাপের বরাতে বলা যায় যে, নাট্য-আখ্যানের ঘটনাবলির বিশ্লেষক

ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমালোচক যথার্থ বলেন: 'নাটকে উপস্থিত দুই বৃদ্ধ শুধু ঘটনার সংযোজক নয়, ব্যাখ্যাকর্তাও। (তরুণ, ২০০৩ : ১০৫) অপরদিকে, *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্যে কাব্যনাট্যকার ঘটনা বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকারী হিসেবে পৌরাণিক চরিত্র সঞ্চয়কে নির্বাচন করেন।

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি কাব্যনাট্যে ত্রয়ী চরিত্রের বেণীবন্ধনে প্রতিফলিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর ভাববিশ্ব: ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয়। বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রায়ণ কৌশলে পৌরাণিক এসকল চরিত্রের মিথের আবরণ খসে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের চিরকালের সঙ্গী সঞ্জয় জানিয়ে দেয় এ কাব্যনাট্যের কথাবস্তুর কথক ও বিবৃতিকার তথা বার্তাবহ সে। 'কিন্ত বিবরণেই প্রচ্ছন্ন থাকে মন্তব্য'–ধৃতরাষ্ট্রের এ জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে বুদ্ধদেব পাঠককে সঞ্জয়ের বিজ্ঞদৃষ্টি সম্পর্কে অবগত করেন। তার বিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে ঘটনার বর্ণনার থরে থরে তার সংহত ও দর্শনমণ্ডিত মন্তব্যে। যেমন:

> যজ্ঞাগ্নিও নির্ধূম নয়, প্রভু
> তাতেও আছে অনিবার্য কালিমা। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২০৪)

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অন্তরালে সত্য-অসত্যের, ধর্ম-অধর্মের যে জাল বিস্তৃত– সঞ্জয়ের সংলাপে তাই নিহিত। কুরুক্ষেত্রের দশম দিনে কৌশলে অর্জুন কর্তৃক ভীষ্মকে শরশয্যায় বন্দি; ত্রয়োদশ দিনে কৌরব মহারথীদের চক্রান্তে অভিমন্যু বধ; চতুর্দশ দিনে অর্জুন কর্তৃক ভূরিশ্রবার ডান হস্ত ছিন্ন; অস্ত্রহীন ও ধ্যানরত ভূরিশ্রবাকে সাত্যকি কর্তৃক বধ; কৃষ্ণের সহায়তায় কপট সূর্যাস্তের সুযোগে অর্জুন কর্তৃক জয়দ্রথের শিরোচ্ছেদ; ভীমসেনের পদাঘাতে দুর্যোধন আহত ও দুঃশাসনের রক্তপান; 'অশ্বত্থামা হত-ইতি মাতঙ্গ'– কৃষ্ণের এ কুটিল পরামর্শসূত্রে যুধিষ্ঠিরের আংশিক মিথ্যাচারে দ্রোণাচার্য অস্ত্র ত্যাগ করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক তার শিরোচ্ছেদ প্রভৃতি অন্যায় যুদ্ধের ঘটনা স্মরণে নিয়ে সঞ্জয় এ মন্তব্য করে। এভাবে নাট্য-আখ্যানে পূর্বাপর উপস্থিত থেকে ও দর্শনমণ্ডিত উচ্চারণে সঞ্জয় চরিত্র বিশিষ্টতা হয়ে উঠেছে। এভাবেই:

> মিথের সীমানার মধ্যে থেকেও সঞ্জয় চরিত্রে নতুন একটি ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করেছেন বুদ্ধদেব, যে-সংযোজনটি এই নাটকের দার্শনিক অভিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। মূল মহাভারতের সঞ্জয় শুধুমাত্র দ্রষ্টা এবং প্রতিবেদক। এখানে সঞ্জয় ব্যাখ্যাতাও বটেন। গান্ধারী তাঁকে "দিব্যদৃষ্টি"–সম্পন্ন বলে সম্বোধন করেছেন। এবং সেই অভিধাকে সার্থক করে নাটকের পরিসমাপ্তিতে যে-কথা তিনি বলেছেন, তার মধ্যেই মহাকাল ও ইতিহাস নিয়ে মহাভারতের যা মূল সত্যোপলব্ধি বলে বুদ্ধদেব বসু সিদ্ধান্ত করেছেন, সেটি যথাযথভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪১)

এ কাব্যনাট্যে শতপুত্রের জননী গান্ধারী একমাত্র জীবিত পুত্রের অনিবার্য প্রাণনাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও মানবীয় শুভবোধ থেকে বিচ্যুত হয়নি। 'গান্ধারীর আবেদন'-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সক্রিয়তা তাঁর চরিত্রে সঞ্জাত করেছেন, সেটি নিঃসন্দেহেই ছিল প্রতিষ্ঠিত মিথের উপর নূতন এক সংযোজন। কিন্তু এ-নাটকে তাঁকে আমরা যেভাবে দেখি তাতে আর সব সত্তাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যাকুল এবং যন্ত্রণাদিগ্ধ মাতৃত্বই।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৪০) *গান্ধারীর আবেদন* (১৯০০)-এ 'রবীন্দ্রনাথও তাঁর গান্ধারীকে করেছেন ধর্ম ও সত্যের পূজারিণী। বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব এই তিনি সেই ধর্মশীলা নারীর অন্তরে স্নেহের প্রস্রবণ দেখেছেন।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৮) আমাদের চিরচেনা মায়ের প্রতিমূর্তি হিসেবে বুদ্ধদেব গান্ধারী চরিত্র পরিকল্পনা করেন। 'তিনি মানবী, সর্বোপরি জননী। রাজকীয় মহিমা নয়, সর্বাত্মক ধ্বংসের মাঝে রিক্ত শূন্য এক নারীর দীপ্তির প্রকাশ 'সংক্রান্তি'। (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ১৩৫)

আমি, এক নারী, নারীত্ব যার নিষ্ফল,
এক পত্নী, পতি যার মতিচ্ছন্ন,
এক রাজ্ঞী, রাজত্ব যার মর্মপীড়া,
এক মাতা, মাতৃত্ব যার অভিশাপ–
ধর্ম ছাড়া কোথাও যার আশ্রয় নেই,
সত্য ছাড়া কোথাও নেই নির্ভর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৬)

ক্ষমতালোভী ও গভীর বেদনাক্লিষ্ট মানবসত্তারূপে ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র নির্মিত হয়েছে এ কাব্যনাট্যে। ধৃতরাষ্ট্রঃ রাষ্ট্র তথা ক্ষমতা ধরে রাখে যে–তার নামের এ আক্ষরিক দ্যোতনা বুদ্ধদেব এ চরিত্রে সঞ্চারিত করেন। 'বুদ্ধদেব বসু এ কাব্যনাটকে অষ্টাদশ দিবসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতিচারণ এবং তাঁর বিষণ্ন মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই স্মৃতিরোমন্থন কোনো সুখকর ঘটনা নয়, বরং তা কুরুক্ষেত্রের সতের দিনের যুদ্ধের হত্যা-জিঘাংসা-ঈর্ষা প্রভৃতির বীভৎস-বিভীষিকায় ভরা।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৪৮) অন্ধত্ব, বৃদ্ধত্ব, অসহায়ত্ব সব মিলিয়ে দুঃসহ বেদনায় আচ্ছন্ন এ ধৃতরাষ্ট্র।

আমি,
অন্ধ, বৃদ্ধ, অক্ষম, অসহায়
ধৃতরাষ্ট্র। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৯)

তাছাড়া 'কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যাঁরা এইসব গৌণ চরিত্র– অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, তাদের এই মর্যাদাবিধান মূল মিথের কোথাও দেখা যায়নি। এই যে সংযোজনটুকু বুদ্ধদেব করেছেন, তাতে তাঁর মিথ-মনস্কতারই একটি বিশেষ দিক

প্রকাশিত হয়েছে।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৯) আবার *অনাম্নী অঙ্গনা*-য় বুদ্ধদেব *মহাভারত*-এর সামান্য দাসীকে শিরোনামায় রেখে কাব্যনাট্যের পরিকল্পনা করলেন। উল্লেখ্য যে:

> যে দুটি কাব্যনাটকের জন্য বুদ্ধদেব বসুর সমধিক খ্যাতি, তা হল *অনাম্নী অঙ্গনা* ও *প্রথম পার্থ*। মহাকাব্য মহাভারতই এদের বিষয় বা আকরস্থল। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৭)

অনাম্নী অঙ্গনা

এ কাব্যনাট্যের মুখ্য চরিত্র এক তরুণী কুমারী, অম্বিকার ব্যক্তিগত পরিচারিকা অঙ্গনা। এর প্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র; অম্বিকা: শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী এবং সত্যবতী: শান্তনুর বিধবা পত্নী, বিচিত্রবীর্যের মাতা। অপ্রধান নাট্য-সহায়ক চরিত্র পরিচারিকা অঙ্গনার তিন সখী। এ কাব্যনাট্যে কোনো পুরুষ চরিত্র পরিকল্পিত হয়নি। *মহাভারত*-এর বিদুরের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুনি পরাশর, রাজা শান্তনু, ভীষ্ম–কেউই এ নাট্য-আখ্যানে পরিকল্পিত হয়নি। অম্বিকার অতি সামান্যা এক দাসী যে কিনা মহাভারতকারের নিকট ছিল উপেক্ষিতা: এ কাব্যনাট্যের কেন্দ্রীয় বিভাবনায় সে স্থান লাভ করেছে। 'এরা ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর উচ্চম্মন্যতার বিপ্রতীপ অবস্থানে অবনমিত প্রান্তজন, যাদের নেই মানুষ হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা, অধিকারবোধ ও সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ।' (তাশরিক, ২০১৮ : ১৫৭) সমাজের এ শ্রেণিকে মর্যাদাসিক্ত করে তোলেন অঙ্গনাকে নাট্য-আখ্যানের কেন্দ্রীয় ভাবনায় বিবেচনায় রেখে।

> শুধু দেহসুখ নয়, অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনার জন্য ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জন দিয়ে বিদুরের জন্মকে অঙ্গনা সম্ভব করে তুলেছে। তাই এই ঘটা সাধারণ নাটকের বিষয় বস্তু নয়, তা কাব্যনাটকেরই বিষয় যেখানে বিদুরজননী অনাম্নী হয়েই ইতিহাসকে আবর্তিত করে তোলে। (তরুণ, ২০০৩ : ১০৭)

আর এতেই এ চরিত্রটি মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠলো। বুদ্ধদেব তার নাম দিলেন অঙ্গনা: অঙ্গনা অর্থ সুন্দর, সুগঠিত নারী। এ নাট্য-আখ্যানে অঙ্গনার প্রেম, আত্মপরিচয় নির্মাণ ও তাতে চিরন্তন মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল করে তোলা বুদ্ধদেব বসুর প্রধান আকর্ষণ।

> 'অনাম্নী অঙ্গনা' কাব্যনাট্যের মুখ্যচরিত্র যে-নারী, সেই বিদুরজননী তথা রাজবধূ অম্বিকার দাসী মূল মহাভারতে খুব স্বল্প সময়ের জন্য উল্লিখিত মাত্র–অর্থাৎ একেবারেই উপেক্ষিত চরিত্র। মিথের মধ্যে তাঁর যে-অস্তিত্ব অনুভব করা যায় সেটিও একান্তভাবেই পরোক্ষ। অথচ সেই দৃষ্টির আড়ালে-থাকা উপেক্ষিতা নারীকেই মহাভারতীয় নায়িকাদের অন্যতমা রূপে গড়ে তুলে প্রকৃতপক্ষে মূল মিথের উপর বুদ্ধদেব সার্থক এক সংযোজন করেছেন বললে ভুল হবে না। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩০)

অর্থাৎ এ কাব্যনাট্যের আয়োজন এ চরিত্রকে নতুন বিন্যাসে, নতুন আলোয় পুনরুজ্জীবিত করা। এ নাট্য-আখ্যানে শ্রেণিচেতনায়, ব্যক্তিত্বে, প্রেমে, মাতৃত্বে, জীবনতৃষ্ণায় তিনি অঙ্গনার আধুনিক রূপ নির্মাণ করেন বুদ্ধদেব। *মহাভারত*- এ উল্লেখমাত্র শূদ্র দাসী এ কাব্যনাট্যে সৌন্দর্যে-ব্যক্তিত্বে, নারীত্বের বিকাশে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্রথম প্রণয়ের আবেশ, কৌমার্য, সতীত্ব, রাজবধূর আদেশ ইত্যাদি অঙ্গনাকে দ্বিধান্বিত করেছে। 'বুদ্ধদেব বসু অপূর্ব কবিত্ব ও অসাধারণ নাটকীয়তায় অঙ্গনার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এই অংশে তুলে ধরেছেন।' (মনীষা, 2025 : 592) পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিবেশের আশ্রয়ে সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত নির্মাণের সূত্রে এ চরিত্রটি আধুনিক রূপ লাভ করেছে। '...আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী।'– দাসী মানেই যে আধেক নারী–অঙ্গনা তা মানে না। রানীর আদেশ মানকে সে বাধ্য হলেও 'তার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে সে সচেষ্ট। সেই পূর্ণ হয়ে ওঠার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিস্তীর্ণ 'এক নাটক'। (তরুণ, ২০০৩ : ১০৬) তার পূর্ণ হয়ে ওঠার আখ্যানই এটি। অঙ্গনার এ উচ্চারণে:

> প্রশ্ন উঠবে, এই শ্রেণীচেতনার বিদ্রোহ বা বিদ্রূপ কি মহাভারতের যুগে ছিল? এ-কি একান্তই আধুনিক যুগের কাব্যনাট্যকারের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়? মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধদেব বসু এই আধুনিক আর্টফর্মে নবনির্মাণ করেছেন ঐহিত্যবাহী কাব্যের পুনর্বিচারকে। মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়ড প্রভৃতি মহাকাব্যের অংশবিশেষকে নির্বাচন করে আধুনিক কবি যুগোচিত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রেনেসাঁস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসেও একই ব্যাপার অন্যরূপে ঘটতে দেখি। আবার অঙ্গনার উক্তি: "কিন্তু আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী।" এর মধ্যে সামাজিক বঞ্চনাজাত হতাশা প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাব্যরসকে নষ্ট করে নয়। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৯)

এভাবেই অঙ্গনাকে আধুনিক সাহসী পরিণত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানে। অঙ্গনা চরিত্রের ক্রম-রূপান্তর লক্ষণীয়: নাট্য-কাহিনির সূচনায় প্রেমিকের জীবসনসঙ্গী হতে চাওয়া তরুণী ও অম্বিকার নির্ভরযোগ্য দাসী; তিন সখীর সঙ্গে কথোপকথনে অঙ্গনা শ্রেণি-সচেতন; স্বাধীন ও প্রেমময় দাম্পত্যের স্বপ্নবিলাসিতা; অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাসদেবের সান্নিধ্যে নতুন বোধে রূপান্তরিত অঙ্গনা। রূপান্তরিত অঙ্গনার উচ্চারণ:

> যাকে আমি বহন করছি আমার দেহের মধ্যে,
> আমি তাকে জন্ম দিতে চাই, লালন করতে চাই
> এই রাজপুরীতে, হস্তিনাপুরে।
> ব্যাসের পুত্র–সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে,
> লালিত হবে অন্য কোনো সংসর্গে–
> আমার পক্ষে এই চিন্তা অসহ্য। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৭৭)

এ ভাবনাই তার উত্তরণের সূত্র। 'এই রূপান্তর, এই উত্তরণে সঞ্চারিত হয়েছে পুরাণের মধ্যে আধুনিক মানসের দ্বন্দ্ব বেদনা।' তরুণ, ২০০৩ : ১০৭) জলচিহ্নের ন্যায় ব্যাসের সংযোগের চিহ্ন মুছে যায় পুরাণের দাসীর শরীর থেকে। কিন্তু বুদ্ধদেবের সৃষ্ট অঙ্গনার অন্তরে থেকে গেছে সে-সংযোগের আবেশ। তার সে তন্তুবায়পুত্রের নিকট যেতে পারে না, মাতৃত্বের সুতীব্র বোধে এমনকি ব্যাসের বরে পাওয়া সন্তানের প্রকৃত পরিচিতির মাহাত্ম্যের ভাবনায় সে আধুনিক হয়ে ওঠে।

> এবং সামান্য এক শ্রমজীবিনী নারীর মধ্যে শুধু আত্মচেতন মর্যাদাবোধই নয়, সামাজিক শ্রেণিভেদজাত অপহ্নব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠার যে ব্যাপারটি বুদ্ধদেব এখানে রূপায়িত করেছেন, সেটিও এই বহুপ্রচলিত মিথটির মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি অভিনব সংশ্লেষণ। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৩)

এর ফলে অম্বিকা তাকে আর নিছক দাসী ভাবতে পারছে না। এর ফলে সে আধুনিক ব্যক্তিতে উপনীত হয়। অম্বিকা যেভাবে অঙ্গনার ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় ফিকে হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজা* (১৯১০) কাব্যনাট্যের সুদর্শনাও তার দাসী সুরঙ্গমার নিকট একইভাবে হেরে গিয়েছিল। এভাবে '... আপাত-তুচ্ছ এক নারীর চিত্তে প্রেম, ভালোবাসা ও অপত্যস্নেহের যে চিত্র বুদ্ধদেব নির্মাণ করেছেন, তাতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে আধুনিক কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর দীপ্র প্রতিকৃতি।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : পনের) তাছাড়া সত্যবতী, অম্বিকা, অঙ্গনা এ তিন নারী চরিত্রের আলোকে বুদ্ধদেব সামাজিক বিভিন্ন স্তরের নারীজীবনের বঞ্চনার চিত্র অঙ্কন করেন। এ নাট্য-আখ্যানে রাজকন্যা, রাজবধূ হয়েও অকালবৈধব্যে, সত্যবতীর আদেশে বৃদ্ধ-কুৎসিতদর্শন ব্যাসের সঙ্গে মিলন-আজ্ঞা পালনে, যৌবনের বঞ্চনায় অম্বিকাকে আধুনিক যন্ত্রণাজর্জর নারীতে উপনীত করেন বুদ্ধদেব।

অম্বিকা

তোর বিনয়বচনের অন্তরালে
আমি শুনতে পাচ্ছি অভিযোগ-মনোকষ্ট।
কিন্তু কে না জানে
আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় জীবন।

অঙ্গনা

অন্তত দাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই।

অম্বিকা

[তিক্ত স্বরে]

দাসী ব'লে দুঃখিত তুই, অঙ্গনা?

জানিস না,

আরো কত কঠিন শৃঙ্খলে

আমি, রানী, বন্দিনী। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৬১)

অম্বিকা ও অঙ্গনার কথোপকথনের স্পষ্টত বোঝা যায় 'একই সাথে বুদ্ধদেব বসু পৌরাণিক কাহিনী থেকে গৃহীত অংশে দেখিয়েছেন– নারীদের মধ্যেও সামাজিক স্তর, নিম্নস্তরের নারীদের অধিকার ও মর্যাদার কোনো সুযোগই ছিল না।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৪০) পৌরাণিক সত্যবতী রাজমাতা অথচ শূদ্রাণী এবং ব্যাসদেবের মাতা। অঙ্গনার ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পৌরাণিক ফ্রেম সুদৃঢ় করেছে সত্যবতীর অতীত জীবনের স্মৃতিচারণায়। পুরাণের খোলস ছেড়ে সত্যবতী জেনে গেছে: '... হীন জন্মেও ধন্য হ'তে পারে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৫৬) মানুষ। অঙ্গনার তিন সখীর সকৌতুক কলহাস্যমূলক আলাপচারিতায় অঙ্গনা ও তাদের প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা ও দাসীজীবনের নানামাত্রিক বঞ্চনার সুস্পষ্ট হয়েছে।

এভাবেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের চরিত্রায়ণ কৌশলে চরিত্ররা পৌরাণিক আবহ অতিক্রম করে গেছে আন্তর্চৈতন্যগুণে। আধুনিক মানসিকতায় পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত এ সকল চরিত্র জীবনালেখ্যে, দ্বন্দ্ববেদনায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। 'তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাই নিছক বর্তমান থেকে দূরবর্তী, অতীত যুগের মানুষরূপে দেখলে ভুল হবে, অন্তর্গত পরিচয়ে তারা সমকালীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালীন হওয়ার আবেদন রাখে।' (মনীষা, 2025 : 594-595) অর্থাৎ, পৌরাণিক চরিত্ররা আধুনিক মানুষ হয়েই তাঁর কাব্যনাট্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

> অতিমানব, দেবতা, বা দানব যিনিই হোন না কেন পুরাণের চরিত্রকল্পনার আধারে, শেষ পর্যন্ত তাঁর অতিকথার ভিতরে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি মানবীয় উৎকণ্ঠারই কোনো না কোনো ভাবরূপকে। (সরোজ, ২০০৮ : ২০৯)

৪.২.৫ মঞ্চনির্দেশনা ও নাট্যিকতা

কাব্যনাট্যকে মঞ্চ তথা অভিনয়যোগ্যতার গুণে গুণান্বিত হতে হয়। 'ভুললে চলবে না যে, যে-কোনো শিল্পের মতো কাব্যনাট্যও পাঠক বা দর্শক-সাধারণের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে না। বরং সাধারণ নাটকের মতো কাব্যনাট্যও যেহেতু মঞ্চ-সাপেক্ষ, তাই তাকে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে বরং আরও প্রত্যক্ষভাবে দর্শক-শ্রোতার রুচির পরিচয় পেতে হয়।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৫) বুদ্ধদেব বসুর কাবনাট্যসমূহ মঞ্চ-উপযোগী করেই রচিত হয়েছে। কলকাতাবাসের শুরু থেকেই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো এরূপ: 'আমি চেয়েছিলাম পুরোদস্তুর মঞ্চোপযোগী হতে, মেনে নিয়েছিলাম

শ্যামবাজারিক সব বিধিবিধান। পাঁচ অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, সখীবৃন্দ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত–কিছুই আমি উপেক্ষা করিনি।' (বুদ্ধদেব, ২০১৮ : ১২২–১২৩) কাব্যনাট্যশিল্পে কবির এ সচেতনতা কন্যাকে লেখা পত্র-সূত্রে জানা যায়:

> হঠাৎ একটা নাটক লেখায় হাত দিয়েছি–দুটো অঙ্কের খশড়া তৈরি হয়েছে, আর-এক অঙ্ক হ'লে শেষ হয়, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে শক্ত। লিখি আর ভাবি, কী হবে? হয়তো অভিনয়যোগ্য হবে না, বই বেরোলেও বিক্রি হবে না। ...তবে শঙ্কু খুব উৎসাহ দিচ্ছে আমাকে, আর শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের নাটুকে দল বেশ কয়েকটা তৈরি হয়েছে আজকাল, তাদের পুঁজি বেশির ভাগ বিদেশী নাটকের অ্যাডাপ্টেশন, সেদিক থেকে অন্তত একটা সম্ভবপর চাহিদা আছে। দেখা যাক। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১১৭)

পরবর্তী সময়ে তাঁর সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহে তাঁর এ সচেতনতার প্রমাণ মেলে। তাঁর কাব্যনাট্যের মঞ্চ-উপযোগিতা সম্পর্কে স্মর্তব্য:

> মঞ্চে সফল নাটকের এমন শ্রবণসুখকর ভাষাই বা আমরা কবে কোথায় পেয়েছি? একান্ত পাঠে তা যত সুখদায়ক, শ্রবণে ততটাই রোমাঞ্চকর; আর তেমনি তার আলোকিত উদ্ভাস মঞ্চে এক সফল নাটক হিসেবে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০)

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, নৃত্য, সংগীত, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি কাব্যনাট্যের মঞ্চায়ন প্রক্রিয়া পূর্ণতা প্রদান করে। যথাযথ মঞ্চায়ন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে প্রকৃত নাট্যরস জমে ওঠে। দময়ন্তী বসু সিং বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য মঞ্চস্থ হওয়া বিষয়ে বলেন:

> 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' লেখায় হাত দিলেন। বাঙালি পাঠক জানেন জীবনের শেষ দশকে বুদ্ধদেব বসু অনেক নাটক লিখেছিলেন। অসাধারণ সব নাটক। এর মধ্যে যে ক'টি নাটক আমার মঞ্চে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সবই অতি অভিনয়যোগ্য। ... আমার দুঃখ তিনি দেখলেন না থিয়েট্রনের বারংবার অভিনীত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'প্রথম পার্থ', স্বপ্নসন্ধানীর 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'কলকাতার ইলেকট্রা', নান্দীকারের 'পাতা ঝ'রে যায়'। তাঁর নাটকের কাব্যময়তা কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসুকে অন্য এক স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। শ্রুতিনাট্য হিসেবেও তাঁর কাব্যনাট্য বিশেষ আদৃত। ... মঞ্চে তাদের সার্থক না হবার কারণ দেখি না। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১১৮)

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বুদ্ধদেব বসু মঞ্চায়ন-প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে কাব্যনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী ৪ অঙ্কের নাটক। নাটকটির অঙ্কগুলির মধ্যে দৃশ্য-বিন্যাস মুছে দেওয়া হয়েছে। (পত্রিকায় প্রকাশকালে ছিল।) কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে, দৃশ্য-বিন্যাস পরিকল্পনায় নাট্যকার সচেতনভাবে এক একটি সূত্র রেখে গেছেন যা থেকে প্রযোজক এই অণুদৃশ্যগুলিকে ভাগ করে নিতে পারেন।' (লায়েক, ২০১২ : ৩২) সরাসরি

দৃশ্যবিন্যাসের অভাব বুদ্ধদেব এভাবেই পূরন করে দেন। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যের মঞ্চনির্দেশনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানান: 'আমি ইচ্ছে ক'রেই নাটকের মধ্যে মঞ্চনির্দেশ বেশি দিইনি, দক্ষ পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন কোথায় কী-রকম অঙ্গভঙ্গি প্রয়োজন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৪) তাছাড়া 'নাটকটি প্রযোজনার জন্য বুদ্ধদেব যে নির্দেশাবলি সংযোজন করেছেন, তাতে মনোসংযোগ করলে তাঁর অভীপ্সা সম্পর্কে একটি সুদৃঢ় ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ২৮৬) এ কাব্যনাট্যের 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ অংশে' বুদ্ধদেব বসু এ কাব্যনাট্যের মঞ্চরূপ বিষয়ক প্রতিটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ নির্দেশনা প্রদান করেন: যা তাঁর অন্যান্য কাব্যনাট্যের মঞ্চায়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঠক, দর্শক কিংবা নাট্যনির্দেশক সম্যক ধারণা লাভ করতে সহায়তা করে। তিনি এ নাট্য-আখ্যানের দীর্ঘতা যেন মঞ্চায়নের পক্ষে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে-বিষয়ে বুদ্ধদেব জানান:

> আমি জানি, এই দীর্ঘতা আধুনিক মঞ্চের পক্ষে উপযোগী নয়, তবে আমার বিশ্বাস নাটকটিকে মর্মাঘাত না ক'রেও কোনো-কোনো অংশ বর্জন করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে আমি অভিনয়ের জন্য একটি সংক্ষেপিত লেখন রচনা ক'রে দিতে পারি। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৭)

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র মঞ্চসজ্জা, পাত্র-পাত্রীর বেশবাস, প্রসাধন, আলোকসম্পাত, সংগীত, অভিনয়কলা, অভিনয়ে দৃষ্টিপাতের সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নির্দেশনা প্রদান করে বুদ্ধদেব বলেন: 'আশা করি আমার এই পরামর্শগুলি মঞ্চশিল্পীরা বিবেচনা ক'রে দেখবেন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৭) এ কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীর বেশবাস নিয়ে তাঁর পরামর্শ: 'পরিচ্ছদের জন্য বেশি অর্থব্যয় করা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে মেয়েরা, ভূমিকা বুঝে, নিজেদের মূল্যবান বা আটপৌরে শাড়ি ও চেলি পরতে পারেন, তবে শাড়ির বিন্যাসভঙ্গিতে পুরাকালের একটা আনুমানিক আস্বাদ থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর বেশভূষায় প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণ চলতে পারে। ...বিভাণ্ডক ও তপস্বী অবস্থায় ঋষ্যশৃঙ্গের পক্ষে কোরা থানধুতি ও উত্তরীয় সংগত হবে অথবা কাপড়টাকে বাকলের রঙে ছুপিয়েও নেয়া যায় ঋষ্যশৃঙ্গের ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বা অংশত অনাবৃত থাকলে ক্ষতি নেই। (আমার বিশেষ অনুরোধ: তপস্বী দু-জনকে কখনোই যেন গেরুয়া পরানো না হয়।) রাজপুরোহিতের বসন হবে লম্বিত ও নিষ্কলঙ্ক ধবল।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৪) নাট্য-আখ্যানের পাত্র-পাত্রীদের পোশাক বিষয়ে কাব্যনাট্যকারের ভাবনা তাঁর সুপরিকল্পিত নাট্যবোধের পরিচয় বহন করে। কেননা: 'মঞ্চে একটি সুপরিকল্পিত পোশাকের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।' (ফাহমিদা, ২০২৪ : ২৭৭) এছাড়া কাব্যনাটকটির সুষ্ঠু ও সুচারু মঞ্চায়ন এ মর্মবাণীকে পরিস্ফুট করতে সবিশেষ সহায়তা করবে এ বিবেচনায় তিনি চরিত্রের সাজসজ্জা নিয়েও অভিমত প্রদান করেন। তিনি

বলেন: 'প্রসাধনশিল্পীর পক্ষে কয়েকটি কথা স্মর্তব্য: ঋষ্যশৃঙ্গ অতি তরুণ, প্রায় কিশোর, তাঁকে প্রথম দেখে দর্শকদের সেই ধারণা জন্মানো চাই। চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে 'অন্যরূপ' দেখাবে অনেক বেশি পরিণত ও পুরুষোচিত।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩: ৭৪) নাট্যমঞ্চে যথাযথ আলোর প্রক্ষেপণ নাট্য-আখ্যানের পক্ষে প্রাণস্বরূপ। এ কাব্যনাট্যের ভাবাদর্শ-অনুগামী আলোর প্রয়োগবৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর অভিমত:

> দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যখন বৃষ্টি এলো, নাটকের সমাপ্তিকালে এবং অন্য কোনো-কোনো স্থলে, শিল্পিত আলোকসম্পাতের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু তার ব্যবহার প্রসঙ্গোচিত ও পরিমিত না-হ'লে উদ্দেশ্যের পরাভব ঘটবে। আলোকসম্পাত যেন নিজগুণেই দ্রষ্টব্য হ'য়ে না ওঠে, এই আমার বিশেষ অনুরোধ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৫)

এ নাট্য-আখ্যানে উচ্চহাসির অবকাশ বুদ্ধদেবের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বহির্ভূত। সংগীত, নেপথ্যসংগীত ও যন্ত্রসংগীত প্রভৃতির প্রয়োগকৌশল নিয়ে বুদ্ধদেব বসু নির্দেশনা প্রদান করেন। 'বলা বাহুল্য, সংগীতের সুরযোজনা মৌলিক ও উৎকৃষ্ট হ'লে প্রয়োজনার সৌষ্ঠব অনেক বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় অঙ্কের গান দুটির সুরে তীব্র আদিরস ধ্বনিত হ'লে ভালো হয়, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে শান্তার গানটি হবে বিষণ্ন ও বিধুর। শান্তার গানের সঙ্গে যন্ত্রসহযোগ না থাকা ভালো, যেন সে একা ঘরে আপন মনে গুনগুন করছে, এই ভাবটি অক্ষুণ্ন রাখতে পারলে তার বেদনা আরো সহজে পরিস্ফুট হবে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৫) মূলত সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগে এ কাব্যনাট্যের ভাবাদর্শ প্রকাশের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চরিত্র অভিনেতার অভিনয় দক্ষতা, বিশেষত তপস্বী অবস্থা থেকে সাংসারিক গণ্ডিতে ঋষ্যশৃঙ্গের পরিবর্তন বিষয়ে অভিনয়শিল্পীর কলানৈপুণ্য ও সচেতনতা প্রয়োজন। এক বছরের ব্যবধানে:

> জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ, এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা–এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ঐ সাংসারিকতা-রাজবেশের মতোই তাঁর ছদ্মবেশমাত্র; যে-মুহূর্তে লোলাপাঙ্গীকে দেখে তাঁর চমক লাগলো (মাতাকে দেখে কন্যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক), তারপর যখন 'তরঙ্গিণী' নামটি শুনতে পেলেন, সে মুহূর্ত থেকেই জেগে উঠতে লাগলো তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা: তরঙ্গিণীকে চোখে দেখার পর থেকে নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তার কোনো লুকোচুরি আর রইলো না। তাই, যখন তিনি তপস্বীবেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা দিলো এমন এক স্বপ্রকাশ মহত্ত্ব, যা অন্যেরা সহজে ও সবিনয়ে মেনে নিলে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৬)

নাট্য-আখ্যানের দ্বিতীয় অঙ্কে তপস্বীর আশ্রমে তরঙ্গিণীর সখীদের উপস্থিতি ও সংখ্যা বিষয়ে কাব্যনাট্যকার পরামর্শ: 'দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ অংশে একটি মঞ্চ-নির্দেশ আছে: 'তরঙ্গিণী' ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে ঋষ্যশৃঙ্গ রঙ্গমঞ্চ পার হ'য়ে গেলেন। কিন্তু আমি জানি, কয়েক মুহূর্তের মূক ভূমিকার জন্য 'ষোলোটি' কেন, তার চেয়ে অনেক স্বল্পসংখ্যক অভিনেত্রীও সংগ্রহ করা আমাদের মঞ্চের বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব; অভিনয়কালে শুধু তরঙ্গিণী-সহ ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখালেও কাজ চলতে পারে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৬) এ থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধদেব বসু মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট বাস্তবোচিত জ্ঞানের গভীরতা।

এ নাট্য-আখ্যানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর দৃষ্টিপাতের অভিনয় বুদ্ধদেবের নাট্য-অভিপ্রায় অনুধাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসংগীতের আবহে তরঙ্গিণী ললিত ভঙ্গিতে আবর্তিত হয় এবং 'তারপর, ক্রমশ দূরে স'রে-স'রে, ভূমিতে ফুল ছড়িয়ে, অনেকবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রস্থান করবে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৫); কিংবা প্রথম অঙ্কের [লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর মূক অভিনয়। হাস্য, লাস্য, অঙ্গভঙ্গি। মা'র কথা শুনতে-শুনতে তরঙ্গিণীর মুখ হ'লো উজ্জ্বল, নিশ্বাস দ্রুত, দেহে জাগলো চঞ্চলতা। কয়েক মুহূর্ত পরে সে স'রে এসে রাজমন্ত্রীর সামনে দাঁড়ালো] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৮) এ জাতীয় দৃশ্যের অভিনীত হওয়া প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন: 'তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের চক্ষু যতদূর সম্ভব পরিস্ফুট ক'রে তোলা বাঞ্ছনীয়, কেননা এই দু-জনের দৃষ্টিপাত অভিনয়ের একটি অংশ।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭৫) ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর দৃষ্টিপাতনির্ভর অভিনয় প্রসঙ্গে:

> বলা বাহুল্য যে, অবর্জনীয় এই অভিনয়াংশ অনুধাবনের সামর্থ্য সকল পাঠকের ধারণক্ষমতার সাধ্যাতীত। এখানেই নাট্য-পাঠক নয়, যোগ্য নাট্য-দর্শকের মুখাপেক্ষী থেকে যায়। (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ২৮০)

বুদ্ধদেব এ নাট্য-আখ্যানেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। যেমন:

> [রঙ্গমঞ্চ ধীরে-ধীরে অন্ধকার হ'লো। অস্পষ্ট আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো আলিঙ্গনাবদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীকে। তারপর অন্ধকার। আবার যখন আলো হ'লো, দৃশ্যপরিবর্তন হয়েছে। চম্পানগরের রাজপথ। আকাশে ঘন মেঘ। বিদ্যুতের চমক। নেপথ্যে জনতার কলরোল। তরঙ্গিণী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে ঋষ্যশৃঙ্গ রঙ্গমঞ্চ পার হ'য়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঝর্ঝর শব্দে বৃষ্টি নামলো।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৪১)

দ্বিতীয় অঙ্কে নারী-পুরুষের এ মিলন চিত্রের মধ্য দিয়ে অঙ্গদেশ বৃষ্টিস্নাত হলো; সমস্ত সংকট কেটে গেলো। এ দৃশ্যপটের সূত্রে রাজ্যের বৃহৎ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মঞ্চনির্দেশনা কখনওবা চরিত্রের রূপান্তর প্রক্রিয়া অনুধাবনে

সহায়ক হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে: '[তরঙ্গিণীর শেষ কথাগুলি শুনতে-শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে ফুটলো প্রথমে সংশয়, তারপর বেদনা, অবশেষে শান্তি।]' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৬৭) তরঙ্গিণীর প্রণয়মথিত আবেগী সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গের মানসপটে ক্রমান্বয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে দ্বিতীয় অঙ্কের তপোবনে ছদ্মবেশী তরঙ্গিণীর স্মৃতি; ঘটনাচক্রে কর্তব্যজালে বন্দি ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অচিরেই তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পায় সে। স্মৃতিমন্থনের মধ্য দিয়ে মনোজাগতিক রূপান্তরের চিহ্ন কীভাবে চরিত্র-অভিনেতার মুখশ্রীতে ফুটে উঠবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এখানে। উল্লেখ্য যে, এ কাব্যনাট্যের বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশনা তাঁর পরবর্তী কাব্যনাট্যসমূহের জন্য প্রাসঙ্গিকতা পায় এই অর্থে যে, সেগুলোতেও পুরাণের পুনর্মূল্যায়ন ঘটেছে। পৌরাণিক কাল ও চরিত্রে আধুনিক কাল ও মানসবৈশিষ্ট্য সঞ্চারে এসকল নির্দেশনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু এ কাব্যনাট্যে মঞ্চনির্দেশনার মধ্যে নাট্য-কাহিনির ক্রমধারার সূত্র গ্রন্থিত রয়েছে। এর 'পূর্বরঙ্গ' অংশে দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনে পাঠক জানতে পারেন পশ্চিম সাগরকূলের ঋদ্ধিময়ী দ্বারকা নগরীর বীভৎস অতীতের ধারা বেয়ে আরেক শঙ্কিত, অশুভ পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নাট্য-আখ্যানে বুদ্ধদেব 'পূর্বরঙ্গ' অংশের এ তথ্যের সঙ্গে প্রথম অঙ্কের যোগসূত্র নির্মাণ করেন মঞ্চনির্দেশনার মাধ্যমে। প্রথম অঙ্কের সূচনায় রয়েছে:

> [বৃদ্ধদের সংলাপ শেষ হবার আগেই বিবিধ অশুভসূচক শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, এবারে তা আরো স্পষ্ট হ'লো। কয়েক মুহূর্ত এই সব শব্দ, তারপর ধীরে যবনিকা উঠলো। দ্বারকা-পুরীর প্রাসাদের একটি কক্ষ। বাতায়নে সুভদ্রা, সত্যভামা অদূরে দাঁড়িয়ে। বাতায়নের বাইরে রাজপথ।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৮৫)

মঞ্চনির্দেশনায়ই বুদ্ধদেব জানিয়ে দেন যেন এ নাট্য-আখ্যানের দৃশ্যপট দুই নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হবে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের, চরিত্রের বাহ্যিক ও মানসিক রূপ-রূপান্তর জন্য পাঠককে তাঁর মঞ্চনির্দেশনার ওপর নির্ভর করতে হয়।

> [দ্বারকায় রাজপথ। পিছনে রাজপুরীর সিংহদ্বারের আভাস। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁকে প্রথম অঙ্কের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর কাঁধে গাণ্ডীব, পিঠে তূণ, মুখে পথশ্রম ও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন। চলার ভঙ্গি চেষ্টাকৃতভাবে বীরোচিত।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১১৫)

কিংবা,

[অর্জুন আরো কয়েকবার শরনিক্ষেপের চেষ্টা করলেন, কিন্তু গাণ্ডীব উত্তোলন করাই তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠলো।

তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি শর শিথিলভাবে খ'সে পড়লো, তারপর তূণে আর বাণ রইলো না।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১২৮)

আধুনিক সময়ের ক্লান্ত-শ্রান্ত মানবের প্রতিভূ হিসেবে অর্জুন ও কৃষ্ণের রূপাবয়ব পুনর্নির্মাণের অভীপ্সা বুদ্ধদেব মঞ্চনির্দেশনায় সংযুক্ত করেন। এর মধ্য দিয়ে 'অর্জুনের মুখে পথের শ্রম আর প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন স্পষ্ট; তাঁর চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলে হঠাৎ কৃষ্ণকে দেখেও চিনতে পারেননি। কৃষ্ণের দীপ্তিতে দীপ্যমান অর্জুনেও স্তিমিতবল হয়ে এসেছেন। অর্থাৎ কালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যদিও 'কালসন্ধ্যা' মহাভারতের এক বিশেষ সময়কে অবলম্বন করে রচিত, তবু, এই কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব এক বিশেষ নাট্যককৃতিত্বে মহাকাব্যিক বিশালতাকে রক্ষা করেছেন।' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৫০) তাছাড়া যদু বংশের আত্মধ্বংসলীলার নাট্যময় ও কাব্যময় উপস্থাপনায় সজাগ ছিলেন বুদ্ধদেব। সুরাবিহ্বল অভিজাতবংশীয় পুরুষ ও রমণী, দ্বারকার জনতা, দুই প্রহরী, দস্যুদল প্রমুখের অংশগ্রহণে বিশৃঙ্খল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, দৃশ্যপট নির্মাণে বুদ্ধদেব নাট্যিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেন। যেমন:

> [দস্যুদল ও নারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলন। মেয়েরা কেউ-কেউ দস্যুদের গলা জড়িয়ে ধরলো, কেউ-কেউ চেঁচিয়ে উঠলো ভয় পেয়ে। কোনো-কোনো ভয়ার্ত নারীকে কোলে তুলে নিলো দস্যুরা, অন্য নারীরা এই দৃশ্য দেখে হেসে উঠলো।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৩০)

নাট্য-আখ্যানের এসকল দৃশ্য মঞ্চায়ন বিষয়ে তিনি কনিষ্ঠ কন্যাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন: 'আমার নাটকটা তুই ভালোমতো শুনতে পাসনি ব'লে আক্ষেপ করিস না, কলকাতায় ব'সে আমরাও শুনতে পাইনি। আবহসংগীত এত উচ্চ, উগ্র ও গতানুগতিক ছিল যে তার তলায় চাপা প'ড়ে গেল সেই ছন্দোবদ্ধ কথাগুলো, যা আমি বহু পরিশ্রম ক'রে রচনা করেছিলাম। সমস্ত জিনিশটা একটা বিশ্রী গোলমাল বলে মনে হচ্ছিল আমার। শ্যামল ও তার সহকর্মীরাও খুব নিরাশ হয়েছে। আর-একটা দোষ হয়েছিল যে আমার স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও স্তব্ধতার কোনো মুহূর্ত ছিল না, মেয়েদের কথাগুলো একেবারে রুদ্ধশ্বাস বেগে উচ্চারিত হবার জন্য তার বোধগম্যতা বা নাটকীয়তা কোনোটাই পরিস্ফুট হ'তে পারেনি। শ্যামলের নিজের অভিনয় ভালো হ'লেও এ-যাত্রায় অন্যদের তেমন যথোপযুক্ত মনে হ'লো না—সেও একটা দুঃখের কারণ। তবু যন্ত্রসংগীতের ডামাডোল যদি না থাকতো, এবং কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যেত, তা'হলেই অনেকের ভালো লাগতো বলে আমার বিশ্বাস—এত ত্রুটি সত্ত্বেও কলকাতায় কেউ-কেউ আনন্দ পেয়েছে বলে শুনছি।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫৬) এ থেকে তাঁর মঞ্চসচেতনার বোধ অনুধাবন করা যায়। *কালসন্ধ্যা*র আখ্যান শেষে বুদ্ধদেব যেন অন্য কোনো নাট্য-আখ্যানের ভাবনায় গভীর মনোনিবেশ করলেন, মঞ্চনির্দেশনায় সে-আবহ আনলেন এভাবে: '[ব্যাসদেব আবার আসীন হ'য়ে পুঁথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, লেখনী তুলে নিলেন। মঞ্চে আলো ম্লান হ'য়ে এলো।

রচনায় নিবিষ্ট ব্যাসদেবকে কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা– কোনো শিলাখণ্ডের মতো অস্পষ্ট ও স্থির। ধীরে যবনিকা নামলো]' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৩৮) ব্যাসদেবরূপী বুদ্ধদেব বসু যেন *প্রথম পার্থ*, *সংক্রান্তি* কিংবা *অনাম্নী অঙ্গনা*-এর আখ্যান পরিকল্পনায় অভিনিবেশী হলেন।

প্রথম পার্থ

কুন্তীর কর্ণকে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দেয়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব দিন কর্ণের নিকট কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের আগমন, কর্ণ স্ব-সিদ্ধান্তে অটল– এমন গুটিকয়েক ঘটনা উপজীব্য করে বুদ্ধদেব বসু ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্র বহুবিচিত্র রূপান্তর ও আন্তর্রহস্যের স্বরূপ উন্মোচন দেখানো হয়েছে বলে খুব বেশি মঞ্চনির্দেশনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। এটি তাঁর পরিমিত শিল্পবোধের চিহ্নায়ক। তাছাড়া কর্ণ ও কুন্তীর হৃদয়সংগ্রামের রক্তিম আভা এ নাট্য-আখ্যানে:

> শুধুমাত্র, সাধারণ নাটকীয় আবরণে তার সমস্ত সম্ভাবনার স্তরগুলি খুলে যেত না বলেই একে সাধারণ নাট্যমঞ্চে নয়, কবিতার নাট্যমঞ্চে তুলে ধরতে হল। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৫)

এ নাট্য-আখ্যানে আলো-অন্ধকারের ব্যবহারে মঞ্চে চরিত্রের উপস্থিতি ও প্রস্থান নির্দেশ করেছেন। যেমন: নাট্য-আখ্যানের সূচনায় দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ওপর আলোর প্রক্ষেপণ ঘটেছে। একই সময়ে একই মঞ্চে কর্ণ উপস্থিত; কিন্তু সে অর্ধ–আলোকিত। পরক্ষণেই দেখা যায়–'[বৃদ্ধেরা অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন হলেন। কর্ণকে উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেলো।]' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪৫) এভাবে আলোর নানামাত্রিক প্রয়োগে চিহ্নিত হয়েছে এ নাট্য-আখ্যানের দৃশ্য ও দৃশ্যসঞ্জাত ভাবব্যঞ্জনা।

তাছাড়া চরিত্রের কথোপকথনকালে বুদ্ধদেব বসু সংক্ষেপে ও সংহত ভঙ্গিতে কিছু নির্দেশনা যুক্ত করেন; যেমন: [কুন্তী কর্ণের পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়ালেন।], [মুগ্ধ চোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে], [সবিস্ময়ে], [স্বগতোক্তির ধরনে], [হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বাসিত স্বরে], [তীব্র স্বরে], নিস্তাপ স্বরে], [দীর্ঘশ্বাস ফেলে], [ক্ষণকাল পরে], [মুখ তুলে তাকিয়ে, বিমূঢ়ভাবে], [কোমল স্বরে ডেকে], [সতর্কভাবে], [চমকে উঠে, কিন্তু মনের ভাব গোপন ক'রে], [চাটুবাক্যের ধরনে, কিন্তু সতর্কভাবে], [ক্ষণকাল পরে, অন্তরঙ্গ সুরে], [কোমল স্বরে, কূটভাবে], [আগ্রহের সুরে], [ঈষৎ হেসে], [বাঁকা হেসে], [অনেকটা আপন মনে], [সহাস্যে], [মৃদু হেসে], [সহাস্যে, পরিহাসের সুরে], [তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে], [চাপা গলায়], [শান্তভাবে], [হঠাৎ কেঁপে ওঠে] প্রভৃতি নাট্য-নির্দেশনা এ নাট্য-আখ্যানের চরিত্রের আন্তর্রহস্য উন্মোচনে যেমন

সহায়ক; তেমনি এগুলো নাট্য-আখ্যানকে নাট্যরস ও নাট্যগুণান্বিত করেছে নিঃসন্দেহে। এখানে প্রয়োজন বিবেচনায় কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনের একটি অংশ উদ্বৃত করা হলো:

কুন্তী

[কোমল স্বরে]

না—না—না!

আর অন্ধ থেকো না, কর্ণ, চিনতে শেখো নিজেকে, ...

তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান।

[কর্ণ কুন্তীর চোখে চোখ রাখলেন, কিছু বললেন না] ...

কর্ণ

[উন্মনভাবে, স্বগতোক্তির ধরনে]

কবে, তা মনে পড়ে না,

কার মুখ থেকে, মনে পড়ে না, ...

কুন্তী

[ব্যগ্র স্বরে]

তুমি জানতে? তুমি আগেই জানতে? তা'হলে দূরে ছিলে কেন এতদিন? ...

কর্ণ

আমার স্বগৃহ? তা কোথায়?

[ক্ষণকাল পরে ভিন্ন সুরে]

–কিন্তু কে নয়,

কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে সপ্রাণ, ...

[ক্ষীণ হেসে]

হয়তো সেই অর্থেই-আমি। ...

[কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে]

না– আমি বিশ্বাস করি না!

এ কি সম্ভব যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে

কখনো সহ্য করতে পেরেছিলেন কোনো মানবী– এমনকি দীপ্তিময়ী কুন্তী?...

[আবেগের সঙ্গে]

মা! আমার মা!

আমার ঘুমের মধ্যে লুকোনো এক স্বপ্ন,

আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপন এক সঞ্চার আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে! ...

[আবিষ্টভাবে]

মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ।

কর্ণ আর কুন্তী, পুত্র আর মাতা। ...

[হঠাৎ থেমে, ভিন্ন সুরে]

কিন্তু তারপর? আমার জন্মের পর?

কোথায় তুমি ছিলে তখন—আর কোথায় আমি? (বুদ্ধদেব, ২০১৩: ১৪৮–১৫১)

দীর্ঘ এ উদ্ধৃতির আলোকে সহজেই অনুমেয় যে, কর্ণ ও কুন্তীর সংলাপের পরতে পরতে বুদ্ধদেব বসু যে নির্দেশনা প্রদান করেন– তাতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা মাত্রা সুচিহ্নিত হয়েছে; যা নাট্য-দ্বন্দ্ব ও নাট্য-রসকে ঘনীভূত করেছে। এসব নির্দেশনায় কাব্যনাট্যকারের মৌল অভিপ্রায় নিহিত। এর মঞ্চায়ন বিষয়ে সচেতনতা থেকেই তিনি জানান– 'রঙ্গমঞ্চে বা অন্যভাবে, পেশাদার বা শৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক 'অনাম্নী অঙ্গনা' বা 'প্রথম পার্থ'র সম্পূর্ণ, সংক্ষেপিত বা আংশিক অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অথবা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধির লিখিত অনুমতি প্রয়োজন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫৩১) একই ভাবনা সংক্রান্তি কাব্যনাট্যের মঞ্চনির্দেশনায় লক্ষণীয়।

সংক্রান্তি

সংক্রান্তি কাব্যনাট্যের সূচনায় এ বুদ্ধদেব: 'হস্তিনাপুরে রাজপুরীর একটি প্রাঙ্গণ। যষ্টি দিয়ে ভূমি অনুভব করতে-করতে ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশ করলেন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৯)– এ নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া এ কাব্যনাট্যের চরিত্ররা কখন কীভাবে সংলাপ উচ্চারণ করবে এ বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করেন; যেমন: [আবেগহীন স্বরে], [ঈষৎ তিক্ত স্বরে], [সরোষে], [শান্তভাবে], [সোৎসাহে], [উষ্মার স্বরে], [অধৈর্যের ভঙ্গি করে], [তীব্র উচ্চ স্বরে], [নেপথ্যে শঙ্খনাদ] প্রভৃতি। এসব টুকরো টুকরো নাট্যনির্দেশনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর ভাবনাবিশ্বের প্রতিবিম্বায়ন ঘটিয়েছেন এ কাব্যনাট্যে।

নাট্য-আখ্যানে গান্ধারী চরিত্রের অনুপ্রবেশকালে সঞ্জয় জানিয়ে দেয়: 'তাঁর আয়ত নেত্রে অনলস্পৃষ্ট অশ্রুবেগ।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৫)– এখানে বুদ্ধদেব বিশেষ দ্রষ্টব্যের ন্যায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এ তথ্য দিয়ে যে,

'এই নাটকে গান্ধারীর চক্ষু অনাবৃতরূপে কল্পিত হয়েছে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৫) এ কাব্যনাট্যে যে মর্মান্তিক সত্য ও নির্মম বাস্তবতা সন্নিবেশিত হয়েছে তা, মুক্ত দৃষ্টিপাতে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ গান্ধারীকে দিলেন বুদ্ধদেব বসু। পুরাণের পলেস্তরা খসিয়ে মঞ্চে নতুন এক গান্ধারীকে তুলে ধরলেন বুদ্ধদেব। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত উল্লেখ্য:

> নাটকের অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়েছেন গান্ধারী; বুদ্ধদেবের নাট্যানির্দেশে এখানে তিনি মুক্তদৃষ্টি, তাঁর দুই চোখ অনাবৃত। মহাভারতের মিথ থেকে এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব একটি গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সরে গেছেন যা এক অর্থে হয়ত বা একটি পৌরাণিক প্রথাকে অস্বীকার করা-ই বলা যায়। (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৯)

বুদ্ধদেব বসু পৌরাণিকতার আশ্রয়ে আধুনিকমনস্ক হয়ে ওঠেন এভাবেই। তাঁর এ বোধের ব্যতিক্রম *অনাম্নী অঙ্গনা* কাব্যনাট্যেও ঘটেনি।

এ কাব্যনাট্যের সূচনায় নাট্যনির্দেশনা রয়েছে: '[দৃশ্য: হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরস্থিত অলিন্দ ও প্রাঙ্গণ। মঞ্চের অগ্রভাগে প্রাঙ্গণ, কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে অলিন্দ। অলিন্দের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি স্বর্ণখচিত তোরণাকৃতি দ্বার। যবনিকা উঠতে দেখা গেলো সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে অঙ্গনা ব'সে আছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর গুঞ্জনস্বরে অঙ্গনার গান। ফাল্গুনের এক অপরাহ্ণকাল।]' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৩) সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে অঙ্গনার ব'সে থাকা প্রতীকী ব্যঞ্জনামণ্ডিত; এটি অঙ্গনার শ্রেণিগত অবস্থান সুচিহ্নিত করে। আবার পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়কালে চরিত্রের অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন বুদ্ধদেব। সখীদের সঙ্গে অঙ্গনার কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরা হলো:

> কিন্ত দেবী অম্বিকা
>
> আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত নন—
>
> [ব্যঙ্গ ও বেদনামিশ্রিত সুরে]
>
> তিনি আমাকে স্নেহ করেন। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৬)

এ মঞ্চনির্দেশনায় অঙ্গনার যাপিত জীবনের ও বেদনার্ত হৃদয়ের পরিচয় নিহিত। 'তিনি আমাকে স্নেহ করেন।'—সাধারণ বিবৃতিমূলক সংলাপে গভীর বাস্তবতার অভিব্যঞ্জিত হয় তার পূর্বে সংযোজিত মঞ্চনির্দেশনার ফলে। 'অঙ্গনার মিলন-মুগ্ধ কাব্য এবং অম্বিকার ঈর্ষা-দ্বেষ-ব্যঙ্গ ও তির্যক বাক্য কাব্যনাট্যের প্রকরণ বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্য বজায় রেখেছে।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৬৫) তাছাড়া এ কাব্যনাট্যের দৃশ্যান্তর প্রক্রিয়ায় মঞ্চনির্দেশনা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। যেমন: '[একদিক দিয়ে অঙ্গনা-সহ তৃতীয় সখীর, আর-এক দিক দিয়ে অন্য দু-জনের প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে অন্তঃপুরের দ্বার খুলে গেলো। অলিন্দে দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে এলো অম্বিকা। তার পিছনে সত্যবতী।]' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৫১)—অম্বিকার দ্রুত লয়ে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে নাট্য-আখ্যানে নাটকীয়তার সঞ্চার হয়। আবার নাট্য-কাহিনির গতিবেগ ও অঙ্গনার মনস্তত্ত্ব চিত্রায়নে বুদ্ধদেব নির্দেশনা দেন:

> [গান শেষ ক'রে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অঙ্গনা, ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। তার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যাস্তের আভার মতো মিলিয়ে গেলো মঞ্চের আলো। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার; তারপর ধীরে-ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, কোমল রৌদ্রে আবার দেখা গেলো অঙ্গনাকে, সিঁড়ির শেষ ধাপে মূর্তির মতো উপবিষ্ট। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলো অম্বিকা। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অঙ্গনার কাছে দাঁড়ালো, অঙ্গনা লক্ষ করলো না।] (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৭১)

এ নাট্য-আখ্যানে ব্যাসদেবের সঙ্গে অঙ্গনার মিলিত হবার দৃশ্য সরাসরি বর্ণনা করেননি বুদ্ধদেব। এখানে মঞ্চে আলো ও অন্ধকারের প্রয়োগ-সূত্রে তা ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলেন তিনি। 'কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার'-এর নির্দেশনায় ব্যাসদেব ও অঙ্গনার মিলনের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। অন্ধকার কেটে পরের দিন ভোরের কোমল রোদে মূর্তিপ্রতিম অঙ্গনার মধ্য দিয়ে কাব্যনাট্যকার অঙ্গনা চরিত্রের অন্তর্গত পরিবর্তনকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলেন। একইভাবে অম্বিকা যখন অঙ্গনার নিকট ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে জানতে চায়; তখন তাদের সংলাপ বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যনাট্যকার যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন, তা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক। যেমন : [কৌতূহল-মেশানো ঈর্ষার সুরে], [তার চোখে ঈর্ষার ঝলক, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ], [ক্ষণকাল পরে, ঠোঁট বাঁকিয়ে], [ভ্রুকুটি ক'রে], [মনে-মনে প্রীতি, ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি], [তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে], [তার চোখে রোষের বিস্ফোরণ, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ], [তার রোষ প্রশমিত, কিন্তু কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর] প্রভৃতি অম্বিকার সংলাপের পূর্বে এসব নির্দেশনা অম্বিকা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষণীয় যে, কাব্যনাট্যের মঞ্চনির্দেশনায় বুদ্ধদেব বসু স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই দেখা যায়:

> 'থিয়েট্রন' গ্রুপ, 'স্বপ্নসন্ধানী', 'বহুরূপী', 'দ্য ব্লাইন্ড'–'এইসব বিখ্যাত নাট্যসংস্থার বাইরেও বুদ্ধদেব বসুর ষাটের দশকে লেখা নাটকগুলি নানা জায়গায় নানা গোষ্ঠী কতবার যে মঞ্চস্থ করেছেন, করেন এবং নিয়মিত পাঠ করে থাকেন তার হিসেব নেই। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০)

নাটক মঞ্চায়নের এসব অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেব বসুকে অনুপ্রাণিত করেছে নিঃসন্দেহে। আলোচিত প্রতিটি কাব্যনাট্যের পরিসমাপ্তি অনির্দিষ্টসূচক। বুদ্ধদেব প্রকৃতপক্ষে পরিসমাপ্তিকে নাট্যমঞ্চে উপস্থাপ্য বা মীমাংসিত করে তুলতে চাননি। তিনি তাঁর কাব্যনাট্যের আবেদন হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চান। ফলে নাট্যমঞ্চের অতৃপ্তির বোধ থেকে পাঠক নিজের মতো করে নান্দনিক মীমাংসায় পৌঁছাবেন বলেই তাঁর প্রত্যাশা। তাঁর প্রতিটি কাব্যনাট্যের পরিশেষে বিষয়ে এ কথা প্রাসঙ্গিকতা পায়। ফলে, দর্শক বা পাঠক এক অনির্দেশ্য, অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতি লাভ করেন। এটা তাঁর কাব্যনাট্যের অন্যতম বিশিষ্টতা।

বস্তুত, প্রতিটি নাট্যপ্রয়াসে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন গভীরভাবে ও একনিষ্ঠচিত্তে মঞ্চকেন্দ্রিক ভাবনায় উজ্জীবিত। এ বিষয়ে চিঠিতে কনিষ্ঠ কন্যাকে জানান: 'আমি প্রথম যখন নাটকলেখায় হাত দিয়েছিলাম, অহমিকাবশত ভেবেছিলাম বেরোনোমাত্র অভিনীত হবে, কিন্তু এখন সেই আশা শূন্যে এসে ঠেকেছে–তবু খুব সম্ভব আরো নাটক লিখবো, এবং মঞ্চের দিকে চোখ রেখেই লিখবো-হয়তো সেগুলোতে যারা অংশ নেবে তারা হবে না আমার কন্যা বা আত্মীয় বা

পরিচিত কেউ, এমনকি আমি হয়তো তাদের চোখেও দেখবো না কোনোদিন, যেমন তারা দেখবে না আমাকে।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৭২) এ আত্যন্তিক প্রয়াসের ফলে:

> শুধু সংলাপ, দ্বন্দ্ব, ভাষার ঐশ্বর্যে নয়, মঞ্চোপযোগিতায়ও তাঁর নাটক বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। (রাজীব, ২০১৯ : ৫২)

৪.২.৬ কাব্য ও নাট্যের সংহতি-সূত্র: চিত্রকল্প ভাবনার অভিনবত্ব

বিষয়ের বা বস্তুর আপাত সাদৃশ্যের অন্তরালে কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি ও নাটকের গতিশীলতা-ক্রিয়াশীলতার মেলবন্ধনে চিত্রকল্পের জন্ম হয়। কাব্যনাট্যকারের ভাবনাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি, বিবর্তন-বিবর্ধন এবং পরিণতির স্বরূপ চিত্রকল্পের আধারে নন্দনমণ্ডিত হয়ে ধরা পড়ে। কবিতার ছন্দোবদ্ধতায় কেবল ভরসা করে বুদ্ধদেব সময়জাত বাস্তবতা ও সংকটকে বিধৃত করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, যেনবা তাঁর বলবার কথাটি তাতে পুরোপুরি আঁটে না: এমন শিল্প-অভিপ্রায় থেকে কাব্যনাট্য-আখ্যানে চিত্রকল্পের অভিযোজনা ঘটেছে। 'চিত্রকল্প সামগ্রিক সৃজনক্রিয়ার অংশ বলে সেখানে শিল্পীর চেতনালোকের স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকে। এর প্রাথমিক উদ্ভাস বস্তুধর্মী হলেও অর্ন্তলীন চেতনাই শেষ পর্যন্ত এর অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে অবশ্যই কল্পনা ক্রিয়াশীল থাকে এবং কল্পনাই অভিজ্ঞতার ভাববীজগুলিকে পল্লবিত করে দেয়। চিত্রকল্পের মৌল ধর্মই হল প্রত্যক্ষতা এবং স্বতন্ত্র কোনো অলংকার না হলেও চিত্রকল্পের অবস্থান উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তির নানা বৃত্তে।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ৯৮) কবি ও নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু প্রাতিস্বিক শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন কাব্যনাট্যিক আখ্যানে দৃঢ় ও সংহত চিত্রকল্পের সংশ্লেষে। '...পরিণত বয়সে 'যে আঁধার আলোর অধিক' রচনার পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে 'আমার যৌবন'- গ্রন্থে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বললেন কবিতার চিত্রকল্প বা রূপকল্প প্রয়োগের কথা– 'আমাকে ছেড়ে দিতে হবে সরলতার পথ, বলতে হবে উক্তির পরিবর্তে চিত্রকল্প দিয়ে, ঘোষণার পরিবর্তে ছবির সাহায্যে।' (উত্তম, ২০০৮ : ২২) এ থেকে বোঝা যায় পরিণত বয়সে রূপকল্প ব্যবহারে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

মানব-অন্তর্দেশের অনির্বচনীয় অনুভূতির চিত্রায়ণে কিংবা অন্তর্জীবনের রহস্যের অনুসন্ধানে বুদ্ধদেব বসু যখন ব্যাপৃত হয়েছেন; তখন তাঁর প্রবল কবিত্বশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকল্পরাজি। দৈনন্দিনতাকে ছুঁয়েও জীবনের রূপ, রং, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতির অন্তর্গূঢ় বোধের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটে চিত্রকল্পের আশ্রয়ে। 'চিত্রকল্পের মৌল ধর্মই

হল প্রত্যক্ষতা এবং স্বতন্ত্র কোনো অলংকার না হলেও চিত্রকল্পের অবস্থান উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তির নানা বৃত্তে।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ৯৮) অনঙ্গব্রতে অঙ্গীকৃত তরঙ্গিণী তপস্বীকে বলে:

> পশু, পক্ষী ও পতঙ্গকে বৃক্ষ যেমন ফলদান করে, তেমনি আমি জনে-জনে করি আত্মদান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৩)

বৃক্ষরাজি অরণ্যের পশু, পাখি, কীটপতঙ্গকে স্বার্থহীনভাবে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আহার জুগিয়ে জীববৈচিত্র্যকে প্রাণবান রাখে। সহজ ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির ভারসাম্য ও সৌন্দর্য সংরক্ষিত, এতে নেই স্বার্থ বা কলুষতার লেশমাত্র। পতিতাবৃত্তি তরঙ্গিণীর নিকট তেমনই প্রতিভাত হয়েছে। অন্যান্য জৈবিক উপাদানসমূহের মতো নরনারীর সংযোগও মানবজীবনে অপরিহার্য। তার এ উচ্চারণে বারাঙ্গনাবৃত্তি আর নিছক বারাঙ্গনাবৃত্তি থাকে না; তা আত্মত্যাগের উদারনৈতিক ভাবপ্রকল্পে রূপ নেয়। আত্মত্যাগের চিহ্নিত ভাবপ্রকল্পের সঙ্গে তাই বুদ্ধদেব সুকৌশলে একাত্ম করে নেন ঋষ্যশৃঙ্গকে। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ঋষ্যশৃঙ্গ বলে: 'তত্ত্বজ্ঞান আমারও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয়, যেন পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৩) এ একাত্মতা মূলত তরঙ্গিণীর আত্মদানের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায়। বাংলা কাব্যনাট্যসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এ এক নতুন শিল্পপ্রয়াস। এছাড়া চরিত্রের রূপ ও রূপান্তরের ইঙ্গিতবহ উপস্থাপনায় নির্মিত হয়ে চিত্রকল্প। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ:

> আজ যখন প্রাতঃসূর্যকে প্রণাম করি, তিনি যেন একটি রশ্মি দিয়ে আমার মর্মস্থল স্পর্শ করলেন। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৪)

ভোরের সূর্যকে প্রণিপাত করা ঋষ্যশৃঙ্গের দৈনন্দিন তপস্যার অংশ। সূর্যদেব তার মর্মস্থল স্পর্শ করলেন– এমন অনুভূতি দিনটিকে বিশেষ করে তোলে। ঋষ্যশৃঙ্গের এ উচ্চারণ আপাতদৃষ্টিতে অনুভূতির সংজ্ঞাপক হলেও এতে অন্তর্নিহিত রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সংযোগের সূত্র। প্রভাতসূর্যের রশ্মি আত্মিক প্রশান্তি ও শক্তির উদ্দীপনায় জাগ্রত করে ঋষ্যশৃঙ্গকে। তরঙ্গিণী তথা নারী প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে তার সত্তায় এক নতুন জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। তরঙ্গিণীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের মর্মস্থল নাড়িয়ে, তাকে নতুন বোধে জাগিয়ে, নতুন জীবনানুধ্যান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক মানবচেতনায় উন্নীত করে। আবার ঋষ্যশৃগকে 'মৃগয়া' করার জন্য তরঙ্গিণীকে প্রলুব্ধ করতে লোলাপাঙ্গী বলে:

> একটিমাত্র আঙুলে যদি স্পর্শ করিস তা হবে তপ্ত পৃথিবীর বুকে প্রথম জলবিন্দুর মতো। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৮)

লোলাপাঙ্গী তরঙ্গিণীকে অপাপবিদ্ধ ঋষিকুমারের কৌমার্য হরণের উপায় শিখিয়ে দিচ্ছে। লোলাপাঙ্গীর ভাবনায় তরঙ্গিণীর যৌন-আর্কষক স্পর্শে বিশুষ্ক, নির্জীব ও মানবীয় জৈবিক আবেগস্পর্শহীন তাপস সত্তা হবে সিক্ত, শান্ত ও

নতুন জীবনাবেগে প্লাবিত। নারীপ্রকৃতির সামান্যতম অঙ্গুলিস্পর্শে ঋষ্যশৃঙ্গের অপাপবিদ্ধ সত্তায় সামগ্রিক অর্থে এক রূপান্তর ঘটবে; প্রকৃতির উপমার আশ্রয়ে নির্মিত চিত্রকল্পে এ অভিব্যঞ্জনা বিধৃত হয়েছে। নর-নারীর মিলন সূত্রের প্রত্নউপমায় এ নাট্য-আখ্যানের মৌল দর্শনও আভাসিত। তাই এ-ভাবনাসংশ্লিষ্ট চিত্রকল্প নির্মাণই যেন বুদ্ধদেব বসুর শিল্পপ্রেরণা। কেননা: 'চিত্রকল্প আমাদের জীবনযাপন ও বিশ্বাসের উপকরণ থেকে গৃহীত হয়।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ৯৯) তরঙ্গিণীর যাপিত জীবনের বিশ্বাসের জগৎ উন্মোচিত হলো এভাবে:

তরঙ্গিণী। আমি কিন্তু পূজ্যজনকে প্রণাম করি না, আলিঙ্গন করি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আলিঙ্গন? লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে?

তরঙ্গিণী। তেমনি। (*আলিঙ্গনের ভঙ্গি ক'রে*) এই আমার ব্রতের দ্বিতীয় অঙ্গ। এবার আপনার মুখচুম্বন আমার কর্তব্য।

ঋষ্যশৃঙ্গ। চুম্বন? অলি যেমন মধুপুষ্প চুম্বন করে?

তরঙ্গিণী। তেমনি ... (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৪)

সাধারণ দৃষ্টিতে এটি তরঙ্গিণীর ছলনার কৌশলমাত্র। ছলনা সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুনতর বোধে উপনীত হয়। অন্যান্য জৈবিক উপাদানের অনিবার্যতার মতো কামবোধও অনিবার্য বুদ্ধদেব মানসে। 'যৌনসঙ্গমের এমনকি এই তীব্র, কর্কশ, প্রত্যক্ষ স্থূলতাও কাব্যিক; কারণ তা উপমায় ও জীবননাট্যে পূর্ণ।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৯) এভাবে নাট্য-আখ্যানে বাস্তবনিষ্ঠ ঘটনাংশের চেয়ে ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রের মনোলোকের উদ্ভাসনে প্রয়োজনে চিত্রকল্পের গড়ে উঠেছে। যেমন শান্তার সঙ্গে যাপিত জীবনে ঋষ্যশৃঙ্গের উপলব্ধি:

বিস্বাদ–বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।
আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৫৫)

এমন সুচারু ও সুগভীর জীবনবোধসঞ্চারী সংলাপের সংযোজন ঋষ্যশৃঙ্গের রূপান্তরিত চৈতন্যের চিহ্নায়ক। তরঙ্গিণীর সান্নিধ্যে বীর্যমন্ত্রের আহ্বানে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতিক্রিয়া ছিল সহজ-স্বাভাবিক, প্রেমময়-পুণ্যময় উজ্জীবন। সহজানন্দের এ রতি-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে তার আত্ম-আবিষ্কার ঘটেছে। কিন্তু শান্তার সান্নিধ্য তাকে করে তোলে সমাজ-সংসারের কর্তব্যজালে অসহায় নিষ্প্রাণ, আনন্দহীন। সমাজ-শৃঙ্খলিত নিয়মের বেড়াজালসমূহ, যেমন: রাজদায়িত্ব, সমাজ-স্বীকৃত বিবাহ প্রথা, প্রেমহীন দাম্পত্য মেনে নেয়ার দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি ঋষ্যশৃঙ্গের স্বাধীন প্রেমানুভবের বিরোধী। 'পিঞ্জরিত জন্তু'র ন্যায় অন্যের ইচ্ছার অধীনে স্বস্তি নেই তার। বস্তুত, কামের সীমায় মানব-

আত্মার মুক্তি নেই; এটি ব্যক্তির স্বাধীন সত্তাকে সীমায়িত করে– এ বারতা দিতে চান বুদ্ধদেব। কামহীনতায় উত্তরিত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীকে নিঃসঙ্গতার পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেন বুদ্ধদেব। কারণঃ 'বৈনাশিক যুগসঙ্কটের প্রভাবে প্রেমের রাজ্যে বুদ্ধদেব প্রত্যক্ষ করেছেন বিচ্ছিন্নতার জ্বালা, বিশ্বাসের বিচ্যুতি।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৩২৮) বুদ্ধদেব বসুর চৈতন্যস্থিত নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে তাঁর পত্রাবলি থেকে জানা যায়ঃ 'তুমি যে নিঃসঙ্গতার কথা লিখেছো সেটা যৌবনের নিঃসঙ্গতা। সেটা দুঃখ দেয়, আবার সেই সঙ্গে বেঁচে থাকার মাধুর্যও বাড়ায়। আর-এক রকম নিঃসঙ্গতা আছে– সেটা কবির নিঃসঙ্গতা, যদি মনে-প্রাণে সাহিত্য-রচনাতেই লিপ্ত থাকো তাহ'লে পরিণত বয়সে তার স্বাদ পাবে। সেটাও দুঃখের, সে-দুঃখ বেঁচে থাকার গভীরতা বাড়ায়।' (কলকাতা, ২০০২ : ১৫) ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর অন্তিম পরিণতি তথা নিঃসঙ্গ যাত্রা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের এ ভাবনা সক্রিয় থাকা অপ্রাসঙ্গিক নয়। অপরদিকে তিনি সময়াবর্তে নেমে আসা অন্ধকার এবং তা থেকে উত্তরণের চিত্রপট নির্মাণ করেন *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যের অঙ্গসৌষ্ঠবে।

কালসন্ধ্যা

কবিতার সঞ্জীবনী আবেগে বুদ্ধদেব বসু স্থাপন করেন বস্তুগত ক্রিয়াশীলতায়, ঘটনা বিচিত্র অভিঘাত এবং তা কাব্যনাট্যের মৌল উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়েছে। 'কাব্যনাটকে নিছক ব্যক্তিগত আবেগ থেকে কবিতাকে মুক্ত করে এনে তাকে বস্তুগত নাটকীয় পরিবেশের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে স্থাপন করা উচিত। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে বুদ্ধদেব বসু এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটাননি।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৪) ফলে এ কাব্যনাট্যের ভাবানুষঙ্গী চিত্রকল্প নির্মাণে বুদ্ধদেব বসু সংহত শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক কালসন্ধ্যার স্বরূপ সুভদ্রার সংলাপে ফুটে ওঠে এভাবেঃ

> নভোমণ্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,
> মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৮৫)

ধূলিকণা, বরফ ও গ্যাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট ধূমকেতু সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে সূর্যের নিকটবর্তী হলে এর বরফ গলে গ্যাস ও ধূলিকণা পুচ্ছের মতো আকৃতি পায়। এটি ধূম্রপুচ্ছ নামে পরিচিত। ধূমকেতুর সঙ্গে সূর্যের আলোর মিথস্ক্রিয়ায় সূর্যের ঔজ্জ্বল্য কমে মহাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুভদ্রার দৃষ্টিতে দ্বারকাপুরীর জায়মান ধ্বংসযজ্ঞের রূপাবয়ব নির্মিতিতে বুদ্ধদেব প্রয়োগ করলেন ধূম্রপুচ্ছের ইমেজ। আমরা জানি যে, 'চিত্রকল্পের উৎস, রং, আলো, অন্ধকার, গতির তারতম্য, চিত্রের মূর্ত-বিমূর্তভাব, আবেগ, মনন ইত্যাদি কবিসত্তার বিচিত্র বর্ণালিম্পনের দিগন্ত পাঠকের কাছে উন্মোচিত করে।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ১০০) এখানে তাই ধূম্রপুচ্ছ ক্রম-বর্ধনশীল গতি ও অন্ধকারের, ঘনিয়ে আসা দুর্লক্ষণের প্রতিচ্ছবিঃ যদু বংশের অবধারিত ধ্বংসের রূপকল্প ধূম্রপুচ্ছের গতিশীলতা ও অন্ধকারের

ইমেজে কল্পনা করেন কাব্যনাট্যকার। মূলত, 'সত্যভামা ও সুভদ্রার কথোপকথনে কালসন্ধ্যার ভীতিপ্রদ মূর্তির সংকেতটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে।' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৪৯) একই দৃশ্যপটের উন্মোচনে সত্যভামার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে ভূকম্পনের চিত্রপ্রতিমায়।

গুরুগুরু মন্ত্র, যেন ভূমিকম্পে
বিদীর্ণ মন্দির, নাগরিক হর্ম্য,
দানবের ধর্ষণে বিহ্বল দিঙনাগ,
উন্মূল যেন অশ্বত্থ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৮৫)

দ্বারকাপুরীর আত্মধ্বংসলীলার স্বরূপ সত্যভামার দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে ভূমিকম্পের বিধ্বংসী ও মহালয়ের চিত্রকল্পে। 'গুরুগুরু মন্ত্র', 'বিদীর্ণ মন্দির', 'দানবের ধর্ষণ', 'বিহ্বল দিঙনাগ', 'উন্মূল অশ্বত্থ' প্রভৃতির খণ্ড খণ্ড ধ্বংস-আবহের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ভূমিকম্পের স্বরূপে উন্মূলিত চেতনায় ভর করে বুদ্ধদেব পাঠককে যেন নিয়ে যান পুরাণের সেই যদু বংশের ক্রম-নিঃশেষিত হওয়ার রূপ-ব্যঞ্জনা। কেননা, এ অশ্বত্থ যদু বংশের প্রতিরূপক। এভাবে দ্বারকাপুরীতে নেমে আসা চরম বিপর্যয়কে আকাশ-পাতালব্যাপী অনুষঙ্গে তুলে ধরেন। বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন বিপর্যয়ের চিত্র। দ্বিতীয় অঙ্কে তৃতীয় নারীর উচ্চারণে দ্বারকাপুরীর মহাসর্বনাশের স্বরূপ ফুটে ওঠে এভাবে:

অশ্বখুরধ্বনি, চক্রের ঘর্ঘর
প্রলয়ের কলরোলে ডুবে যায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১২৪)

ক্রম-বিলীয়মান দ্বারকারপুরীর চিত্র কাব্যের প্রলেপে, নাট্যের গতিময়তায় অসামান্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে এখানে। আবেগ, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা আর বিস্ময়ের মিশেল সংলাপে এত ক্রিয়াশীল সঞ্চারিত হয়, যেন পাঠক চৈতন্যে যুদ্ধের ঝনঝনানি, ভয়ার্ত পরিবেশ দৃশ্যরূপ পায়। দ্বারকানগরী যেন যমালয়ে পরিণত হয়েছে। মহাপ্রলয়ের মহাসংকটকালে দ্বারকাপুরীর পথে ব্যাকুলচিত্তে সমবেত নারীদের একমাত্র প্রার্থনা পার্থের আবির্ভাব। সর্বগ্রাসী ধ্বংসের কবল থেকে দ্বারকায় বেঁচে থাকা প্রতিটি প্রাণের উদ্ধার কর্তা একমাত্র পার্থ। 'সাদৃশ্য সৃষ্টি চিত্রকল্পের অন্যতম কাজ হলেও সাদৃশ্যভাবনার উদ্দীপনে চিত্রকল্পের কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘটে না। চিত্রকল্পের মাধ্যমেই কবিচেতনার প্রসারিত ভূমিকা তথা ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটে। যার দ্বারা পাঠকের কল্পনাবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হয়।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ৯৯) ফলে তৃতীয় নারী চরিত্রের চৈতন্যে অশ্বখুরধ্বনি মূলত পার্থের রথ আগমনের গতিশীলতার প্রতীকী ছবি। দ্বারকাপুরীর শক্তিশালী প্রলয়ের বুদ্ধদেব বসুর কল্পনায় 'কলরোল' হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে; বাংলা কাব্যনাট্যের

পরিক্রমায় এ এক অভিনতুন ব্যঞ্জনা। মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের ইঙ্গিত এমনই কাব্যময়তায় উপস্থাপন করেন তিনি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এক যুদ্ধাহত বিমূঢ় ও বিষণ্ন সময়ের অধিবাসী ছিলেন এ কাব্যনাট্যকার। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র: একটি খোলা চিঠি'তে বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন: '... এই চিঠি যেখানে আরম্ভ করেছিলাম, আর এটা লেখার ফাঁকে-ফাঁকেও যা অনেকবার হানা দিয়েছে আমাকে; আজকের দিনের বাংলাদেশ, তোমার আমার এই কলকাতা শহর। গোঙাচ্ছে, কাৎরাচ্ছে, প'ড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে ছিন্নভিন্ন ... ভেবো না আমি বড্ড বেশি বাড়িয়ে দেখছি ব্যাপারটাকে– আমি ভুলিনি পৃথিবীতে এতবার এত মহাযুদ্ধ ঘ'টে গেছে– এত মারী, এত বিস্তীর্ণ হননযজ্ঞ ও ধ্বংসোন্মাদনা যে সে-তুলনায় এটা মানবেতিহাসে একটি ক্ষুদ্র ফুটনোট মাত্র জোগাতে পারে। তবু: এটাই আমার নিকটতম পরিবেশ, এখানেই আমার জীবিকা ও দৈনিক জীবনের সংস্থান; আমি ইচ্ছে করলেও ভুলে থাকতে পারি না; আমি না চাইলেও আমাকে দেখতে হয় খবর-কাগজে বিষাক্ত হেডলাইন, আর মানুষের মুখে আক্রোশ আর সন্ত্রাস আর হতাশা। দিনের পর দিন দেখছি এ-সব, আর মনে-মনে ভাবছি: এর মধ্যে কোনো সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয়ের মর্মরধ্বনির স্থান কোথায়?' (বুদ্ধদেব, ২০২৩ : ৩৯) তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা তাই যে-কোনো প্রতিকূলতায়ও অব্যক্ত অথচ নিশ্চিতির আশায় প্রতীক্ষা করতে জানে। সুভদ্রার ভাবনায়:

> কোন তীব্র অপেক্ষায় বিশ্বে যেন পড়ে না নিশ্বাস? (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০৬)

সময় ও সভ্যতার প্রেক্ষাপটে এক গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সঙ্গে বৃহত্তর পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। মহাপ্রলয়ের মধ্যেও মানুষের আশায় বসতি; সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে গভীর উৎসাহী হয় জীবনের প্রতি। চরিত্রের বিশেষ বিশেষ মূহূর্তের ভাবনা তথা, মানসিক অনুভূতির প্রগাঢ়তায় এ কাব্যনাট্যের নাট্যরস জমে উঠেছে। সুভদ্রার ব্যক্তিক অনুভূতিতে তাই সামষ্টিক জীবন-আকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জনার্থক হয়ে ওঠে। আবার সত্যভামার ভাবনায় সে-আকাঙ্ক্ষারই সম্প্রসারণ ঘটান বুদ্ধদেব:

> সুভদ্রা, আমার মন অন্য কথা বলে।
> অকস্মাৎ দেখি যেন রশ্মিরেখা, যা এখনো দিগন্তে লুকোনো। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১০১)

অশ্বত্থের রূপকল্পে যদু বংশের নিঃশেষিত হওয়ার দৃশ্যকল্পের মধ্যেও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নতুন কালের, নতুন সম্ভাবনার অভিদ্যোতনা আনেন বুদ্ধদেব। সুভদ্রার মনো-অভ্যন্তরীণ এ অনুভূতিতে মহাজাগতিক অন্ধকারের, মহাপ্রলয়ের কালেও আলোর এ উৎসারণ বুদ্ধদেবের ইতিবাচক জীবনদর্শনের স্মারক। প্রকৃতপক্ষে:

> সত্যভামা ও সুভদ্রা চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে নাট্যকার পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার বিবর্তন অর্থাৎ জীবনের আনন্দ ও অশ্রুর সহাবস্থান চিত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে দুঃখের ঘনায়মান মেঘের ম্লানিমা ঘটনার গতিকে মাঝে মাঝে এক ঘেয়ে

সংলাপাত্মক বিবৃতিতে কিছুটা স্থাণু করে তুললেও শেষাবধি সত্যভামার কণ্ঠে কবি-নাট্যকার আকণ্ঠ আলোকিত রৌদ্রের পিপাসা বজায় রেখেছেন। (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৬)

বুদ্ধদেব বসুর চিত্রকল্প নির্মাণ কৌশল-সূত্রে এ কথা বলা যায় যে, তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট নাট্য-আবেদন, তীক্ষ্ণ ও তীব্র রসবোধ, মানব মনের সুগভীর বিন্যাস ও নাট্যবস্তুকে চিরন্তন মূল্যমান প্রদান প্রভৃতি দ্বারা সবিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কবিচৈতন্যের সংস্পর্শে অ-পূর্ব চিত্রকল্প জন্ম নেয়। পরবর্তী কাব্যনাট্যসমূহে এরই ধারাবহিকতা প্রবহমান।

প্রথম পার্থ

পৌরাণিক কালকে বর্তমানকালস্পর্শী করে তুলেও বুদ্ধদেব যেন তৃপ্ত হন না; অনাগত কালের আবহে এক চিরন্তন কালের মাত্রা অন্বেষণ তাঁর অন্যতম অভিপ্রায়। তাঁর মিথকথার প্রয়োগবৈচিত্র্যে এ ভাবনা সংপ্রোথিত রয়েছে।

> প্রথম পার্থ (১৯৬৯) কাব্যনাট্যটিতে বুদ্ধদেবকে আবার দাঁড়াতে হল সেই ভূমিতে যার ফসল রবীন্দ্রনাথ একবার তুলে নিয়েছেন 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এ।... এবং তার কাব্যত্ব শুধু বাচনিকতা নির্ভর নয়। এখানে বাইরের নাটক ও ভিতরের নাটকের বিচিত্র মেলবন্ধন ঘটেছে। বাইরের নাটকের মূল কথা হল, কর্ণের সহসা জাগ্রত ক্ষণস্থায়ী মাতৃমোহ কোন্ মহা জাগরণের ভিতর দিয়ে ভেঙে গেল।... এবং বাইরের এই নাটক সমর্থিত হচ্ছে কবিতাগত চিত্রকল্পের অন্তর্বন্ধনে–যা তার সংহতিকে দিয়েছে লাবণ্য। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ'-এর প্রকৃতি পৃথক। (সরোজ, ২০০৮ : ২১১)

এ কাব্যনাট্যে কর্ণের নিঃসঙ্গচেতনার নান্দনিক উপস্থাপনায় বুদ্ধদেব চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। মাতার সঙ্গে সন্তানের জন্মাবধি বিচ্ছিন্নতার প্রগাঢ় বেদনা কর্ণের সংলাপে ফুটে উঠেছে এভাবে:

> তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান–
> হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫৩)

মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর সঙ্গে মাতার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সৃষ্টি হয়। মাতা শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কর্ণের জীবন-ইতিবৃত্তে ঘটেছে বিপ্রতীপ ঘটনা; 'কালস্রোতের' নামে নদীর জলে শিশু কর্ণকে ভাসিয়ে দেয়া যে প্রকৃতপক্ষে 'অবজ্ঞার জলে' ভেসে যাওয়া পরিণত কর্ণ বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতায় তা মর্মে মর্মে অনুভব করে। 'প্রত্যাখ্যাত কর্ণ ভেসে গিয়েছিল নদীর জলে আর আজ প্রত্যাখ্যাতা কুন্তী ভেসে যাচ্ছেন নয়নজলে। (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১৩২) নিদারুণ বঞ্চনার এ চিত্র বুদ্ধদেব পাঠকের চৈতন্যে পরিস্ফুট করেন ভেসে চলার ক্রিয়াশীলতায়। 'হাত বাড়ালেও

স্পর্শ পাবো না' –স্পর্শের জগৎ অতিক্রম স্পর্শাতীত অনুভূতি সৃষ্টি করে। মাতৃস্পর্শবঞ্চিত কর্ণের নিঃসীম বেদনা ও অন্তহীন অভিমানের উৎসারণ নিহিত এতে। '' 'কালসন্ধ্যায়' ভাগ্যের পরিহাসে জন্মরাত্রে কর্ণকে ভেসে যেতে হয়েছে নদীস্রোতে। প্রতিপালিত হয়েছেন সূতগৃহে। রাজার পুত্র হয়েও সেই অভিজ্ঞান পাননি। অথচ সমাসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে কুন্তী এসে জানিয়েছেন তাঁর মাতৃপরিচয়। মা-কে জানার আবেগে কর্ণ-বিস্মিত, বিহ্বল হলেও জানেন, তিনি 'লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্ত সন্তান'। তাই তীরবর্তী মায়ের সঙ্গে মিলন অসম্ভব।'' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৩) যদিও কুন্তীর নির্মম স্বীকারোক্তি:

আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যেমন ঘটের মধ্যে হুতাশন,
যেমন মাটির ভাণ্ডে বৈদূর্যমণি,
যেমন গুহার আঁধারে মহাব্যাঘ্র:
আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম– (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪৭)

কর্ণের নিকট কুন্তী সংগোপনে রাখার প্রচেষ্টাকে ব্যক্ত করেছে কাব্যিক ভাষায়। কেননা 'কাব্যনাট্যে চরিত্র কাব্য-সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজেকে খুলে দেয়।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৫) কুন্তীও অকপটে নিজেকে মেলে ধরেছে কর্ণের নিকট। মহর্ষি দুর্বাসার বরে সূর্যদেবকে আহ্বান করে কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণ জন্ম করে। পরবর্তী সময়ে কুন্তী তার স্বামী পাণ্ডুরাজের নিকট কর্ণের এ জন্মবৃত্তান্ত গোপন রাখে। স্বয়ং সূর্যদেবের রশ্মিরেখার প্রভাবে যার জন্ম, তাকে প্রচ্ছন্নে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিল কুন্তী। 'ঘটের মধ্যে হুতাশন', 'মাটির ভাণ্ডে বৈদূর্যমণি', 'গুহার আঁধারে মহাব্যাঘ্র' প্রভৃতি শিশু কর্ণের প্রচ্ছন্নের থাকার চেয়ে পাঠকের চৈতন্য আচ্ছন্ন করে তোলে কর্ণ চরিত্রে অন্তর্নিহিত প্রখর শক্তিমত্ততা, বীরোচিত মনোভাব, মহাকালের পটে চিরবরণীয় হয়ে থাকার সামর্থ্য। একইভাবে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের ভ্রূণ সৃষ্টির আদি ইতিহাস তুলে ধরে এভাবে:

তখন আদিত্য, পূষণ, দিনমণি,
তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব
প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্তলে তাঁর দৃষ্টি–একটি কোমলতম রশ্মিরেখা–
অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো। নামলো গভীর নিদ্রা আমার চেতনায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫০)

নারীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জৈবিক প্রক্রিয়ায় কাব্যভঙ্গিমায় ও নাট্য-গতিতে অনন্য মাত্র লাভ করে বুদ্ধদেবের তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তিতে। পুরাণের অলৌকিক ঘটনা কবির কল্পনাশক্তিতে এমনভাবে বিধৃত হয় যে, তা এক রোমান্টিক আবহ

ও অনুভূতির যোগান দেয়। প্রখর সূর্যের সুকোমলতম রশ্মিরেখা কুন্তীর অন্তঃস্তলে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বস্তিময় আবহ তৈরি হয় চলচঞ্চলা কুন্তীর দেহে-মনে। উল্লেখ্য যে, একবার কুন্তীর আতিথিয়েতায় তুষ্ট হয়ে মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীকে অতি গূঢ় আহ্বানমন্ত্র বর দিলেন, যাতে আকৃষ্ট হবে যেকোনো দেবতা। তবে দুর্বাসা সতর্ক করেছিলেন মন্ত্র উচ্চারণের সময় ও প্রয়োজন বিষয়ে। 'সদ্যতরুণী', 'প্রায় বালিকা' সে-সতর্কবার্তা ভুলে কৌতূহলবশত, অস্থিরমতী চঞ্চলা কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করে। সূর্যের কোমল আলো ও উষ্ণতা কুন্তীর চেতনায় প্রশান্তির, তৃপ্তির প্রগাঢ় অনুভূতির সঞ্চার করে। পাঠকও অকপটে সে-অনুভূতির অংশীদার হয়ে ওঠেন, যেনবা লৌকিক কোনো প্রণয়মণ্ডিত সন্তানবতী হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে। আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের সম্ভাব্য হত্যাদৃশ্য কৃষ্ণের কল্পনায় ধরা দিয়েছে এভাবে:

> বজ্রতুল্য অঞ্জলিক বাণের আঘাতে
> তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
> ঊর্ধ্বাকাশে, সূর্যমণ্ডলে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯১)

অর্জুনের শক্তিশালী ও পবিত্র বাণের ভীষণ আঘাতে কর্ণের ছিন্ন মস্তকের দৃশ্যরূপের কল্পনায় সংযোজিত হয়েছে আলোর গতিময়তা ও কবিতার অভিক্ষেপ। মৃত্যু বা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কর্ণের বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন সত্তার অবমুক্তির 'ঊর্ধ্বাকাশ' ও সূর্যমণ্ডল-এর মাধ্যমে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। ঊর্ধ্বাকাশের সূর্যমণ্ডলে তার আত্মার মুক্তি প্রতিবিম্বিত হয় পাঠকের কল্পনায়। কৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন কর্তৃক কর্ণের প্রাণনাশের ক্ষিপ্রতার চিত্রকল্পে: 'অর্জুনকে রক্ষা করতে যখন স্বয়ং কৃষ্ণের সহায়তা প্রয়োজন হয় তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রথম পার্থ রণকৌশলে এবং বীরত্বে অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (উত্তম, ২০০৮ : ১৪৬) মানবজীবনের বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে কর্ণের মুক্তির অভিপ্রায় ধরা পড়েছে তারই ভাষ্যে:

> সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
> রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৪)

মহাবটবৃক্ষসম মানবজীবনপ্রবাহে কর্ণ তার মৃত্যুকে কল্পনা করেছে 'রক্তিম ফলের' প্রতীকী চিত্রকল্পে। রক্তিম ফলের রূপকল্পে কর্ণের প্রকৃত বীরোচিত সত্তা সহজেই অনুমেয়। মৃত্যু জীবনের পটে সহজ, সুন্দর ও আকর্ষণীয়: যা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নির্দেশ করে। পৌরাণিক কর্ণের এ বীরবত্তাকে আধুনিক সংকটময়, নিঃসঙ্গ জীবনের পটে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন বুদ্ধদেব। 'কর্ণ তার নিয়তি নির্ধারিত পরিণতির কথা উপলব্ধি করে যে

সত্য উচ্চারণ করেছে তার মধ্য দিয়ে তার যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে তা বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে এক সার্বিক সত্তায় উন্নীত করেছে।' (উত্তম, ২০০৮ : ১৪৪) এভাবে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে এবং তার কাব্য-ব্যঞ্জনাঋদ্ধ পরিসমাপ্তিতে বুদ্ধদেবের শিল্পমানস অনন্যতার সাক্ষ্য বহন করে। আর তাই '...প্রথম পার্থ' কাব্যনাটকে দেখি এক পণ্ডিত প্রতিভাবান পুরুষকে, যিনি জেনেছেন, জীবন অসংখ্য মৃত্যুর যোগফল। বেঁচে থেকে, নত হয়ে মহৎ হওয়ার চাইতে শ্রেয় মৃত্যু। তাই কর্ণ সমস্ত প্রলোভন ও স্বপ্নের ইশারাকে অগ্রাহ্য করে মৃত্যুকেই বরণ করেছেন।' (তরুণ, ২০০৭ : ৬৪) এ কাব্যনাট্যে মৃত্যু কর্ণের মহিমান্বিত সত্তার প্রতিচ্ছবি; আর *সংক্রান্তি*-তে তা নতুন কালবৃত্তের চিত্রকল্পময় উপস্থাপনায় ব্যতিক্রমী আস্বাদ আনে।

সংক্রান্তি

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের নান্দনিক উপস্থাপনায়, চরিত্রের মনস্তত্ত্বে সেসব ঘটনাপ্রবাহ কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে প্রভৃতি কাব্য ও নাট্যগুণের যুগল আধারে বিধৃত হওয়ার সূত্রে এ নাট্য-আখ্যানে চিত্রকল্প যোজিত হয়েছে। 'কাল যদি জটিলতর হয় তবে অনেক সময় সৌষম্যের শৃঙ্খলা ভেঙে যেতে পারে; তাই আধুনিক চিত্রকল্প হয়ে ওঠে অস্থির, তির্যক, দূরযানী–অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব এখানে সমীকৃত হয়ে যায়।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ১০১) যেমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু একালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়েরও প্রতীকী উচ্চারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

> অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা শুনতে-শুনতে
> আপনার দৃষ্টিহীন নেত্রকোটর থেকে কুঞ্চনময় কপোল পর্যন্ত নিঃসৃত হ'য়ে
> কয়েক বিন্দু অশ্রু
> লুক্কায়িত হ'লো শ্বেত শ্মশ্রুদামে– যেন লজ্জায়? (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২০৫)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুদৃশ্য এখানে ব্যক্তিমানুষের সংবেদনশীল অনুভাবনায় অসামান্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কৌরবদের যুদ্ধকৌশলে অভিমন্যুর হৃদস্পর্শী মৃত্যু *মহাভারত*-এর ধর্ম-অধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক, যা দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রকেও অশ্রুসিক্ত ও লজ্জিত করে। কবির কল্পনায় সে অশ্রুও লজ্জিত হয়ে আত্মধিক্কারে যেন মুখমণ্ডলের শ্বেত শ্মশ্রুদামে মুখ লুকায়। কুরুক্ষেত্রের ত্রয়োদশ দিনে চক্রব্যূহে প্রবেশ করে কৌরব মহারথীদের কূটকৌশলে অর্জুন-সুভদ্রার ষোল বছর বয়সী অভিমন্যুর মৃত্যু ব্যক্তি, সমষ্টি ছাড়িয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অসীম বেদনা ও লজ্জাজনক হত্যাযজ্ঞ। তবু এ হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে; হত্যাযজ্ঞের পটে দাঁড়িয়েও ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ-ক্লান্ত হয় না।

> ছিলো অগণ্য জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত,

অক্ষৌহিণী সেনানী–
আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার।
আমি ছিলাম ভরতবংশীয় রাজা, রাজপিতা,
জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ সেই রাজত্ব আজ,
এমনকি আমার পিতৃত্ব
একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৯৯–২০০)

দোর্দণ্ড প্রতাপ আর ক্ষমতার লেলিহান শিখা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ করে দিয়েছিল: যা তার পতনকে অনিবার্য করে তোলে। পরিজন, রাজন্য হারিয়ে এবং সৈন্যবাহিনির সক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এক সময়ের প্রতাপশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তার রাজত্ব ক্রম-ক্ষয়প্রাপ্ত ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। 'সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার'-এ সৈন্যবাহিনির শক্তিহীনতা এবং 'জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ রাজত্ব'-এর মধ্য দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের শাসনকাঠামোর ক্রম-অবলুপ্তির প্রতিতুলনায়ও বুদ্ধদেব বসুর শিল্পীসত্তা যেন তৃপ্ত হয় না কৌরবদের পরাজয়ের চিত্রায়নে। কেননা শতপুত্র হারানোর বেদনা আরও দুর্বহ। এক মাত্র দুর্যোধনের মধ্যে তার পিতৃত্ব অস্তিত্বটুকু বহমান এবং তাও নিঃশেষিত প্রায়; 'একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান'। পুরো চিত্রকল্পে ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্ব, প্রতাপ ও পিতৃত্বের পরাজয়ের চিত্র ক্রম-উন্মোচন করেন কাব্যনাট্যকার। আবার, ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধের দৃশ্যরূপ উন্মোচিত হয় এভাবে:

রক্তক্ষরণে রঞ্জিত হ'য়ে
দুই দেহ যেন পুষ্পিত দুই শাল্মলীবৃক্ষ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৩২)

রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধের চিত্ররূপময় উপস্থাপনায় কাব্যনাট্যকার শিমুল গাছের রক্তিম রূপের দৃশ্যকল্পের সাযুজ্য নির্মাণে প্রয়াসী হন। এখানে পুষ্পিত শাল্মলীবৃক্ষের রক্তিম সৌন্দর্যের আভা ও উজ্জ্বলতার সঙ্গে রক্তের লাল রঙের মিশেলে জীবনের গাঢ় অথচ তীব্র অনুভূতির অভূতপূর্ব ও নাটকীয় অভিযাত্রা সূচিত হয়েছে। জীবনের উজ্জ্বলতা ও মৃত্যুর তীব্র বেদনা: বিপতীপ্র দুই ভাবনা কবিকল্পনায় অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'সার্থক চিত্রকল্প শব্দে-রঙে-রেখায় কবিতার আবহ সৃষ্টি করে। চিত্রকল্প কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় যেমন তেমনি আবার অন্তিমে সামগ্রিক রসপরিণামের জন্যে চিত্রকল্পের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ১০০) এ প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য-শিল্প ভাবনা স্মর্তব্য: '... শিল্পের সৌন্দর্য এতই উদার ও নির্বিচারী যে সেখানে স্বচ্ছন্দে স্থান ক'রে নেয় গোলাপের পাশেই কুমড়োফুল, বালিকার হাসির পাশেই স্ফীতকায় দন্তিল গণিকা, স্বাস্থ্যবতী রূপসীর পাশেই কৃমিসংকুল জন্তুর শব্দ। আর শিল্পলব্ধ জ্ঞান– যদি কিছু থাকে, আছে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস– তাও নয় ঘোষণীয় বা বিশ্লেষণযোগ্য, তা

প্রকাশ করা যায় হয়তো নতুন একটি শিল্পরচনায়– জীবনের মধ্য দিয়ে নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই শিল্পকলা কিছু করে আমাদের নিয়ে, আমাদের জন্য– এমন কিছু যা আমাদের কোনো গভীরতম অভাব পরিপূরণ করে, মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে যা অবিচলভাবে কাঙ্ক্ষণীয়;– আমরা সেজন্যই তাকে রহস্যময় এক প্রয়োজন বলেছি।' (বুদ্ধদেব, ২০২৩ : ৪৮–৪৯) এমন বিপতীপ্রতার সংশ্লেষে তিনি ভাবনাকে ব্যঞ্জনামণ্ডিত করে তোলেন। সঞ্জয়ের সংলাপে:

এই সুন্দর অগ্রহায়ণে
ক্ষেত্র থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ পরিপক্ব ধান্যের মতো
দেহ থেকে উৎপাটিত জীবাত্মা–
গণনার অতীত, বেদনার অতীত, বিমিশ্র– (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২১৭)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গণে হত্যার বিপরীতে হত্যা রূপকল্প অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত থেকে কৃষকের পাকা ধান সংগ্রহের আনন্দমিশ্রিত অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব। কালের আবর্তে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়: না জীবন, না রাজত্ব– এখানে তারই প্রতীকী রূপায়ণ ঘটেছে। এখানে চিত্রকল্প কেবল বুদ্ধদেবের অবচেতনতলের অংশ নয়; তাঁর পরিশ্রসী শিল্পমনীষায় অনন্য উৎকর্ষ লাভ করেছে। একই উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে নামার বর্ণনায়:

নামলেন তিনি জলে, মন্থর পায়ে
যেন পুষ্করবাসী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত। তাঁর মাথায়
ঝ'রে পড়লো তীরবর্তী দেবদারু থেকে পল্লব
দূর্বার মতো, যেন আশীর্বাদে। আর জল
তাঁকে ঘিরে-ঘিরে স্নাত ক'রে দিলো, সস্নেহে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২০)

রণক্লান্ত দুর্যোধনের হ্রদে নামার দৃশ্যরূপ প্রকৃতির সহযোগে ও কবিতার পেলবতায় অনন্য মাত্রা পেয়েছে এখানে। প্রকৃতি যেন তার বেদনায় একাত্ম অনুভব করছে। পুকুরবাসী দেবতায় ভক্তি, দেবদারু পল্লবের কোমল স্পর্শ কিংবা পুকুর-জলের সস্নেহে স্নাত প্রভৃতির আলোকে এক অন্য দুর্যোধনের রূপাবয়ব নির্মাণ করেন বুদ্ধদেব। সমস্ত গ্লানিমা, কালিমা অন্তর্হিত হয়ে এক অন্য দুর্যোধনে ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। কেননা, প্রকৃতি যাকে এমন সরল ও আপন করে বরণ করে নেয়, তাতেই এ ইঙ্গিত সুপ্ত রেখেছেন বুদ্ধদেব। 'চিত্রকল্পের সাংগঠনিক অবয়বও কবির চেতনার সূত্র নির্ণয়ে সাহায্য করে। কবি কখনও সহজ-সরল চিত্রকল্পের বিন্যাসে হৃদয়ের ভাবতন্ময় রূপটি প্রকাশ করেন; আবার কখনও

মিশ্র জটিল চিত্রকল্পে, একাধিক উপাদানের সংলগ্নতায় ভাবনার ক্রমবলয়িত, পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘাবয়ব, গভীরতর রূপটি প্রত্যক্ষ করান।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ১০০) উদাহরণস্বরূপ: দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনায়

উদ্‌গীর্ণ হ'লো ঝলকে-ঝলকে রক্ত–
একটি রক্তিম ধারা মাটিতে
বিভক্ত হ'য়ে ধীরে মিলিয়ে গেলো
সূর্যাস্তের লোহিতবর্ণ আলোর মধ্যে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৩৮)

সূর্যাস্তের রক্তিম আভার সঙ্গে দুর্যোধনের রক্তের প্রবহমানতাকে একই চেতনায় সমীকৃত করেন কাব্যনাট্যকার। সূর্যাস্তের রক্তিম আভা যেমন সোনালি রোদমাখা আগামী দিনের আভাস দেয়, দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তেমনি নতুন কালের ইঙ্গিত করা হয়েছে। যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত, আহত, রক্তাক্ত মানব সত্তার শেষযাত্রা আর দিনের সূর্যের অস্ত যাওয়া যুগ-সংক্রান্তির কথা বলে। 'জীবন সংগ্রাম, যুদ্ধের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি তাঁর দূর হয়েছে এই শান্তিময় মৃত্যুতে। এই মৃত্যুই আনে মানুষের ইতিহাসে ক্রান্তিকাল। নাট্যকার দুর্যোধনের মৃত্যুতে অনুভব করেছেন মানুষের ইতিহাসের সংক্রান্তি।' (মনীষা, 2025 : 594) প্রকৃতির প্যারাডাইমে সে-তত্ত্বকথাই ভাস্বর করে তোলেন বুদ্ধদেব।

সূর্য নামে পশ্চিমে,
শান্ত রৌদ্রে পরিপ্লুত পৃথিবী।
মনে হয় যেন আকাশ আর মৃত্তিকা,
নির্নিমেষে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে
নিঃশব্দ প্রণয়ভাষণে মগ্ন। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৩০)

আকাশ ও পৃথিবীর নীরব প্রেমময় কথনের চিত্রকল্পময় উপস্থাপনা ঘটেছে এখানে। এ যুদ্ধের অবসানে মানবজীবনে ও প্রকৃতিতে শান্তি ও স্বস্তি ফিরেছে যেন। প্রকৃতি ও মানব মনের এক গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রকৃতি যেন এ অন্তিম পরিণতির আভাসে উদ্বেলিত। '' 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাকালের এক ক্রান্তি মোচন হয়েছে এবং উত্তরণের পথ নির্মাণ হয়েছে। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জাগতিকার্থে কখনো কখনো কোনো কোনো বিনাশ ভয়ংকর, কিন্তু সেই বিনাশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে মহান সত্য। 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং সংকট, অবশেষে দুর্যোধনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে উত্তরণ তা শুভ ভবিষ্যতের

ইঙ্গিতবাহী। (অনুপম, ২০০৮ : ১৫০) এভাবে কালের চেতনা ও কালের নতুন নির্মাণে চিত্রকল্প ভূমিকা পালন করে। তবে *অনাম্নী অঙ্গনা*-য় ভিন্ন তাৎপর্যে চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে।

অনাম্নী অঙ্গনা

কাম থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বৃহত্তর জীবন-উপলব্ধি, এবং সে-উপলব্ধির সূত্রে চরিত্রের রূপান্তর প্রক্রিয়া চিত্রকল্পের আধারে অভিব্যঞ্জিত করেন কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব। অর্থাৎ গভীর ও গভীরতর জীবনসত্য চিত্রকল্পের প্রয়োগে প্রতিফলিত হয়েছে। সমসাময়িক ভাব, কল্পনা, ধারণা, প্রবণতা বা চিন্তা অপূর্বপ্রজ্ঞাক্ষম বুদ্ধদেবের কবি-কল্পনায় সাহিত্যরসে জারিত হয়ে বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করে। তাঁর কবি মনীষায় ও নাট্যমানসের সংশ্লেষে অতীত ঐতিহ্যের অভিনব মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাসের সূত্রে চিত্রকল্প তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে 'মিথ'-এ বিরাজিত স্বপ্নের গোপন অর্থের তাৎপর্য, সংকেতের রহস্যময় ব্যঞ্জনা, অসীম ও নিবিড়তায় চিত্তের নবীন আবিষ্কারের দিগন্ত প্রসার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইমেজে দেখা দিল।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ১০১) এ কাবনাট্যে প্রণয়ভাব বুদ্ধদেবের শিল্পভাবনায় অঙ্গনার প্রাণশক্তির আধারে পরিণত হয়েছে।

> ... আর তাই আমার প্রণয়
> এখনো শুধু ক্ষীণ এক তরু, যাতে সবেমাত্র একটি-দুটি কুঁড়ি
> কাঁপছে আশায়, ভোরের বাতাসে, উদীয়মান দিনের দিকে তাকিয়ে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৬)

অঙ্গনার অন্তরে সূচিত হওয়া নতুন প্রণয়ের ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে ক্ষীণ তরুতে সদ্য অঙ্কুরিত একটি দুটি কুঁড়ির দৃশ্যকল্পে। অঙ্কুরিত প্রেমের আশা ভোরের সুশীতল বাতাসের দোলা ছাপিয়ে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। অঙ্গনা তার অপুষ্পিত, কুঁড়িসম প্রেমের যুগপৎ আনন্দ ও অজানা যন্ত্রণার শঙ্কায় অস্থির। দাসী জীবন থেকে সে তাই মুক্তি প্রত্যাশী। কিন্তু মুক্তি মেলে না। সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে অঙ্গনা যখন জানায় অম্বিকা তাকে স্নেহ করে, তখন সখীদের সংলাপে এক অসামান্য ব্যঞ্জনাঋদ্ধ চিত্রকল্প সম্ভাবিত হয়:

> **তৃতীয় সখী**
>
> [তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে]
>
> পক্ষিণীর প্রতি মাংসাশী যেমন স্নেহশীল!
>
> **দ্বিতীয় সখী**
>
> যেমন গাভীর প্রতি দুগ্ধজীবী ব্রাহ্মণ!
>
> **প্রথম সখী**
>
> যেমন মৃগের প্রতি মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৬–২৪৭)

রাজদাসীদের জীবনের নির্মম বাস্তবতা প্রতীকায়িত হয়েছে এখানে। পাখির প্রতি মাংসভোজীর স্নেহদৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্তে গাভীর প্রতি দুগ্ধজীবী ব্রাহ্মণের স্নেহাস্পর্শ এবং নিরীহ হরিণের প্রতি শিকারে মত্ত ক্ষত্রিয়ের আপাত স্নেহদৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে স্বার্থের, আতঙ্কের প্রাণনাশের সমূহ আশঙ্কা। অম্বিকার আপাত বৈপরীত্যময় স্নেহের প্রচ্ছন্নে রয়েছে অঙ্গনার স্বাধীনচেতনা হরণের দৃশ্যপট। কেননা রাজবধূ অম্বিকা অঙ্গনার সেবায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই যেমন করেই হোক তাকে দাসী করে রাখা চাই। 'নাট্যকার অম্বিকার মাধ্যমে সমাজের উঁচু স্তরের স্বার্থান্ধ মানুষদের ছবি এঁকেছেন, আর এখানেই এই নাটক পৌরাণিকতার গণ্ডী পেরিয়ে আধুনিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।' (মনীষা, 2025 : 592–593) প্রকৃতির অনুষঙ্গে বুদ্ধদেব অঙ্গনার দাসীজীবনের বঞ্চনা ও বেদনাকে সার্বজনীন পটভূমিকা প্রদান করেন। একইভাবে:

তোর বিষাদ
ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মনে,
যেমন বৈশাখের মেঘ
প্রথমে আমার হাতের মতো ছোটো, তারপর আকাশ-জোড়া। (বুদ্ধদেব ২০১৩ : ২৫০)

অঙ্গনার হৃদয়-উদ্ভূত বেদনা রুমা, সুনন্দা, হিরন্মতীর তপ্ত মরুরসম দাসীজীবনের প্রেক্ষাপটে বৈশাখী মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তিন সখীর অন্তস্থল ছুঁয়ে সে-বেদনা বুদ্ধদেব প্রবাহিত করেন অবারিত প্রকৃতিলোকে। ভাষার এ ক্রিয়াশীলতা ও আন্তর্ধর্মীয় কাব্যবোধই এ নাট্য-আখ্যানের গতিশীলতার স্মারক। আবার কবিচিত্তের বিশিষ্ট চেতনা ভাষায়, রূপনির্মাণে ও অলংকরণে এমন অভিনব চিত্রময়তা লাভ করে। নাট্য-আখ্যানে অম্বিকার অনুরোধে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়, তখন অঙ্গনার অনুভাবনায় বাষ্পের গতির চিত্রকল্প নির্মিত হয় এভাবে:

আমার জীবন,
যা এতদিন আমারই সীমায় বদ্ধ ছিলো,
মৃৎপাত্রের মধ্যে যেমন তণ্ডুল,
এখন তা আমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে চাইছে,
রন্ধনকালীন অন্নকে ছেড়ে বাষ্প যেমন ঊর্ধ্বে উঠে যায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৬৯)

অঙ্গনা তার প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সমস্ত কিছু নিজের সীমায় রেখেছিল যা মাটির পাত্রে চালের উপমায় বিধৃত হয়েছে। ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হবার কল্পনায় অঙ্গনার ভাবনা তার জীবন আর নির্দিষ্ট সীমায় নেই। জীবনের সীমা অতিক্রমণের

দৃশ্যকল্প নির্মিত হয়েছে মৃৎপাত্রে থাকা তণ্ডুল যেমন রন্ধনকালে তাপের প্রভাবে বাষ্প যেমন অন্নকে ছেড়ে ঊর্ধ্বগামী হয়, তেমনিভাবে নিজেকেই যেন নিজে অতিক্রম করে চলেছে অঙ্গনা। এটি তার জীবনের সীমা অতিক্রমণের প্রতীকী চিত্রকল্প। বদ্ধ, স্থির ও অপরিবর্তনীয় পরিস্থিতির বিপরীতে এখানে মুক্ত, অস্থির ও পরিবর্তনশীলতার চিত্ররূপ নির্মিত হয়েছে। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হবার অনুভূতি অঙ্গনা যখন অম্বিকাকে ব্যাখ্যা করছে তখন তার ভাষা নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ মিশে এক অসামান্য সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। যেমন:

> যেমন বৃদ্ধ বট থেকেও নির্গত হয়
> তরুণ হরিৎ বাসন্তিক পল্লবগুচ্ছ,
> তেমনি একটি হাসি–একটি মুহূর্ত–
> খ'সে পড়লো সেই মুখ থেকে আমার অন্তঃকরণে,
> আমার অন্তর থেকে নিঃসৃত হ'য়ে তাঁর সর্বাঙ্গে মিলিয়ে গেলো। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৭৫)

যৌন সংসর্গ ব্যক্তির মনোগত রূপান্তরের উপাদান হিসেবে বুদ্ধদেবের রোমান্টিক জীবনভাবনায় বারংবার চিহ্নিত হয়েছে। নর-নারীর যুগল মিলনের চিত্রায়নে বুদ্ধদেব বরাবরের মতো এখানে ভাষাকে কাব্যঘনিষ্ঠ করে তোলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অম্বিকার আজ্ঞাবহ দাসী হিসেবে রাত্রির দ্বিতীয় যামে ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হলে এক অ-পূর্ব অনুভবের আস্বাদ পায় অঙ্গনা। 'বৃদ্ধ বট', 'তরুণ হরিৎ বাসন্তিক পল্লবগুচ্ছ'-এর চিরন্তনত্ব প্রেমের চিরায়ত রূপের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে হাসির নির্মল আনন্দের ধারা: যা প্রবাহিত হয়েছে ব্যাসের মুখ থেকে অঙ্গনার অন্তরে এবং অঙ্গনার অনন্ত থেকে ব্যাসের সর্বাঙ্গে। এটি মানবিক অনুভূতির প্রগাঢ়তাকে ধারণ করে। মূলত প্রকৃতির অনুষঙ্গে মানবীয় অনুভূতির সাযুজ্যকল্পে এক অনির্বচনীয় চিত্রময়তার সূচনা ঘটে এতে। 'লক্ষণীয়, অঙ্গনার এই প্রথম মিলনই তার যথার্থ প্রথম প্রেম।' (তরুণ, ২০০৭ : ৬৯) *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যের তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের প্রবাহে এমন আনন্দসঞ্জাত প্রগাঢ় অনুভূতির সন্ধান মেলে। 'পুরাণে যে নারী ছিলেন একান্তই অনুল্লেখ্য, সেই নারীর মনোলোকে আধুনিক জীবনচেতনা সঞ্চার করে, যেমন সঞ্চারিত হয়েছিল তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে, বুদ্ধদেব বসু মিথকাহিনিকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : পনের) এর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয় অঙ্গনার ক্রম-রূপান্তরের ইতিবৃত্ত। এক মিলন রাত্রির স্মৃতিচিহ্ন অনন্তকালের আনন্দ ও সৌন্দর্যের আধার হয়ে থাকে অঙ্গনার জীবনে। ' ব্যাসদেবের ব্যাকুল বাহুপাশ যে অরণ্যের নিবিড়তায় অঙ্গনাকে জড়িয়ে নিয়েছিল। অঙ্গনার এই মহামিলনের অস্থির বহিঃপ্রকাশের ভাষা কাব্যময় এবং অঙ্গনার মানসিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে উত্তেজেক নাটকীয়তা।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৪৪) গানের মধ্য দিয়ে তার মুক্ত জীবনানন্দের চিত্র ফুটে ওঠে এভাবে:

কোন দূরে উড়ে অদৃশ্য হ'লে তুমি,
মহাবিহঙ্গ, সুন্দর! উন্মুল তরু মূর্ছায় অবসন্ন।
কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে
ক্ষুদ্র নতুন পাখি
মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো ঊর্ধ্বে,
উষার আলোয়–নীলিমায়–নিঃশব্দে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৮২)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আশ্রয়ে কাম থেকে প্রেমের পথে যাত্রার চিত্রকল্পময় উপস্থাপনা লক্ষণীয় এখানে। প্রেমের শক্তির আধারে 'ক্ষুদ্র নতুন পাখিরূপী' অঙ্গনা আর মৃত্তিকাসংলগ্ন থাকতে পারে না; প্রেমের অপার্থিব টানে সে বিচরণ করে ঊর্ধ্বালোকে, ভোরের আলোমাখা শান্ত নিবিড় নীলিমায়। প্রকৃতপক্ষে, 'নারীর বাসনা ও প্রজনন সৌন্দর্য পুরুষের কামনায় রাঙিয়ে উঠে কীভাবে নান্দনিক অনুভূতিতে, মৃত্যু-অনুভবে ও নবজন্মে সর্বায়ত হতে পারে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিতে পারে অধীরতা, মন্ময় প্রজ্ঞা ও অন্তর্বেদনার প্রজ্বলন ও উন্মীলন এবং পুনর্নব হওয়ায় বিভূতি-এসবই বুদ্ধদেব বসুর রচনাদির বিষয়আশয়।' (বেগম আকতার, ২০১৩ : ১০৮) অঙ্গনার রূপান্তরচিত্রে এ কথাই আভাসিত। ' ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ বা বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর উপলব্ধির সঙ্গে দাসী অঙ্গনার এই অনুভবের বিশেষ পার্থক্য নেই।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৬) এভাবেই চিত্রকল্পের প্রয়োগবৈচিত্র্যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যসমূহ নান্দনিক অনুধ্যানের জগতে পরিণত হয়। 'বস্তুত, বুদ্ধদেবের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কাব্যনাটকের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : পঁচিশ)

৪.২.৭ কাব্যনাট্যে ভাবাদর্শের চিহ্নায়ন

সমগ্রতলস্পর্শী শিল্পভাবনার অ-পূর্ব সংশ্লেষণে বুদ্ধদেব বসুর কাবনাট্যসমূহ বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর ভাববিশ্বের বহুবিধ প্রান্ত কাব্যনাট্যের আখ্যানে পরিদৃশ্যমান। বর্তমান গবেষণার এ অংশে বুদ্ধদেবের জীবনবীক্ষা, মূল্যবোধ, সৃজনক্ষম প্রজ্ঞা, বিশ্বাসের জগৎ, কাঙ্ক্ষিত জীবনবোধ চিহ্নবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হবে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ চিহ্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হলে বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের আখ্যানপটে ব্যবহৃত মিথকথা নতুনতর ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

ভারতীয় জীবনস্রোতে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ মিথের শিল্প প্রণোদনায় রচিত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তি ও সমষ্টির, প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির বহুমাত্রিক অভিব্যক্তিকে রূপান্বিত করেন। এ কাব্যনাট্য সৃজনের মৌল তাৎপর্য ব্যাখ্যানে ও অনুধাবনে, নাট্যকার ও কাব্যনাট্যের মধ্যে সংযোগ-সূত্র অন্বেষণে, প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিকতা পায়। এ নাট্য-আখ্যানে আধুনিক জীবনঘনিষ্ঠ নবরূপায়ণে: 'অলৌকিকতা-সমৃদ্ধ পুরাণের-স্তর উত্তীর্ণ মিথ-কাহিনীকে যেন তাঁর প্রতিটি অক্ষর পাঠ করে, সেই প্রাচীন মিথ-কাহিনীর অক্ষর বিন্যাসের উপরই নিজস্ব কালের বর্ণ এবং অক্ষরের সন্নিপাত ঘটিয়েছেন।' (কমলেশ, ১৯৮০ : ১২২) ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকে প্রায় পুরাণের অনুরূপ রেখে এ চিহ্নের প্যারাডাইমসমূহ নির্বাচন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ এ নাট্য-আখ্যান মূল চিহ্ন। এ চিহ্নের অন্তঃস্রোতে শায়িত কাব্যনাট্যটির ভাববিশ্ব 'কাম থেকে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণ'-এর শিল্পযাত্রা। রাজপুরোহিতের উচ্চারণে:

> কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো দু-জনে,
> অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ:
> তাদের ভূমিকা, আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর–
> এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গনা-প্রেমিকা।...
> যেমন রজ্জু থেকে গাভীরা, তেমনি কর্ম থেকে তারা নিঃসৃত। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৭২)

জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে তাদের আত্মিক মুক্তি ঘটেছে। কর্তব্যের জালে আবদ্ধ তপস্বী এবং সমাজ-সীমায় তরঙ্গিণীর বিবিধ সংকট রজ্জুবদ্ধ গাভীর প্যারাডাইমে বিন্যস্ত করেন কাব্যনাট্যকার। শেষ পর্যন্ত উভয়েই মানবসমাজ-প্রতিষ্ঠিত এ বন্ধনকে অতিক্রম করে বৃহত্তর বোধের আলোয় মুক্তি লাভ করেছে। গহন-গভীর হৃদয়াবেগের প্রভাবে আত্মিক মুক্তির চিহ্নায়ন ঘটেছে আলোচ্য উদ্ধৃতিতে। আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্বসংকুলতা, প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরিসর মানুষের আত্মিক মুক্তির অন্তরায়। প্রেমের মধ্যেই বুদ্ধদেব মানুষের আত্মিক মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন। প্রেমেই মানব মন উন্মুক্ত, স্বাধীন এবং বৃষ্টির মতো চলচঞ্চল। তাই এ আখ্যানে বৃষ্টির প্যারাডাইম সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে মানবসত্তার জাগরণ ঘটাতে তরঙ্গিণীর কাব্যময় উচ্চারণ:

> জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হ'লো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হ'লো মনোরথ, উচ্ছল হ'লো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ। বিলোল হ'লো বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়–প্রতিধ্বনি। মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরিক্ষে তৃষ্ণা, ধরণী দেয় তৃপ্তি। সাগর থেকে বাষ্প, বাষ্পে জমে মেঘ, মেঘ নামে বর্ষণে। বিদ্যুৎ জ্বলে অঙ্গ থেকে অঙ্গে; শোণিতে জাগে জ্বালা, বজ্রপাতে চূর্ণ হয় চেতনা। এসো তিমির, এসো তন্দ্রা, এসো দাবানল, এসো ধারাজল। তুমি আমার তৃষ্ণা,

তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন–মন্থন–মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ–বর্ষণ–বর্ষণ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩৫)

মানবপ্রকৃতির আদিমতম প্রবৃত্তির জাগরণের প্রতীকী চিত্র যেন। 'জন্তু', 'নিদ্রা', 'মনোরথ', 'মেঘ', 'বিদ্যুৎ', 'বজ্র', 'বৃষ্টি', 'তৃষ্ণা', 'তৃপ্তি', ' তিমির', 'তন্দ্রা', 'ধারাজল', 'ফণা' এমন অসংখ্য দ্যোতকের আয়োজন মূলত মানবজীবনের অন্যতম সঞ্চালক শক্তি কামকে অভিদ্যোতিত করার অভিপ্রায় থেকে। নাট্য-আখ্যানের প্রেক্ষাপটে অনাবৃষ্টির বিপরীতে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ছাড়িয়ে, নর-নারীর যুগল মিলনে উর্বরতার চিহ্ন নির্দেশিত হয়েও, আরও সম্প্রসারিত শিল্পদৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের স্বাধীন মনের বাসনার প্রতীকায়ন। এখানে তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ম-নীতি-কর্তব্য কোনো কিছুর অধীন নয়। বৃষ্টির ধারা তাদের মুক্ততার দ্যোতক হয়ে ওঠে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্বিষ্ট কামতৃষ্ণার উৎসারণ নয়, বরং কামের মধ্যে ক্রমশ প্রেমের ধারা সৃষ্টি। 'বুদ্ধদেবের কাছে কাম গভীর অর্থব্যঞ্জক। যা কোনো মানুষকে আত্ম-অন্বেষণে ব্রতী করে, যা নানা রূপান্তর ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে তাকে অসীমের দিকে এগিয়ে দেয়।' (সচ্চিদানন্দ, ২০১৫ : ১৩৪) যুগের চারিত্র্যধর্ম আত্মস্থ করে ঋষ্যশৃঙ্গ তাই উপলব্ধি করে:

আমার সামনে সব অন্ধকার। অন্ধকারেই নামতে হবে আমাকে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৬৯)

ঋষ্যশৃঙ্গের অন্ধকারে নিমজ্জন আধুনিক মানুষের অন্তরস্থ নৈঃসঙ্গ্যবোধের প্রতীকী চিহ্ন। তরঙ্গিণীকেও একই পথের অভিমুখী হতে হয়। 'আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।' (দময়ন্তী, ২০১৩ : ৭০) তরঙ্গিণীর গন্তব্যহীন পথে নিষ্ক্রান্ত হওয়া আধুনিক মানবের চিহ্নায়ক। বুদ্ধদেব 'মহাকালের বুকে মানুষকে দেখেছেন ক্রীড়ানক রূপে। ফলে, তাঁর মনে বিষাদ যোগ এসেছে। কিন্ত তার থেকে মুক্তিও খুঁজছেন।' (তরুণ, ২০০৩ : ৯৮) বুদ্ধদেব তাঁর অভিলক্ষ্য পৌঁছাতে এ নাট্য-আখ্যানের ভাষিক স্তরে রূপক-প্রতীক সমন্বিত আবহ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে 'মৃগয়া' করতে তরঙ্গিণীর অন্যতম কৌশল হলো:

আমরা সখীরা ঘিরে ফেলবো তাঁকে–যেমন সরোবরে নামে শ্রেণীবদ্ধ মরাল। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৯)

কিংবা, নেপথ্যের নারীকণ্ঠের সংগীতের প্রতি উৎকর্ণ ঋষ্যশৃঙ্গ বলে:

মরাল যেমন কৈলাসের জন্য আকুল, এঁদের প্রতি তেমনি আমার ঔৎসুক্য জাগছে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৩১)

প্রথম উদ্ধৃতিতে মরালের উপমা-চিহ্নে সুশৃঙ্খলা-ঐক্য-সৌন্দর্য-নির্দিষ্ট গতির দোলা চিহ্নায়িত হয়েছে। অপরদিকে, পৌরাণিক ব্যাখ্যানুসারে কৈলাস পবিত্র স্থান। মরাল যেমন আকুল হয়ে কৈলাসের অভিমুখী হয়, ঋষ্যশৃঙ্গও প্রবল আর্কষণ অনুভব করে নেপথ্যের নারীকণ্ঠের সংগীতের প্রতি। তার এ সহজাত আকর্ষণ বিশুদ্ধ ও পবিত্র। মরাল ও

কৈলাস এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী আকর্ষষিত হবার চিহ্নায়ক প্রক্রিয়াকে বেগবান করে। এভাবেই 'সৃষ্টির আদি থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ নানা প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই মিথ গড়ে উঠেছে।' (হোসনে আরা, ২০১৮ : ৬১) অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোকিত চরিত্রগুলোও কাব্যনাট্যকার পাঠকের চেতনায় জাগরূক রাখেন ভাষিক উচ্চারণের নান্দনিকতায়। 'বিশ্রামের সময় পাইনি; অশ্বের যেমন কশাঘাত, তেমনি ছিলো আমাদের পক্ষে কর্তব্যবোধ।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৮)– ১ম দূতের এ সংলাপে চিহ্নায়িত হয়েছে কর্তব্যের চাপে পিষ্ট বিরামহীন, বিশ্রামহীন জীবন পরিসর। গাঁয়ের মেয়েদের সংলাপে:

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য–
বৃষ্টি নেই! (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৭)

অনাবৃষ্টির কবলে রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রতীকায়ন ঘটেছে উদ্ধৃতিতে। 'অটল আক্রোশ, ' রুদ্রের রক্তচক্ষু', 'মাটির ফাটে বুক', 'শুকনো জলাশয়', 'ধুঁকছে নির্বাক পশুরা', 'শস্যহীন মাঠ', বন্ধ্যা সধবারা, 'বৃষ্টি নেই'–এসব শব্দবন্ধে বুদ্ধদেব অঙ্গদেশের সংকট প্রতীকায়িত করলেন বটে: তবে বৃহৎ অর্থে এটি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনাঋদ্ধ শিল্পরূপায়ণ। কেননা: 'বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত জটিল আবর্তময় সংকটদীর্ণ সময়ের অন্তঃসারকে অন্তরে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর প্রাতিস্বিক জীবনবোধ। আধুনিক মানবচৈতন্যের সমুদ্রবিস্তৃতি ও তার বিভঙ্গতা, প্রবহমাণ জীবন ও ক্রমভঙ্গুর মূল্যবোধ, সভ্যতার বৈনাশিক তাণ্ডব ও জাগতিক বিপন্নতা–এইসব প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধদেব বসু কৈশোর থেকেই স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : এক)

তপস্বী ও *তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক নাট্যমানসের সৃজনক্ষম প্রজ্ঞা কল্পনার রসে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। পুরাণের পাটাতনে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা অন্বেষণ করেন তিনি। বস্তুত, 'হাজার বছরের বাংলা নাটকের ধারায় বুদ্ধদেব বসু সঞ্চার করেছেন এক স্বকীয় মাত্রা।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪: আট) প্রকৃতই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী বাংলা কাব্যনাট্যসাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। এ কাব্যনাট্য এক মহৎ শিল্প-সৃষ্টি।' (মাহবুব, ২০০৯ : ৪৪) এ কাব্যনাট্যে গদ্যের ছদ্মবেশে কাব্যের পেলবতা, নাট্যক্রিয়ার চমৎকারিত্বে ও গতিশীলতায়, চরিত্রের আন্তর্দ্বান্দ্বিক রূপাবয়ব নির্মিতিতে, প্রাজ্ঞ ও দক্ষ বুদ্ধদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যের ভাবাদর্শের চিহ্নায়নেও বুদ্ধদেব বসুর শিল্পসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে যদুবংশ-ধ্বংসের নাটকীয় ঘটনাধারায় সঙ্গে আধুনিক জীবনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে নাট্য–আখ্যানে চিরকালীন আবহ এনেছেন। বুদ্ধদেব তাঁর বিশ্বাস ও অনুধ্যানের জগতকে বিশিষ্ট ও বিবিধ চিহ্নায়ন কৌশলে বিধৃত করেন। তাই 'মহাভারতের কাহিনি কেবল স্থবির উপাখ্যান নয়, বরং তা আবহমান কালের প্রবহমান প্রজ্ঞা' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : তের)–য় উন্নীত হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে:

> আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তমান,
> মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;
> কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,
> কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৮৪)

'পূর্বরঙ্গ' অংশে প্রথম বৃদ্ধের সংলাপ 'এই তো সেদিনমাত্র কুরুক্ষেত্র রক্তপাত শেষ'; এবং এ অংশে দ্বিতীয় বৃদ্ধের শেষ সংলাপ 'কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্ব'লে ওঠে আরেক শ্মশান'– এর মধ্যে রয়েছে আকস্মিকতা, নাটকীয়তা, দ্বন্দ্বময় জীবনজিজ্ঞাসা; যা পুরো নাট্য-আখ্যানজুড়ে তাদের উপস্থিতিকে প্রচ্ছন্নে জীবন্ত রেখেছে। মানবের পথচলায় মৃত্যু থেকে নবজীবন লাভ, বার্ধক্য থেকে শৈশবে উত্তরণের নঞর্থকতার বিপরীতে জীবনের আবাহনগীতি, নতুন দার্শনিক প্রস্থানভূমিতে পৌঁছানোর চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। বস্তুত সময় ও সভ্যতার পরিক্রমায় আসে সুদিন আর দুর্দিন। এর কোনোটিই চিরস্থায়ী নয়। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন ও বোধের ভিত্তি রচিত হয়। বুদ্ধদেব বসুকে 'তাই বলতে হলো– 'কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান'। এই ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের শান্তি প্রত্যাশায়। এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও সমাগত প্রায়।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০১) শান্তির অন্বেষণে তবু বুদ্ধদেব বসু বিরামহীন। কৃষ্ণের সংলাপে তারই চিহ্ন:

> আমি আছি
> অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। তুমি যাত্রা করো।
> এই দেশ বাসযোগ্য নেই আর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১২৩)

কৃষ্ণের 'অন্য প্রতিজ্ঞা' বুদ্ধদেবের নতুন দার্শনিক প্রতীতীরই চিহ্নায়ক। কালের চলিষ্ণুতা ও অমোঘ পরিণতিকে মেনে আধুনিক মানুষের মতন অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে কৃষ্ণ। 'এ অঙ্কে যা-কিছু ভাঙা-গড়া, তার সবটাই মনের জগতে।' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৫৩) নবতর দার্শনিক বোধে উত্তীর্ণ কৃষ্ণের নির্বিকারত্বে অর্জুনের মর্মবেদনা তাই।

যাদবের পরিণাম শুনে
আমি পরিতপ্ত, অস্থির, বেপথুমান।
গাত্র যেন ঘর্মাক্ত, ত্বকে জ্বালা।
অথচ, আশ্চর্য-তুমি নির্বিকার। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১২০)

যুগসংকটে ধ্বস্ত, শ্রান্ত আধুনিক মনের রূপ অর্জুনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। সমূলে উৎপাটিত যদু বংশের করুণ পরিণাম-সূত্রে অর্জুনের চৈতন্যে 'পরিতপ্ত', 'অস্থির', ' বেপথুমান' প্রভৃতি আধুনিক বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নায়িত হয়েছে এখানে। কৃষ্ণের মতন ত্রাণকর্তার এমন অপ্রত্যাশিত ও বৈপরীত্যসূচক মনোভাব মানবের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রতীকী চিহ্নায়ন বটে। 'ভীষণ ঘটনাগুলো নেপথ্যে ঘটে গেলেও আগাগোড়া অপ্রত্যাশিত নাটকীয় অভিঘাতে আমাদের সত্তা আলোড়িত হয়। বিশেষত যখন ঘটনা এবং কথনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন মনে হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ–যিনি স্বভাবধর্মে– আমাদের আকৃষ্ট করেন, যিনি সবকিছুর ঘটক–তিনি কেমন নির্বিকার। এ সেই পদ্মপাণি যিনি নিজের হাতে 'জ্ঞাতিহন্তা', রক্তপাতক; তিনি কেমন নিরুদ্বেগ, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম পুরুষ। ঘটনাসঞ্জাত আবেগ আমাদের আলোড়িত করে। ফলে স্থিরতা ও অস্থিরতার নাটকীয় বৈপরীত্যে আমরাও দুলতে থাকি।' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৫০) এ বৈপরীত্য জনতার মাঝে ত্রাসের জন্ম দিয়েছে; ধ্বংসের উন্মত্ত খেলায় মেতেছে তারা। প্রথম প্রহরীর কণ্ঠে

মধুর স্তোস্তপাঠে মিশ্রিত প্রভাতের তন্দ্রা
এবং নৃত্যে-গীতে মন্দ্রিত সন্ধ্যার মন্দির–
যা-কিছু উৎসাহিত করে মরজীবনে।
অথচ ওরাই আজ শেষ পর্যন্ত
চীৎকৃত বায়ুবেগে বলছে:
ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই! (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৯৭-৯৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয় দ্বারকাপুরীর জনজীবনে সরল আশ্বাসের জন্ম হয়েছিল। শান্ত-মধুর, নৃত্য-গীতময় আনন্দিত জীবনের সানন্দনিশ্বাস কেড়ে নিল ধ্বংসের উন্মাদনা। 'ধ্বংস' ও 'সুখ' বিপরীতবোধক শব্দবন্ধে বুদ্ধদেব ধ্বংসের মদমত্ততা চিহ্নায়িত করেন। এভাবে 'এই কাব্যনাট্যে একদিকে গদ্য ছন্দের সংলাপ যেমন বুদ্ধদেবকে সর্বপ্রথম তুঙ্গস্পর্শী সার্থকতা এনে দিয়েছিলো, আবার কাব্যিক সংলাপে উপমা ও অলংকারের যথাযোগ্য ব্যবহার চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে আস্বাদন করতেও সহায়তা করেছিল।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৯) কৃষ্ণের সংলাপেও তা লক্ষণীয়:

নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।

প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র, অচিরাৎ ধুলায় লুটালো।
হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা–দ্রুত–পরস্পর কিংবা যুগপৎ–
যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১১২)

পারস্পরিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা, যুদ্ধের উন্মত্ততা এখানে প্রকৃতির আশ্রয়ে চিহ্নায়িত হয়েছে। চৈত্রের বাতাসে শুকনো পাতা ঝরে পড়ার, কিংবা ঝড়ের বেগে বৃক্ষের উৎপাটিত হওয়ার দৃশ্যকল্পে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে নির্বিচারের অস্ত্রাঘাতের রূপকল্প। যাদবকুলের রথী-মহারথীরা যেন পারস্পরিক আঘাতে-প্রত্যাঘাতে মুহূর্তেই প্রাণ হারিয়ে শুকনো পাতার মতো, ঝড়ে উন্মূলিত বৃক্ষের মতো দ্বারকাপুরীর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। শুকনো পাতা আর সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় মূল্যহীন, নিষ্প্রাণ তারা। এভাবে প্রকৃতির শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক রূপের আধারে চিহ্নায়িত হয় পুরাণের কালসন্ধ্যার স্বরূপ। সময় ও সভ্যতার কালবেলায় মানুষ তাই শেষপর্যন্ত একা, নিঃসঙ্গ।

এ কী!
আমি একা–কৃষ্ণ নেই!
অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান–শরীরসর্বস্ব, জড়! (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৩৪)

কৃষ্ণবিহীন অর্জুন যেন অসীম শূন্যতায় ক্রম-নিমজ্জমান সত্তা, যা আধুনিক জীবনের অন্যতম সংকট। অর্জুনের মধ্য দিয়ে চিহ্নায়িত হলো 'জীবিতের যন্ত্রণা'– যা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের অন্যতম অনুপ্রেরণা। কৃষ্ণসঙ্গবিহীন অর্জুনের অনুভাবনায় এখানে কালের রথচক্রে নিঃসঙ্গ মানবাত্মার হাহাকার প্রতীকী চিহ্ন হয়েছে। এমন বৈরী প্রতিবেশ ধ্বংস না সৃষ্টির ইঙ্গিত, অর্জুনের মানসলোক তা নিয়ে দ্বিধান্বিত।

কী-অদ্ভুত দ্বিরালোক। অনিশ্চিত, বিকৃত সন্ধ্যার লগ্ন!
পিঙ্গল আভাস আর পাণ্ডুবর্ণ অমার মিশ্রণ।
আরম্ভ না অবসান? প্রদোষ না প্রত্যুষ-কে জানে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১২৩)

'অদ্ভুত দ্বিরালোক', 'অনিশ্চিত বিকৃত সন্ধ্যা', পিঙ্গল আভাস', পাণ্ডুবর্ণ', 'অমা' প্রভৃতি দ্যোতকের মধ্য দিয়ে কালসন্ধ্যার রূপকল্প দ্যোতিত হয়ে ওঠে। পরিবর্তমান, রহস্যময়, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত কালের প্রতীকী উন্মোচন ঘটেছে এখানে। বুদ্ধদেবের মননভূমির দার্শনিক অভিপ্রায় চিহ্নিত হয়ে যায় এরই সূত্র ধরে। তাঁর মানসভূমি মূলত 'মানবসভ্যতা নানা রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বৈনাশিক কালকে অতিক্রম করে অনাগতের দিকে যাত্রা

করে।' (বিশ্বজিৎ ও সিরাজ, ২০১১ : ৩৩৫) উত্তরকথন অংশে ব্যাসদেবের কণ্ঠে অন্তরালে বুদ্ধদেবই যেন জানিয়ে দেন:

কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর, ...
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হ'লো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে–
হয়তো বা আরব্ধ এখনই।
যাত্রা করো, বিদায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৩৭–১৩৮)

'মহাকালের রথচক্রের পরিবর্তন মেনেই মানুষকে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে হয়। প্রলয়ের উপকূলে দাঁড়িয়ে নবজীবনের, নবকালের অস্তিত্বকে প্রধান করে তোলার অভিপ্রায় থেকেই বুদ্ধদেব বসু পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটালেন। 'পুরাণ অবলম্বী নাটকে আদি যুগ নবতমযুগ এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই। কিছু ভিন্নতা অবশ্যই আছে। বুদ্ধদেবও নবতমের মধ্যে পুরাতনের শিল্পসিদ্ধি ঘটিয়ে চিরন্তনেরই পরিচয় দিয়েছেন।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৭৩) বুদ্ধদেবের কালচেতনার সংহত প্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় অনুচরের সংলাপে:

শুধু বৃত্ত
ঘোরে অবিরাম
নেই মধ্য,
নেই প্রান্ত,
শুধু নৃত্য
চলে অফুরান।
চঞ্চল এই সংসার;
পরি -বর্তন সার সত্য। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৩১)

কবিতার আবেগাশ্রয়ী অবয়বে বুদ্ধদেব বসু নাটকীয় ক্রিয়াশীলতা সঞ্চার করেন তাঁর মননভূমে সংপ্রোথিত ভাবাদর্শের চিহ্নায়নের জন্যই। কাব্যভাবনার সঙ্গে নাট্যময়তার মিশেলে এখানে চিরকালীন সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এ কাব্যনাট্যের নামকরণও তাই সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতবহ। কেননা, 'কালসন্ধ্যা কালান্তরের সূচনা করে। কালান্তর অর্থ–

কালের আবর্তনজনিত পরিবর্তন। দেশ ও পাত্র থেকে কালকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সাধারণ মানষের পক্ষে অবিচ্ছিন্ন কালের ধারণা করা সম্ভব হয় না। দেশে ও পাত্রে কালের যে পরিবর্তনের প্রকাশ ফাটে ওঠে, তারই নাম ইতিহাস। এই মানবেতিহাস কাল থেকে কালান্তরে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ইতিহাসের দিনগুলো হ'ল খণ্ডকাল; আমরা খণ্ডকালের বাসিন্দা হয়েও অন্য অর্থে চিরকালের। এমন উপলব্ধিতে যিনি সঞ্জীবিত, তিনি সংসারের শত বন্ধনে জড়িয়ে থাকলেও তাঁর আন্তর-সত্তা তাঁকে নিরাসক্ত চিরজীবনে উত্তীর্ণ করে দেয়।'' (কণিকা, ১৯৯৪ : ১৫১)

নাট্যিক রসমাধুর্যমণ্ডিত প্রকাশরীতিতে, ছন্দোবদ্ধ সংলাপমুখরতায়, চরিত্রের অন্তর্দেশের সন্ধানে, ভাষা সৌকর্যে আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয়ে, শব্দ চয়নের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিকোণের সঞ্চারে, স্বল্পকথনের মধ্যেও শব্দনির্বাচনে আধুনিক চেতনার প্রতিফলনে, চিত্রকল্প নান্দনিক প্রয়োগে এ নাট্য-আখ্যান সমৃদ্ধ। এ কথা সকলের জানা যে, 'শিল্পী সবসময়েই 'নতুন করে পাব বলে' এই প্রত্যাশার জন্যই ব্যাকুলিত থাকেন। আলোচ্য নাটিকাটিতেও পুরাতনের রূপের সঙ্গে একটি অখণ্ড আত্মীয়তার সুর বাঁধা পড়েছে এবং বুদ্ধদেবের আলোচ্য কাব্যনাটিকা 'কালসন্ধ্যা' যথার্থই পুরাণের বাতাবরণে নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৭৩) একই তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয় *প্রথম পার্থ* কাব্যনাট্যে।

প্রথম পার্থ

বহির্কাঠামোয় পৌরাণিক কুরুপ্রান্তরকে উপস্থাপন করে কাব্যনাট্য-আখ্যানে কর্ণ-কুন্তী-দ্রৌপদীর হৃদয়গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং এর সূত্রে কাব্যনাট্যে বিন্যস্ত বুদ্ধদেবের বিশ্বাসের জগৎ নানা চিহ্নে বিশ্লেষিত হবার অবকাশ রাখে। বুদ্ধদেব বসুর চেতনায় সংপ্রোথিত নিঃসীম নিঃসঙ্গতা এবং তা থেকে ব্যক্তির বলিষ্ঠ উত্তরণের এ আখ্যানে পৌরাণিক কাল সমকালে সমপতিত হয়ে ভাবীকালের জন্য ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে কাব্যনাট্যকার নাট্য-আখ্যানের শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃদ্ধের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ে জানা যায় এ কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্বাত্মক পটভূমি সম্পর্কে।

> তাঁদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা–
> অন্তত ছিলাম:
> যতদিন না ধার্তরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ
> একপাল ইঁদুরের মতো ছিন্ন করেছিলো সেই রজ্জু,
> সৌভ্রাত্র যার নাম, যা বেঁধে রাখে রাষ্ট্রকে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪১)

দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে হস্তিনাপুরের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ যে বাধাপ্রাপ্ত হয় কুরু-পাণ্ডবের মধ্যকার মৈত্রী বৈরিতায়, তা উঠে এসেছে। মিত্রতার রশ্মিকে বুদ্ধদেব বসু চিহ্নায়িত করেন 'সৌভ্রাত্র'-এ; আর 'জতুগৃহ', 'দ্যূতক্রীড়া', 'পাণ্ডবের বনবাস ও প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রম-ছিন্ন হওয়া বন্ধনকে উপমায়িত করেন ইঁদুরের দ্যোতকে। প্রকৃতপক্ষে 'দুই ব্রাক্ষ্মণ কিন্তু যুদ্ধ চান না; তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।' (ধ্রুবকুমার ২০১৯ : ২৭৫) ক্ষমতা, প্রতাপ ও রাজ্যজয়ের খেলায় কৌরব ও পাণ্ডবগণ এতটাই উন্মত্ত ছিল যে তারা তাদের শৈশব-কৈশোরের সমস্ত সুখস্মৃতি, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বিস্মৃত হয়। ক্রমে ক্ষয়ে যাওয়া এ বন্ধনের চূড়ান্ত পরিণতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। বুদ্ধদেবের শিল্পবাসনায় এ চেতনা চিরন্তন মূল্যবোধে জারিত হয়ে সমকালের সমাজ ও জীবনকে ছুঁয়ে তা ভাবীকালের জন্য সংকেতবহ হয়ে ওঠে। কখনওবা যুদ্ধের চিহ্নে কর্ণের অস্তিত্ব সংকট নিরসনের সূত্র দ্যোতনা লাভ করে।

এই যুদ্ধ
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।
সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।
আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,
আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।
আমি তাই স্বাগত জানাই
রক্তবর্ণ, ক্ষমাহীন, মুক্তিদাতা এই দেবতাকে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৮৬)

পুরো নাট্য-আখ্যানে অস্তিত্বের অন্তহীন সংকটের মধ্য দিয়ে কর্ণের জীবন পরিক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটবে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মাতার সঙ্গে, দ্রৌপদীর সঙ্গে প্রেমজীবনে তার অস্তিত্ব সুস্থির ভিত্তি পেতে পারত: 'একজন: আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা–আমার মা।/ আর অন্যজন: আমার অস্পৃষ্টা, দূরচারিণী কান্তা।/ দুই নারী: আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৮২)– এ উচ্চারণে কর্ণের অস্তিত্বহীনতার চূড়ান্ত রূপ অনুধাবন করা যায়। কুরুক্ষেত্র তার মনোলোকের রক্তাক্ত রূপেরই প্রতীক হয়ে ওঠে। এরকম: 'অনিঃশেষ যন্ত্রণা যেন সহসা উচ্ছ্বসিত হতে হতে স্তব্ধ।– তাকে ছন্দে ভাষায় মূর্ত যে স্তব্ধতা পরমুহূর্তে অগ্নিস্রাবের ইঙ্গিত দেয়। এই যে চাপা আবেগ– করে তোলা, পুরাণকে অধুনায় দাঁড় করানো তা কম কৃতিত্বের নয়। যে জন্য 'প্রথম পার্থ'র কর্ণ মহাভারতীয় যতখানি, তার চাইতে হয়ে ওঠেন আধুনিক বিষাদাক্লিষ্ট পরাস্ত মানুষের প্রতিভূ।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৫) কর্ণের বিচ্ছিন্নতা ও বিষাদাক্রান্ত

মনের সূত্রে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের প্রতি দৃকপাত করা যেতে পারে। মাতৃহীন বুদ্ধদেবের পিতার দ্বিতীয় বৈবাহিক জীবন তাঁকে পিতৃপরিবার থেকে অনেকটা দূরে ঠেলে দেয়। সময় যত গড়িয়েছে, এ দূরত্ব ততই বেড়েছে। তাঁর কন্যার স্মৃতিচারণায়: '... কারণ আমার বাবা জীবনেও মালখানগরের মাটিতে পা রাখেননি; শুধু তাই নয়, তার পিতার অথবা পিতৃক পরিবারের কোনো প্রভাবই তাঁর জীবনে ছিলো না।' (দময়ন্তী, ২০১১ : ৪৯) তাই বলা যায়, কর্ণ যেন বুদ্ধদেবের মানসের প্রতীকী চিহ্ন। আবার, দ্রৌপদীর স্বয়ংববর সভার প্রতিকারহীন অবিচারের ঘটনা স্মরণ করে কর্ণ বলে:

লজ্জায় তুমি উজ্জ্বলতর, অপমানে দেদীপ্যমান,
লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সুন্দর,
ঝঞ্ঝাহত তরণীর মতো অশান্ত
এক আশ্চর্য, অরুন্তুদ উন্মোচন,
এক অবিশ্বাস্য চিত্তমন্থন আবির্ভাব। ...
আমারও শোণিত হ'লো প্রজ্বলন্ত,
আমার মস্তক যেন দীর্ণ, আমার চিন্তায় অন্ধকার, ...
আমি কি হেসে উঠেছিলাম– যেন মদিরায় মত্ত?
উদ্‌গীর্ণ করেছিলাম–কোনো বাক্যে–আমার ন্যক্কার?
শুধু এটুকু জানি: আমার সেই অন্ধ উচ্ছ্বাসের
অর্থ কেউ বোঝেনি। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৭২-১৭৩)

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তীব্রতা ও উজ্জ্বলতার দ্যোতকে দ্রৌপদীর সৌন্দর্যের আকর্ষণীয় রূপ একই রেখায় সমীকৃত হয়েছে কর্ণের কল্পনায়। অগ্নিশিখা অবিসম্ভাবী দাহ্যগুণ ও সৌন্দর্যের আধার বিপতীপ্র বোধের জন্ম দেয়, যা কর্ণের পক্ষে দ্রৌপদীকে অর্জন করবার প্রতীকী চিহ্নায়ন। কর্ণ তাই ঝড়ে কবলিত নৌকার মতন অস্থির, দিশাহীন, বিপদাক্রান্ত; শোণিতধারায়, মনের গহন গভীরে এ বেদনা অবিরাম বয়ে চলা ক্লান্ত মানবসত্তা। তবু যেন তা সে লুকাতে জানে মদমত্ততার ছলনায়। স্বয়ংবর সভায় যোগ্য হয়েও সূতপুত্র বলে অসম্মানিত ও অবরণীয় হওয়ার গ্লানি ও প্রেমের বঞ্চনা নিয়ে কর্ণ নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হয়। কাব্যভঙ্গিমায় কর্ণের মনোজাগতিক টানাপড়েন উন্মোচিত হয়েছে এখানে। কর্ণের নিকট কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের আগমন এ অন্তর্দহন বৃদ্ধি করেছে। উপেক্ষিত ও নিঃসঙ্গ কর্ণের আশ্রয় প্রত্যাশী হয় কুন্তী:

রৌদ্র প্রখর।

বৃক্ষের মতো ছায়া ফেলে
কর্ণ দণ্ডায়মান।
আমি খুঁজবো আশ্রয় সেই ছায়ায়, আমি আজ প্রার্থিনী। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪৫)

আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখানে প্রখর রোদের প্রতীকে চিহ্নায়িত হয়। প্রখর রৌদ্রের বিপরীতে কর্ণ বৃক্ষপ্রতিম আশ্রয় ও সুশীতল ছায়ার প্রতিরূপক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একই মায়ের গর্ভজাত দুই পুত্র কর্ণ ও অর্জুন অভিশপ্ত দুর্ভাগ্যের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হবে: এমন দুঃসহ ভাবনায় কুন্তী কর্ণের নিকট আশ্রয় চায়। বুদ্ধদেবের আকাঙ্ক্ষা কর্ণ চরিত্রকে মহিমান্বিত করা। এ কথা সবার জানা যে, 'মহাভারতের সবচেয়ে হতভাগ্য চরিত্রের নাম কর্ণ। অতুলনীয় বীর হওয়ার পরও শুধু পরিচয় সংকটের কারণে সে বারবার অপমানিত হয়েছে, এমনকি অন্যায় যুদ্ধে নিহত হতে হয়েছে তাকে। এই উপেক্ষিত বীরের অটল চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় তুলে ধরে বুদ্ধদেবের 'প্রথম পার্থ' নাটকটি।' (রাজীব, ২০১৯ : ৪৯) তাই তার চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত বুদ্ধদেবের কাঙ্ক্ষিত ভাব-কল্পনা। যেমন:

কী আশ্চর্য ভ্রূণের সঙ্গে গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ:
এক দেহে দুই প্রাণ, দুই দেহে এক অনুভূতি,
যেন জগতের মধ্যে অন্য এক জগৎ–
দুর্গের চেয়েও নির্বিঘ্ন, স্বর্গের চেয়েও, তৃপ্তিকর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫১)

ভ্রূণ ও গর্ভধারিণীর অপার্থিব, নিরাপদ, ও গভীর সংযোগের স্বরূপ এখানে দুর্গ ও স্বর্গের দ্যোতকে অভিদ্যোতিত হয়েছে। মাতার সঙ্গে ভ্রূণের অন্তর্নিহিত সংযোগ-সূত্রের মধ্যে বুদ্ধদেব প্রচ্ছন্নে রেখেছেন কর্ণের নিঃসীম হাহাকার 'আমার জন্ম নেবার কোনো কারণ ছিলো না...' কিংবা 'সূর্যের বীজে-অনূঢ়ার গর্ভে–/ লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্ত সন্তান!' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫২)–এর মতো লাঞ্ছনা-বঞ্চনা। দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে সে-বঞ্চনার স্বরূপ উঠে এসেছে এভাবে:

আপনার স্বয়ংবরসভায় কর্ণের
প্রত্যাখ্যান। যজ্ঞভূমি থেকে কুকুরের মতো
প্রত্যাখ্যান অযোগ্য ব'লে নয়, অন্ত্যজ ব'লে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৬৪)

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় অযোগ্য, অন্ত্যজ হিসেবে চিহ্নিত করে কর্ণকে কুকুরের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করার চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। মাতৃস্নেহবঞ্চিত, অভিমানী, আত্মপরিচয়বঞ্চিত কর্ণ দমে যায় না, এসব সংকটের মধ্যেও অনিবার্য মৃত্যু জেনেও সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয় না: অংশ নেয় যুদ্ধে। 'এই প্রত্যাখ্যান– এই প্রতিকারহীন অবিচারের জ্বালা

কর্ণের মানসিক জগতে একটা তীব্র আলোড়ন এনে তাঁর মনে নানা বিকারের জন্ম দিয়েছে। (সুমিতা, ২০২৫ : ২১) তাছাড়া কর্ণের 'ভিতরের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বাইরে ছড়িয়ে যেতে যেতে আবার ভিতরে টান টান হয়ে বাঁধা পড়ে।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৫) তাই যুদ্ধ তার অস্তিত্বের সমার্থক দ্যোতক হয়ে ওঠে।

আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হ'তে পারব নিজের কাছে প্রকাশিত- ও প্রমাণিত। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৭৮)

আত্মপরিচয়ের এ অভীপ্সায় কর্ণ হয়ে ওঠে আধুনিক মানুষের প্রতীকী চিহ্ন। আধুনিক কর্ণের অনুধ্যানের জগতে তাই শাস্ত্রীয় খণ্ডিত জগৎ নয়। 'মিথ যেমন করে নিঃসঙ্গ, দণ্ডিত ও পরাজিত ব্যক্তি নায়ককে ফিরিয়ে আনতে চায় সমাজকেন্দ্রে, বিশ্বাসের বলয়ে, বুদ্ধদেবও সেভাবে আত্মিক নৈঃসঙ্গ্য থেকে উত্তরণ করেন সামূহিক জীবনে নয় আত্মনাভিকেন্দ্রে, নিজের প্রবল অবিরল সৃষ্টিকাজের একাগ্রতায় এবং কবিসত্তার সার্বভৌমত্বে। (বেগম আকতার, ২০১৩ : ১০৬) কর্ণই তাই জানিয়ে দেয়:

আমি শাস্ত্র মানি না: আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।
যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।
যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৫৬)

সর্বমানবীয় কল্যাণবোধে জাগ্রত হয় কর্ণ। বুদ্ধদেব বসুর অভিপ্রায় এটিই। বুদ্ধদেবের নিকট নিঃসঙ্গতা মানে পলায়নপরতা নয়, বরং সত্য অনুসন্ধানে ও ব্যক্তির ইতিবাচক উত্তরণ তথা সম্প্রসারণের সৃষ্টিশীল উৎস। 'শাস্ত্র' তার সীমায়িত জীবনবোধের প্রতীকী চিহ্ন। বুদ্ধদেবের কর্ণ অনায়াসেই শাস্ত্রের তথাতথিত গণ্ডি পেরিয়ে সর্বমানবীয় মঙ্গলচেতনায় চিহ্নায়িত হয়। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণে কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎকে উপজীব্য করে লেখা বুদ্ধদেবের *প্রথম পার্থ* নাটক বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : উনিশ)– হিসেবে এভাবেই বিবেচিত হয়। এক যুগবৃত্তের অবসানে আরেক নতুন যুগবৃত্তের আখ্যান *সংক্রান্তি*-তে ভাবাদর্শের অন্তর্বিন্যাসে বুদ্ধদেব সচেতন শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দেন।

সংক্রান্তি

বুদ্ধদেব বসু *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্যে পৌরাণিক যুগ-সংক্রান্তিকে একালের করে তুলেছেন বহুবিচিত্র চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায়। বিধ্বংসী যুদ্ধ এ কাব্যনাট্যের অন্যতম দিক। কুরুপ্রান্তরের বাস্তবোচিত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া অনুধাবনে প্রয়োজন বিবেচনায় একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

তাঁরা আক্রমণ করলেন পরস্পরকে

যেন ক্ষিপ্ত দুই বৃষ,
বা মদস্রাবী দুই হস্তী,
বা যুগল সিংহ–একই সিংহীর জন্য কামোন্মত্ত–
তর্জনে
গর্জনে
আস্ফালনে
দন্তঘর্ষণে
অতি ভীষণ–দুর্দান্ত– রোমহর্ষণ।
বিচিত্র
তাদের গতির ভঙ্গি, দেহের ঘূর্ণন, রণকৌশল,
বামাবর্ত, দক্ষিণাবর্ত, উড্ডীন, অবডীন,
সম্মুখীন, বঙ্কিম ও তির্যক:
প্রচণ্ড
গদার শব্দ, বেগের শব্দ, পায়ের শব্দ,
ঝঞ্ঝার মতো নিশ্বাস,
সিন্ধুর তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বাস,
ধুলোর মেঘে সূর্যালোক নিষ্প্রভ,
সংঘর্ষে অগ্নিকণা ওড়ে বাতাসে,
পদাঘাতে মৃত্তিকা ফেটে যায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৩১–২৩২)

বুদ্ধদেব বসুর অভিপ্রায় যুদ্ধের ভয়াবহ অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের বিরোধী মনোভাব প্রতিপন্ন করা। ভীমসেন ও দুর্যোধনের যুদ্ধ দৃশ্যের দিকে দৃকপাত করলে পাঠকমাত্রই এর ভয়াবহতায় শিউরে উঠবেন। বুদ্ধদেব সচেতনভাবে এ অনুভূতির অভিজ্ঞতা পাঠককে দিতে চেয়েছেন। 'পরস্পরের আক্রমণ', ' ক্ষিপ্ত বৃষ', 'মদস্রাবী হস্তী', 'তর্জন-গর্জন', 'গদার-বেগের-পায়ের শব্দ', 'সিন্ধু তরঙ্গ', 'ধুলোর মেঘ'–সহ বলা চলে পুরো উদ্ধৃতিটি যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমগ্র চিহ্নকে ধারণ করে রয়েছে। যুদ্ধে দুর্যোধনের শক্তিমত্ততার চিহ্নায়ন ঘটেছে এভাবে:

... প্লাবনের মতো
দুর্যোধনের বিস্ফারিত বিক্রম
স্খলমান পল্লীর মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে

পাণ্ডবপক্ষের সম্বল, যারা মৎস্য মগধ চেদিরাজ্য থেকে এসেছিল–

কিন্তু কেউ আর নিজের দেশে ফিরবে না। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২১৭)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের শক্তি ও বিক্রম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্লাবনের প্যারাডাইমে তুলে ধরেন বুদ্ধদেব। প্লাবন বা বন্যা যেমন পল্লীর সমস্তকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দুর্যোধনও তেমনি পাণ্ডবদেব সমস্ত সম্বল নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। উল্লিখিত উপমা-চিহ্নে এ তাৎপর্যই ব্যক্ত হয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায়। স্ফুলিঙ্গের মতো চোখ নিয়ে দুর্যোধন যখন:

ভীমসেনের সম্মুখে এগিয়ে যায় তখন দুর্যোধন:

তাঁর সমবয়সী বাল্যবন্ধুর দিকে তাকিয়ে

তাঁর মুখশ্রী যেন কোমল হ'লো–মুহূর্তের জন্য।

বিষণ্ন সুরে বললেন, 'ভীমসেন,

ছেলেবেলায় আমরা ছিলাম খেলার সঙ্গী...

সে-সব দিন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে,

শুধু পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশিষ্ট। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৪)

অসাধারণ দক্ষতায় যুদ্ধ-দৃশ্যের মধ্যে বুদ্ধদেব সঞ্চারিত করেন শৈশব-কৈশোরের অমলিন, নির্দ্বন্দ্ব, সুনির্মল স্মৃতি। গৃহ, শিষ্য যাদের এক, একই নদীতে যারা আনন্দিত চিত্তে সন্তরণ করত, মল্লযুদ্ধ ও অশ্বচালনায় যারা খেলাচ্ছলে প্রতিযোগিতা করত: আজ তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত। এক বুক হাহাকার প্রচ্ছন্নে ফুটে ওঠে এ বর্ণনায়। তাদের স্বপ্নসম দিনের উল্লেখে কাব্যনাট্যকারের যুদ্ধবিরোধী মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। দুর্যোধনকে নিয়ে গান্ধারীর প্রার্থনা ছিলো:

আমি চেয়েছি সে জয় করুক–নিজেকে।

তার যুদ্ধ হোক সেই সব শত্রুর সঙ্গে,

যা তারই মধ্যে ভুজঙ্গের মতো গর্জমান। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৯)

দুর্যোধনের অন্তর্নিহিত হিংস্র প্রবৃত্তি এখানে চিহ্নায়িত হয়েছে সাপের দ্যোতকে। সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষ নানা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু কাব্যনাট্যকার বলতে চান যুদ্ধ নিজের সঙ্গে নিজের হওয়াতেই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ। কেননা গান্ধারী জানে যুদ্ধের নির্মমতা। ধৃতরাষ্ট্র যখন গান্ধারীকে বলে, 'গান্ধারী, তোমার কি হৃদয় নেই?' তখন গান্ধারী বলে:

হৃদয়, মহারাজ? আমার হৃদয় এক শবাচ্ছন্ন শ্মশান, (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৩০)

গান্ধারী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ শূন্যতার, হাহাকারের প্রতিরূপক এটি। 'জীবিতের যন্ত্রণা' নিয়ে শবাচ্ছন্ন শ্মশানভূমে গান্ধারীর অনিঃশেষ বেদনায় আচ্ছন্ন। 'কঠোরতা কোমলতায় ভরা গান্ধারী চরিত্র সৃষ্টি করে বুদ্ধদেব যাথার্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিষাদই গান্ধারীর একমাত্র সম্পদ। এই বিষাদ তাঁকে নিয়ে গেছে মৃত্যুর মত অন্ধকারে অজানা রহস্যময় এক লোকে।' (জগন্নাথ, ১৯৯৮ : ৫৭) 'শিল্পের ক্ষেত্রে এমনকি বাচ্যার্থও যথেষ্ট নয়,–তার ভিতরে ব্যঞ্জনার্থ ফুটিয়ে তুলতে গেলে এমন শব্দ প্রয়োজন যা বাক্যমধ্যের অন্য শব্দের প্রতিভাকে বাড়িয়ে তোলে। যেটুকু একটি শব্দের ভিতরের অর্থ-জ্যোতি, সমধর্মী আর একটি শব্দ তার পাশে এসে সেই জ্যোতিকে বাড়িয়ে তোলে।' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২২) শ্মশান শব্দের সঙ্গে শবের যোগসূত্র রয়েছেই। তবু বুদ্ধদেব শ্মশানের পূর্বে শবাচ্ছন্ন শব্দটি প্রয়োগ করেন শ্মশানের তাৎপর্য আরও গভীরভাবে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে। গান্ধারীর হাহাকার অকপটে পাঠকের চৈতন্যে সঞ্চারিত হয়। শোকাভিভূত হয়েও গান্ধারী প্রাজ্ঞ জীবনভাবনায় প্রোজ্জ্বল। 'শত পুত্রের মৃত্যুযাত্রা দেখেও আশ্চর্য প্রাজ্ঞ, সমাহিত মাতা গান্ধারী।' (রাজীব, ২০১৯ : ৫১) পাঠকের চৈতন্যে গান্ধারীর জন্য করুণার সঞ্চার হলেও যুদ্ধ অবধারিত ও অনিবার্য। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে করুণার কোনো স্থান নেই।

...বনভূমিতে মাতঙ্গদল ধাবিত হ'লে
যেমন লুপ্ত হ'য়ে যায় হরিণ-শশকের পদচিহ্ন,
তেমনি উৎপাটিত হয় করুণা
রণক্ষেত্রে, যোদ্ধার প্রতি পদক্ষেপে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২০৫)

অরণ্যভূমিতে হাতির দর্পমিশ্রিত পর্দাপণে যেমন হরিণ-শশকের মতো নিরীহ প্রাণী প্রাণভয়ে প্রাণপণে পালিয়ে যায়, এমনকি মুছে যায় তাদের পায়ের চিহ্নটুকুও; তেমনি রণক্ষেত্রে যোদ্ধার অন্তর থেকে করুণা, স্নেহ, প্রেম অন্তর্হিত হয়। হাতি, হরিণ ও শশক দ্যোতকের আড়ালের যুদ্ধের নির্মমতা সুচিহ্নায়িত হয়েছে এখানে। জীবন ও জগতের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন প্রজ্ঞাপ্রসূত মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির। গান্ধারীর ভাষ্যে:

মহারাজ, তোমার চক্ষু দৃষ্টিহীন ব'লে অন্ধ নও তুমি,
তুমি প্রজ্ঞাহীন ব'লেই দৃষ্টিহীন।
অথবা তুমি সজ্ঞান, তবু ভ্রান্ত,
বুদ্ধি আর ভ্রান্তির মধ্যে চিরকাল দোলায়মান–
কিন্তু ভ্রান্তি তোমার বরণীয়, তাই স্বেচ্ছায় তুমি অন্ধ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২২৭)

ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক বিশেষ প্রতিবন্ধকতা তার দৃষ্টিহীনতা, সে চোখে দেখতে পায় না। বুদ্ধদেব বসু এখানে অন্ধত্বের সংজ্ঞায়ন পাল্টে দিলেন। প্রজ্ঞাহীন, ভ্রান্তির দোলায় দোলায়মান সত্তাকে কবি দৃষ্টিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, 'বুদ্ধদেব বসুর 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে মূলত মহাকালের এক রক্তাক্ত ইতিকথা চিত্রিত হয়েছে। মানব-জীবনে কাল বা সময় বয়ে নিয়ে আসে কখনো ক্রান্তি আর কখনো উত্তরণ। বুদ্ধদেব বসু ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নের চিত্র 'সংক্রান্তি' কাব্যনাটকে উপস্থাপন করেছেন। '(অনুপম, ২০০৮ : ১৫০) সঞ্জয়ের ভাষ্যেও এ বাণী তুলে ধরেন বুদ্ধদেব: 'মানুষের ইতিহাসে আসে ক্রান্তিকাল,/ মহৎ বংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪০) ইতিহাসের অনিবার্য ক্রান্তিকাল উত্তরণের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। এ অন্ধত্বের মোচন হলেই মানবীয় শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটবে। বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও দর্শনভাবনার সঙ্গে মিথের অন্তরঙ্গ সংযোগ ও সমন্বয় ঘটে বলেই তিনি এমন মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন। বলা যায়: 'মিথকে বহু সময়েই তিনি নিজের সৃষ্টিশীল সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন করে উপলব্ধি করেছেন। পুরাণবৃত্তান্তকে নিছক কাহিনি বলে ধার্য না করে তার গভীরে নিহিত থাকা বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক অনুধ্যানকেও অন্বেষণ করেছেন বুদ্ধদেব।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ৬২)

অনাম্নী অঙ্গনা

বুদ্ধদেব বসু যুগের বহুবিচিত্র সংকটের বিপরীতে ব্যক্তির আত্মিক মুক্তি, বিধ্বংসী কালের পটে ব্যক্তিকে সমুন্নত ও বলিষ্ঠ রেখেছেন প্রেমের শক্তিতে। সাহিত্যিক জীবনের শুরুর দিকের কামগন্ধী প্রেম পরিণত বুদ্ধদেবের শিল্প-অভীপ্সায় আত্ম-উত্তরণের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। প্রেমের নবতর ব্যাখ্যান নির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর আশ্রয় সমাজের অগোচরে-অনাদরে থাকা প্রান্তনারীজন। কেননা: 'তার নিজস্ব চিন্তা, ইচ্ছা, মেধা ও সৃজনশীলতার বাস্তবায়ন সেখানে ছিল বাহুল্য, অগ্রাহ্যযোগ্য। যেহেতু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষই ছিল কর্তাব্যক্তি, সেহেতু নারীর ভূমিকা সেখানে নিতান্তই তার আজ্ঞা পালনকারী হিসেবেই মূল্যায়িত হত। পারিবারিক সংস্কার, ধর্মীয় নীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধানের দাপটে নারী বহুকাল পূর্বেই হারিয়েছিল স্বাধীন ও নিজস্ব মনোভঙ্গিকে বাস্তবায়নের সুযোগ। শিক্ষা ও ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনে অনধিকারী বিবেচিত নারীর জন্য নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গৃহপরিসরের বেষ্টনী তাকে বহির্জগত থেকেই শুধু দূরে সরিয়ে দেয়নি, পাশাপশি তার মনোলোকেও আরোপ করেছিল পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল।' (তাশরিক, ২০১৮ : ২৪৮) তাই এ কাব্যনাট্যের অঙ্গনা বলতে পারে:

> যত ফুল ছিলো আমার মালায়,
> যত চন্দন আননে ও বক্ষে,
> সেই বিশাল গন্ধে ডুবে গেলো সব–নদীর জলে লোষ্ট্রের মতো। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৭৩)

এখানে ফুল, মালা, চন্দন প্রেম-সৌন্দর্য-পবিত্রতার দ্যোতক। লোষ্ট্র এখানে কামবোধের এবং নদী প্রেমবোধের দ্যোতক। নদীর প্রবহমানতায় ব্যাসদেবের সমস্ত শারীরিক অসংগতি দূরীভূত হয়ে গেছে: যা অঙ্গনার প্রেমে উত্তরণের চিহ্নায়ক। 'অম্বিকার কাছে যা ছিল যৌনতা, অঙ্গনার কাছে তাই হলো প্রেম। ব্যাস সংসর্গ– 'তার জীবনান্তর'। (তরুণ, ২০০৩ : ১০৬) প্রিয়জনের প্রেমের, সৌন্দর্যের বিশালত্ব অভিদ্যোতিত হয়েছে এখানে। ব্যাসদেবের সঙ্গে অঙ্গনা মিলন-অনুভূতি প্রেমের আবরণে তুলে ধরেন বুদ্ধদেব। মূলত 'মূল মহাভারতের কাহিনিকে আবয়বিক কাঠমোয় অটুট রেখেও এমন একটি আশ্চর্য আধুনিক উপলব্ধিকে এই নাটকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব, তাতে কাহিনিকে ডি-কনস্ট্রাক্ট না-করা হলেও রি-কনস্ট্রাক্ট তো অবশ্যই করা হয়েছে যে এটা মানতেই হবে।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ২৩৩) নবসৃষ্ট অঙ্গনা তাই বলতে পারে:

যার অন্তরালে আমার বীজময় রাত্রি–
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে–
ফ'লে উঠতে পারে গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোক্তা যার ভবিষ্যৎ। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৮১)

মহামতি বিদুরের জন্মের ইঙ্গিত বুদ্ধদেব গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালি ধানের উপমায় বিধৃত ধরেন। সোনালি ধান এখানে মহামতি বিদুরের প্রতিরূপক। নারীর তার সন্তান সম্ভাব্যতাকে, স্বর্গীয় অনুভূতিকে প্রকৃতির প্যারাডাইমে অনুভব করছে–এ এক অনন্য উপলব্ধি। *প্রথম পার্থ*র কুমারী কুন্তী দুর্বাসার থেকে পাওয়া মন্ত্রে স্বেচ্ছায় সূর্যদেবতাকে আহ্বান করে কর্ণের জন্ম দিলেও গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়ে দেয়। আর, এ কাব্যনাট্যের অঙ্গনা কুমারীত্ব বিসর্জন অস্বীকৃত হয়েও অম্বিকার আজ্ঞা পালনের জন্য ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভস্থ বিদুরের মাতা হিসেবে মহিমান্বিত অনুভব করে। ফলে সন্তানবতী অঙ্গনা নিজেকে সোনালি ফসলের প্যারাডাইমে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে অনায়াসে। কাব্যনাট্যের আখ্যানপটের এধরনের বৈপরীত্য উপস্থপনায় বুদ্ধদেবের আধুনিক মানসতার পরিচয় মেলে। 'অনাম্নী অঙ্গনা'র সঙ্গে 'প্রথম পার্থ'র এমন একটি সূক্ষ্ম বৈপরীত্য আছে যা আমাদের ভাবায়। কুমারীর সন্তানকে লজ্জায় মেনে নিতে পারেন নি কুন্তী। কিন্তু অম্বিকার দাসী এই অনাম্নী অঙ্গনা তার কানীন পুত্রকে সগর্বে লালন করেছে। অথচ দুই নারীই ভোগ করেছে যন্ত্রণা। একজন কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে কৌমার্য হারিয়েছে; প্রথম সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়েও তাকে ভূলতে পারে নি। অন্যজন ব্যাসের ঔরসে সন্তান পেয়ে ধন্য। কিন্তু তাকে ভুলতে হয়েছে তার প্রথম স্বপ্ন-যা ভোলা তার পক্ষে মর্মান্তিক।' (তরুণ, ২০০৩ : ১০৫) আধুনিক নারীর যন্ত্রণাকাতর, দ্বন্দ্বাত্মক মানসিকতা চিহ্নায়িত হয়েছে এর মধ্য দিয়ে। আবার, ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে অঙ্গনার ভাবনায় ব্যাসদেবের স্বরূপ ছিলো এমন:

ঋষিরা শার্দূলের মতো চক্ষুষ্মান, শুনেছি,
তাঁদের দৃষ্টি অন্ধকারেও সচ্ছল। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৬৫)

ঋষি বা জ্ঞানীদের শার্দূল তথা বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাদের দৈব অন্তর্দৃষ্টির। এ অন্তর্দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্নে রয়েছে গভীর জ্ঞান ও বোধিশক্তির দ্যোতনা। ঋষিদের বোধিশক্তি অজ্ঞতা ও অন্ধকার দূর করে। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলন-পরবর্তী অঙ্গনার সীমাকে অতিক্রম করে নতুন আনন্দানুভূতির প্রতি উদ্বেলিত হয়। শূদ্রাণী নারীকে এক মিলন-রাত্রির মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে করে তোলেন বুদ্ধদেব। বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর নারীজীবনের প্রতি মমত্ববোধ আজন্মলালিত। স্মৃতিকথায় তিনি জানিয়েছেন 'রান্নাঘরের কোণে দেয়ালহীন একটি একচালা– আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মুগ্ধ। এক মহিলা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন, অন্য একজন গর্ত থেকে চাল তুলে নিয়ে তক্ষুণি আবার ঢেলে দিচ্ছেন ধান–ঢেঁকির মাথাটি উঠে গিয়ে আবার পড়তে যেটুকু সময় নেবে ঠিক সেই ক-টি মুহূর্তের মধ্যে: আমার অবাক লাগছে যে, প্রথম মহিলার ভুল হচ্ছে না কখনো। দ্বিতীয় মহিলার হাতের উপর একবারও ঢেঁকি পড়ছে না– মুহূর্তের জন্যও না-থেমে কী দ্রুত এঁরা কাজ ক'রে যাচ্ছেন– আমার চোখে প্রায় ম্যাজিকের মতো ব্যাপার, কিন্তু এঁদের বাহবা দেবার কেউ নেই।' (বুদ্ধদেব, ১৯৬০ : ৬৯–৭০) গ্রামীণ জীবনে নারীদের প্রাত্যহিক এ চিত্র তিনি দরদ নিয়ে অঙ্কন করেন। এ কাব্যনাট্যে দাসী অঙ্গনার চরিত্র নির্মাণে বুদ্ধদেবের এ শিল্পমনস্তত্ত্ব সক্রিয় থাকা অবান্তর নয়। অঙ্গনাদের জীবন যখন সমাজের যূপকাষ্ঠে পীড়িত, তখন বুদ্ধদেব তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন সংগীতের অভিযোজনায়।

অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,
খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,
সামনে উঠোন, খিড়কিদোরে পুকুর,
তেঁতুলতলায় শিউরে ওঠে ছায়া:
–দূর, অনেক দূর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৩)

অঙ্গনার গানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও জীবনের বিপরীতে প্রত্যাশিত স্বপ্নময় জীবনের প্রতিচ্ছবির চিহ্নায়ন ঘটেছে এখানে। রাজপ্রাসাদ জৌলুস ও সুবিধাদির থেকে দূরে খড়ের চালের কুটিরে, একটুকরো আলোমাখা গৃহস্থ জীবনের স্বপ্ন অঙ্গনার। প্রতিটি নারীর হৃদয়ে ছোট অথচ স্বস্তিময় এক স্বপ্ন সংগোপনে থাকে: অঙ্গনার গানে তা-ই প্রতিকায়িত হয়েছে। 'দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চায় অঙ্গনা। উচ্চবর্ণ নারীদের সবচেয়ে বড় সম্পদ স্বাধীনতা– সেই স্বাধীনতার জন্য সে কাতর।' (রাজীব, ২০১৯ : ৪৮) প্রথম সখী বলে: 'কোনো অরণ্যের নিভৃতে, পর্ণকুটিরে/ কোনো শবরযুবকের সঙ্গে ভূমিশয্যায় শয়ন–/তাও ভালো/এই রমণীয় বসনভূষণের তুলনায়–/ যা আমাদেরই দাসীত্বেরই

চিহ্ন।' (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৮) বুদ্ধদেব বসু পৌরাণিক কাঠোমোয় নারীকে উপস্থাপন করে তাতে সঞ্চার করেন প্রবল জীবনতৃষ্ণা। কথ্যভঙ্গিমায় বুদ্ধদেব বসু নারীর না-পাওয়া প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা, নাট্যিকতা তুলে ধরেন; যেমন তৃতীয় সখীর সংলাপ:

আমি ভাই পোড়-খাওয়া মানুষ। অল্প বয়সে
আমিও চোখে চোখ মিলিয়েছিলাম–এক পড়োশীর সঙ্গে।
কিন্তু মা
পারলেন না চন্দ্রহার, বাজুবন্দ গড়াতে,
তাই শেষ পর্যন্ত হাতে হাত মিললো না। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৫)

গদ্যভঙ্গির এ সংলাপে 'পড়োশীর সঙ্গে', 'কিন্তু মা' এমন উচ্চারণে যুগপৎ কাব্যভাব ও নাট্যগুণ সঞ্চারিত হয়। 'শব্দ যে-অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হবে, সেই বাক্যের অন্যান্য শব্দের অর্থাবহ ঐ একক শব্দের অর্থের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে।' (অভী, ২০১১ : ৪৪) এখানে 'পোড়-খাওয়া' শব্দবন্ধ পরবর্তী বাক্য-বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। প্রেমময় জীবন হাতছানি দেয় নারীকে; কিন্তু নানা সংকটে তারা কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপন করতে পারে না। তবু, বুদ্ধদেব তাঁর নারী চরিত্রদের প্রেমের শক্তিতে আধুনিক জীবন-পথের যাত্রী করেছেন।

পথ চলতে প্রণয়,
জল তুলতে প্রণয়,
পায়ে-পায়ে তাই বিপদ, তাই ভয়।
সহজে নামে স্বপ্ন–বড়ো সহজে,
বুকের মধ্যে কাঁপন–বড়ো সহজে,
ধরা দিতে চায় শরীর–বড়ো সহজে। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৪৪)

এখানে প্রণয় নারীর জাগতিক ও মানসিক মুক্তির প্রতীকী চিহ্ন। প্রণয়ের সহজাত বেগবানতার সঙ্গে নারী মুক্তিকে একইরেখায় সমীকৃত করেন বুদ্ধদেব বসু ''এখানে 'বড়ো সহজে' এই শব্দ গুচ্ছ তিনবার পুনরুক্ত হয়ে কাব্যিক ভঙ্গিতে প্রেমাবেশকে ফুটিয়ে তুলেছে, এমনকি সখীর উক্তিতেও।'' (কৃষ্ণরূপ, ২০১১ : ১২৮) আবার নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনায়:

আপনি যেন শুক্লা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না
ব্যাসদেবের অমাবস্যার তুলনায়। (বুদ্ধদেব, ২০১৩: ২৫৮)

অম্বিকার এ সংলাপে চাঁদের দুই বিপ্রতীপ তিথির প্যারাডাইম ব্যবহৃত হয়েছে: ক) চাঁদের প্রায় পূর্ণ তিথি তথা শুক্লা দ্বাদশী; খ) অমাবস্যা, অর্থাৎ যখন চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় থাকার ফলে চাঁদ অদৃশ্য থাকে। চাঁদের দুই ভিন্ন রূপের আধারে এখানে সত্যবতী ও ব্যাসদেবের সৌন্দর্য চিহ্নায়িত হয়েছে। সত্যবতীর সংলাপে ব্যাসদেব চিহ্নায়িত হয়েছে এভাবে:

তিমিঙ্গিল যেমন সরোবরে আশ্রয় নিতে পারে না,
তেমনি তাঁদের পক্ষে অসম্ভব
স্নেহের শাসন, পারিবারিক বন্ধন, গার্হস্থ্য। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৫৯)

তিমিঙ্গিল তিমি প্রজাতির বড় প্রাণী বিশেষ। এটি যেমন সরোবরের সীমায়িত পরিসরে অবস্থান করতে পারে না, তেমনি যুগে যুগে জন্ম নেয়া মহৎ প্রাণের ব্যক্তিকে সাংসারিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা যায় না। শান্তনু, ব্যাসদেব কালের পটে তেমনই মহৎ প্রাণ। এমন প্রাণের সংস্পর্শে এসে অঙ্গনার তাই উপলব্ধি:

একবার তিনি অরণ্যের মতো
আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লেন। নীড়ের মধ্যে পাখির মতো আমার মুখ–
হারিয়ে গেলো তাঁর শ্মশ্রুদামের তৃণে দূর্বায় পল্লবে।
আর আমার দেহ
যেন আমার সঙ্গে বিবাদ ভুলে হ'য়ে উঠলো মধুর। (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ২৭২)

নারী প্রেম ও প্রকৃতির মাঝে শান্তি ও আনন্দের ধারা খুঁজে পায়: এখানে উপমা-চিহ্নে তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। অরণ্য প্রকৃতির বিস্তৃতির প্রতীক চিহ্ন। অঙ্গনা সেই বিস্তৃতির পটে একাকার হয়ে গেল। নীড় আশ্রয় ও শান্তির প্রতীক চিহ্ন। অঙ্গনার অনুভবে বিস্তৃত প্রকৃতির বুকে শান্তি ও আশ্রয়ের প্রতীক হয়ে উঠলো ব্যাসদেবের সান্নিধ্য। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে অঙ্গনা যেন তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের আহ্বানে মধুময় অনুভূতি লাভ করলো। প্রকৃতির বিচিত্র প্যারাডাইমে বুদ্ধদেব এভাবেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভাবনাকে সন্নিবেশিত করেন।

আধুনিক জীবনদৃষ্টি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের পুরোনো পাতায় চোখ রেখেছেন; যেখানেরই দেখেছেন বঞ্চনার আভাস, তা নিয়ে তাঁর অতৃপ্ত শিল্পীসত্তা সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন হয়েছে: তাঁর সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহ বিশ্লেষণে এ সত্যই প্রতীয়মান হয়। পুরাণের বিচিত্রগামী পথের অভিজ্ঞতা কাব্যনাট্যের ফর্মে স্বকীয় শিল্পতৃষ্ণা থেকে উদ্ভাসিত করেন তিনি। নতুন জীবনালেখ্য ও ভাষ্য নির্মাণে বুদ্ধদেব 'বস্তুত নতুন দার্শনিক বোধি সঞ্জাত করে কখনো অন্তরঙ্গে পুরাতন ধারণাটির বিলুপ্তি ভেঙে দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু পুনর্নির্মাণ করেননি যে, এও আমরা কখনো বা বহিরঙ্গের

কাঠামো বিলোপুতার মিথ-প্রয়োগের মৌল প্রবণতা এইটিই–অর্থাৎ পুরোনোর পরিবর্তন, কখনো ভেতরে, কখনো বা বাইরে।' (চন্দ্রমল্লী, ২০১৫ : ৮০) আর এ কারণেই 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক হাজার বছরের বাংলা নাটকের ধারায় নানা কারণেই স্বকীয়তা দাবি করতে পারে। তাঁর কাব্যনাটক বিষয়গৌরবে যেমন অনন্য, প্রকরণ-প্রকৌশলেও তেমনি অনুপম। বস্তুত, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম কাব্যনাট্যকার।' (বিশ্বজিৎ, ২০২৪ : পঁচিশ)

সহায়কপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ — ১৯৯৯, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* জেনারেল প্রিন্টর্স, কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০১৬, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অভী চৌধুরী — ২০১১, *নিহিতার্থের খোঁজে*, মনফকিরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

আনন্দ রায় — ১৯৬০, 'দর্পণে দুই মুখ', অমিয় দেব, *বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ* (সম্পাদিত), বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

'নবীন কবি'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তম দাশ — ২০০৮, *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব* (সম্পাদিত) মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা

'বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক' অনুপম হাসান 'কবি বুদ্ধদেব বসু' / উত্তম দাশ

কণিকা সাহা — ১৯৯৪, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় — ১৯৮০, *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-র ভূমিকা*, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস — ১৪১৮, *মহাভারত সারানুবাদ*, রাজশেখর বসু, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, কলিকাতা

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী — ২০১১, ''কাব্যনাটক ও বুদ্ধদেব বসু" *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

গৌতম দত্ত ২০২৫, 'বুদ্ধদেব বসুর নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ', সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ১-২

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত ২০১৫, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

চিরঞ্জীব শূর ২০১৬, 'উত্তরঔপনিবেশিক সাহিত্য সমালোচনা: গোড়ার কিছু কথা'/ চিরঞ্জীব শূর, *প্রতীচ্যের সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব* (সংকলিত), আলোচনা চক্র, কলকাতা

চিরঞ্জীব শূর ২০১৭, 'উত্তর-ঔপনিবেশিক আখ্যান'/ রাহুল দাশগুপ্ত, *উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য* (সংকলক), আলোচনা চক্র কলকাতা

জগন্নাথ ঘোষ ১৯৯৮, *নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া', *বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে* (সম্পাদিত) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২০০৩, *বাংলা কাব্যনাট্য: রূপ ও রীতি*, প্রতিভাস, কলকাতা

২০০৭, *কাব্যনাট্য-বিভাবনা*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা

তারক পুরকাইত 2016, Pratidhwanti the Echo 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাস: কারণ অনুসন্ধান', Volume - V, Issue-11

তাশরিক-ই-হাবিব ২০১৮, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচিত্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

দময়ন্তী বসু সিং ২০১১,'উত্তরাধিকার', *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠী ২০০৭, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৯, *বুদ্ধদেব বসু: স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, বিগ বুক্স, প্রথম বিগ বুক্স সংস্করণ, কলকাতা

পুষ্পেন্দুশেখর গিরি ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসু-র তপস্বী ও তরঙ্গিণী নবমূল্যায়ন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রতিভা বসু ২০২০, *জীবনের জলছবি*, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল ২০১৪, *বুদ্ধদেব বসু নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, (সম্পাদিত) অবসর, ঢাকা

২০১৩, 'বুদ্ধদেব বসুর নন্দনভিতে মিথ', *কবির চেতনা: চেতনার কথকথা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু ২০১৩, বুদ্ধদেব বসুর নাটকসমগ্র ১, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১৩, *বুদ্ধদেব বসুর চিঠি: কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে* (স্মৃতি, সূত্র, সম্পাদনা) বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু ১৯৬০, *আমার ছেলেবেলা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা

১৩৮৫, *মহাভারতের কথা*, বুদ্ধদেব বসু এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিডেট ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা

২০১৮, *আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর, ঢাকা

২০২৩, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা

বিপান চন্দ্র ১৯৬০, *আধুনিক ভারত: ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ*, শক্তি রাহা, সৈকত রুদ্র, হিমাচল চক্রবর্তী ও গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়, (অনুবাদ ও সম্পাদনা) পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

২০২৪, *বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্যসমগ্র* (সম্পাদিত), দ্বিতীয় মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১১, ''বুদ্ধদেব বসু: শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি'' *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল ২০১১, 'বুদ্ধদেব বসুর নন্দনস্বভাবে মিথের ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী ২০১১, ''তপস্বী ও তরঙ্গিণী: একটি জনান্তিক পর্যবেক্ষণ'' *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

মাহবুব সাদিক ২০০৯, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০১২, *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা

মনীষা পাল 'পুরাণ ও আধুনিকতার মেলবন্ধন: বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক', Trisangam International Journal, Volume-v, Issue-1, 2025

মুনিরা সুলতানা ২০২১, *বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসমালোচনা মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী*, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম ২০১১,''আত্মজৈবনিক রচনায় বুদ্ধদেব বসু পাঠ অথবা 'আধুনিকতাবাদী' সাহিত্যের তত্ত্ববিচার'' *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

২০২৪, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ২য় সংস্করণ ২য় মুদ্রণ, ঢাকা

মো. মুসফিকুর রহমান ২০২৫, 'বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রবণতা: প্রসঙ্গ ভূগোল ও চরিত্রায়ণ', ফিনিক্স, পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন, (ISSN- 2249-7404)

রাজীব সরকার ২০১৯, *বহুমাত্রিক বুদ্ধদেব বসু বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে*, কথাপ্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

শান্তনু কায়সার ২০১৩, *কাব্য ও নাট্য কাব্যনাট্য*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

সচ্চিদানন্দ দাস ২০১৫, *বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণি*, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

সুমিতা ভট্টাচার্য ২০২৫, ''বুদ্ধদেব বসুর ''প্রথম পার্থ': কর্ণপ্রসঙ্গ'', ফিনিক্স, পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন, (ISSN- 2249-7404)

সমীর সেনগুপ্ত ১৯৯৮, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপধ্যায় ১৯৮৪, *আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র-চিত্রকল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৮, *বাংলা কবিতার কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সোহানা মাহবুব ২০২০, *অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সৈয়দ আবুল মকসুদ ২০১১, *ঢাকার বুদ্ধদেব বসু*, প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ২০০৮, *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকচিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হিমেল বরকত ২০১৩, *সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

হোসনে আরা ২০১৮, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা কাব্যনাট্যের সৃজন ও বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা একইসঙ্গে ধারাবাহিক ও স্বাতন্ত্র্যঋদ্ধ। উভয়েই তাঁদের অলোকসামান্য কবিপ্রতিভা এবং নাট্যসৃজন-জ্ঞানের অভূতপূর্ব শিল্পসমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব কাব্যনাট্যের জগৎ নির্মাণ করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আখ্যানতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞানের পরাকলা ব্যবহার করে এই দুই শিল্পীর কাব্যনাট্য সৃজনের যে বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপিত হয়েছে– তার সম্মিলন-বৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে আত্মদর্শন-নির্ভর বিষয়বৈচিত্র্যে কাব্যনাট্যের বহুস্বর সৃজন করেন বুদ্ধদেব সেখানে মিথ-নির্ভর কাঠামোর আশ্রয়ে মানবিক বোধের সংকট ও সমাধানের এক চিরায়ত শিল্পস্বর অনুসন্ধান করেন। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বর্তমান অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যিক ভাববিশ্বের যে তুলনামূলক প্রান্তগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে সেগুলো হলো: বিষয়ভাবনা, আখ্যান বিন্যাস, চরিত্রায়ণ, মঞ্চসংশ্লিষ্ট ধারণা ও নাট্যিকতা-সৃষ্টির সামর্থ্য এবং স্বকীয় ভাষাবৈশিষ্ট্য। এই বিশেষায়িত প্রস্তুতি এবং প্রকাশ উভয় শিল্পীর জন্য অনিবার্য ছিল, কেননা, 'নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কাব্যনাট্যকে জটিল প্রয়াস রূপে চিহ্নিত করা যায়।' (ধ্রুবকুমার, ২০১৯ : ২৬৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্যসমূহ তাঁর বিশ্বাসের দর্শন ও তত্ত্বকথার শিল্পিত অভিজ্ঞান। প্রেম ও প্রকৃতি, মানুষ ও মানবতা, সীমা ও অসীম, প্রতাপ-প্রথা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্র-সত্তার ভাবনাসমূহ আলোকিত করেছে তাঁর কাব্যনাট্যের ভাবনারীতিকে। অর্থাৎ, 'ভাবের রূপকার হিসাবেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার নাটক ভাবতত্ত্বের আধার।' (কনক, ১৯৫০ : ০৪) তাঁর রচিত *প্রকৃতির প্রতিশোধ* কাব্যনাট্যে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী চরিত্রটির সসীম-অসীমের দ্বন্দ্ব বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আখ্যান পটভূমি গতিপ্রাপ্ত হয়ে মীমাংসার পৌঁছেছে। *রাজা ও রানী* কাব্যনাট্যে প্রেমের অন্ধ-আবেগ, দুর্নিবার শক্তি ক্রমশ যুদ্ধের নেশায়, রাজধর্ম কিংবা ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনে, হিংসানলে জর্জরিত হয়ে বিরোধের উত্তুঙ্গ অবস্থানে পৌঁছেও মানবীয় প্রেমের অন্তর্নিহিত সারধর্ম কল্যাণবোধই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *বিসর্জন* কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ বিধৃত করলেন প্রথা-প্রতাপের বিপরীতে মানবপ্রেমের সর্ববিস্তারী আখ্যান। পুরাণের চিত্রাঙ্গদাকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনভাবনায় *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য-আখ্যানে উদ্দীপিত করে তুললেন। *মালিনী* কাব্যনাট্যে রাজার কন্যা রাজধর্ম ও রাজকীয় আভিজাত্যের বিপরীতে নবধর্ম নামক হৃদয়ধর্মের আলোয় আলোকিত করেছে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকে। আর *রক্তকরবী*-তে যক্ষপুরীর আখ্যানের অন্তস্তলে রবীন্দ্রনাথ আঁকলেন ব্যক্তির আত্মার শৃঙ্খল-যন্ত্রণা এবং মুক্তির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। রোমান্টিকবোধ, মানবতাবাদের অমিয় ধারা, উপনিবেশিত জীবনের নানামাত্রিক সংকট ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, বিশ্বায়িত জীবনবোধের উৎসারণ এবং এসবের রূপক-প্রতীকচিহ্নিত আড়ালের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই তাঁর বলার কথাটি ব্যক্ত করে চলেন।

কাব্যনাটের প্রকরণে সংকট ও অসঙ্গতি থেকে উত্তরণের উৎস হিসেবে রবীন্দ্র-চেতনায় স্থিত চিরন্তন মূল্যবোধের স্বকীয় চেতনাপ্রবাহ সক্রিয় থেকেছে।

অপরদিকে, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের বিষয়ভাবনা মিথকেন্দ্রিক। 'বিশেষত বুদ্ধদেব বসু পাশ্চাত্যের কাব্যনাটকের জনক টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাটকের তত্ত্বকে পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন। এ কারণেই সম্ভবত এলিয়টের মতো বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে।' (অনুপম, ২০০৮ : ১৫৩) আর তাই *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর অনালোকিত ঘটনাপ্রবাহ কিংবা নাম-উল্লেখমাত্র চরিত্রসমূহ নিয়ে তাঁর যে অভিযাত্রা তা বাংলা কাব্যনাট্যের ভুবনে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেছে। মিথের আশ্রয়ে আধুনিক মানুষের সত্তাগত যাবতীয় সংকট, দ্বন্দ্ব ও তা থেকে উত্তরণের উৎস অন্বেষণ করেন বুদ্ধদেব। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যে দুইজন নর-নারীর অন্তরে কাম ও প্রেমের প্রথাগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এর নবরূপায়ণ ঘটিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাতে আধুনিক জীবনের সংকটাকুল বোধসমূহকে সমন্বিত করলেন। যাদববংশের নির্মম করুণ পরিণতি কিংবা অর্জুনের পরাজয়, কৃষ্ণের বারংবার অন্তর্ধান হওয়ার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাট্যে মহাকালের প্রেক্ষাপটে মানুষের অসীম সক্ষমতার ধারণাকে বদলে দিলেন। *প্রথম পার্থ* এ *মহাভারত*-এর ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণ আধুনিক মানুষের অন্তর্দাহনের ও সংকটের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত হয়েছে। *সংক্রান্তি* কাব্যনাট্যে কুরুক্ষেত্রের পটভূমিকায় যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধ্বংসী চিত্র তুলে ধরে বুদ্ধদেব বসু এর নেতিবাচকতা উন্মোচন করে আধুনিক মানব সমাজকে সচেতন করার শিল্পিত প্রয়াস গ্রহণ করলেন। আর *অনাম্নী অঙ্গনা*-য় *মহাভারত*-এর বিদুরের জন্মের পূর্বের ইতিহাসের আড়ালে থাকা এক শূদ্র নারীকে বুদ্ধদেব বসু অভিষিক্ত করলেন আধুনিক জীবনবোধে, বিশেষ করে মাতৃত্বের অপার্থিব বোধে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-আখ্যানে ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ বিরলদৃষ্ট হলেও তা তাঁর কাব্যনাট্যিক উপস্থাপন-কৌশলের সূত্রে ভিন্ন মাত্রায় নান্দনিক উচ্চতা অর্জন করে। উদাহরণ হিসেবে *বিসর্জন* কাব্যনাট্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নাট্য-আখ্যান কাঠামোর প্রসঙ্গ মনে করা যেতে পারে। জীবরক্ত দিয়ে বলি পূজা বন্ধের ফলে প্রতিটি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের শিল্প-অভীপ্সা অনুযায়ী কাব্য ও নাট্যের অপূর্ব শৃঙ্খলায় বিভিন্ন ভাবনায় ও ক্রিয়ায় উদ্দীপিত হয়েছে এবং তা-ই এ নাট্য-আখ্যানকে অন্তিম পরিণতির দিকে গতিসঞ্চারী করেছে। আবার, গুহাবাসী সন্ন্যাসীর সাধনার দৃঢ়তা দ্বিধাবিজড়িত হতে শুরু করে বালিকানাম্নী চরিত্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার সূত্রে। পুরো নাট্য-আখ্যানজুড়ে এই একটিমাত্র ঘটনারই অনুরণন টের পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নবম দৃশ্যে সন্ন্যাসী বলে:

জগতের গাছে তুই ফুটেছিস ফুল,

জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে!

চল্ বাছা, গুহা হতে বাহিরেতে যাই।

সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,

সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,

মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী–

জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে

মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ১০৭–১০৮)

পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এখানে উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা চতুর্থ অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে। তবে এটুকু বলে রাখা ভালো যে, 'মানুষ প্রকৃতির উৎসারণ, কিন্তু প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই সে রচনা করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আবার, চৈতন্যশীল প্রাণী হিসেবে প্রকৃতির সঙ্গেই সে গড়ে তোলে পুনঃসম্বন্ধ; তার শ্রমে ও প্রেমে, জৈবিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায়, শিল্পসৃষ্টিতে ও বিজ্ঞানসাধনায় প্রকৃতিই হয়ে ওঠে মূল জীবনপট।' (বেগম আকতার, ২০০৭ : ৩৮) আর এভাবেই কাব্যনাট্য তো বটেই রবীন্দ্র-সৃষ্টি জগতে প্রকৃতি অমোঘ নিয়ন্তা হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য-আখ্যানে ঘটনা অপেক্ষা ঘটনা-তাড়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। তাই অন্বিষ্ট চরিত্রসমূহের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির দিকেই তাঁর নাট্যমানস অধিক নিবিষ্ট থেকেছে। সূক্ষ্ম বিন্যাসে মানব মনের সংঘাত ও বিপ্রতীপ বোধের শিল্পরূপ-সৃজন তাঁর কাব্যনাট্যের আকর্ষণবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কর্ণ-কুন্তীর অপত্যপ্রেম-কূটনীতি-ব্যক্তিচৈতন্য-উন্মোচিত আত্মপরিচয়ের সংঘাতপূর্ণ শিল্প-উচ্চারণ স্রণ করা যেতে পারে:

কবে, তা মনে পড়ে না,

কার মুখ থেকে, মনে পড়ে না,

কোনো কল্পনার কম্পন হয়তো, কোনো দূরশ্রুত প্রবাদ,

কোনো গহন স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে,

জন্মান্তরের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট–

আমি শুনেছিলাম, ভুলেছিলাম, ভেবেছিলাম,

ভুলে যেতে-যেতে ভুলতে পারিনি,

মেনে নিতে-নিতে মানতে পারিনি

রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,

আমার পিতা সূর্যদেব।

–কিন্তু এ কি সত্য হ'তে পারে? (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ১৪৮)

উপনিবেশের সৃষ্ট শোষণ, বৈষম্য ও বদ্ধতার বিপরীতে আলোর অন্বেষণ, সসীম-অসীমের তত্ত্ব পরীক্ষণে, প্রেমের নতুন ভাবনা-পরিসর উন্মোচনে, সমাজ-নির্দেশিত নারীর অবস্থা ও অবস্থানকে অতিক্রমের আত্যন্তিক প্রয়াসে এবং সর্বোপরি মানব মুক্তির বাণী সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের আখ্যান ভিন্নতার আবেদন সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে। সমাজ-প্রচলিত বিভিন্ন উপলব্ধি এবং আবেগময় আচরণকে তিনি প্রাত্যহিকতার নিগড় থেকে মুক্ত করে অভূতপূর্ব দার্শনিক উচ্চতায় উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যসমূহের চরিত্ররা সংশ্লিষ্ট ভাবের প্রতীকে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। অপরদিকে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত আধুনিক জীবনের সংকট সমাধানের সূত্র হিসেবে মিথের আশ্রয়ে প্রেম ও পুণ্যের নবতর ব্যাখ্যা নির্ণয়ে, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-নির্ভর আখ্যানে সুকৌশলে যুদ্ধবিরোধী চেতনার বিস্তারে, পুরাণের ধূলিমলিন পাতা থেকে কাহিনি ও চরিত্রকে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রদীপ্ত করে তুলতে বুদ্ধদেব বসু দক্ষতার পরিচয় দেন। ধূসর অতীতের উপাখ্যানে আধুনিক মানসতার আলো ফেলেছেন তিনি। স্থবির পুরাণ-আখ্যানে আধুনিক জীবনের প্রবহমানতা সঞ্চার করেছেন। পুরাণের ধূসরতর কাহিনি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নে তাঁর কাব্যনাট্যে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংকট সাঙ্গীকৃত হয়েছে, পুরাণ আশ্রয়ে পরিস্ফুট হয়েছে আধুনিক মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য থেকে তুলে আনা কোনো চরিত্র, কিংবা তাঁর কল্পিত মানস-চরিত্রকে মানবধর্মের ও মানবপ্রেমে অভিষিক্ত করেন। *রক্তকরবী* কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যে এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়: 'এখানে ব্যক্তিবিশ্বের সংকটকে বিধৃত করার পূর্বধরন বদলে গেল, জীবন ও প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্বকে তিনি বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক সংকটের পটভূমির বিস্তৃত সীমায় পর্যবেক্ষণ করতে চাইলেন। এটা রবীন্দ্রচেতনার দ্বান্দ্বিক ক্রমবিকাশ বা আপতিক সূত্র নয়, তাঁর চৈতন্যস্থিত মানবতাবাদের ধারাবাহিক চিন্তাটির রূপান্তরিত মাত্রা, ব্যক্তির আত্মত্রাণ ও যূথবদ্ধ মানবের মুক্তিকে ঐতিহাসিক সত্যের বিবেচনাসাপেক্ষ করা।' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৭০) এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যনাট্যে নারী চরিত্র এগিয়ে রয়েছে। তাঁর কাব্যনাট্যসমূহের আখ্যানপটে বালিকা, সুমিত্রা, ইলা, অপর্ণা, গুণবতী, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, নন্দিনীর উপস্থিতি কিংবা সক্রিয়তা– এ কথাই পাঠক বা দর্শককে জানান দেয়। বুদ্ধদেবের চরিত্ররা

আধুনিক জীবন-জটিলতায় ঘুরপাক খেয়ে দ্বন্দ্বজর্জরিত চিত্তে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তরঙ্গিণী, কুন্তী, গান্ধারী, অঙ্গনা কাব্যনাট্যের আখ্যানপটে এ সকল চরিত্রের উপস্থিতি বিশ্লেষণে বলা যায় যে, নারী চরিত্রের রূপাঙ্কনে উভয় কাব্যনাট্যকারের শিল্পযাত্রা উত্তরণের অভিমুখী। এ সকল নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব নাট্য-আখ্যানপটে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যা সমাজের প্রচল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিপরীতে গিয়ে সমাজ-চিহ্নিত বারাঙ্গনা সামাজিক তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করে তরঙ্গিণীর অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেমের অমৃতধারা। তরঙ্গিণীর প্রেমময় উচ্চারণে এর প্রমাণ মেলে।

তরঙ্গিণী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিণী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

তরঙ্গিণী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই– তুমি প্রয়োজন! (বুদ্ধদেব, ২০১৩ : ৪১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যেও প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ততায় নারী চরিত্রসমূহ প্রাণময়ী, সৌন্দর্যময়ী হয়ে উঠেছে। বলা যায়: "নারী রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণময়ী সৌন্দর্য প্রতিমা। ইহারা সকলকে ডাক দিয়াছে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য– unreality হইতে মুক্তি দেওয়া ইহাদের কাজ। ... ইহারা যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোকরশ্মি– আলোকের দূতী।" (কনক, ১৯৫০ : ২১)

উভয় কাব্যনাট্যকারই নাটকের ফর্ম নিয়ে যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন তাতে এ কথা অনুমেয় যে, তাঁরা সুপরিকল্পিতভাবে কাব্যনাট্য সৃজনে করেছেন। অত্যুক্তি হবে না যে, কাব্যনাট্য সৃজনে তাঁদের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্য-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাধর্মিতা। ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও রসধারা নিয়ে সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহ উভয় শিল্পীর ক্রম-উত্তরণের ও আত্ম-পরিক্রমণের সৃষ্টিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁদের সৃজনকলায় নিহিত রয়েছে উপনিবেশের তৈরি-করা আয়নাকে ভেঙে ফেলে বাঙালির প্রকৃত জীবনাকাঙ্ক্ষার উদ্ভাসনের আন্তরিক প্রয়াস। তাঁদের বহু-স্তরায়িত ও প্রাণপ্রতিম শিল্পভাবাদর্শের সূক্ষ্ম, হৃদয়সংবেদী গ্রন্থনায় ও বুনন শৈলীর গুণে কাব্যনাট্যসমূহ বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে। বুদ্ধদেব নাট্য-আখ্যানে প্রয়োজনীয় মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেন, আবার নাট্যনির্দেশকের জন্য স্বাধীনভাবে মঞ্চস্থ করবার অবকাশটুকু অক্ষুণ্ন রাখেন।

পৌরাণিক কালের আধুনিক সংস্করণ নির্মাণের প্রচেষ্টা তাঁর মঞ্চ-ভাবনায় পরিদৃষ্ট হয়। নাট্যনির্দেশকের প্রজ্ঞা ও দক্ষতার ওপর রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা ছিল বলে ন্যূনতম মঞ্চনির্দেশনা প্রদানই তিনি যথাযথ মনে করেছেন। তবে, প্রতিটি কাব্যনাট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা' শিরোনামায় যেসকল প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, তা আজকের উদ্যোগী নাট্য-নির্দেশকের জন্য মঞ্চপরিকল্পনার অতি-আবশ্যিক শিল্প-সহায়তারূপে সক্রিয় থাকে। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ-ভাবনা প্রসঙ্গে বলা যায়:

> আমরা মঞ্চে প্রত্যক্ষ করি, অদৃশ্য কবিসত্তার কেন্দ্রস্থল থেকে বেরিয়ে আসা একটি সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি বদলে দেয় চরিত্রের বাহ্য অবয়ব এবং দৃশ্যমানতার মধ্যে অদৃশ্যের প্রতি বারবার ইঙ্গিত জানায়। ফলে আহ্বান-বাণীর চারপাশে রচিত হয় ছন্দময়তার মায়া, নাট্যবিষয়ের প্রতিবেদন তাতেই হয়ে ওঠে সংকেতময়। একে কবিতার মাত্রা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। নাটকে গান-কবিতার মাধ্যম বিষয়ের আন্তঃসঙ্গতি রচনা ছাড়াও একই সঙ্গে বহন করে নাট্যদ্বন্দ্বের ভার ও চরিত্রসমূহের অবস্থানিক সমতা তৈরির পটভূমি। নাট্যবৃত্ত কবিতাবৃত্তির শক্তিকে নিজ কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে; জয়সিংহের আত্মবিসর্জন, ক্ষেমঙ্করের বন্ধু হত্যা–এসব ঘটনাংশ মূলতই আবেগজাত ক্রিয়া, এবং অন্তর্গত ভাবমূল্যে সে ক্রিয়ার উদ্বোধন সাধিত হয়। (বেগম আকতার, ২০১৪ : ১৬৩)

উভয় কাব্যনাট্যকারই নাট্যমঞ্চের ঐতিহ্যগত কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছেন। ঔপনিবেশিক কাঠামোর ত্রুটি চিহ্নায়নে, নতুন মানবিক সমাজের রূপকল্প প্রদানে, বাঙালির আত্মিক মুক্তি ও শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও আন্তরিক। অপরদিকে, পুরাণের খোলসে মোড়া আধুনিক জীবনের রূপায়ণে বুদ্ধদেব বসু স্বকীয় শিল্পভাবনার নিদর্শন রেখেছেন।

কাব্যের সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতির সঙ্গে নাটকের গতিশীলতা ও দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধনে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব দক্ষতার পরিচয় দেন। নাট্য-আখ্যানে গভীর জীবনবোধ ও দার্শনিকতার উন্মোচনে, চরিত্রসমূহের আন্তরচৈতন্যের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সংগীত সংযোজনা করেন। তাঁর কাব্যনাট্যে দ্বন্দ্ব-সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে তথা ভাবাদর্শ উন্মোচনের ভরকেন্দ্রে রয়েছে কবিতা ও গান। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে, *রক্তকরবী*র ভাবদ্বন্দ্ব নিরসনে পৌষের গানের সংযোজনা নাট্য-আখ্যানে বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। তাছাড়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে নন্দিনীর ভাষা বিশেষ মাত্রা হিসেবে চিহ্নায়িত হয়ে আছে। নাট্য-আখ্যানের পটে 'নন্দিনীর ভাষা প্রাণের ভাষা, আনন্দের ভাষা, খুশির ভাষা, তার ভাষায় আছে নৃত্যের তাল, খুশির জোয়ার। এর গতি লঘু অথচ ক্ষীপ্র। এর দ্যুতি আলোকময়। ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ গতিময় কথনরীতিতে নির্মিত নন্দিনীর ভাষা।' (সাইফুল, ২০০৩ : ২৫৯) দৃষ্টান্তস্বরূপ:

> ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৮৫)

অপরপক্ষে, বুদ্ধদেব বসু কবিতার ভাষায় তো বটেই এমনকি গদ্যের ভঙ্গিমায়ও বলবার বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, যেন-বা তা কবিতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের কথোপকথন। এ কথোপকথনের আবেশ থেকে তপস্বী কিংবা তরঙ্গিণী কেউই মুক্ত হতে পারে না; বরং ক্রম-আবেশে জড়িয়ে নতুন মানুষে পরিণত হয়। ব্যক্তির আন্তর-রূপান্তর প্রক্রিয়ায় গদ্যভাষা এমন প্রণোদনা দেয় যে তা অনায়াসে পাঠকের হৃদয়েও প্রগাঢ় অনুভূতি জাগায়। একটি জৈবসমন্বিত প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের গদ্যভঙ্গিমা কাব্যধর্ম ও নাট্যগুণের স্পর্শে গতিশীল, আকর্ষণীয় এবং পরবর্তী শিল্পস্রষ্টাদের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। কাব্যনাট্যের প্রকরণে তো বটেই বুদ্ধদেব বসুর সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জীবনব্যাপী সম্পর্ককে চিহ্নিত করেন: 'complex and vital relationship' এবং 'প্রায় বৈষ্ণব কবিতার রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্কের মতো।' (সমীর, ১৯৯৮ : ৩১৮) পরস্পর-সম্পৃক্ত এই অনন্যতা ও বহুস্তর-সংযোগ বর্তমান অভিসন্দর্ভে এই দুই মহান শিল্পীর কাব্যনাট্য বিবেচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সহায়কপঞ্জি

অনুপম হাসান — ২০০৮, 'বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক' *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব*, উত্তম দাশ (সম্পাদিত) মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৫০, *রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় — ২০১৯, *বুদ্ধদেব বসু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, প্রথম বিগ বুক্স সংস্করণ, বিগ বুক্স, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু — ২০১৩, বুদ্ধদেব বসুর নাটকসমগ্র ১, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল — ২০০৭, *কবির উপন্যাস*, ঐতিহ্য, ঢাকা

২০১৪, *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, প্রথম প্রকাশ, অবসর, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৪০৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

সমীর সেনগুপ্ত — ১৯৯৮, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা

সাইফুল ইসলাম — ২০০৩, রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উপসংহার

চিন্তার ও বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সৃজিত কাব্যনাট্যসমূহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসুর ক্রম-রূপান্তরিত ও ক্রম-উত্তীর্ণ নাট্য-মানসের সুচিহ্নায়ন পরিলক্ষিত হয়। কাব্যনাট্যের আখ্যানে তাঁদের সৃজিত শিল্পবিশ্বাস এবং প্রকরণসৌকর্যের নান্দনিক উদ্ভাসন ঘটেছে। এর সঙ্গে শিল্পসমন্বিত হয়েছে তাঁদের মানবমুক্তির বারতা। ভিন্ন সময়, শিল্পবোধ ও দার্শনিক চেতনার কাব্যনাট্যিক রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট ধারায় স্বতন্ত্র মাত্রা ও রসাবেদন সঞ্চার করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের এই সৃষ্টিশীল সঞ্চার পথে অংশীজন হয়ে উঠেছেন উত্তর কালের একাধিক সাহিত্যিক। তাঁদের সকলের শিল্পপ্রচেষ্টা কালোত্তীর্ণ হয়েছে এমন দাবি করা না গেলেও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, শম্ভু মিত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সাজেদুল আউয়াল, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ বাংলা কাব্যনাট্যের শক্তিশালী বিচরণ এই ধারাকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁরা সৃষ্টিশীল কবিসত্তার আন্তরগরজ থেকেই তুলনামূলকভাবে স্বল্প চর্চিত এ সাহিত্য ধারায় নিজেদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা কররছেন। এই উত্তরাধিকার মূলত রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের ঐকান্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী নাট্যপ্রচেষ্টার শিল্পরূপায়ণের সূত্রে অন্বিত এবং বিচিত্র বৈভবে বিকশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের শিল্পসফল প্রচেষ্টাসমূহ মূলত কাব্যনাট্যধারার অণুবিশ্ব, বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য প্রমাণের সূত্রে এই সত্যই প্রতিভাত হয়। তাঁদের সৃজনসম্ভারে সঞ্জীবনীশক্তি হিসেবে সক্রিয় থেকেছে কবিকল্পনা ও সমাজ-সচেতন সক্রিয় নাট্যভাবনার নির্বিকল্প সৃষ্টিশীল সম্মিলন। বস্তুত, আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের শিল্প-সম্ভাবনাময় অবয়ব তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে; যাকে এককভাবে প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের শ্রেণিকরণে আবদ্ধ করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যসমূহ একান্তভাবেই তাঁদের অনন্য স্বকীয়তার স্মারক। এই অভিসন্দর্ভে আলোচ্য কাব্যনাট্যকারদ্বয়ের প্রাতিস্বিক ভাববিশ্ব এবং তার প্রাকরণিক রূপায়ণ বিবেচিত হয়েছে; যার লক্ষ্য ছিল এই স্বল্প চর্চিত সাহিত্যধারার বিশ্লেষণে নবতর আলোকসম্পাত করা।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলা কাব্যনাট্যের বিকাশ ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর স্বকীয় ভাবাদর্শের আখ্যানতাত্ত্বিক ও চিহ্নবিজ্ঞানভিত্তিক স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। উভয় শিল্পীর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং সৃজনের অভিনবত্ব কীভাবে তাঁদের কাব্যনাট্যধারায় শিল্পরূপপ্রাপ্ত হয়েছে তার বিশেষত্ব শনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের

প্রতিপাদ্য প্রমাণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। প্রচলিত সুলভ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব রচিত কাব্যনাট্যের বিষয় ও শিল্পরূপ বিশ্লেষণ বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য ছিল না। শিল্পীর চিন্তাজগৎ যেহেতু তাঁর সৃজন-কলার অবিচ্ছেদ্য অংশ সেহেতু শিল্পীর ভাববিশ্ব সৃষ্টিকর্মের প্রকরণ-কাঠামোর সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কসূত্রে জৈবসংযোগ নিশ্চিত করে পাঠক-গবেষকের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। এই নিয়ত অভূতপূর্ব সংযোগ যেহেতু বহু চিহ্নের সমাবেশ এবং আখ্যানতাত্ত্বিক বিভিন্ন উপাদানে ঋদ্ধ সেহেতু সংগত কারণেই এ দুই শিল্পীর কাব্যনাট্যিক-পাঠের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহকে আখ্যানতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যান-কৌশলের সাহায্যে এবং চিহ্নবৈজ্ঞানিক কাঠামের আলোকে পাঠসমূহের শিল্পরস অনুধাবন ও উপস্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। বলা যেতে পারে, এই অভিসন্দর্ভে আখ্যানতাত্ত্বিক এ ব্যাখ্যার স্পষ্টীকরণে চিহ্নবিজ্ঞান সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের শিল্পসম্ভারের যে গভীরতা তাকে যথাযথভাবে শনাক্ত করে উপস্থাপন করা একটি আয়াসসাধ্য বিষয়। তাই নন্দনতত্ত্বের বিচারে কিছু শৈল্পিক বিশেষত্ব অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্তমান গবেষণায় অনালোকিত রয়ে যাওয়ার শঙ্কা বিদ্যমান। ভবিষ্যৎ গবেষণায় এ সকল সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টি অনিবার্যভাবেই বহুস্বরিক। তাই সময়ের সাথে সাথে গবেষকের চিন্তনকাঠামোর বিবর্ধনের সূত্রে তাঁদের কাব্যনাট্যসমূহ নতুনতর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হবে এটাই প্রত্যাশিত।

আকরগ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি,পত্র-পত্রিকা

আকরগ্রন্থ

বুদ্ধদেব বসু — ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসু নাটক সমগ্র* ১, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৪০৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

১৪০৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ* দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

সহায়কপঞ্জি

ক. বাংলা গ্রন্থ (বর্ণনাক্রমিক)

অজয় দাশগুপ্ত ও অরবিন্দ চক্রবর্তী — ২০০৯, *শেকসপিয়র রচনা সমগ্র*, (ভাষান্তর), সর্বাধুনিক সংস্করণ, পুনশ্চ, ৯/এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা

অজিতকুমার ঘোষ — ১৯৬৩, *নাটকের কথা*, প্রথম প্রকাশ, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১৯৯৯, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টর্স, কলকাতা

অনুপম হাসান — ২০১০, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক বিষয় ও প্রকরণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অমলেশ ত্রিপাঠী — ১৯৮৫, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

অমলেন্দু বসু — ১৯৭১, *সাহিত্যলোক*, জেনারেল প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অমিতাভ দাস — ২০১০, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

অভী চৌধুরী — ২০১১, *নিহিতার্থের খোঁজে*, মনফকিরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

অরবিন্দ পোদ্দার — ১৯৫৫, *ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক*, প্রথম প্রকাশ, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ২০০০, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অলোক রায় — ২০০১, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (সম্পাদিত), ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০১৬, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, (সম্পাদিত), ২য় সংস্করণ ডিসেম্বর দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অশোককুমার মিশ্র — ২০১১, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপঃ অরূপ* প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আনন্দ রায় — ১৯৬০ *বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ* (সম্পাদিত), বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

আনিসুজ্জামান — ২০১৬, *তাঁর সৃষ্টির পথ*, বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা

আনোয়ার পাশা ও মুহম্মদ আবদুল হাই — ২০১৪, *চর্যাগীতিকা* (সম্পাদিত) স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৮০, *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবু সয়ীদ আইয়ুব ২০২১, *পথের শেষ কোথায়*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আবুল ফজল ২০১৬, *মানবতন্ত্র*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৪১৬, *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি*, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উত্তম দাশ ১৯৮৯, *কাব্যনাট্য*, প্রথম প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা

২০০৮, *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব* (সম্পাদিত), মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৪১৫, *রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

১৩৬৬, *রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা

কণিকা সাহা ১৯৯৪, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০, *রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা*, এ. মুখর্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

কমলেশ রায় — ২০১৫, *রবীন্দ্রনাট্যে যাত্রার প্রভাব*, ভাষাচিত্র, ঢাকা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় — ১৯৫৯, *ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

২০১২, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পঞ্চাশ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪ রত্নবলী, কলকাতা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় — ১৯৮০, *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-র ভূমিকা*, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

কাজী নজরুল ইসলাম — ২০১৮, *নজরুল রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

খোন্দকার আশরাফ হোসেন — ২০১৩, *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গোপীচন্দ নারঙ — ২০১৩, *গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব*- সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), দ্বিতীয় মুদ্রণ সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত — ২০১৫, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৩৬৭, *রবি-রশ্মি পূর্বভাগে*, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও পুনর্বিবৃত), এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

চিন্মোহন সেহানবীশ ২০১৭, *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা*, প্যাপিরাস, কলকাতা

চিরঞ্জীব শূর ২০১৬, *প্রতীচ্যের সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব* (সংকলিত), আলোচনা চক্র, কলকাতা

২০১৭, *উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ ও বাংলা সাহিত্য* (সংকলক), আলোচনা চক্র কলকাতা

জগন্নাথ ঘোষ ১৯৯৮, *নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ কলকাতা

জয়া চ্যাটার্জী ১৯৯৯, *বাংলা ভাগ হল*, আবু জাফর অনূদিত, প্রথম সংস্করণ, এল্ অ্যালমা পাবলিকেশনস, কলকাতা

জিয়া হায়দার ১৯৯৫, *নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশ ১৪১৩, *কবিতার কথা*, দশম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০৫, *সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, ১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, কলকাতা

২০০৭, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা

২০০৯, *কবিতার বহুস্বর*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮, *বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে* (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২০০৩, *বাংলা কাব্যনাট্য: রূপ ও রীতি*, প্রতিভাস, কলকাতা

২০০৭, *কাব্যনাট্য-বিভাবনা*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা

তাশরিক-ই-হাবিব ২০১৮, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচিত্র*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

দীপ্তি ত্রিপাঠি ২০০৭, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবাশিস ভট্টাচার্য ২০১৪, *রবীন্দ্রকাব্যনাট্যে বাক্‌প্রতিমা*, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫, *কাব্যের মুক্তি এবং তার পর*, প্রতিভাস প্রথম সংস্করণ, প্রতিভাস, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৯, *বুদ্ধদেব বসু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, প্রথম বিগ বুক্‌স সংস্করণ, বিগ বুক্‌স, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

নবেন্দু সেন ২০১৬, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা* (সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ, রত্নবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ ১৯৭৮, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা*, ৪র্থ সংস্করণ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

নীলিমা ইব্রাহিম — ১৯৬৪, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় — ১৪২০, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, অষ্টম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী — ২০০৬, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

পুষ্পেন্দুশেখর গিরি — ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসু-র তপস্বী ও তরঙ্গিণী নবমূল্যায়ন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রতিভা বসু — ২০২০, *জীবনের জলছবি*, প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — ১৪২০, *রবীন্দ্রজীবনকথা*, আনন্দ, দ্বাদশ মুদ্রণ, কলকাতা

১৯০৭, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা

প্রমথ চৌধুরী — ২০০১, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, সুচয়নী পাবলিশার্স, সুচয়নী প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

প্রমথনাথ বিশী — ১৩৬১, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রমোদ সেনগুপ্ত ১৯৫৭, *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রো, কলিকাতা

প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী ২০১৬, *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, (সম্পাদিত) প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

ফয়েজ আলম ২০১৪, *উত্তর-উপনিবেশী মানস*, ২য় সংস্করণ সংবেদ, ঢাকা

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ ১৪১৪, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* (সম্পাদিত), একাদশ সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা

বসুধা চক্রবর্তী ১৩৬৭, *মানবতাবাদ*, প্রথম প্রকাশ, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা

বাদল সরকার ১৪২১, *নাটক সমগ্র* প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা

১৪২০ *নাটক সমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ড মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

বিজন ভট্টাচার্য ২০১৪, *নবান্ন*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা

বিনয় ঘোষ ১৩৫৫, *নবজাগৃতি*, প্রথম সংস্করণ, *বাংলার* ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বিপান চন্দ্র ১৯৬০, *আধুনিক ভারতঃ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ*, শক্তি রাহা, সৈকত রুদ্র, হিমাচল চক্রবর্তী ও গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়, (অনুবাদ ও সম্পাদনা) পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১৩, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পরিমার্জিত সংস্করণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

২০২৪, *বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্যসমগ্র* (সম্পাদিত), দ্বিতীয় মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেকীন ২০১১, *বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবার্ষিক স্মরণ*, (সম্পাদিত), বর্ণায়ন, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু ১৩৮৫, *মহাভারতের কথা*, বুদ্ধদেব বসু এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিডেট ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা

১৯৬০, *আমার ছেলেবেলা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট

২০১৩, *বুদ্ধদেব বসুর চিঠিঃ কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে*, দময়ন্তী বসু সিং (স্মৃতি, সূত্র, সম্পাদনা) বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা

২০১৮, *আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর, ঢাকা

২০২৩, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল ২০০৭, *কবির উপন্যাস*, ঐতিহ্য, ঢাকা

২০১২, *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২০১৩, *কবির চেতনা: চেতনার কথকথা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

২০১৪, *বুদ্ধদেব বসু নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, (সম্পাদিত) অবসর, ঢাকা

২০১৪, *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, প্রথম প্রকাশ, অবসর, ঢাকা

২০১৪, *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব* (সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা

২০২১, *রবীন্দ্রনাথের এশিয়া দর্শন*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী

২০০৪, *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা ১৪১২, *দু-চারিটি অশ্রুজল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

২০১১, *প্রভাতসূর্য* (সম্পাদিত), নবযুগ, ঢাকা

২০২১, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি*, কথাপ্রকাশ, কথাপ্রকাশ প্রথম সংস্করণ, ঢাকা

মুনিরা সুলতানা

২০২১, *বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসমালোচনা মতাদর্শ ও গদ্যশৈলী*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

২০২৩, *দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ — ২০১৩, *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* (সম্পাদিত), দ্বাদশ মুদ্রণ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মার্টিন কেম্পশেন — ২০১৮, *অনুভবে অনুধ্যানে রবীন্দ্রনাথ মার্টিন কেম্পশেন*, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), দ্বিতীয় মুদ্রণ, কারিগর, ৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা

মানবেন্দ্রনাথ রায় — ১৯৬৩, *নব মানবতাবাদ*, স্বদেশরঞ্জন দাস (অনূদিত) দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

মাহবুব সাদিক — ১৯৯১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০০৯, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

২০১২, *কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা

মোমেনুর রসুল — ২০২২, *সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ব্যক্তি-সমাজ-রাজনীতি ও শিল্প-ভাবনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম — ২০২৪, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ২য় সংস্করণ ২য় মুদ্রণ, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান — ২০০৮, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৯০৮, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

১৪২৫, *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা

১৩৫৪, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, নতুন সংস্করণ, কলকাতা

১৯০৮, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০২৩, *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিয়োলজি সস্যুর থেকে দেরিদা*, তৃতীয় মুদ্রণ, তবুও প্রয়াস, কলকাতা

রাজশেখর বসু ১৪১৮, *মহাভারত সারানুবাদ*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, কলিকাতা

রাজীব সরকার ২০১৯, *বহুমাত্রিক বুদ্ধদেব বসু বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে*, কথাপ্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, *উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ* ১ম খণ্ড (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ নাট্যচিন্তা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

শঙ্খ ঘোষ ২০০৯, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা

১৪২১, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, প্যাপিরাস, কলকাতা

শম্ভু মিত্র ১৪২২, ত্রয়োদশ সংস্করণ, *চাঁদ বণিকের পালা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

শামসুজ্জামান খান ২০১২, *সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ* (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শান্তনু কায়সার ১৯৮৫, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২০১৩, *কাব্য ও নাট্য কাব্যনাট্য*, প্রথম প্রকাশ, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

শাশ্বত ভট্টাচার্য ২০১০, *রবীন্দ্রনাট্যধারার প্রথম পর্যায়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শিশিরকুমার দাশ ২০১৩, *মধুসূদনের কবিমানস*, প্রথম এবং মুশায়েরা সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭২, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, ১ম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা

সচ্চিদানন্দ দাস ২০১৫, *বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা

সজনীকান্ত দাস ২০০৭, বাং*লা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৪, *ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার*, প্রথম প্রকাশ, আশা প্রকাশনী, কলকাতা

সনৎকুমার মিত্র ১৩৬০, *শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক*, প্রথম প্রকাশ, জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩/২ মণীন্দ্র মিত্র রোড, কলিকাতা

সমীর সেনগুপ্ত ১৯৯৮, *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপধ্যায় ১৯৮৪, *আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র-চিত্রকল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

২০০৮, বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সাইফুল ইসলাম ২০০৩, *রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৩৬৯, *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব*, ২য় সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

২০০৬, *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা*, দেজ পাবলিশিং কলকাতা

সেলিম আল দীন ১৯৯৬, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সোহানা মাহবুব ২০২০, *অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন ২০১৭, *রবীন্দ্রচেতনায় নারী*, কথাপ্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঢাকা

সুকুমার সেন ২০১৫, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা

সুখেন বিশ্বাস ২০১০, *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১১, *নন্দনতত্ত্বের প্রাচ্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪১৬, *পৌরাণিক অভিধান* (সংকলিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সুনীল কুমার সরকার ১৯৬৫, *অবভাস-বিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ*, অ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন ২০১৪, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম ধ্রুবপদ প্রকাশ, ধ্রুবপদ ঢাকা

সৈয়দ আবুল মকসুদ ২০১১, *ঢাকার বুদ্ধদেব বসু*, প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক ২০১২, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, পুনর্মুদ্রণ, চারুলিপি প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান ২০০৮, *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হরপ্রসাদ মিত্র ১৩৭০, *রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ* প্রথম খণ্ড, ডি, এম. লাইব্রেরি, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা

হাসনাত আবদুল হাই ২০১২, *সাঈদ আহমদ রচনাবলি ১ম খণ্ড*, (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হিমেল বরকত ২০১৩, *সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা

হেমন্ত নাথ দাশগুপ্ত ১৩৫৪, *বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত*, প্রকাশক: শ্রীমনীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, ১২৪/৫ বি রসা রোড, কলিকাতা

হুমায়ুন কবির ২০১৭, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* হায়াৎ মামুদ (অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা) প্রথম বিপিএল প্রকাশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

হোসনে আরা ২০১৮, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ক্ষুদিরাম দাস ২০০৫, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ক্ষেত্রগুপ্ত ১৩৬৬, *প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থ নিলয়, ১৭২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

ক্ষেত্রগুপ্ত ২০১৫ *মধুসূদন রচনাবলী* (সম্পাদিত) সপ্তম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা

খ. বাংলা প্রবন্ধ (বর্ণানুক্রমিক)

কৃষ্ণা ঘোষ ২০১৯, 'রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ও প্রতিবাদ', THE IMPRESSION A Journal on multidisciplinary studies, Annual Issue (ISSN-2278-2699)

গৌতম দত্ত ২০২৫, 'বুদ্ধদেব বসুর নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ', সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ১-২

তারক পুরকাইত 2016, Pratidhwanti the Echo 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাস: কারণ অনুসন্ধান', Volume- V, Issue-11

ফাহমিদা সুলতানা তানজী ২০২৪ সেপ্টেম্বর, 'থিয়েটারে পোশাক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে গুরুত্ব', সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মনীষা পাল ২০২৫, 'পুরাণ ও আধুনিকতার মেলবন্ধন: বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক', Trisangam International Journal, Volume-v, Issue-1

মো. মুসফিকুর রহমান ২০২৫, 'বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রবণতা: প্রসঙ্গ ভূগোল ও চরিত্রায়ণ', ফিনিক্স, পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন (ISSN 2249−7404)

শিশির ভট্টাচার্য্য ২০০৩, 'সেমিওলজি ও ঈশ্বর', *একবিংশ পত্রিকা*, খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত) ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভাশিস সিনহা শ্রাবণ ১৪১৯, 'নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ' খেয়া রবীন্দ্র সংকলন, পুলক হাসান সম্পাদিত, ৫৩তম সংখ্যা

সাদ কামালী ২০১৮, '*রবীন্দ্রনাথের গীত কাব্যনাটক পুরাণ উপলব্ধি ও পৌরাণিক আখ্যানের নবরূপায়ণ*' অগ্রবীজ সাহিত্য ও চিন্তার কাগজ, সম্পাদক চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ, এগারো বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সুমিতা ভট্টাচার্য ২০২৫, ''বুদ্ধদেব বসুর ''প্রথম পার্থ': কর্ণপ্রসঙ্গ'', ফিনিক্স, পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন, (ISSN- 2249-7404)

গ. ইংরেজি গ্রন্থ (Alphabetical Order)

Aristotle's Poetics 1819, N. Bliss (translated) 21, water lane, fleet street, London

Dhaka University Institutional Repository

Astrida Neimanis — 2017, *Bodies of water Posthuman Feminist Phenomenology*, Bloomsbury Academic, New York

August Strindberg — 1924 *Miss Julie & other Plays,* Boni and liveright inc, New York

Bill Ashcroft — 2007, *Post-colonial studies The Key concepts,* Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Routledge, Second edition London and New York

Bertolt Brecht — 1939, *Mother courage and her children*

Bernard Shaw — 1991, *Pygmalion*, Jacqueline Fisher (edited) Logman

C. Day Lewis — 1961, *The poetic Image*, Jonathan Cape Thirty Bedford square, Tenth impression, London

Constantin, Stanislavsky — 1936, *An Actor Prepares* Elizabeth Elizabeth Reynolds Hapgood (translated) Two Manchester Square, London

Daniel Chandler — 2007, 2nd Edition, *Semiotics The Basics*, Routledge, Taylor & Francis Group London and New York

David woodruff smith, Amie L. Thomasson (editors) — 2005, *Phenomenology and philosophy of Mind,* Consciousness with reflexive content, David Woodruff Smith, USA oxford up Inc

Denis Donoghue — 1966, *The Third Voice*, Princeton University Press, New Jersy

Dhaka University Institutional Repository

Dragos simandan — 2024, *Actor-network theory,* Springer Nature

Edward W. Said — 1994, *Culture and Imperialism*; vintage Books, New York

Edmund Husserl — 1973, *The Idea of Phenomenology*, William P. Alston and George Nakhnikian (translated) Fifth impression, The Hague Martinus Nijhoff

Ferdinand De Saussure — 1959, *Course in General Linguistics*, Charles Bally and Albert Sechehaye (edited) Philosophical library, New York

Frantz Fanon — 1986, *Black Skin, White Masks,* Charles Lam Markmann (translated), Pluto Press; 345 Archway Road, London

Gerard Genette — 1980, *Gerard Genette Narrative Discourse An Essay in Method*, Jane E. Lewin (translated) Cornell university press, Ithaca, New York

Homi K. Bhabha — 1994, *The Location of Culture,* Routledge, II New Fetter Lane, London

John Howard Lawson — 1960, *Theory And Technique of Playwriting*, Hill and WANG, New York

Joseph David Clark — 2022, *Posthumanism in Literary Studies: The Nomad and Anthropocentrism,* Bangor University

Dhaka University Institutional Repository

Lisa M. Given	2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods* volume 1& 2, A Sage Reference publication
Longinus	1907, *On The Sublime*, W. Rhys Roberts (edited), second edition, Cambridge: at the university press
L.V. Redman & A.V.H. Mory	1933, *The Romance of Research*, The Wiliams & Wilkins Company
Merleau-Ponty	2012, *Phenomenology of Perception Maurice Merleau-Ponty,* Donald A. Landes translator Routlegde, Taylor & Francis Group, London and New York
Mikhail Bakhtin, V.N. Voloshinov	1973, *Marxism and the philosophy of Language*,seminar press, New York
Mieke Bal	2017, *Narratology Introduction to the theory of Narrative*, university of Tronto press, Toronto Buffalo London
M.N. Roy	1981, *New Humanism*, second edition 10), Ajanta Publications, Third Reprint India
Nicolas Bencheri	2017, The Internation Encyclopedia of Organizational communication, Actor-Network Theory, New York
Ngugi wa Thiong'o	1994, *Decolonising the Mind*, Zimbabwe Publishing House (Pvt.) Ltd. Reprinted

Dhaka University Institutional Repository

P. Gurrey — 1968, *The Appreciation of Poetry*, Oxford university press, seventh print, London

Peter Barry and Helen Carr (edited) — 2007, *Beginning Theory*, 3rd edition, Manchester university Press

Peter Huhn, Jan Christoph Meister, John Pier, wolf Schmid (edited) — 2014, *Handbook of Narratology,* 2nd edition, volume i & ii, Boston

Richard Grusin (edited) — 2016, *Anthropocene Feminism*, university of Minnesota Press, London

Roland Barthes — 1986, *Elements of Semiology* Annette Lavers and Colin Smith (translated) Eleventh printing, Hill and wang, New York

Rosi Braidotti — 2013, *The Posthuman*, polity Press, 65 Bridge Street, Cambridge

Sir Percival Griffiths — 1952, *The British Impact on India*, first published, Macdonald, London

Terry Eagleton — 2003, Second Edition, *Literary Theory An Introduction*, Forth Printing, The university of Minnesota Press

Dhaka University Institutional Repository

T.S. Eliot

1921, *The Sacred wood: Essays on Poetry and criticism*, Alfred knopf, New York

1961, *On Poetry and Poets*, London: faber and faber

1950, *Poetry and Drama*, Faber & Faber Ltd, 24 Russell square London

1951, *Selected Essays*, London: faber and faber

1961, On *Poetry and Poets*, New York, The Noonday Press

1920, *The scared wood essays on poetry and criticism*, Methuen & Co. Ltd, London

Umberto Eco

1976, *A Theory of Semiotics*, Indiana University Press, London

William Henry Hudson

1913, *An Introduction to the study of Literature*, Second Edition Enlarged, London, George G. Harrap & Company

William Wordsworth & Coleridge

1802, *Lyrical Ballads*, Vol:1, Third Edition, London

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ইংরেজি প্রবন্ধ (Alphabetical Order)

K. Suresh Kumar — 2017, *Humanism Philosophy* Global Journal For Research Analysis, Voume-6, Issue: 9, Special Issue September

Kaniphnath Malhari kudale & Mr. Rupesh Kotte — 2024, *Exploring Phenomenology in Literary Analysis: A Novel Theoretical Framework*, Literary voice Peer Reviewed Journal of English studies, Nubmer-2, Volume-1

Samita Mishra — 2022, *'The Future of the literary text in the posthuman condition'* International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol-7, issue: 3, May-June

Thomas Groenewald — 2004, *A Phenological Research Design Illustrated*, International Journal of Qualitative Methods, 3 (1), April